ইযহারুল হক

(সত্যের বিজয়)

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ
ইবন খলীলুর রাহমান কীরানবী

Contents

ইযহারুল হক

(সত্যের বিজয়)

[খৃস্টধর্মের আলোচনায় প্রামাণ্য গ্রন্থ]

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

বহু ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা

রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রাহমান কীরানবী

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

Contents

ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) [২য় খণ্ড]
আল্লামা রহমাতুল্লাহ্ বিন খলীলুর রাহ্মান কীরানবী
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর অনূদিত
সম্পাদনা : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৪৪

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩২৭
ইফাবা প্রকাশনা : ২৪৪৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯১
ISBN : 984-06-1190-9

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
ফাল্গুন ১৪১৪
সফর ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ৯১১২২৭১

মূল্য-৪৫০/- টাকা মাত্র

IJHARUL HAQ (Victory of Truth) [Vol II] : Written by Allama Rahmatullah Ibn Khalilur Rahman Keranvi in Arabic and translated into Bangla by Dr. Khandker Abdullah Jahangeer and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207. February 2008

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Contents

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামই মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম। আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমেই এ ধর্মকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এটা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই যুগে যুগে অমুসলমানেরা এ শাশ্বত দীন এবং এর প্রবর্তক মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে বিরোধিতা করে আসছে।

১৭৫৭ সালের পর হতেই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বেদনাদায়ক অবসানের পর ইংরেজ শাসন শুরু। আর এ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারীরাও এ উপমহাদেশে তাদের মিশনারী কার্যক্রম জোরদার করে। ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডে। খ্রিস্টধর্মের যোগ্য প্রচারক সৃষ্টির মানসে 'বাসেল মিশনারী সেমিনারী' নামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদের সাথে সাথে আরবী ভাষা, পবিত্র কুরআন, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাসও শিক্ষা দেয়া হতো। এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিশনারীরা সাধারণ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে পুস্তক-পুস্তিকা এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে জোর তৎপরতা চালাতে থাকে।

মিশনারীদের এ তৎপরতা এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয়, যার ফলে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা এবং ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রহমান কীরানবী (র) যেন মহান আল্লাহ্র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী মুজাফফর নগর জেলার কীরানা নামক স্থানে মার্চ ১৮১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। বক্তৃতা, বিতর্ক ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের শাশ্বত বাণীকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বেশিরভাগ জবাব তিনি তাদেরই ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিস্ময়করভাবে মিশনারী অপতৎপরতা প্রতিহত করেন।

আল্লামা কীরানবী (র) মিশনারীদের এই অপতৎপরতার জবাব সম্বলিত 'ইযহারুল হক' (সত্যের বিজয়) শীর্ষক আরবী ভাষায় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাভাষী সুধী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ

গ্রহণ করে। অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট আলিম ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং সম্পাদনা করেছেন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সাবেক পরিচালক মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। গ্রন্থটি পাঠে সুধী পাঠকবৃন্দ দীন হিসেবে অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

আমি গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমিন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর খ্রিস্টান শাসকদের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারীগণও পূর্ণোদ্যমে ত্রিত্ববাদের প্রচার শুরু করে। শুধু প্রচারই নয়; ছলে বলে কৌশলে এ উপমহাদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনারীর পক্ষে উইলিয়াম কেরী কলকাতায় আগমন করেন। এরপর শুরু হয় বহুমুখী তৎপরতা। অগণিত মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা, ইসলামী শিক্ষার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি জবর দখল, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে মূল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা অপসারণ, ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্য উপস্থাপন এবং গোলাম মুহাম্মদ কাদিয়ানী ও অন্যান্য ভণ্ড ধর্মপ্রচারককে সাহায্য করে ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা। সর্বোপরি ইসলাম, কুরআন মজীদ ও মহানবী (সা)-এর কুৎসা রচনা করে বাংলা উর্দু-ফারসী ভাষায় ছাপিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য অপতৎপরতারই খণ্ডচিত্র। এরই সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারক মি. কার্ল গোটালেব ফান্ডার ১৮২৯ সালে খ্রিস্টান পাদরীদের গতানুগতিক মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদাগার সম্বলিত 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) নামক একটি পুস্তক রচনা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী আক্রমণ পরিচালনা করেন। মূল পুস্তকটি জার্মান ভাষায় রচিত হলেও এর উর্দূ ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকেন। এমনকি তারা এও দাবি করতে থাকেন যে, এ পুস্তকের যুক্তিগুলো খণ্ডন করার সাধ্য কোন মুসলমান আলিমের নেই।

মুসলমানদের এ দুর্দিনে এ উপমহাদেশে একজন বিশিষ্ট আলিম বহু ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (র) মি. ফান্ডার সহ খৃস্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রকাশ্যে বিতর্কের এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে মি. ফান্ডার এতে শর্তারোপ করেন যে, বিতর্কে পরাজিত হলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে আল্লামা কীরানবী (র) পরাজিত হলে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। পাঁচজন বিশিষ্ট বিচারক এবং অসংখ্য শ্রোতার উপস্থিতিতে তিনদিন এ বিতর্ক চলার কথা থাকলেও মি. ফান্ডার ও তাঁর দলবল পরপর দুদিন বিতর্কে পরাজিত হয়ে তৃতীয় দিন কিছু অযৌক্তিক শর্তারোপ করে বিতর্ক বন্ধ করে দেন।

Contents

[ছয়]

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, এরপর মি. ফান্ডার খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তুরস্কে যান। কিন্তু তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (র) তুরস্কে গেলে মি. ফান্ডার গোপনে সেখান থেকে পলায়ন করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'ইযহারুল হক' শীর্ষক পুস্তকটি 'মীযানুল হক'-এর জবাবে লিখিত হয়েছে। পুস্তকটিতে মূল খ্রিস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারের জবাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েই দেয়া হয়েছে। আল্লামা কীরানবী (র)-এর রচনার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের বিভ্রান্তিকর মিথ্যা অপপ্রচারের স্বরূপ বাইবেলের উদ্ধৃতি থেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন, এ প্রত্যাশা নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বইটির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশিষ্ট আলিম ও পণ্ডিত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধন করেছেন ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও সম্পাদক মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। মহান আল্লাহ্ মরহুম লেখক, এর অনুবাদক ও সম্পাদক এবং পুস্তকটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পুস্তকটির প্রথম খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হলো। বাংলাভাষী বিজ্ঞ পাঠক মহল পুস্তকটি পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সফল হয়েছে মনে করব।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক দীন বুঝার তৌফিক দিন। আমিন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

Contents

Contents

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খৃষ্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত বাক্যাবলির অসারতা প্রমাণ

এই অধ্যায়ের ভূমিকায় আলোচিত বিষয় থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যোহনের বাক্যাবলি রূপকতায় পরিপূর্ণ। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এমন অনুচ্ছেদ তাঁর পুস্তকে কমই পাওয়া যায়। ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, খৃষ্টের কথার মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা থাকত, যে কারণে তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা এবং তাঁর নিকটতম শিষ্যরাও অনেক সময় তিনি বুঝিয়ে না দিলে তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পারতেন না।

দ্বাদশ বিষয় থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যীশু তাঁর স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনোই তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা দ্ব্যর্থহীন ও সন্দেহমুক্তভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি এমন কিছুই বলেন নি যা থেকে তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়। এ বিষয়ে খৃস্টানগণ যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করেন তা মূলত যোহনের লেখা থেকে গৃহীত দ্ব্যর্থবোধক কিছু অস্পষ্ট কথা। এই কথাগুলো তিন প্রকারের :

(১) যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশ করা তাদের বাইবেলীয় উদ্ধৃতিগুলোর কিছু উদ্ধৃতি শাব্দিক অর্থে কখনোই যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে না। তারা কষ্টকল্পনা করে এগুলোর কিছু ব্যাখ্যা করেন এবং সেই ব্যাখ্যার দ্বারা যীশুর ঈশ্বরত্ব দাবি করেন। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যুক্তি, বিবেক ও বহুসংখ্যক খৃষ্টীয় বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের একত্ব এবং যীশুর মানবত্ব ও প্রেরিতত্ব প্রমাণিত। কাজেই এই প্রমাণিত সত্যের বিপরীতে এ সকল কষ্ট-কল্পনানির্ভর ব্যাখ্যা ও ধারণা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) খৃস্টানদের পেশকৃত দ্বিতীয় প্রকারের উদ্ধৃতি যীশুর অন্যান্য বাক্য বা নতুন নিয়মের অন্যান্য বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যাত। কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে তাঁদের ত্রিত্ববাদী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) খৃস্টানদের পেশকৃত তৃতীয় প্রকারের উদ্ধৃতি তাদের নিজেদের মতেই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আমাদের বক্তব্য হলো, এ সকল বাক্যকে যেহেতু ব্যাখ্যা করতেই হবে, সেহেতু এগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে যুক্তি, বিবেক ও অন্যান্য বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। ত্রিত্ববাদী ব্যাখ্যা কখনোই এরূপ হতে পারে না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে তাদের পেশকৃত প্রমাণাদি সবই অস্পষ্ট অথবা অপ্রাসঙ্গিক। এজন্য আমি এখানে তাদের সকল প্রমাণ উল্লেখ করছি না; বরং তাদের অধিকাংশ প্রমাণ আমি এখানে উল্লেখ করব এবং সেগুলোর অসারতা আলোচনা করব। পাঠক সেগুলো থেকেই বাকিগুলোর অবস্থা বুঝতে পারবেন।

খৃস্টানদের প্রথম দলিল

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের পেশকৃত প্রথম দলিল হলো, বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God) কথাটির প্রয়োগ।

দু'টি কারণে এই দলিলটি অত্যন্ত দুর্বল :

প্রথমত, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির বিপরীতে বাইবেলে বারংবার যীশুকে 'মনুষ্য পুত্র' (son of man) বলা হয়েছে যা পাঠক ইতোপূর্বে জানতে পেরেছেন। এছাড়া তাঁকে বারংবার 'দাউদের পুত্র' বা 'দাউদ সন্তান' (son of David) বলেও অভিহিত করা হয়েছে।[৯] কাজেই 'ঈশ্বরের পুত্র' ও 'দাউদের পুত্র' এই তিনটি অর্থের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় করা জরুরী যাতে বুদ্ধি-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক ও অসম্ভব-অবাস্তব কোন অর্থ না হয়।

দ্বিতীয়ত, 'ঈশ্বরের পুত্র' (son of God) কথাটির মধ্যে 'পুত্র' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ সকল জ্ঞানী একমত যে, আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থে পুত্র বলতে বুঝানো হয় পিতামাতা উভয়ের দৈহিক জৈবিক মিলনের মাধ্যমে যার জন্ম। এ অর্থ 'ঈশ্বরের পুত্র' (son of God) -এর ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে এমন একটি রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে যা খৃস্টের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের ব্যবহার থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে 'ধার্মিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ আয়াতে যীশুর ক্রুসবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : "আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

একই ঘটনাই উক্ত শতপতির উপর্যুক্ত বক্তব্য লূক তাঁর সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৭ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। লূকের ভাষা : "যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।"

৯. দেখুন মথি ১/১, ৯/২৭, ১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫ ২২/৪২; মার্ক ১০/৪৭, ৪৮; লূক ১৮/৩৮, ৩৯।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মার্ক যেখানে 'ঈশ্বরের পুত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেখানে লূক 'ঈশ্বরের পুত্র'-র পরিবর্তে 'ধার্মিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশু ও যীশুর যুগের মানুষদের ভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির অর্থ ছিল 'ধার্মিক'।

বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশু ছাড়া অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনভাবে 'পাপী'র ক্ষেত্রে 'দিয়াবলের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।...৮৮ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; ৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও... ।"

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদীগণ ও খৃষ্টের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয় : "৪১ তোমাদের পিতার কার্য তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। ৪২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে...৪৪ তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা।"

এখানে আমরা দেখছি যে, ইহূদীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র একজনই তাদের পিতা, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। যীশু তাদেরকে বললেন, না, বরং তোমাদের পিতা হলো দিয়াবল। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ অথবা দিয়াবল তাদের প্রকৃত পিতা নয়। পুত্র শব্দটি এখানে শাব্দিক বা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই রূপক অর্থ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। ইহূদীদের বক্তব্যের অর্থ হলো, আমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী। আর যীশুর কথার অর্থ হলো, তোমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী নও, বরং তোমরা অধার্মিক ও দিয়াবলের আদেশ পালনকারী।

যোহনের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না; কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত। ১০ ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পড়ে (the children of God are manifest, and the children of the devil)।"

উক্ত পত্রের ৪ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God)"।

উক্ত পত্রের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God); এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে; সে তাহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে (every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him); ২ ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানগণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।"

রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।"

ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৪ তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর, ১৫ যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও।"

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো সুস্পষ্টরূপে আমাদের দাবি প্রমাণ করে। এই অধ্যায়ের ভূমিকার চতুর্থ বিষয় থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বাইবেলে কাউকে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' বললেও তাতে প্রমাণিত হয় না যে, সে সত্যই ঈশ্বর বা প্রকৃত অর্থেই সে ঈশ্বর। তাহলে 'ঈশ্বরের পুত্র' বা অনুরূপ শব্দ বললে কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই 'ঈশ্বর পুত্র' বা ঈশ্বর ? বিশেষত যখন আমরা দেখি যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে রূপক অর্থের ব্যবহার খুবই বেশি। এই অধ্যায়ের ভূমিকায় পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে 'পিতা' ও 'পুত্র' শব্দদ্বয়কে অসংখ্য ও অগণিত স্থানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

(১) লূক তাঁর সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে খৃস্টের বংশাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন : যীশু যোষেফের পুত্র এবং আদম ঈশ্বরের পুত্র।[১০]

এখানে সুস্পষ্ট যে, আদম প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না এবং ঈশ্বরও ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু পিতামাতা ছাড়া তাঁর জন্ম হয়েছিল এজন্য লূক তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর লূককে পুরস্কৃত করুন! এখানে তিনি পিতৃত্ব বর্ণনায় ভাল পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। যীশু যেহেতু শুধু পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন, সেহেতু তিনি তাঁকে যোষেফের পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আদম যেহেতু পিতামাতা উভয়

১০. লূক ৩/২৩-৩৮।

ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেন, সেহেতু তিনি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(২) যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু মোশিকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন : "২২ আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। ২৩ আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।"

এখানে দুই স্থানে 'ইস্রায়েল'-কে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, উপরন্তু তাকে প্রথমজাত পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) গীতসংহিতার ৮৮ (প্রচলিত বাইবেলে ৮৯) গীতে দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "১৯ একদা তুমি নিজ সাধুকে দর্শন দিয়া কথা কহিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, আমি সাহায্য করিবার ভার একজন বীরকে সমর্পণ করিয়াছি, আমি প্রজাদের মধ্যে মনোনীত একজনকে উন্নত করিয়াছি। ২০ আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি, আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি (with my holy oil have I anointed him)।...২৬ সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর (Thou art my father, my God), ও আমার পরিত্রাণের শৈল। ২৭ আবার আমি তাহাকে প্রথমজাত করিব, পৃথিবীর রাজগণ হইতে সর্বোচ্চ করিয়া নিযুক্ত করিব।"

এখানে দায়ূদকে বীর (mighty), মনোনীত (chosen), অভিষিক্ত অর্থাৎ মসীহ (The Messiah) বা খৃস্ট (The Christ, The Anointed), ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (firstborn) ও পৃথিবীর রাজাগণ হইতে সর্বোচ্চ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(৪) যিরমিয় ৩১ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত পুত্র।"

এখানে যোষেফের (ইউসুফ আ) দ্বিতীয় পুত্র ইফ্রয়িমকে ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই, কারো ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' বা অনুরূপ শব্দ বলা হলে যদি তাতে তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে ইস্রায়েল, দায়ূদ ও ইফ্রয়িমই ঈশ্বরত্বের বেশি অধিকারী বলে প্রমাণিত হবে; কারণ তাদেরকে 'ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র' বলা হয়েছে। আর অবরাহাম, মোশি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রথমজাত পুত্রই সম্মান ও মর্যাদার সর্বাধিক অধিকার ভোগ করেন। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই এর প্রচলন রয়েছে।

এখানে খৃস্টানগণ বলতে পারেন যে, যীশুকে নতুন নিয়মের কোন কোন পুস্তকে 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র (only begotten son)' বলা হয়েছে। এতে তাঁর বিশেষত্ব

বুঝা যায়। কিন্তু আমরা বলব যে, এক্ষেত্রে 'একজাত' বা 'একমাত্র' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হতে পারে না। কারণ ঈশ্বর নিজেই এই 'একজাত পুত্রের' আরো অনেক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে তিনজনকে 'প্রথমজাত' বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'পুত্র' বা 'প্রথমজাত' শব্দের ন্যায় 'একজাত' শব্দেরও রূপক অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

(৫) ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে শলোমনের বিষয়ে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে"।

যদি কারো সম্পর্কে 'ঈশ্বরের পুত্র' বললে তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে ঈশ্বরত্বের বিষয়ে যীশুর চেয়েও শলোমনের দাবি অধিক জোরালো বলে প্রমাণিত হবে; কারণ শলোমন যীশুর পূর্ববর্তী এবং তাঁর পিতামহদের অন্যতম।

(৬) দ্বিতীয় বিবরণের ১৪ অধ্যায়ের ১ আয়াতে, হোশেয় ১ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে ইস্রায়েল সন্তানদের সকলকেই 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'ঈশ্বরের সন্তান' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(৭) যিশাইয় ৬৩ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন: "তুমি ত আমাদের পিতা; যদ্যপি অব্রাহাম আমাদিগকে জানেন না, ও ইস্রায়েল আমাদিগকে স্বীকার করেন না, তথাপি তুমি সদাপ্রভু আমাদের পিতা, অনাদিকাল হইতে আমাদের মুক্তিদাতা, এই তোমার নাম।"

উক্ত পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে: "কিন্তু এখন, হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের পিতা"।

এভাবে যিশাইয় ভাববাদী তাঁর নিজের ও সকল ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে বললেন যে, 'ঈশ্বর আমাদের পিতা'।

(৮) ইয়োব ৩৮ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে রয়েছে: "তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।"

(৯) ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ধার্মিক, যীশুর প্রতি বিশ্বাসী, প্রেমিক ও ঈশ্বরের নির্দেশ মান্যকারী ও সৎকর্মশীলদেরকে বাইবেলে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১০) গীতসংহিতার ৬৭ (পরবর্তী সংস্করণে ৬৮) গীতের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা।"

এখানে ঈশ্বরকে পিতৃহীনদের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১১) আদি পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে: "২ তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।

৪ তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের নিকটে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।"

এখানে 'ঈশ্বরের পুত্রেরা' বলতে অভিজাতদের পুত্রদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মনুষ্যদের কন্যাগণ' বলতে সাধারণ মানুষদের কন্যাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এজন্য ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে অনুবাদক প্রথম আয়াতটির অনুবাদে লিখেছেন : "২ তখন অভিজাতদের পুত্রেরা সাধারণ মানুষদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলে 'অভিজাত মানুষের পুত্র'-কেও 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, 'অভিজাত মানুষ'-কেও বাইবেলের পরিভাষায় 'ঈশ্বর' বলা যায়।

(১২) বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে অনেক স্থানেই ঈশ্বরকে 'তোমাদের পিতা' বলা হয়েছে। যীশুর শিষ্যদেরকেও এভাবে বলা হয়েছে এবং অন্যদেরকেও এভাবে বলা হয়েছে।

(১৩) পিতা-পুত্রের ন্যায় সুসম্পর্কিত হওয়ার কারণে কখনো কখনো বাইবেলে 'পিতা' বা 'সন্তান' শব্দকে বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ইতোপূর্বে পাঠক দেখেছেন, শয়তানকে 'মিথ্যার পিতা' বলা হয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে যীশু ইহূদীদের সম্পর্কে বলেছেন : 'নরকের সন্তান' (child of hell) [১১] ও 'যিরূশালেমের সন্তান'।[১২]

লূকলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে যীশু জগৎমুখি মানুষদেরকে "জগতের সন্তান (The children of this world)" বলেছেন এবং স্বর্গবাসীদেরকে 'ঈশ্বরের সন্তান (children of God)' ও 'পুনরুত্থানের সন্তান' (children of the resurrection) বলেছেন।[১৩]

১ থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে থিষলনীকীয়দেরকে 'দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান' (the children of light, and the children of the day) বলা হয়েছে।

---

১১. মথি ২৩/১৫ : বাংলা অনুবাদে 'নারকীয়' লেখা হয়েছে।

১২. মথি ২৩/৩৭ : হা যিরূশালেম..তোমার সন্তানদিগকে...।

১৩. লূক ২০/৩৪-৩৬ : ৩৪ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবাহিতা হয়। ৩৫ কিন্তু যাহারা সেই জগতের এবং মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহ করে না এবং বিবাহিতাও হয় না। ৩৬ তাহারা আর মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের সমতুল্য, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান।

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানগণের দ্বিতীয় দলিল

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে রয়েছে; "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের; তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।"

এখানে যীশু স্পষ্টত ঈশ্বরত্ব দাবি করেন নি। তবে খৃস্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে এ কথাটির ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, এ কথাটির ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কারণ বাহ্যত তিনি এই জগতেরই মানুষ ছিলেন। অথচ তিনি বলছেন যে, তিনি এ জগতের নন। এতে বুঝা যায় যে, একটি গুঢ় রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি এ কথা বলেছেন। আর তা হলো যে, তিনি মানুষরূপী হলেও মানুষ নন, বরং স্বর্গের বা ঊর্ধ্বজগতের ঈশ্বর।

তাদের এই ব্যাখ্যা দুই কারণে বাতিল :

প্রথমত, এই ব্যাখ্যা যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক। তেমনিভাবে তা নতুন ও পুরাতন নিয়মের অগণিত বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত, যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলেছেন। যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতের যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন : "তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব বলিয়া ভালবাসিত; কিন্তু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।"

যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।... ১৬ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।"

এভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন যে, তাঁরা এই জগতের নন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁদেরকে তাঁরই মত একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যেমন এ জগতের নন, তাঁর শিষ্যরাও ঠিক তেমনি এ জগতের নন। খৃস্টানদের দাবি অনুসারে, যদি এ জগতের না হওয়ার কারণে ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে যীশুর শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে (না'উযু বিল্লাহ!)।

যীশুর এই বাক্যের সঠিক অর্থ হলো, তোমরা পার্থিব জগতের লোভ-লালসার অনুসারী ও জাগতিক স্বার্থান্বেষী। আর আমি তদ্রূপ নই, বরং আমি ঊর্ধ্বজগতের বা স্বর্গের মর্যাদার অভিলাসী এবং ঈশ্বরের প্রেম অনুসন্ধানী। এরূপ রূপক ব্যবহার সকল ভাষাতেই বিদ্যমান। ধার্মিক ও সংসারবিমুখ মানুষদেরকে সকল দেশে এবং সকল ভাষাতেই বলা হয় 'এরা এ জগতের মানুষ নয়।'

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের তৃতীয় দলিল

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আমি ও পিতা, আমরা এক (I and my Father are one)"।

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, এই বাক্য যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। দুই কারণে তাদের এই দাবি বাতিল :

প্রথম কারণ : প্রকৃত অর্থে খৃস্ট এবং ঈশ্বর কখনোই এক হতে পারেন না। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেও তিনি ও ঈশ্বর এক ছিলেন না। কারণ খৃস্টের একটি মানবীয় আত্মা ও দেহ ছিল। খৃস্টানগণও বিশ্বাস করেন যে, এ দিক থেকে তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক ছিলেন। এজন্য তারা বলেন যে, 'আমি ও পিতা এক' এই কথাটি বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, বরং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি ও ঈশ্বর এক। মানুষ হিসেবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। আবার ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। এ দিক থেকে তিনি ও পিতা এক ছিলেন।

তাদের এই ব্যাখ্যা অন্তসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র। কারণ খৃস্টের বাক্য হয় তার প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে অথবা যীশুর অন্যান্য বাক্য, অন্যান্য ঐশ্বরিক গ্রন্থের বাক্য এবং যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের এই ব্যাখ্যা জ্ঞান ও যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক এবং বাইবেলের অন্যান্য বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় কারণ : এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন : "২১ যেন তাহারা সকলে এক হয় (they all may be one); ২১ পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে (এক)[১৪] থাকে (that they also may be one in us); যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক (that they may be one, even as we are one); ২৩ আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে[১৫] (I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one)।"

এখানে যীশু বলেছেন : "যেন তাহারা সকলে এক হয়", "যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা এক" এবং "যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে"। এ

১৪. (এক) শব্দটি বাংলা বাইবেলে উল্লেখ করা হয় নি, তবে ইংরেজিতে রয়েছে।

১৫. বাংলা বাইবেলের ভাষ্য : যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়।

বাক্যগুলো থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা সকলে এক ছিলেন। দ্বিতীয় বাক্যে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, 'ঈশ্বরের সাথে তাঁর একত্ব' যেরূপ 'তাঁদের মধ্যকার একত্ব'-ও ঠিক তদ্রূপ।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সাথে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না।

বস্তুত, 'ঈশ্বরের সাথে এক' হওয়ার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা। এই ঐক্যের মূল পর্যায়ে খৃস্ট, প্রেরিতগণ ও সকল বিশ্বাসী সমান। পার্থক্য হলো ঐক্যের শক্তি ও দুর্বলতায়। ঈশ্বরের সাথে এরূপ ঐক্যে খৃস্ট অন্যদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও তাঁর ঐক্য পূর্ণতর।

ঐক্য ও অংশীদারত্ব বলতে যে এই অর্থ বুঝানো হয়েছে তা বাইবেল থেকেই প্রমাণিত হয়। যোহন তাঁর প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন : "৫ আমরা যে বার্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। ৬ আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা (অংশীদারিত্ব) আছে (We have fellowship with him), আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না। ৭ কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা (অংশীদারিত্ব) আছে (We have fellowship one with another)।"

ফার্সী অনুবাদ বাইবেলে এখানে সহভাগিতা বা অংশীদারিত্ব শব্দের পরিবর্তে 'ইত্তিহাদ' (union) বা 'একত্ব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে : "আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমরা এক... তবে পরস্পরে আমাদের এক হইয়াছি...।" এ থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া বা ঈশ্বরের সহভাগী বা অংশীদার হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের নির্দেশ মত জ্যোতি ও পূণ্যের পথে চলা।

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের চতুর্থ দলিল

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯... যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন? ১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।"

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, খৃস্টের এই কথাগুলো : "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে (he that hath seen me hath seen the Father)", "আমি

Contents

পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন (I am in the Father, and the Father in me)" এবং "পিতা আমাতে থাকিয়া (the Father that dwelleth in me) আপনার কার্য সকল সাধন করেন"—এগুলো প্রমাণ করে যে, খৃস্ট ও ঈশ্বর একই সত্ত্বা ছিলেন।

তাদের এই দাবি দুটি কারণে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রথমত, খৃস্টানগণও বিশ্বাস করেন যে, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কাজেই যীশুর কথা তাদের মতেই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য তারা ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে ঈশ্বরকে দেখা বলতে ঈশ্বরকে জানা বুঝানো হয়েছে। আর খৃস্টকে তাঁর দৈহিকরূপে দেখলে বা তাঁর দেহকে জানলে ঈশ্বরকে দেখা বা জানা হয় না, বরং তাদের মতেই যীশুর ঈশ্বরত্বের জ্ঞান লাভ করলেই ঈশ্বরকে জানা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে যীশুর মধ্যে পিতা ঈশ্বরের অবস্থান বা অবতরণের যে অর্থ রয়েছে তাও অধিকাংশ খৃস্টানদের মতেই শাব্দিক ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তার ব্যাখ্যা করতে হবে। এ সকল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা বলেন, যীশু একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। এজন্য দ্বিতীয় বিবেচনায়, অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরত্বের বিবেচনায় তাঁর এই তিনটি বাক্যই সঠিক।

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টের এই বাক্যগুলো খৃস্টানদের নিকটেই প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে গৃহীত নয়, বরং তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষে গৃহীত। ইতোপূর্বে আমরা বারংবার বলেছি যে, কোন বাক্য যদি তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ না করে তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে সেই ব্যাখ্যা অবশ্যই যুক্তি, জ্ঞান ও অন্যান্য ঐশ্বরিক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর এই বাক্যগুলোর ব্যাখ্যায় খৃস্টানগণ যা কিছু বলেন তা সবই অন্যান্য ঐশ্বরিক বাক্য এবং জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে যীশু বলেছেন : "সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি।" তৃতীয় দলিলের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে।"

খৃস্টানদের ব্যাখ্যা অনুসারে এই বাক্যগুলোর দ্বারা যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়! কারণ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যার মধ্যে কেউ অবস্থান করছেন তিনি যদি কোথাও অবস্থান করেন, তবে তার মধ্যের সত্ত্বাও তথায় অবস্থান করবেন। আর যীশু ও ঈশ্বর এক এবং যীশুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। সেই যীশু ও শিষ্যগণ এক এবং শিষ্যগণের মধ্যে যীশু অবস্থান ও অবতরণ করেছেন। কাজেই শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার!

১ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে[১৬] বলা হয়েছে : "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ ? আর তোমরা নিজের নও।"

২ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে রয়েছে : "আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক ? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, (যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব (ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them...)"।

ইফিষীয় ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে রয়েছে : "সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের মধ্যে (in you all)[১৭] আছেন।

কারো মধ্যে ঈশ্বরের থাকা বা অবস্থান করা যদি উক্ত ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের একত্ব (union) বা উক্ত ব্যক্তির ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে, তবে বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর, বরং করিন্থের বাসিন্দাগণ সকলেই ঈশ্বর এবং ইফেসাস (Ephesus) অঞ্চলের সকল বাসিন্দাই ঈশ্বর! কোন খৃস্টান কি তা মানবেন!

প্রকৃত সত্য কথা হলো, ছোট যদি বড়র অনুসারী হন, যেমন তার প্রেরিত, তার ছাত্র বা তার দাস হন, তবে ছোটর প্রতি যে সম্মান-অসম্মান, মর্যাদা-অমর্যাদা, ভালবাসা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তা সব রূপকভাবে বড়র প্রতিই বর্তায়। আর এজন্যই প্রেরিতদের সম্পর্কে যীশু বলেন : "যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে।" মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪০ আয়াতে এ কথাটি রয়েছে।

ছোট্ট শিশুটির বিষয়ে তিনি বলেন : "যে কেহ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" লূকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৪৮ আয়াতে এ কথা রয়েছে।

যে ৭০ ব্যক্তিকে তিনি দুই জন করে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন তাদের বিষয়ে তিনি বলেন : "যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" লূকলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে এ কথা রয়েছে।

---

১৬. বাংলায় শেষ বাক্যটি ২০ আয়াতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. বাংলা বাইবেলে "সকলের অন্তরে"।

মথির সুসমাচারের ২৫ অধ্যায়ে পুনরুত্থান ও বিচার দিবসে মনুষ্যপুত্রের ডানে ও বামে অবস্থানকারীদের বিষয়েও এ ধরনের কথা বলা হয়েছে।[১৮]

এ কারণেই যিরমিয় ভাববাদীর ভাষায় ঈশ্বর বলেছেন : "বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আমাকে গ্রাস করিয়াছেন, আমাকে চূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে শূন্যপাত্রস্বরূপ করিয়াছেন, আমাকে নাগবৎ গ্রাস করিয়াছেন, আমার উপাদেয় ভক্ষ্য দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে দূর করিয়াছেন।" যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫১ অধ্যায়ে এ কথা রয়েছে।[১৯]

এই অর্থেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "যারা তোমার বায়আত (আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্‌রই বায়আত গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর।"[২০]

এই অর্থেই প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (মৃ; ১২৭৩ খৃ) বলেন: "তুমি যদি আল্লাহ্‌র সাথে বসতে চাও তবে আল্লাহ্‌র ওলী বা প্রিয় মানুষদের সাথে বস।"

এই অর্থেই যীশু বলেছেন : "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।" অর্থাৎ যে আমাকে বুঝেছে ও জেনেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রেরণকারী ঈশ্বরকেই জেনেছে।

এমনিভাবে কোন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান বা ঈশ্বরের মধ্যে কোন মানুষের অবস্থান, কোন মানুষের যীশুর মধ্যে অবস্থান এবং কোন মানুষের মধ্যে যীশুর অবস্থানের প্রকৃত অর্থ হলো তাঁদের আনুগত্য করা, মান্য করা। এই অর্থেই যোহনের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন (And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us)"[২১]।

পঞ্চম পর্যায়ের দলিল : যীশুর পিতা ব্যতিরেকে জন্ম

কখনো কখনো খৃস্টানগণ যীশুর কিছু অবস্থাকে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। কখনো তারা দাবি করেন যে, তিনি যেহেতু পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেহেতু এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র।

১৮. মথি ২৫/৩১-৪৬।
১৯. যিরমিয় ৫১/৩৪।
২০. সূরা : ৪৮ ফাতহ, ১০ আয়াত।
২১. ১ যোহন ৩/২৪।

এই প্রমাণ অত্যন্ত দুর্বল ও অসার। কারণ এই বিশ্ব সবই নতুন সৃষ্ট। খৃস্টানগণ বলেন যে, মাত্র ৬০০০ বছর পূর্বে এই বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে আসমান-যমিনের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে–জড়পদার্থ, গাছপালা এবং প্রাণী–সবই এক সপ্তাহের মধ্যে সৃষ্ট। এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের বর্ণনা ও খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণীই পিতামাতা ব্যতিরেকে সৃষ্ট। তাহলে বিশ্বের সকল প্রাণীই যীশুর মত পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্ট। এদিক থেকে তারা যীশুর সমকক্ষ। অন্যদিকে তারা যীশুর চেয়ে উচ্চতর, তা হলো, যীশুর মাতা ছিলেন, আর এ সকল প্রাণীর পিতামাতা কিছুই ছিল না। প্রতি বছর বৃষ্টির মওসুমে বিভিন্ন প্রকারের কীট-পতঙ্গ পিতামাতা ব্যতিরেকে জন্মলাভ করে। তাহলে পিতামাতা ছাড়া জন্মলাভ কিভাবে ঈশ্বরত্বের কারণ বা প্রমাণ হতে পারে ?

মানবজাতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা মানুষদের মধ্যেও এদিক থেকে যীশুর চেয়ে উন্নততর মানুষের অস্তিত্ব দেখতে পাই। আদম এ দিকে থেকে যীশুর ঊর্ধ্বে। কারণ তিনি পিতামাতা ব্যতিরেকেই জন্মলাভ করেছেন। অবরাহামের সমসাময়িক যাজক মল্কীষেদক (Melchisedec)-ও এদিক থেকে যীশুর ঊর্ধ্বে। পিতামাতা ব্যতিরেকেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর বিষয়ে মহামতি পৌল ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত তাঁর পত্রের ৭ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে লিখেছেন : "সেই যে মল্কীষেদক...[২২] তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি নাই, আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই.."।

ষষ্ঠ পর্যায়ের দলিল : যীশু কর্তৃক অলৌকিক কার্যাদি সম্পাদন

কখনো কখনো খৃস্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে তাঁর অলৌকিক কার্যাদির কথা উল্লেখ করেন। তারা দাবি করেন, এ সকল অলৌকিক কর্ম প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন।

তাদের এই প্রমাণগুলো দুর্বল ও অসার। যীশুর শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক কর্ম ছিল মৃতকে জীবিত করা। কাজেই আমরা এটি নিয়েই আলোচনা করি।

প্রথমত, যীশু কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার কোন ঘটনাই প্রমাণিত নয়।[২৩]

২২. 'সেই সে মল্কিষেদক' বাক্যাংশটুকু ইব্রীয় ৭ অধ্যায়ের ১ আয়াত থেকে অনুবাদকের সংযোজন। বাকিটুকু ৩য় আয়াত।

২৩. যীশু কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। যীশু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ফিলিস্তিনের শিক্ষিত ইহূদী জাতির মধ্যে তাঁর অলৌকিক কর্মগুলো প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক ঐতিহাসিকের লেখা ইতিহাস এখনো বিদ্যমান। কিন্তু তাঁদের কেউই যীশুর কোন অলৌকিক কার্যের কথা লিখেন নি। শুধু তাই নয়, স্বয়ং যীশুর অস্তিত্বই ঐতিহাসিকভাবে অপ্রমাণিত। সমসাময়িক ইহূদী ও অ-ইহূদী ঐতিহাসিকগণ সমাজের অনেক খুটিনাটি বিষয় লিখলেও, যীশু নামে কোন ব্যক্তির আগমন, ধর্মপ্রচার, অলৌকিক কার্যাদি সংঘটন, বিচার, ক্রুশে মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই লিখেন নি। এছাড়া প্রচলিত সুসমাচারগুলো থেকেও যীশু কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার বিষয় প্রমাণ করা দুষ্কর।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত সুসমাচারগুলোতে এমন কথা রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, যীশু কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার ঘটনাগুলো সঠিক নয়।

তৃতীয়ত, যদি আমরা প্রচলিত সুসমাচারগুলোর এ বিষয়ক বর্ণনাগুলো সঠিক বলে মেনে নিই, তবে তা থেকে প্রমাণিত হবে যে, যীশু তাঁর জীবনের শুরু থেকে ক্রুশারোহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা দেখেছেন।[২৪] পক্ষান্তরে যিহিষ্কেল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেন, যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৭ অধ্যায়ে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫] কাজেই মৃতকে জীবিত করা যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয় তবে যিহিষ্কেল ভাববাদীই ঈশ্বর হওয়ার অধিকতর যোগ্যতা রাখেন।

এলিয় (Elija) একটি মৃত শিশুকে পুনর্জীবিত করেন। ১ রাজাবলির ১৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] ইলীশায় (Elisha) একজন মৃত বালককে পুনর্জীবিত করেন। ২ রাজাবলির ৪ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।[২৭] ইলীশায় (Elisha) নিজের মৃত্যুর পরেও তাঁর দ্বারা এরূপ অলৌকিক কার্য সংঘটিত হয়। মানুষেরা এক ব্যক্তির মৃতদেহ ইলীশায়ের কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এতে সেই মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়ে যায়। ২ রাজাবলির ১৩ অধ্যায়ে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] এছাড়া ইলীশায় ভাববাদী কুষ্ঠরোগীকে তার কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য করেছিলেন। ২ রাজাবলির ৫ অধ্যায়ে তার উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯]

সপ্তম পর্যায়ের দলিল : পুরাতন নিয়মের ও প্রেরিতদের কিছু বাক্য

খৃস্টানগণ খৃস্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে কখনো কখনো পুরাতন নিয়মের কিছু আয়াত উদ্ধৃত করেন। কখনো কখনো তারা যীশুর শিষ্যগণ বা প্রেরিতগণ বা প্রেরিতগণের কিছু বক্তব্য যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশ করেন। আমি 'ইযালাতুল আওহাম' (সংশয়

---

২৪. প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'বাইবেলের গ্রন্থগুলোর মধ্যকার বৈপরীত্যে'র আলোচনায় ৮৯ নং বৈপরীত্য দেখুন।

২৫. যিহিষ্কেল ৩৭/১-১৪।

২৬. ১ রাজাবলি ১৭/১৭-২৪।

২৭. ২ রাজাবলি ৪/৮-৩৭।

২৮. ২ রাজাবলি ১৩/২০-২১ : "পরে ইলীশায়ের মৃত্যু হইল, ও লোকেরা তাঁহার কবর দিল। তখ মোয়াবীয় লুটকারী সৈন্যদল, বৎসর ফিরিয়া আসিলে, দেশে আসিয়া প্রবেশ করিল। ২১ আর লোকেরা এক জন লোককে কবর দিতেছিল, আর দেখ, তাহারা এক লুটকারী সৈন্যদল দেখিল। সেই শব ইলীশায়ের কবরে ফেলিয়া দিল; তখন সেই ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইয়া ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করিবামাত্র জীবিত হইয়া পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।"

২৯. ২ রাজাবলি ৫/১-১৪।

অপনোদন) পুস্তকে এ সকল আয়াত ও বক্তব্য উল্লেখ করে সেগুলোর অসারতা ও সঠিক অর্থ উল্লেখ করেছি। আগ্রহী পাঠককে উক্ত পুস্তকটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

এই গ্রন্থে আমি এই পর্যায়ের দলিলগুলো আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। কারণ :

প্রথমত, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, স্বয়ং যীশুর যে সকল বক্তব্যকে তাঁর ঈশ্বরত্বের সপক্ষে পেশ করা হয় সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল।

দ্বিতীয়ত, এই দুর্বল ও অসার দলিলগুলোও ব্যাখ্যা ছাড়া প্রকৃত অর্থে তাঁর ঈশ্বরত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। এগুলোকে তাঁর ঈশ্বরত্বের দলিল হিসেবে পেশ করার আগে ধরে নিতে হবে যে, 'তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ এবং একজন পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন।' আর এই ধরে নেওয়া বিশ্বাসটির সপক্ষে খৃস্টের বা পূর্ববর্তী ভাববাদীদের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এছাড়া এই বিশ্বাসটি খৃস্ট ও পূর্ববর্তী ভাববাদীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সর্বোপরি তা মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই এই বিশ্বাসটি বাতিল, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল একটি ধারণা।

তৃতীয়ত, প্রথম পর্যায়ের দলিলগুলো, অর্থাৎ যীশুর ঈশ্বরত্বের সপক্ষে যীশুর বাণীগুলোর যখন এই অবস্থা, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল, অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বাণী ও প্রেরিতদের বাণীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সেগুলোও সাধারণভাবে এরূপ দুর্বল, দ্ব্যর্থবোধক ও অপ্রাসঙ্গিক। এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত যীশুর বাণীগুলো তিন প্রকারের এবং সেগুলো বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্যের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এ বিষয়ে পেশকৃত পুরাতন নিয়মের বাণী ও শিষ্যদের বাণীও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

চতুর্থত, সর্বোপরি, যীশুর পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যগণ বা প্রেরিতগণের কেউ যদি সুস্পষ্টভাবেও বলেন যে, যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ যীশুর বিষয়ে অস্পষ্টতা ও মতবিরোধ তাদের যুগেই শুরু হয়। সে সময়ে একেক জন নিজের বুদ্ধি বিবেক নিয়ে একেক মত প্রকাশ করেছেন। কাজেই তাঁদের কারো নিজস্ব মতামত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষত, প্রথম অধ্যায়ে পাঠক দেখেছেন যে, প্রেরিতদের সকল বক্তব্য ও লিখনি ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর ছিল না। তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে অনেক ভুলভ্রান্তি, মতবিরোধ ও বৈপরিত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। আর খৃস্টধর্মের স্থপতি খৃস্টানদের মহাপুরুষ পৌলের কোন কথা আমাদের

নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি খৃস্টের শিষ্য বা প্রেরিত ছিলেন না এবং ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্তও ছিলেন না। উপরন্তু আমরা তার বিশ্বস্ততাতেই বিশ্বাস করি না।[৩০]

প্রিয় পাঠক! আমি এখানে খৃস্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত খৃস্টের বাণীগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছি খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের দাবির অসারতা নিশ্চিত করা এবং তাদের ঘুরানো-প্যাঁচানো বক্তব্য পেশের সুযোগ বন্ধ করার জন্য। অনুরূপভাবে খৃস্টের প্ররিতদের বিষয়ে যা কিছু বললাম তাও খৃস্টান প্রচারকদের দাবির অসারতা নিশ্চিত করার জন্য। তাঁরা প্রচলিত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো যীশুর বা তাঁর প্রেরিতদের বলে বিশ্বাস করেন। এজন্য তাঁদের মনের সন্দেহ দূর করতেই এগুলোর আলোচনা করলাম।

অন্যথায় আমাদের বিশ্বাস হলো, নতুন নিয়মে উদ্ধৃত এ সকল বক্তব্য বা বাণী খৃস্টের বা তাঁর প্রেরিতদের বলে প্রমাণিত নয়। প্রথম অধ্যায়েই আমরা আলোচনা করেছি যে, প্রচলিত এ সকল পুস্তকের কোনটিরই অবিচ্ছিন্ন সূত্রপরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এছাড়া এসকল পুস্তকের মধ্যে সাধারণভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে অগণিত বিকৃতি সাধিত হয়েছে। খৃস্টের ঈশ্বরত্ব বা ত্রিত্বের বিষয়ে বিশেষভাবে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।

পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনেছেন যে, এ সকল বিষয়ে বিকৃতি সাধন করা ইহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের একটি সুপরিচিত অভ্যাস।

আমি বিশ্বাস করি যে, নিঃসন্দেহে যীশু খৃষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতগণ এ সব কুফরী বা ঈশ্বর বিরোধী (blasphemous) বিশ্বাস থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং ঈসা (যীশু) আল্লাহ্‌র বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং যীশুর প্রেরিতগণ আল্লাহ্ প্রেরিতের প্রেরিত।

ফখরুদ্দীন রাযীর সাথে খৃস্টান পাদ্রীর বিতর্ক

(মধ্য এশিয়ার) খাওয়ারিযম শহরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু উমার ফখরুদ্দীন রাযীর (৬০৬ হি) সাথে জনৈক খৃস্টান পাদরীর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে আমি এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

---

৩০. ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য পৌল মিথ্যা কথা বলতেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন : "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?" (রোমান ৩/৭) এ থেকে জানা যায় যে, তিনি যে বিষয়কে 'ঈশ্বরের গৌরব' প্রকাশক বলে কল্পনা করেছেন, সে বিষয়ে ঈশ্বর, যীশু বা পবিত্র আত্মার নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। কাজেই তার কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না।

সূরা আলে-ইমরানের ৬১ আয়াত মহিমাময় আল্লাহ্ তাঁর মহান রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন : "তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরে যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল : 'এস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে এবং তোমাদের নারিগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অর্পণ করি।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন : "আমি যখন খাওয়ারিযম শহরে অবস্থান করছিলাম, তখন ঘটনাচক্রে শুনতে পেলাম যে, একজন খৃস্টান ব্যক্তি নিজ ধর্মের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দাবি করেন। আমি তাঁর নিকট যেয়ে আলোচনায় লিপ্ত হই।

তিনি আমাকে বলেন : মুহাম্মাদের নবুওয়তের (প্রেরিতত্বের) প্রমাণ কী ?

আমি তাঁকে বললাম : মোশি, যীশু ও অন্যান্য ভাববাদীদের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক চিহ্নসমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক চিহ্নসমূহ অগণিত মানুষের দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে। এখন আমাদের সামনে দুটি বিকল্প রয়েছে :

প্রথম বিকল্প : আমরা অগণিত মানুষের মাধ্যমে বর্ণিত এ সকল অলৌকিক ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করব না। অথবা এ সকল ঘটনা সত্য বলে মেনে নিয়ে বলব যে, অলৌকিক চিহ্নসমূহ কোন মানুষের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে না। এক্ষেত্রে মোশি, যীশু ও অন্যান্য সকল ভাববাদীর ভাববাদিত্ব বাতিল ও অপ্রমাণিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিকল্প, আমরা স্বীকার করব যে, এ সকল অলৌকিক কার্য সত্যই সংঘটিত হয়েছে এবং এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা নবুওয়তের বা ভাববাদিত্বের প্রমাণ হিসেবে গৃহীত। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ভাববাদী বা নবীগণের সাথে সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়তও স্বীকার করতে হবে। কারণ দলিল একই পর্যায়ের হলে দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ও একই পর্যায়ের হবে।

উক্ত খৃস্টান পণ্ডিত বলেন, আমি বলছি না যে, যীশু নবী বা ভাববাদী ছিলেন বরং আমি বলি যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন।

আমি বললাম : আপনার কথাটি বাতিল। বিভিন্নভাবে তা বুঝা যায়।

প্রথমত, নবুওয়তের কথা বুঝার আগেই তো ঈশ্বরকে চিনতে হয়। আপনি যা বলেছেন তা বাতিল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ঈশ্বর হচ্ছেন অনাদি-অনন্ত অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা। পক্ষান্তরে যীশু হচ্ছেন মানবীয় দেহের অধিকারী আদি ও অন্ত বিশিষ্ট একটি পরিবর্তনশীল সত্ত্বা, যিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেন।

এরপর আপনাদের বিশ্বাস অনুসারেই তিনি জীবিত থাকার পরে নিহত হন। প্রথমে তিনি শিশু ছিলেন। এরপর তিনি কিশোর হলেন। এরপর যুবকে পরিণত হলেন। তিনি আহার করতেন, পান করতেন, মলমূত্র ত্যাগ করতেন, ঘুমাতেন এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। আর এতো মানুষের জ্ঞানের প্রথম কথা যে, এরূপ পরিবর্তনশীল একটি সৃষ্টি কখনো অনাদি-অনন্ত ঈশ্বর হতে পারেন না। যিনি পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ের মুখাপেক্ষী তিনি কখনো অমুখাপেক্ষী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হতে পারেন না। যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছেন তিনি কখনো আদিহীন চিরন্তন ঈশ্বর হতে পারেন না। পরিবর্তনশীল সত্ত্বা কখনো অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, আপনার বক্তব্যের অসারতার দ্বিতীয় দিক হলো, আপনারা স্বীকার করেন যে, ইহূদীগণ যীশুকে গ্রেফতার করে, তাঁকে ক্রুশে চড়ায়, তাঁকে ক্রুশের উপর জীবিত অবস্থায় রেখে দেয়, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলে, তাঁর অস্থি চূর্ণ করে। আপনারা আরো দাবি করেন যে, তিনি ইহূদীদের থেকে পালিয়ে বেড়াতেন ও তাদেরকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। যখন তারা তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করে তখন তিনি অত্যন্ত কাতরতা ও আহাজারি প্রকাশ করেন। সত্যই যদি তিনি ঈশ্বর হতেন, অথবা ঈশ্বর যদি তাঁর মধ্যে অবস্থান করতেন, অথবা ঈশ্বরের কোন অংশ যদি তাঁর মধ্যে অবস্থান করতো, তবে তিনি কেন নিজের আত্মরক্ষা করলেন না ? তিনি কেন তাদেরকে প্রতিরোধ করলেন না ? তিনি কেন তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিলেন না ? তাদের থেকে কাতরতা বা অসহায়ত্ব প্রকাশেই বা তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ? তাদের থেকে তাঁর পালিয়ে বেড়ানোরই বা কি প্রয়োজন ছিল?

আল্লাহ্‌র শপথ! আমার বড় অবাক লাগে যে, কোন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বা বিবেকবান মানুষ কিভাবে এরূপ কথা বলে বা এরূপ একটি ধারণার সত্যতায় বিশ্বাস করে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি যে কথা অবাস্তব ও বাতিল বলে ঘোষণা করে!

তৃতীয়ত, যীশু ঈশ্বর ছিলেন বলতে আপনারা কী বোঝেন ? হয় বলবেন যে, এই মানবীয় দেহটিই স্বয়ং ঈশ্বর, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর যীশুরূপে মর্ত্যে আগমন করেছিলেন, অথবা বলবেন যে, ঈশ্বরের সত্ত্বা পরিপূর্ণভাবে তাঁর মধ্যে অবতরণ করেন বা অবস্থান করেন, অথবা বলবেন যে, ঈশ্বরের সত্ত্বার কোন একটি অংশ বা ঈশ্বর আংশিকভাবে তাঁর মধ্যে অবতরণ বা অবস্থান করেন। এই তিনটি কথাই বাতিল।

যদি আপনারা প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, এই মানবীয় দেহটিই স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর এই দেহটি পরিগ্রহ করে জগতে এসেছিলেন, তাতে প্রমাণিত হবে যে, যীশুকে হত্যা করে ইহূদীগণ বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বরকে হত্যা

করেছে।[৩১] ঈশ্বরের মৃত্যুর পরে 'ঈশ্বরবিহীন' বিশ্ব কিভাবে চলল ? সর্বোপরি, ইহূদীগণ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল ও লাঞ্ছিত একটি জাতি। সেই জাতি যে ঈশ্বরকে হত্যা করতে পারে সেই ঈশ্বর বড় অসহায় ঈশ্বর!

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : 'ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্ত্বায় যীশুর মানবীয় দেহের মধ্যে অবতরণ ও অবস্থান করা'র তত্ত্বও পূর্বের তত্ত্বের মতই বাতিল। ঈশ্বর যদি দেহবিহীন নিরাকার হন, তবে তাঁর জন্য কোন দেহের মধ্যে অবতরণ বা অবস্থান অসম্ভব। কারণ এতে তাঁর সত্ত্বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের যদি নিজস্ব দেহ থেকে থাকে তবে অন্য একটি দেহের মধ্য তাঁর অবতরণ করাতে তাঁর নিজস্ব সত্ত্বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রকারের পরিবর্তন বা স্থানান্তর কখনো অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয় সম্ভাবনা : ঈশ্বরের অংশ বিশেষ যীশুর মধ্যে অবতরণ করেছিল বা অবস্থান করেছিল বলে কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ঈশ্বরের যে অংশ যীশুর মধ্যে অবতরণ করেছিল সে অংশ কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের জন্য প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় ? যদি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য কোন অংশ স্থান পরিত্যাগ করে যীশুর দেহের মধ্যে আগমন করে তবে তাতে মূল ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বরত্ব হারাবেন! আর যদি যীশুর দেহের মধ্যে আগমনকারী অংশটি ঈশ্বরে সত্ত্বার মূল অংশ না হয়, তবে তাকে ঈশ্বরের অংশ বলা যায় না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর ঈশ্বর হওয়া বা যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের বা ঈশ্বরের কোনো অংশের অবতরণ করা একটি অসম্ভব, অবাস্তব ও বাতিল কথা।

চতুর্থত, যীশুর ঈশ্বরত্বের দাবি মিথ্যা হওয়ার চতুর্থ প্রমাণ হলো, ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা বা ইবাদত-বন্দেগীতে যীশুখৃষ্ট অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। বিষয়টি খৃষ্টানদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং অগণিত মানুষের দ্বারা বর্ণিত। তিনি ঈশ্বর হলে কখনোই তা সম্ভব হতো না। কারণ ঈশ্বর নিজেকে বা অন্য ঈশ্বরকে উপাসনা করেন না।

এ সকল বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে যীশুর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস বাতিল বলে প্রমাণ করে।

এরপর আমি উক্ত খৃস্টান পণ্ডিতকে বললাম : যীশুখৃষ্ট যে ঈশ্বর ছিলেন তার প্রমাণ কী ?

---

৩১. যেমন একটি জিন যদি মানুষ বা কোন প্রাণীর দেহ পরিগ্রহ করে মানুষের মধ্যে আগমন করে এবং মানুষেরা সেই দেহটি হত্যা করতে সক্ষম হয় তবে এতে সেই জিনটিকেই হত্যা করা হয়।

তিনি বললেন : তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হলো, তিনি অনেক অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেছেন । তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেছেন। ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছাড়া এগুলি সম্ভব নয়।

আমি বললাম, আপনি কি স্বীকার করেন যে, প্রমাণের অনুপস্থিতি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণিত হয় না ? যেমন এই মহাবিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে স্রষ্টার অস্তিত্ব ছিল না। আপনি যদি মেনে নেন যে, প্রমাণের অনুপস্থিতি প্রমাণিত বিষয়ের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে না, তবে আমি বলব যে, যীশুর দেহের মধ্যে যদি ঈশ্বরের অবতরণ বা অবস্থান আপনি সম্ভব মনে করেন, তবে আমার, আপনার ও সকল প্রাণী ও সকল জড়পদার্থের মধ্যে যে ঈশ্বর অবতরণ করেন নি তা আপনি কিভাবে জানলেন ?

তিনি বললেন, পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। আমি যীশুর ক্ষেত্রে এ কথা বলি যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন বা ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। কারণ তাঁর দ্বারা এ সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে এরূপ অলৌকিক অত্যাশ্চর্য কর্ম আমার দ্বারা বা আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয় নি। এতে আমরা জানতে পারলাম যে, আমরা ঈশ্বরের অবতার নই।

আমি তাঁকে বললাম, আমি বুঝতে পারছি যে, প্রমাণের অনুপস্থিতি যে প্রমাণিত বস্তুর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে না, আপনি তা বুঝতে পারেন নি।

কোন সৃষ্টপ্রাণীর দ্বারা অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন হওয়া যদি তার ঈশ্বরত্বের চিহ্ন হয়, তবে বলতে হবে যে, যীশুর হাতে অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদিত হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যীশু ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার।

আর আমার বা আপনার দ্বারা, বা কোন কুকুর বা বিড়াল বা ইঁদুর দ্বারা এরূপ কর্ম সম্পাদিত না হওয়াতে আমাদের বা এ সকল প্রাণীর ঈশ্বরত্ব অপ্রমাণিত রয়ে গেল। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের বা এ সকল প্রাণীর 'ঈশ্বর না হওয়া' প্রমাণিত হলো না বরং সম্ভাবনা রয়ে গেল যে, আমাদের মধ্যেও হয়ত ঈশ্বর অবতরণ করেছেন বা আমরাও ঈশ্বরের অবতার। তবে এখনো তা প্রমাণিত হয় নি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কোন একজন মানুষকে 'ঈশ্বরের অবতার' বলে স্বীকার করার অর্থই হলো যে, কোন সৃষ্টির ঈশ্বরের অবতার হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা। আর যে মতের ফলে কুকুর, মাছি ইত্যাদির মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ ও অবস্থানের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয় সে মতটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ঘৃণিত ও বাতুল।

দ্বিতীয়ত, মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে প্রাণহীন লাঠিকে প্রাণবন্ত সাপে রূপান্তরিত করা মৃত মানুষকে জীবিত করার চেয়েও কঠিনতর। কারণ মৃত মানুষকে

জীবিত করার ক্ষেত্রে দেহ অবয়ব ঠিকই থাকে, শুধু মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। পক্ষান্তরে প্রাণহীন লাঠিতে শুধু প্রাণ সঞ্চারই করা হয়নি, উপরন্তু তার অবয়ব পাল্টে তাকে সাপের আকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যদি প্রাণহীন লাঠিকে সাপে রূপান্তরিত করার দ্বারা মোশির ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের পুত্রত্ব প্রমাণিত না হয়, তবে মৃত মানুষকে জীবিত করার দ্বারা কিভাবে যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হবে ?

এ কথায় উক্ত খৃষ্টান পণ্ডিত লা-জওয়াব হয়ে যান। তাঁর আর কিছু বলার থাকে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।"

ফখরুদ্দীন রাযীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি এখানেই শেষ।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরআনের বিশুদ্ধতা ও অলৌকিকত্ব প্রমাণ

কুরআনের আলোচনার সাথে এখানে হাদীস সম্পর্কেও আলোচনা সংযোজন করেছি এবং আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থাবলিতে সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে আলোচনা করছি। এই অধ্যায়কে আমি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি :

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার প্রমাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন সম্পর্কে পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের নিকট সংরক্ষিত বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থাবলিতে সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাদীস সম্পর্কে পাদরীদের সন্দেহ অপনোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার প্রমাণ

অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী (God's Word)[৩২]। যীশুখৃস্টের ১২ জন প্রেরিতের সংখ্যার ভিত্তিতে এখানে আমি মাত্র ১২টি বিষয় উল্লেখ করব। অন্যান্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, কুরআনের আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার সপক্ষে একটি বিষয় হলো, কুরআনে পার্থিব অথবা ধর্মীয় যে কোন বিষয় আলোচনার সময় বিপরীত বিষয়টির প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনুপ্রেরণামূলক বা ভীতি প্রদর্শনমূলক, করুণাবিষয়ক বা শাস্তি বিষয়ক যে কোন আলোচনা অতিরঞ্জন ব্যতিরেকে মধ্যম পন্থায় করা হয়েছে। মানুষের কথায় এই দু'টি বিষয় থাকে না। কারণ যখন যে অবস্থায় কথা বলে, তখন সেই অবস্থাই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সেই অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সে কথা বলে। এর বিপরীত অবস্থার প্রতি সে লক্ষ্য রাখে না। এজন্য ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশের সময় করুণা লাভের যোগ্যদের বিষয় সে লক্ষ্য রাখে না। এর বিপরীত বিষয়টিও এমনি। এভাবে মানুষ জাগতিক বিষয় বলার সময় পরকালের কথা লক্ষ্য রাখতে পারে না এবং পরকালের কথা বলার সময় জাগতিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। ক্রোধের সময় সংশ্লিষ্ট অপরাধের চেয়েও অতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশ করে। এরূপ আরো অনেক বিষয় রয়েছে।

---

৩২. মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনেক অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেন। সেগুলির অন্যতম হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। গ্রন্থকার এখানে কুরআনের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। তবে কুরআনের অলৌকিকত্ব এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানিগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবে, কেউ তা জেনেও অবহেলা করবে বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

Contents

কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রথম বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহ্‌র বাণীত্বের (Divinity, Divine Authority) একটি প্রমাণ হলো, কুরআনে সর্বত্র ভাষা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্য মান রক্ষা করা হয়েছে।[৩৩] আরবীতে এই সর্বোচ্চ সাহিত্য মানকে 'বালাগাত' বলা হয়। এর অর্থ হলো, আকর্ষণীয় সর্বোত্তম শব্দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রকাশ ঘটানো এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। এভাবে শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের মহত্ত্ব ও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য যত গভীর ও পরিপূর্ণ হয় 'বালাগাত'-এর মানও তত পূর্ণতা পায়। বিভিন্নভাবে কুরআনের এই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান জানা যায়।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর প্রথম দিক

আরবদের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা বা বালাগাত সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনার ক্ষেত্রে। উট, ঘোড়া, নারী, রাজা, তরবারির আঘাত, তীর নিক্ষেপ, যুদ্ধক্ষেত্র, আক্রমণ ইত্যাদির বর্ণনায় আরবগণ সবচেয়ে বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। অনারব কবি ও সাহিত্যিকগণও তাঁদের কাব্য ও সাহিত্য কর্মে এ ক্ষেত্রে বিশেষ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে সাহিত্য ও অলঙ্কারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। কারণ অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি এরূপ বর্ণনা পছন্দ করে।

প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে কবি ও সাহিত্যিকগণ এ সকল বিষয়ে নতুন নতুন অর্থ উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ সাধারণত এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের থেকে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করেন। যদি কোন বুদ্ধিমান ও মেধাবী মানুষ কোন একটি বিষয়ে সাহিত্যিক যোগ্যতা অর্জন করার মানসে দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ ও চর্চা করেন তবে ক্রমান্বয়ে তিনি এ বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন। কুরআন মূলত এ সকল কাব্যিক বা সাহিত্যিক কোন বিষয়ের বর্ণনায় রচিত নয়, সেহেতু এই গ্রন্থে সাহিত্যিক মান রক্ষিত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে কুরআনে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এতে বুঝা

---

৩৩. মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য 'নিয়ম পুস্তক' নয় বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের একটি দিক। লক্ষণীয় যে, এটি কুরআন কারীমের একক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। সকল ধর্মগ্রন্থেই ভালভাল বিষয় আলোচিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে বিষয় ও অর্থ মানুষের মন নাড়া দিতে পারে। তবে অর্থের পাশাপাশি শব্দ, বাক্য ও ভাষাশৈলীর মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহিতা কুরআনের বৈশিষ্ট্য।

যায়, কোন মানবীয় চর্চা বা চেষ্টার ফলে নয়, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবেই এর সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর দ্বিতীয় দিক

মহান আল্লাহ্‌ কুরআনের সকল ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন এবং মিথ্যা সর্বোতভাবে পরিহার করেছেন। যে কোন কবি বা সাহিত্যিক যদি মিথ্যা বর্জন করে শুধু সত্যের মধ্যে নিজের সাহিত্যকর্ম আবদ্ধ রাখেন তবে তার সাহিত্যমানের অবনতি ঘটে। এরূপ সাহিত্য উন্নত সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। এজন্যই বলা হয় 'সবচেয়ে সুন্দর কাব্য যা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা।'

একারণেই জাহিলী যুগের আরবী সাহিত্যের দুই দিকপাল কবি লাবীদ ইবনু রাবীআহ এবং হাস্‌সান ইবনু ছাবিত-এর ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁদের কাব্যের মান কমে যায়। ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁরা যে কাব্য রচনা করেন তার মান তাঁদের জাহিলী কাব্যের সমপর্যায়ের ছিল না। কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত বিষয় দেখতে পাই। সকল প্রকার মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও বাড়িয়ে বলা থেকে বিমুক্ত থাকা সত্ত্বেও কুরআনের সাহিত্যমান অক্ষুণ্ন রয়েছে।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর তৃতীয় দিক

মানবীয় কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, একটি বৃহৎ কাব্যের মধ্যে হয়ত একটি দুইটি পংক্তি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম বলে গণ্য হয়, বাকি পংক্তিগুলি সাধারণ মানের হয়। পক্ষান্তরে কুরআনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যত বৃহৎ বা দীর্ঘ কাহিনী বা বর্ণনাই হোক, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে যা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেউ যদি সূরা ইউসুফ নিয়ে একটু চিন্তা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই দীর্ঘ সূরাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর চতুর্থ দিক

কোন কবি বা সাহিত্যিক যদি কোন বিষয় বা গল্প পুনরাবৃত্তি করেন তবে প্রথম বর্ণনা ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে সাহিত্য মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে কুরআনে কারীমে নবীগণের কাহিনী, সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের কাহিনী, ধর্মীয় বিধিবিধান, আল্লাহ্‌র গুণাবলির বিবরণ বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কোথাও দীর্ঘ এবং কোথাও সংক্ষেপ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বর্ণনায় চূড়ান্ত সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার মধ্যে সাহিত্যিক মানের কোন কমবেশি লক্ষ্য করা যায় না।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর পঞ্চম দিক

কুরআনের আলোচ্য বিষয় মূলত উপাসনা-আরাধনা বা ইবাদত-বন্দেগির নির্দেশ দেওয়া, অশ্লীল, অন্যায় ও গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করা, উত্তম আচরণ, লোভমুক্ত জীবন ও আখিরাতমুখিতার উৎসাহ প্রদান। এ ধরনের বিষয়ে সাহিত্যিকের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা পরিদর্শনের সুযোগ খুবই সীমিত। কোন সুপ্রসিদ্ধ ভাষার যাদুকর কবি বা সাহিত্যিককে যদি বলা হয়, তুমি উচ্চাঙ্গের উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও ভাষার অলঙ্কার দিয়ে দশটি ফিক্‌হী বিষয়ে অথবা ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ, তাহলে তিনি তাতে পুরোপুরি সক্ষম হবেন না। পক্ষান্তরে কুরআন এই অসাহিত্যিক বিষয়গুলিতেই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করেছে।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর ষষ্ঠ দিক

কোন কবি বা সাহিত্যিক একাই সাহিত্যের সকল বিষয়ে পারঙ্গমতা দেখাতে পারেন না। প্রত্যেকেই একটি বিশেষ বিষয়ে ভাল করেন, বাকি বিষয়গুলিতে অত ভাল করতে পারেন না। আরবীয় কবিদের বিষয়ে বলা হয়, ইমরুল কায়স (৫৪৫ খৃ.) তার কাব্যে ফুর্তি, উল্লাস, নারীর বর্ণনা এবং ঘোড়ার বর্ণনার ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, নাবিগা যুবইয়ানী (৬০৪ খৃ) ভয়ের বর্ণনায় পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, আ'শা (৬২৯ খৃ) শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও মদের বর্ণনায় ভাল করেছেন, যুহায়র (৬০৯ খৃ) আগ্রহ ও আশা প্রকাশে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন।

ফার্সী কবিদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মাত্র দু'জন কবি নিযামী মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (১১৪৪-১২১১ খৃ) এবং ফেরদৌসি হাসান ইবনু মুহাম্মাদ (৯৩২-১০২০ খৃ) যুদ্ধের বর্ণনায় ভাল করেছেন। শেখ সা'দী শারাফুদ্দীন ইবনু আবদুল্লাহ্ (১১৮৪-১২৯২ খৃ) গযলের ক্ষেত্রে একক সাফল্য দেখিয়েছেন। আনওয়ারী আলী ইবনু ইসহাক (১১৭০ খৃ) কাসীদা সাহিত্যে ভাল করেছেন।

কুরআনে সকল বিষয়েই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষিত হয়েছে। উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উপদেশ, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমরা তা দেখতে পাই। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।[৩৪]

পারলৌকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রদান করে কুরআনে বলা হয়েছে : "কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।"[৩৫]

৩৪. স্বভাবতই আরবী পাঠের সাহিত্যিক মান, শব্দ প্রয়োগ ও ভাষাশৈলীর প্রভাব অনুবাদের মধ্যে রক্ষা করা যায় না। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের আলাদা ছন্দ আছে। উদ্দীপনার ছন্দ থেকে ভয়ের ছন্দ আলাদা। অনেক সময় ভাষা ভাল না বুঝলেও এই ছন্দের প্রভাব হৃদয়ে অনুভব করা যায়।

৩৫. সূরা : ৩২ সাজদা, ১৭ আয়াত।

ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক স্থানে বলা হয়েছে : "তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। তাদের প্রত্যেকের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করান হবে গলিত পূঁজ যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে। কিন্তু তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।"৩৬

শাসন ও নিন্দাবাদের অর্থে একস্থানে বলা হয়েছে : "তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।"৩৭

ওয়ায-নসীহত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "তুমি বল তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই, এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাস তাদের কোন কাজে আসবে কি?"৩৮

আল্লাহ্র গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ অবগত আছেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যা কিছু কমে ও বাড়ে এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।"৩৯

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর সপ্তম দিক

মানবীয় কথায়, গল্পে কাব্যে বা আলোচনায় যখন বিষয় পরিবর্তন করা হয় বা অনেক বিষয় আলোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা কঠিন হয়। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গমনের ক্ষেত্রে ভাষার গতিশীলতা বা কাব্যের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। এতে সাহিত্যকর্মের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক মান ক্ষুণ্ন হয়।

কুরআনে অতি সীমিত পরিসরে বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনী বা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়া হয়েছে। আদেশ-নিষেধ, সংবাদ, জিজ্ঞাসা, সুসংবাদ, শাস্তির সংবাদ, নবুওয়ত প্রমাণ, আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণ, আল্লাহ্র গুণাবলির একত্ব আলোচনা, উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উদাহরণ উল্লেখ,

৩৬. সূরা : ১৪ ইবরাহীম, ১৫-১৭ আয়াত।

৩৭. সূরা : ২৯ 'আনকাবূত, ৪০ আয়াত।

৩৮. সূরা : শু'আরা, ২০৫-২০৭ আয়াত।

৩৯. সূরা : ১৩ রা'দ, ৮-৯ আয়াত।

কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে ভাষাশৈলীর ধারাবাহিকতা ও সর্বোচ্চ সাহিত্য ও অলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে, আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ যা দেখে হতবাক হয়ে যান।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর অষ্টম দিক

অধিকাংশ স্থানে কুরআনের বাক্যাবলি অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। শ্রুতিমধুর সুন্দর কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থ ও ভাবের আবহ তৈরি করা হয়। নমুনা হিসেবে আমি পাঠককে কুরআনের ৩৮ নং সূরা সূরা 'সাদ' পাঠ করতে অনুরোধ করছি। সূরাটির শুরুতেই অবিশ্বাসীদের সংবাদ, তাদের চরিত্র, আচরণ, অবিশ্বাসের কারণে পূর্ববর্তী জাতিগুলির ধ্বংসের সংবাদ; আরবের কাফিরগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ ﷺ-কে অবিশ্বাস করার কথা, তাঁর প্রচারিত একত্ববাদের বিষয়ে তাদের বিস্ময় প্রকাশ, অবিশ্বাসের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যের কথা; তাদের কথায় হিংসার প্রকাশ, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা, পৃথিবীতে ও পুনরুত্থানের পরে তাদের লাঞ্ছনার আগাম সংবাদ, পূর্ববর্তী জাতিগণের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রবণতা, আল্লাহ্ কর্তৃক অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান, কুরায়শ ও অন্যান্য অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে অনুরূপ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ধৈর্যধারণে উৎসাহ প্রদান, পূর্বের বিষয়গুলির মাধ্যমে তাঁকে সান্তনা প্রদান ... ইত্যাদি অনেক বিষয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণীয় সুন্দর কয়েকটি মাত্র বাক্যে বিধৃত হয়েছে। এরপর দাঊদ, সুলায়মান (শলোমন), ইবরাহীম (অবরাহাম), ইয়া'কূব (যাকোব) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। আর সবকিছুই সম্পন্ন করা হয়েছে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কিছু বাক্যের মাধ্যমে।

কুরআনের একটি বাক্য লক্ষ্য করুন। কুরআনে বলা হয়েছে : "কিসাসের মধ্যে (হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধানে) তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"[৪০]

এই বাক্যটির মধ্যে সামান্য কয়েকটি শব্দ রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। ব্যাপক অর্থবোধক ও সাহিত্যিক মানসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে এই বাক্যে রয়েছে শাব্দিক অলঙ্করণ যাতে মৃত্যু ও জীবনকে একটি ছোট্ট বাক্যে পরস্পরের মুখোমুখি রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে মৃত্যু হলো জীবনের পরিসমাপ্তি, সেই মৃত্যুর মধ্যে জীবন নিহিত থাকার কথা বলে এর অর্থের মধ্যে আকর্ষণীয়তা ও নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

আরবদের মধ্যে এই অর্থে অনেক বাক্য প্রবাদরূপে প্রচলিত ছিল। কুরআনের এই বাক্যটি শব্দে ও অর্থে সেগুলোর চেয়ে অনেক সুন্দর ও উন্নত। এই অর্থে আরবরা

৪০. সূরা : ২ বাকারা, ১৭৯ আয়াত।

বলত : "কিছু মানুষের হত্যা সকল মানুষের জীবনদান", "বেশি করে হত্যা কর যেন হত্যা কমে যায়", "হত্যা হত্যা রোধে অধিক কার্যকর" ইত্যাদি। আরবদের মধ্যে প্রচলিত এই তিনটি বাক্যের মধ্যে শেষ বাক্যটিই অর্থ প্রকাশের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। আর কুরআনের বাক্যটি এই বাক্যটির চেয়েও অনেক পরিশীলিত ও অধিকতর অর্থজ্ঞাপক। নিম্নের ছয়টি দিক থেকে আমরা দুইটি বাক্যের তুলনা বুঝতে পারব :

(১) উপরের চারটি বাক্যের মধ্যে কুরআনের বাক্যটিই সংক্ষিপ্ততম। বাক্যের শুরুতে 'তোমাদের জন্য' কথাটি থাকলেও, মূল অর্থ মাত্র তিনটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে : "মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে জীবন"। "তোমাদের জন্য" কথাটি অন্যান্য বাক্যের মধ্যেও অর্থের দিক থেকে সংযুক্ত ও উহ্য রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বাক্যে কুরআনের বাক্যের চেয়ে এক বা একাধিক শব্দ বেশি রয়েছে।

(২) 'হত্যা হত্যা রোধে অধিক কার্যকর' বাক্যটির দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উভয় হত্যাই সমান বা যে কোন হত্যাই হত্যা রোধ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যে রোধকারী হত্যা ও রোধকৃত হত্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। শুধু বিশেষ প্রকারের হত্যা, অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদানই হত্যা রোধ করে।

(৩) আরবদের মধ্যে প্রচলিত বাক্য তিনটির মধ্যে সর্বোত্তম বাক্যে 'হত্যা' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনে তা করা হয় নি। ফলে শব্দ ব্যবহারে অলঙ্কারিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) আরবদের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, হত্যা শুধু হত্যাই রোধ করে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, কিসাস হত্যা, আঘাত ইত্যাদি জীবনের জন্য ক্ষতিকর সকল কর্মই রোধ করে। এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের বাক্যটির অর্থ ব্যাপকতর।

(৫) হত্যা রোধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো জীবন রক্ষা করা। আরবীয় বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায় না, বরং শুধু হত্যা রোধ করার বিষয়টিই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায়।

(৬) আরবীয় বাক্যটির অর্থ বিভ্রান্তিকর। বাক্যটি থেকে মনে হতে পারে যে, যে কোন হত্যা হত্যা রোধ করে। যুলুম, অন্যায় বা বিনা বিচারে হত্যাকেও 'হত্যা' বলা হয়। এরূপ হত্যা কখনোই হত্যা রোধ করে না, বরং হত্যার প্রসার ঘটায়। আরবীয় বাক্যটি ভাল অর্থে বলা হলেও এ থেকে ভুল বুঝার বা ভুল অর্থে ব্যবহারের সমূহ আশংকা রয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি পরিপূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক অর্থ জ্ঞাপক।

কুরআনে বলা হয়েছে : "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থকে তারাই সফলকাম।"[8১]

অর্থাৎ যারা ফরয ইবাদত পালনে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং সুন্নাত-নফল পালনে রাসূলের আনুগত্য করে অথবা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যা কিছু আদেশ-নিষেধ করেছেন সকল বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য করে, আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করতে ভয় পায়, তাঁর শাস্তি ও হিসাবের ভয় করে এবং আজীবন সকল বিষয়ে তাঁর অবাধ্যতা হতে আত্মরক্ষা করে তারাই জাগতিক জীবনে এবং পুনরুত্থানের পর পারলৌকিক জীবনে সফলকাম।

এই বাণীটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানব জীবনে সফলতার সকল জরুরী বিষয়গুলো এতে বিধৃত হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সত্যের সাক্ষ্য উচ্চারণ করছে। উক্ত ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, তিনি বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের একজন বিশপ (Partiarch) । তিনি আরবী ও অন্যান্য ভাষা জানেন। তিনি একজন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে উপর্যুক্ত আয়াতটি (যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম) পাঠ করতে শুনেন। তিনি বলেন, আমি উক্ত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি দেখলাম যে, মরিয়ম তনয় যীশুর উপর এই জগত ও পরজগতের বিষয়ে আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছিলেন তার সবই এই ছোট্ট একটি আয়াতের মধ্যে এসে গিয়েছে।

কথিত আছে যে, একজন অভিজ্ঞ খৃস্টান চিকিৎসক হুসায়ন ইবনু আলী ইবনু ওয়াকিদী নামক একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করেন : আপনাদের ধর্মগ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন কথা নেই কেন ?

হুসায়ন বলেন : আল্লাহ্ একটি আয়াতের অর্ধেকের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল কথা বলে দিয়েছেন। খৃস্টান চিকিৎসক আয়াতটি সম্পর্কে হুসায়নকে প্রশ্ন করেন। হুসায়ন বলেন : আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আহার করবে এবং পান করবে, কিন্তু অমিতাচার করবে না।"[8২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা কিছু খাদ্য ও পানীয় বৈধ করেছেন তা থেকে আহার ও পান কর, কিন্তু হালাল ছেড়ে হারামে গমন করবে না, পানাহারের বিষয়ে

---

8১. সূরা : ২8, ৫২ আয়াত।

8২. সূরা : ৭ আ'রাফ, ৩১ আয়াত।

অপচয় করবে না এবং তোমাদের জন্য ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় কিছু পানাহার করবে না।

উক্ত চিকিৎসক পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনাদের নবী (সা) এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কি ?

হুসায়ন বলেন, আমাদের নবী (সা) কয়েকটি শব্দের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমন্বিত করেছেন। উক্ত চিকিৎসক সেই শব্দগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, "পাকস্থলী রোগের বাড়ি আর খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ সকল ঔষধের মূল। প্রত্যহ দেহকে তার অভ্যাস অনুসারে খাদ্য প্রদান কর।"[৪৩]

তখন উক্ত চিকিৎসক বলেন যে, ইনসাফের কথা হলো, আপনাদের ধর্মগ্রন্থ এবং আপনাদের নবী (সা) (জগদ্বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসাতত্ত্ববিদ) গ্যালেন (Galen)-এর প্রয়োজনীয়তা রাখেন নি। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে তাই হলো স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলনীতি।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর নবম দিক

শব্দের গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এবং তার শ্রুতিমধুরতা ও বিনম্রতা মূলত দু'টি পরস্পর-বিরোধী গুণ। মানবীয় সাহিত্যকর্মে দু'টি দিক একত্রিত করা কষ্টকর। বিশেষত কথা লম্বা হলে তাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের ক্ষেত্রে এই দু'টি গুণ সর্বদা রক্ষা করা মানবীয় অভ্যাসের ঊর্ধ্বে। কুরআনের সকল ক্ষেত্রে এ দু'টি গুণ সমানভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সাহিত্য মান অলৌকিক।

কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর দশম দিক

কুরআনে অলঙ্কারশাস্ত্রের সকল শিল্প প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বায়ন, রূপক, তুলনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপালঙ্কার, শুরুর সৌন্দর্য, সমাপ্তির সৌন্দর্য, বাক্যশেষের সৌন্দর্য, অগ্রবর্তীকরণ, স্থানান্তরকরণ, প্রয়োজন অনুসারে বাক্যসমূহের সংকোচন, সংযোজন ও বিভাজন ইত্যাদি সকল অলঙ্কারিক শিল্প

৪৩. এই বাক্যটি হাদীস নয় বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী নয়। এই অর্থে বিশুদ্ধ সনদে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই কথাগুলো হাদীস নয়। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কোন হাদীসগ্রন্থে সনদসহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয় নি। কথাটি আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি চিকিৎসা বিষয়ক বাক্য মাত্র। ভুলক্রমে কেউ কেউ কথাটিকে হাদীস বলে প্রচার করেছেন। এজন্য মুহাদ্দিসগণ কথাটিকে জাল হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন : ইরাকী, যায়নুদ্দীন আবদুর রাহীম ইবনুল হুসায়ন (৮০৬ হি), ফাতহুল মুগীস (কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০) পৃ. ১২৭, ১২৮; সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১ হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ) ১/২৮৭, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় মুদ্রণ ২০০৬) পৃ. ১৬৩।

কুরআনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। দুর্বল, শ্রুতিকটু, অপ্রচলিত, ব্যবহারের অনুপযুক্ত বা বাজে শব্দ থেকে তা পরিপূর্ণ মুক্ত। ভাষার যাদুকর কোন আরব সাহিত্যিকও সবগুলো বিষয় একত্রিত করতে পারবেন না বরং তাঁর সাহিত্য কর্মে হয়ত দুএকটি শিল্প তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন। কেউ যদি কোন বড় সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে এগুলোর সন্ধান করেন তবে সামান্য কিছু শৈল্পিক বিষয় তিনি খুঁজে পাবেন। পক্ষান্তরে কুরআনে সব বিষয়ই রয়েছে।

উপরে দশটি বিষয় উল্লেখ করলাম। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে, কুরআন সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৈল্পিক ও সাহিত্যিক মান সংরক্ষণ করেছে যা মানুষের জন্য অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। আরবী সাহিত্যিকগণ তাঁদের স্বভাবজাত বিচারবুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারেন। অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতগণও ভাষার অলঙ্কার ও সাহিত্যে তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা অনুধাবন করতে পারেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বেশি হবে, তিনি তত বেশি কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

কুরআনের অলৌকিকত্বের দ্বিতীয় বিষয়

কুরআন কোন মানুষের রচিত বাণী নয় বরং তা আল্লাহ্র বাণী, এ কথার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো এর বিন্যাস। এ বিষয়টিও ভাষাকেন্দ্রিক। কুরআনে ভাষার সর্বোচ্চ সাহিত্যমান ও অলঙ্কার সংরক্ষণ ছাড়াও এর 'কাব্যিক গদ্য' আরবী ভাষায় এক অত্যাশ্চর্য ও অতুলনীয় বিষয়। এর বাক্য বিন্যাস, প্রতি বাক্যের শেষের মিল ও ছন্দ, অভ্যন্তরীণ অর্থ ও অর্থের আবহ ইত্যাদি বিষয় আরবের ভাষাবিদ কবি-সাহিত্যিকদের হতবাক করে দিয়েছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো, কোন কুরআন বিরোধী গায়ের জোরেও যেন বলতে না পারে যে, অমুক বা তমুক সাহিত্যিক, কবি বা লেখকের লেখা থেকে এই কথাগুলো বা এই বিন্যাস চুরি করা হয়েছে। এভাবে কুরআন সকল মানবীয় কাব্য ও সাহিত্যের উপরে নিজের স্থান নিশ্চিত করেছে।

একজন কবি বা সাহিত্যিক তাঁর গদ্যে বা পদ্যে যত চেষ্টাই করুন, সমালোচনার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না এবং তাঁর পুরো সাহিত্যকর্মকে নির্ভুল করতে পারবেন না। এজন্য কবি-সাহিত্যিকগণকে তাঁদের সাহিত্যের জন্য যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তাঁদের ভুলভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্য নিন্দাও করা হয়েছে। কবি ইমরুল কায়স বলেন :

> "দাঁড়াও বন্ধুদ্বয়, আমরা ক্রন্দন করি, প্রিয়তমা ও আবাসস্থলের স্মৃতিতে
> সিকতুল লিওয়া নামক স্থানে, দাখূল ও হাওমালের মধ্যবর্তী স্থানে।"

এই পংক্তির প্রথম অংশের জন্য কবিকে প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে তিনি সুন্দর, শ্রুতিমধুর ও কাব্যিক কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে অনেক অর্থ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশে কাব্যিক সৌন্দর্য তিনি দেখাতে পারেন নি। এজন্য তার সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ কবি আবুন নাজ্‌ম ফাদ্‌ল ইবনু কুদামা (১৩০ হি/৭৪৭ খৃ) অনেক প্রশংসনীয় কবিতা রচনা করেছেন, আবার অনেক কবিতার জন্য নিন্দা কুড়িয়েছেন। তিনি উমাইয়া খলীফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিক (১২৫ হি/৭৪৩ খৃ)-এর নিকট আগমন করে তাঁর প্রশংসায় একটি কবিতা পাঠ করতে শুরু করেন। কবিতার প্রথম পংক্তিতে তিনি বলেন : "ডুবন্ত সোনালী সূর্য যা এখনো ডোবেনি : দিগন্তে যা ট্যারার চোখের মত দেখায়।"

ঘটনাক্রমে হিশাম ট্যারা-চোখ ছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে কবিকে দরবার থেকে বের করে দেন এবং তাকে আটক করার হুকুম দেন।

প্রসিদ্ধ কবি জরীর ইবনু আতিয়্যাহ (১১০ হি/৭২৮ খৃ) সমালোচিত হন তাঁর কবিতার উদ্বোধনী পংক্তির দুর্বলতার কারণে। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (৮৬ হি/৭০৫ খৃ)-এর নিকট গমন করে তাঁর প্রশংসায় একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতার প্রথম পংক্তিটি ছিল :

তুমি কি সচেতন হয়েছ, না কি তোমার অন্তর এখনো অচেতন ?
যে, সকালে তোমার সঙ্গীরা প্রস্থানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ?

তখন আবদুল মালিক তাকে গালি দিয়ে বলেন, বরং তোমার অন্তরই অচেতন।

প্রসিদ্ধ কবি বুহতুরী ওয়ালীদ ইবনু উবাইদ (২৪৮ হি/৮৯৮ খৃ) তাঁর কবিতার উদ্বোধনী পংক্তির কারণে নিন্দিত হয়েছেন। তিনি আরমিনিয়া যুদ্ধের আব্বাসীয় সেনাপতি ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদকে একটি কবিতা পাঠ করে শোনান। কবিতার প্রথম পংক্তিটি নিম্নরূপ :

"দুর্ভাগ্য তোমার সেই দীর্ঘ প্রলম্বিত রাতের..."

তখন সেনাপতি ইউসুফ বলেন : বরং তোমার জন্য দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনা।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও গীতিকার ইসহাক মাওসিলী (২৩৫ হি/৮৫০ খৃ) তাঁর কবিতার উদ্বোধনী পংক্তির জন্য নিন্দিত হয়েছেন। আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২২৭ হি/৮৪১ খৃ) বাগদাদের ময়দানে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হলে তথায় খলীফার উপস্থিতিতে তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটির প্রথম পংক্তি ছিল :

হে গৃহ, প্রাচীনত্ব তোমাকে পরিবর্তন করেছে ও মুছে দিয়েছে :
হায়! আমি যদি জানতাম তোমাকে কিসে পুরাতন করল!

খলীফা মু'তাসিম কবিতার এই প্রথম পংক্তি শুনে এত বিরক্ত হন যে, তিনি একে অশুভ বলে গণ্য করেন এবং প্রাসাদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

এভাবে অধিকাংশ জাঁদরেল কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ধরা পড়েছে।

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রপতিগণ আরবী ভাষায় তাদের পরিপূর্ণ দখল এবং ইসলামের প্রতি তাদের কঠিনতম শত্রুতা সত্ত্বেও কুরআনের সাহিত্যিক, অলঙ্কারিক ও বিন্যাসের মানের ক্ষেত্রে কোন সমালোচনার সুযোগ পান নি। তারা এ বিষয়ে কুরআনের কোন সমালোচনা করতে সক্ষম হন নি।

তারা স্বীকার করেন যে, কুরআন আরবীয় সাহিত্যিকদের গদ্য সাহিত্য বা কবিদের কবিতা কোনটির সাথেই তুলনীয় নয়। এর যাদুকরী আকর্ষণীয়তায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে 'যাদু' বলে অভিহিত করেছেন।[৪৪] কখনো তারা বলেছেন, এগুলো পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী[৪৫] এবং বানোয়াট কথা, মুহাম্মাদ (সা) তা বানিয়েছেন।[৪৬] কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছেন : "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।"[৪৭]

এগুলো সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তার অলঙ্কার, সর্বোচ্চ সাহিত্যমান ও সর্বোত্তম বিন্যাস পদ্ধতিতে অননুকরণীয় ও অলৌকিক।

আর এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ, যারা সংখ্যায় মরুভূমির বালুকা ও পাহাড় প্রান্তরের কাঁকরের মত অগণিত, যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভূতি সুপ্রসিদ্ধ। তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ তাদের প্রতিপক্ষ সকল মানুষের সামনে তাদেরকে একটিমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন। তিনি ঘোষণা করছেন :

"তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৪৮]

---

৪৪. নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন : সূরা আন'আম : ৭, ইউনুস : ২, হূদ : ৭, হিজর : ১৫, ইসরা : ৪৭, আনবিয়া : ৩, ফুরকান : ৮, সাবা : ৪৩, সাফ্ফাত : ১৫, সাদ : ৪, যুখরুফ : ৩০, আহকাফ : ৭, কামার : ২, মুদ্দাছ্ছির : ২৪ আয়াত।

৪৫. নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন : সূরা আন'আম : ২৫, আনফাল : ৩১, নাহল : ২৪, মু'মিনূন : ৮৩, ফুরকান : ৫, নাম্ল : ৬৮, আহকাফ : ১৭, কালাম : ১৫, মুতাফ্ফিফীন : ১৩ আয়াত।

৪৬. নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন : সূরা ফুরকান : ৪, সাবা : ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।

৪৭. সূরা : ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস্সাজদা) : ২৬ আয়াত।

৪৮. সূরা : ১০ ইউনুস, ৩৮ আয়াত।

তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঘোষণা করছেন : "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার--আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না—তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"[৪৯]

তিনি আরো ঘোষণা করছেন : "বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।"[৫০]

তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ (সা) অন্য কারো সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সা) তো তাদের মতই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল, কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারির যুদ্ধ গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও অলঙ্কারিক মান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা বা এর বিপরীতে কোন সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।[৫১]

৪৯. সূরা : ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

৫০. সূরা : ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।

৫১. নবুওয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোন বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোন কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোন প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল। আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দু'টি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে তারা জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

এজন্য তাদের কেউ কুরআনের সত্যতা ও অলৌকিকত্ব মেনে নিয়েছে এবং কুরআন ও তার প্রেরণকারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কেউ তার অলৌকিক সাহিত্যিক মান দেখে হতবাক হয়েছে। কিন্তু কেউই এর সাহিত্য মান অস্বীকার করতে পারে নি।

বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা নামক আরব নেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি শ্রবণ করেন : "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন-অত্যাচার। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৫২]

তখন তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, এই কথাগুলো বড়ই সুমিষ্ট। এর উপরে রয়েছে সৌন্দর্যের আচ্ছাদন, এর নিম্নদেশে রয়েছে ফলের সমাহার, এর উর্ধ্বদেশ ফলবান; এ কখনেই মানুষের কথা নয়।"

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ওয়ালীদ কুরআন শ্রবণ করে তখন তার মন নরম হয়ে যায়। তখন তার ভাতিজা আবূ জাহ্ল তার নিকট এসে তার এই মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে। তখন ওয়ালীদ আবূ জাহ্লকে বলে, তোমাদের মধ্যে কাব্য ও সাহিত্যের বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। আল্লাহ্‌র শপথ, মুহাম্মাদ (সা) যা বলছে তা কোন কাব্য কবিতার সাথেই মেলে না।

আরো বর্ণিত হয়েছে, ওয়ালীদ হজ্জ মওসুমের শুরুতে কুরায়শ বংশের মানুষদেরকে একত্রিত করে বলে, দলে দলে আরবরা হজ্জের জন্য উপস্থিত হবে। মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে কি বলবে তা তোমরা সকলে মিলে একমত হয়ে ঠিক কর যেন একেক জন একেক কথা বলে পরস্পরে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হও। তারা বলে : তাঁকে আমরা গণক বলব। ওয়ালীদ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, সে গণক নয়। তাঁর কথাবার্তা গণকের কথার মত দুর্বোধ্য বা গণকের ছন্দ নয়।

তারা বলে, তাহলে আমরা তাঁকে পাগল বলব। ওয়ালীদ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, সে পাগল নয়। পাগলের প্রলাপ ও উন্মত্ততা তাঁর মধ্যে নেই। তারা বলে, তাহলে আমরা তাঁকে কবি বলব। ওয়ালীদ বলে, সে কবিও নয়। আমরা ছন্দময়, ছন্দহীন ও বিভিন্ন ছন্দের সকল প্রকারের কবিতাই চিনি। তাঁর কথা কোন প্রকারের মধ্যেই পড়ে না।

তারা বলে, তাহলে আমরা তাঁকে যাদুকর বলব। ওয়ালীদ বলে, সে যাদুকরও নয়। যাদুকরের ফুঁক দেওয়া, গিট দেওয়া, যাদুকরী আচরণ দেখানো তাঁর মধ্যে নেই।

---

৫২. সূরা : ১৬ নাহ্‌ল, ৯০ আয়াত।

কেন, আমি জানি যে, তা বাতিল কথা। তবে 'যাদুকর' বলাটা কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। এরপর তিনি বলেন, এ এমন যাদু যা পুত্রকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মানুষকে তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

তখন কুরায়শ বংশের মানুষেরা মক্কার পথে-প্রান্তরে বসে গেল। আগন্তুক তীর্থযাত্রীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ থেকে নিষেধ করতে লাগল। তখন আল্লাহ্ ওয়ালীদের বিষয়ে আয়াত নাযিল করেন : "আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকি... ।"৫৩

তৎকালীন মক্কার অন্যতম সমাজপতি উৎবা ইবনু রাবী'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাঁকে বুঝানোর জন্য আগমন করেন। তিনি কেন তাঁর জাতির মত ও পথের বিরোধিতা করছেন তা তিনি জানতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (কুরআনের ৪১ নং সূরা) সূরা ফুস্‌সিলাতের শুরু থেকে পাঠ শুরু করেন : হা-মীম। এ দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। এ এক গ্রন্থ যার আয়াতগুলো বিষদভাবে বিবৃত হয়েছে আরবী ভাষায় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য...। এভাবে পাঠ করতে করতে যখন তিনি ১৩ নং আয়াতে পৌঁছান : "তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও ছামূদ জাতির শাস্তির অনুরূপ", তখন উৎবা তার হাতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখের উপর রেখে তাঁকে বলেন, তোমার সাথে আমার যে রক্তসম্পর্ক রয়েছে, সেই রক্তের দোহাই দিয়ে তোমাকে অনুরোধ করছি যে, তুমি থাম!

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন উৎবা তার হাত দুখানা পিঠের পিছনে মাটিতে রেখে হাতের উপর ভর দিয়ে বসে বসে মনোযোগের সাথে তা শুনছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে সাজদার স্থান পর্যন্ত পৌঁছান তখন তিনি সাজদা করেন এবং উতবা উঠে দাঁড়ান। তিনি কী বলবেন তা খুঁজে পান না। বাকহীন হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। মক্কার কাফিরদের আলোচনা ও পরামর্শ সভাগুলোতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তখন তার সম্প্রদায়ের মানুষেরা তার নিকট আগমন করে। উৎবা তাদেরকে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, সে আমাকে এমন কথা শুনিয়েছে যা আমার এই দুই কান কোনদিনও শুনেনি। আমি বুঝেই পেলাম না যে, তাঁকে আমি কী বলব!

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রকাশ্যে দীন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন : "তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর...."৫৪ । আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম হারাবী (২২৪ হি/৮৩৮ খৃ)

৫৩. সূরা : ৭৪ মুদ্দাছ্ছির, ১-৩০ আয়াত।
৫৪. সূরা : ১৫ হিজর, ৯৪ আয়াত।

লিখেছেন যে, একজন বেদুঈন অন্য এক ব্যক্তিকে কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনে সাজদা করে এবং বলে, আমি এই বাক্যটির অসাধারণ সাহিত্যমান ও অর্থের আবহে বিমুগ্ধ হয়ে সাজদা করেছি।

একজন অবিশ্বাসী মুশরিক আরেকজন মুসলিমকে পাঠ করতে শোনে : "যখন তারা তার নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল..."[৫৫] তখন সে বলে উঠে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন সৃষ্টি এরূপ কথা বলতে পারে না!

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক আবদুল মালিক ইবনু কুরাইব আসমা'ঈ (২১৬ হি/৮৩১ খৃ) বলেন, আমি একটি ছোট্ট ৫ বা ৬ বছরের মেয়েকে বলতে শুনলাম : 'আমি আমার সকল পাপ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' আমি বললাম, তুমি তো এখনো নিষ্পাপ, তুমি আবার কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ! তখন মেয়েটি কবিতা পাঠ করে বলে :

ক্ষমা চাই আল্লাহ্‌র নিকট সকল পাপের :
আমি একজন মানুষ হত্যা করেছি অবৈধভাবে
চালচলনে সুন্দর তুলতুলে হরিণের মত
মধ্য রাত হয়ে গেল অথচ আমি প্রার্থনা করি নি।

আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! তুমি তো খুব সুন্দর উচ্চাঙ্গের ভাষা আয়ত্ত্ব করেছ। তখন মেয়েটি বলল, কুরআনের আয়াতের তুলনায় কি এ সব কবিতাকে উচ্চাঙ্গের বলা যায় ? আল্লাহ্ বলেছেন : "মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো। আর ভয় করো না এবং দুঃখও করো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন বানাব।"[৫৬] এভাবে মাত্র একটি আয়াতের মধ্যে তিনি দু'টি আদেশ, দু'টি নিষেধ, দু'টি সংবাদ ও দু'টি সুসংবাদ একত্র করেছেন!

আবূ যর গিফারী (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমার ভাই উনাইস ছিল আরবের কবিদের অন্যতম। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার ভাই উনাইসের চেয়ে অধিকতর কাব্য প্রতিভা-সম্পন্ন কবি আর একজনকেও দেখিনি। সে জাহিলী যুগে ১২ জন কবির সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে। পরাজিত ১২ জনের একজন ছিলাম আমি। এই উনাইস যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনল, তখন আমাদের গ্রাম থেকে সে মক্কায়

৫৫. সূরা : ১২ ইউসুফ, ৮০ আয়াত।
৫৬. সূরা : ২৮ কাসাস, ৭ আয়াত।

গমন করল এবং তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসল। আমি তাকে বললাম, লোকটি সম্পর্কে মানুষেরা কী বলছে ? উনাইস বলল, তারা বলছে, তিনি কবি, গণক ও যাদুকর। এরপর সে বলে, আমি গণকদের কথাবার্তা শুনেছি, তাঁর কথা গণকদের কথার মত নয়। আমি কবিতার ছন্দের সাথে তাঁর কথা মিলিয়ে দেখেছি, তাঁর কথা কবিতার সাথে মেলে না। আর আমি ছাড়া অন্য কেউই তাঁর এ কথাকে কবিতা বলে প্রমাণ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সত্যবাদী এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীরাই মিথ্যাবাদী।

জুবায়র ইবনু মুত'ইম (রা) মক্কার গোত্রপতিদের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি কাফির সেনাবাহিনীর অন্যতম নেতা হিসেবে যোগদান করেন এবং মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় মদীনায় অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনতে পান যা তাঁকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রতি তাঁর আকর্ষণের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, মদীনায় বন্দি অবস্থায় অবস্থান কালে একদিন আমি শুনলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের সালাতে সূরা তূর (৫২ নং সূরা) পাঠ করছেন। তিনি সূরাটি পাঠ করতে করতে সূরার শেষে পৌঁছে যখন পাঠ করতে লাগলেন : "তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে ? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ? না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে ? না কি তারা এ সবের নিয়ন্তা ?"[৫৭] তখন আমার অন্তর ইসলাম গ্রহণের জন্য অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল।

দ্বিতীয় শতকের অন্যতম সাহিত্যিক ও গদ্য রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুকাফ্ফা (১৪২ হি/৫৭৯ খৃ)। তিনি ছিলেন পারসিক। ফার্সী ও আরবী ভাষার পরিপূর্ণ দখল ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং এ সকল ভাষা থেকে দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসা ইত্যাদি শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী গদ্যে তাঁর দখল ছিল অতুলনীয়। কথিত আছে, তিনি একবার কুরআনের বিকল্প একটি গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময়ে তিনি চলতি পথে এক শিশুকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনেন : "এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে লও এবং হে আকাশ, তুমি ক্ষান্ত হও। বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো। নৌকা জুদীর উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, অত্যাচারী সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।"[৫৮] তখন তিনি ফিরে যেয়ে এ বিষয়ে যা কিছু

৫৭. সূরা : ৫২ তূর, ৩৫-৩৭।

৫৮. সূরা : ১১ হূদ, ৪৪ আয়াত।

লিখেছিলেন সব মুছে ফেলেন এবং বলেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কথার বিকল্প তৈরি করা যায় না, এ কথা মানুষের কথা হতে পারে না।"

ইয়াহইয়া ইবনু হাকাম আল-গাযাল (২৫০ হি/৮৬৪ খৃ) ছিলেন তাঁর যুগে মুসলিম স্পেন বা আনদালুসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি। বর্ণিত আছে যে, তিনিও এরূপ কিছু চিন্তা করেন। তিনি সূরা ইখলাস নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন যে, এর আদলে এরই ভাষাশৈলীর মানসম্পন্ন একটি ছোট্ট সূরা তিনি রচনা করবেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে চিন্তা করতে যেয়ে আমার মধ্যে এমন ভীতি ও অসহায়ত্বের সঞ্চার হলো যে, আমি অনুশোচনা ও তাওবা করতে শুরু করলাম।

কেন আরবগণ তাদের ভাষার যাদুকারিতা ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার মত সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ কখনোই গ্রহণ করতে পারল না, তা নিয়ে পরবর্তী যুগে কেউ কেউ গবেষণার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই সুস্পষ্ট যে, আরবের সমাজপতি ও কবি-সাহিত্যিকগণ কুরআনের অলৌকিকত্ব এবং নিজেদের অক্ষমতা অনুধাবন করার কারণেই কখনোই এর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় এগিয়ে আসেনি। কিন্তু তৃতীয় হিজরী শতকের মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত ইবরাহীম ইবনু সাইয়ার নায্যাম (২২৫ হি/৮৪০ খৃ), যিনি ভারতীয় ও গ্রীক দর্শন ও ধর্মমতের ভক্ত ছিলেন, দাবি করেন যে, কুরআনের বিকল্প উপস্থাপনের ক্ষমতা আরবদের ছিল, তবে আল্লাহ্ তাদের অক্ষম করে দেওয়ার ফলে তারা তা করতে পারে নি। এ কথার অর্থ হলো, নবুওয়তের পূর্বে আরবদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু নবুওয়তের পরে আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে এই ক্ষমতা নষ্ট করে দেন, ফলে তারা আর তা করতে সক্ষম হয় নি। এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলাই কুরআনের অলৌকিকত্ব।

এভাবে নায্যাম দাবি করছেন যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরে আর এর অনুরূপ কিছু তৈরি করতে সক্ষম হয় নি আরবগণ। তবে এর পূর্বে তাদের এরূপ ক্ষমতা ছিল। তার এই দাবি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। যুক্তি ও জ্ঞানের বিরোধিতা ছাড়াও এর অনেক দুর্বলতা রয়েছে :

প্রথমত, যদি তার কথা ঠিক হতো, তবে আমরা দেখতে পেতাম যে, আরবগণ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরে এর অনুরূপ কিছু তৈরি করতে অক্ষম হলেও, অন্তত, ইতোপূর্বে তাদের কবি-সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকর্মকে কুরআনের মুকাবিলায় পেশ করে কুরআন মুহাম্মাদ (সা)-এর নিজের রচিত বলে দাবি করার চেষ্টা করত।

দ্বিতীয়ত, নায্যামের তত্ত্ব সঠিক হলে আরবের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবিগণ কুরআনের সাহিত্যমান ও ভাষাশৈলীর প্রশংসা করতেন না, বরং অবাক বিস্ময়ে বলতেন যে, এতো অতি সাধারণ কথা। কিন্তু কেন আমরা তাঁর মুকাবিলা করতে পারছি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষ আমরা দেখছি যে, তাঁরা একবাক্যে এর উচ্চাঙ্গের

রচনাশৈলী ও সাহিত্যমানের প্রশংসা করছেন এবং স্বীকার করছেন যে, কোন মানুষের পক্ষে এরূপ রচনা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, যদি মুকাবিলা করার ক্ষমতা হরণের মাধ্যমে কুরআনকে অলৌকিক বলে প্রমাণিত করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তবে কুরআনের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান ও অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হতো না। কারণ 'মুকাবিলা করার মত, অথচ করতে অক্ষম' এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো, কুরআনের সাহিত্যমান যত নিম্ন হবে এর অলৌকিকত্ব তত বেশি প্রমাণিত হবে।

চতুর্থত, কুরআন কারীমে এ কথা বলা হয় নি যে, দেখ, কুরআন একটি অনুকরণীয় রচনা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তার অনুকরণ করতে পারছ না, এ থেকে আল্লাহ্র বা মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষমতা বুঝে নাও, বরং কুরআনে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, কুরআনের নিজস্ব মানের কারণেই তারা এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে : "বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।"[৫৯]

কেউ হয়ত বলতে পারেন, কুরআনে যে শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে তা সবই তো আরবদের জানা ছিল এবং তারা তা কুরআনের বাক্যাবলির মত বাক্যাদিতে ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, তারা কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় সক্ষম ছিল।

এ ধরনের চিন্তার অসারত্ব বুঝতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনেক পশম বা সুতা একত্রিত করে রশি তৈরি করে সেই রশি দিয়ে একটি হাতি বা একটি জাহাজ বেঁধে রাখা যায়, কিন্তু তাই বলে একটি বা কয়েকটি পৃথক রশি দিয়ে কোন হাতি বা জাহাজ বেঁধে রাখা যায় না। এই চিন্তা যদি সঠিক হত তবে সকল ভাষার সকল মানুষই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বা কাব্য রচনা করতে পারত বা সকল আরবই ইমরুল কায়স বা অনুরূপ কবিদের মত কবিতা রচনা করতে পারত; কারণ ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠন ক্ষমতা তো সকলেরই আছে।

কুরআনের অলৌকিকত্বের তৃতীয় বিষয়

তৃতীয় যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী, তা হলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলো পরবর্তীকালে ঠিক সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে :

---

৫৯. সূরা : ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।

(১) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাস্‌জিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না।"৬০

(২) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেনই, যেভাবে তিনি স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আর আমার কোন শরীক করবে না..." ।৬১

এখানে আল্লাহ্ ওয়াদা করলেন মু'মিনদেরকে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাধর করবেন, খলীফা বা শাসক তাদের মধ্য থেকেই হবে, তাদের মনোনীত দীন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই মুসলিমগণ মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, ইয়ামান রাজ্য ও আরব দেশের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ইথিওপিয়ার রাজা নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের কারণে ইথিওপিয়াও ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী এলাকার অনেক মানুষ এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অনেক খৃস্টান জিযিয়া প্রদান ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য করে।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে এই বিজয়, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিমগণ পারস্যের কিছু এলাকা অধিকার করেন, সিরিয়ার সীমান্তবর্তী বুসরা শহর, সিরিয়ার রাজধানী দামেশক ও সিরিয়ার আরো কিছু এলাকা তাঁরা অধিকার করেন।

উমার ফারূক (রা)-এর সময়ে এই সীমা আরো প্রসারিত হয়। তাঁর সময়ে মুসলিমগণ সমগ্র সিরিয়া ও মিসর অধিকার করেন। পারস্যের অধিকাংশ এলাকা তাঁদের পদানত হয়। উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর সময়ে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার চাদর আরো প্রসারিত হয়। মুসলিমগণ পশ্চিমে কায়রোয়ান ও স্পেনের প্রান্তে পৌঁছে যান। পূর্বদিকে তাঁরা চীনের সীমানায় উপস্থিত হন। এভাবে মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে মুসলিমগণ তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র প্রায় পুরোটুকুই অধিকার করেন।

৬০. সূরা : ৪৮ ফাত্হ, ২৭ আয়াত। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় পরে তা বাস্তবায়িত হয়।

৬১. সূরা : ২৪ নূর, ৫৫ আয়াত।

এভাবে আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন এ সকল দেশের সকল দীনের উপর বিজয় লাভ করে। ফলে মুসলিমগণ নিরাপদে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারেন। আলী (রা)-এর সময়ে নতুন বিজয় সাধিত না হলেও তাঁর যুগে মুসলিম মিল্লাতের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে।

(৩) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "অচিরেই তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে"।৬২

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে মুসলিমদেরকে একাধিক 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতির' সাথে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কায্যাবের অনুসারী হানীফা গোত্রের মানুষগণ। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এদের সাথে যুদ্ধের আহ্বান জানান।

(৪) মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথনির্দেশনা ও সত্য দীনসহ, সকল দীনের উপরে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"৬৩

এই ওয়াদাও দ্বিতীয় ওয়াদার মতই প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা আশা করছি যে, ইনশা আল্লাহ্, শীঘ্রই এই ওয়াদার বাকিটাও পূরণ হবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(৫) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "মু'মিনগণ যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যুদ্ধ-লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এ তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করলেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষদের হস্ত নিবারিত করলেন এবং যেন তা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।"৬৪

এ সকল ওয়াদা সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। 'আসন্ন বিজয়' হিসেবে খায়বারের বিজয় লাভ করেছেন মু'মিনগণ। প্রথম 'বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে-লভ্য সম্পদ' হিসেবে

৬২. সূরা : ৪৮ ফাত্হ, ১৬ আয়াত।

৬৩. সূরা : ৬১ সাফ্ফ, ৯ আয়াত।

৬৪. সূরা : ফাত্হ, ১৮-২১ আয়াত।

খায়বার ও (পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী) হিজর অঞ্চলের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাঁরা লাভ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র কাছে অগণিত সম্পদ লাভ করবেন। পরবর্তী প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ্ যে 'বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লভ্য সম্পদের' ওয়াদা করেন, মু'মিনগণ আরবের হাওয়াযিন গোত্র এবং পরে পারস্য ও রোমের বিজয়ের মাধ্যমে তা লাভ করেন। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সবই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৬) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "এবং তিনি দান করবেন তোমাদেরকে আকাঙ্ক্ষিত আরেকটি অনুগ্রহ : আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।"৬৫

এখানে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জান্নাতের নিয়ামত ছাড়াও অতিরিক্ত অনুগ্রহ হিসেবে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়ের ওয়াদা করেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মু'মিনগণ তা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ও কুরআন ব্যাখ্যাকার হাসান বসরী (১১০ হি) বলেন, আসন্ন বিজয় হিসেবে মু'মিনগণ পারস্য ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। এভাবেই কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৭) মহান আল্লাহ্ বলেন : "যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।"৬৬

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বস্তুত এই সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এখানে বলা হয়েছে 'যখন আসবে'। আরবীতে যখন অর্থে 'ইযা' ভবিষ্যতের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যা ঘটে গিয়েছে সে বিষয়ে বলতে কখনোই 'ইযা' ব্যবহার করা হয় না, বরং 'ইয্' ব্যবহার করা হয়। যদি মক্কা বিজয়ের পরে সূরাটি অবতীর্ণ হতো তবে বলা হতো 'ইয্ জাআ–যখন এসে গেল'। এভাবে সুনিশ্চিত যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বেই এই সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে বিজয় ও দীন বাস্তবায়নের যে ওয়াদা করেন তা যথাযথ পূর্ণ করেন। মক্কা বিজয় হয়। মক্কা, তায়িফ ও অন্যান্য এলাকা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

(৮) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "যারা কুফরী করে তাদেরকে বল, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে।"৬৭

এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৯) মহান আল্লাহ্ বলেন : "এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, (সিরিয়া থেকে প্রত্যাগত দল এবং মক্কা থেকে আগত দল) দুই

---

৬৫. সূরা : ৬১ সাফ্ফ, ১৩ আয়াত।
৬৬. সূরা : ১১০ নাস্‌র, ১-২ আয়াত।
৬৭. সূরা : আলে-ইমরান, ১২ আয়াত।

দলের একদল তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন হবে; আর তোমরা চাচ্ছিলে যে, (সিরিয়া থেকে প্রত্যাগত) পরাক্রমহীন-প্রতিপত্তিবিহীন দলটি তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন হোক, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।"৬৮

আল্লাহ্ যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবেই তা সংঘটিত হয়েছিল।

(১০) মহান আল্লাহ্ বলেন : "আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।"৬৯

মক্কার কতিপয় মানুষ একত্রিত হয়ে মক্কার সর্বত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে বেড়াত, মানুষদের সামনে তাঁর, তাঁর দীনের ও অনুসারীদের নিন্দা-মন্দ করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথীদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, এ সকল 'বিদ্রূপকারী'র বিষয়ে আর আমাদের চিন্তা করতে হবে না। আল্লাহ্ শীঘ্রই এদের ব্যবস্থা করবেন। বাস্তবে তাই ঘটে। এই বিদ্রূপকারিগণ বিভিন্ন বিপদে নিপতিত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এভাবেই তাঁর জ্যোতি পরিপূর্ণ হয় এবং তাঁর বিজয় প্রকাশিত হয়।

(১১) মহান আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।"৭০

এই ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা করার ও তাঁকে ধরার বুক থেকে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই তাঁর ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহ্র হেফাযতে থেকে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে গমন করেন।

(১২) মহান আল্লাহ্ বলেন : "আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী) পরাজিত হয়েছে; নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়)। কিন্তু তারা (রোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন থেকে দশ) বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্রই। আর সে দিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহ্র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহ্রই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।"৭১

---

৬৮. সূরা : আনফাল, ৭ আয়াত।

৬৯. সূরা : ১৫ হিজ্‌র, ৯৫ আয়াত।

৭০. সূরা : ৫ মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

৭১. সূরা : ৩০, রূম, ১-৭ আয়াত।

পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল খৃস্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আগে থেকেই চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃস্টাব্দের দিকে (নবুওয়াতের ৮/৯ম বছরের দিকে, হিজরতের ৩/৪ বছর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[৭২] কিছু সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌছে যায়।

রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌছলে মক্কার কাফিরগণ আনন্দিত হয় ঃ তোমরা মুসলিম এবং তারা খৃস্টানগণ আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসিগণ আমাদেরই মত কোন কিতাব মানে না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর বিজয় লাভ করেছে। এভাবে আমরাও শীঘ্রই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মু'মিনগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আনন্দিত হন। আবূ বকর (রা) কাফিরদেরকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী করবেন না। আল্লাহ্র শপথ, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকগণ পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে। তখন কাফিরদের অন্যতম নেতা উবাই ইবনু খালাফ বলে, তোমার কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। সাহস থাকলে এস আমরা সময় নির্ধারণ করে বাজি ধরি। তখন তারা বাজি ধরেন যে, তিন বছরের মধ্যে যদি রোমকগণ বিজয় লাভ করে তবে উবাই আবূ বকরকে ১০টি উট প্রদান করবে। আর তা না হলে আবূ বক্র তাকে ১০ উট দেবেন।

আবূ বক্র পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষয়টি অবগত করান। তিনি বলেন, بضع বলতে তিন থেকে নয় সংখ্যা বুঝানো হয়। কাজেই তুমি বাজির সময় বাড়িয়ে দাও এবং উটের সংখ্যাও বাড়িয়ে দাও। তখন আবূ বক্র উবাইয়ের সাথে কথা বলে বাজির সময় বাড়িয়ে ৯ বছর করেন এবং উটের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করেন।

এই চুক্তির প্রায় ৫ বছর পর ৬২৪ খৃস্টাব্দে (৩ হিজরীতে(উহুদ যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে উবাই ইবনু খালাফ মৃত্যু বরণ করে। এর পরে পরাজয়ের প্রায় ৭ বছর পরে ৬২৭ খৃস্টাব্দে (৬ হি) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হৃত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৭৩] তখন

---

৭২. পারস্য সম্রাটের সেনাদল মিসর অধিকার পূর্বক উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কার্থেজ নগর আক্রমণ করে। অপর একদল পারসিক সেনা এশিয়া মাইনর পুরোটাই রোমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়ী বেশে বস্ফোরাস প্রণালীর তীরে উপনীত হয়। দুর্দান্ত স্লাভ জাতির আক্রমণে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে রোমক সম্রাট পারসিক সেনাদলের গতিরোধ করতে অক্ষম হন। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪১।

৭৩. মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪৭।

Contents

আবূ বক্‌র উবাই-এর সন্তানদের থেকে বাজির চুক্তি অনুসারে ১০০টি উট গ্রহণ করেন এবং দরিদ্রদের জন্য দান করে দেন।

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা পাদ্রী ড. ফান্ডার তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "মুফাস্‌সিরগণ দাবি করেছেন যে, এই আয়াতটি রোমকদের বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা যদি তাদের দাবির সত্যতা স্বীকার করে নিই তবে বলতে হবে যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের ধারণা ও সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে কথাটি বলেছিলেন, তাঁর অনুসারীদের মন শান্ত করার জন্য। এরূপ কথা অনেক জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ থেকে সকল যুগেই শোনা যায়।"

'যদি আমরা তাদের দাবি সত্য বলে মেনে নিই' বলে মি. ফান্ডার বুঝাতে চাচ্ছেন যে, বিষয়টি তাঁর কাছে সত্য বলে স্বীকৃত বা নিশ্চিত নয়। তাঁর এই ধারণাটি বড় অদ্ভুত! কুরআনে এখানে বলা হয়েছে : "শীঘ্রই তারা বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই।" এ থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এই আয়াতগুলো রোমক বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে রোমকগণ আবার বিজয়ী হবে। "সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে" এবং "এ আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" এই বাক্যদ্বয় থেকেও সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এগুলো ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিলেন। রোমক বিজয় সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে এরূপ কথা বলা হলে তা যে কোন মূর্খ আরবের নিকটেও অর্থহীন প্রলাপ বলে গণ্য হতো।[৭৪]

ড. ফান্ডার বলেছেন : "মুহাম্মাদ (সা) নিজের ধারণা ও সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে কথাটি বলেছিলেন।" এ কথাটি দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত :

প্রথমত, খৃস্টান প্রচারক ও পাদ্রিগণসহ সকলেই স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ (সা) একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। সম্মানিত পাদরি মহাশয়ও এখানে তা স্বীকার করছেন। তাঁর পুস্তকের অন্যান্য স্থানেও তিনি তা স্বীকার করেছেন। কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নবুওয়তের দাবিদার-যদি সত্যিই নবী না হন তবে তিনি কখনোই এভাবে কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না যে, অমুক ঘটনা ৯/১০ বছরের মধ্যে সংঘটিত হবেই। তার অনুসারীদেরও এ বিষয়ে বাজি ধরতে অনুমতি দেবেন না, বিশেষত যেখানে তার বিরুদ্ধবাদিগণ অত্যন্ত সক্রিয় ও তার ভুল ধরতে সদা সচেষ্ট।

---

৭৪. কুরআন অবতরণের ইতিহাস বাদ দিলেও কুরআনের ভাষাশৈলী ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, সূরা রূম হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর ঐতিহাসিকভাবে সকলেই একমত যে, রোমকগণ বিজয় লাভ করে হিজরতের প্রায় ৬ বছর পরে ৬২৭ খৃস্টাব্দে।

আর বিষয়টিও এমন যে, তা সংঘটিত হলে তার তেমন কোনই উপকার হবে না, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হলে তিনি লাঞ্ছিত হবেন, তার মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে এবং সক্রিয় বিরুদ্ধবাদিগণ তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হাতে পাবে। কোন বুদ্ধিমানই এরূপ ঝুঁকির মধ্যে যাবেন না।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁদের জ্ঞান ও অনুমানের ভিত্তিতে কখনো কখনো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁদের কোন কথা সঠিক হয়েছে এবং কোন কোন কথা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র রীতি (Divine rule) হলো, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার কোন ভবিষ্যদ্বাণী করলে এবং সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বললে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী কখনোই সত্য ও সফল হয় না। আল্লাহ্ তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেন। ইনশা আল্লাহ্ এই আলোচনার শেষে পাঠক সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

(১৩) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তারা কি বলে, আমরা সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল'? এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।"৭৫

উমার (রা) বলেন, এই আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমি বুঝতে পারলাম না যে, কিভাবে তা সংঘটিত হবে। অবশেষে বদরের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনলাম, 'এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে', তখন আমি বুঝলাম, আয়াতগুলোতে বদরের যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়েছে।

(১৪) মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।"৭৬

এ আয়াতে যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সবই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(১৫) মহান আল্লাহ্ ইহূদীদের সম্পর্কে বলেন, "সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।"৭৭

এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে :

প্রথম, সাধারণ ক্লেশ-কষ্ট, যেমন মুহাম্মাদ (সা) ও ঈসা (আ) সম্পর্কে কটু কথা বলা, দুর্বল মু'মিনদেরকে ভয় দেখানো ইত্যাদি ছাড়া বড় কোন ক্ষতি ইহূদীগণ সাহাবীদের করতে পারবে না।

---

৭৫. সূরা : ৫৪ কামার, ৪৪-৪৫ আয়াত।

৭৬. সূরা : ৯ তাওবা, ১৪ আয়াত।

৭৭. সূরা : ৩ আলে-ইমরান, ১১১ আয়াত।

দ্বিতীয়, যদি তারা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পরাজিত হবে।

তৃতীয়, এই পরাজয়ের পরে তাদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ফিরে পাবে না।

বিষয়গুলো সবই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(১৬) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্র রশি বা মানুষের রশির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গিয়েছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনতাগ্রস্থ হয়েছে।"[৭৮]

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর জীবদ্দশায় ও তাঁর পরে সাহাবীদের সাথে সকল যুদ্ধেই ইহূদীগণ পরাজিত হয়েছে, পরাজয়ের পরে তারা আর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা ফিরে পায় নি। এমনকি এখন পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও তাদের কোন রাষ্ট্র নেই। সকল দেশেই তারা দুর্বল নাগরিক হিসেবে বসবাস রত।[৭৯]

(১৭) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব।"[৮০]

উহুদের যুদ্ধের সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। দু'ভাবে তা হয়েছিল :

প্রথমত, মুশরিকগণ উহুদের যুদ্ধের সময় মুসলিমদের উপর বিজয়ী হয় এবং মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করে। তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। তারা কোন কারণ ছাড়াই পরাজিত শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত, লুণ্ঠন ইত্যাদি না করে পালিয়ে যায়।

---

৭৮. সূরা : ৩ আলে-ইমরান, ১১২ আয়াত।

৭৯. খৃস্টানগণই ইহূদীদেরকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে। ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ধর্মের নামে খৃস্টানগণ সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে ইহূদীদের উপর। জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা থেকে শুরু করে দৈহিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল প্রকার অত্যাচারই তাদের উপর করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার রশি ধরে ইহূদীগণ ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। কুরআন কারীমে সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল)-এর ৪-৮ আয়াতে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ ফিলিস্তীন থেকে ইহূদীদের বিতাড়নের বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন : "সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব।" অর্থাৎ আশা করা যায় যে, আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে ক্ষমতা, অধিকার বা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করবেন। কিন্তু যদি তারা তা পেয়ে আবার পূর্বের মত অবাধ্যতা, অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়, তবে আবারও আল্লাহ্ পূর্বের মত তাদেরকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত করবেন।

৮০. সূরা : ৩ আলে-ইমরান, ১৫১ আয়াত।

দ্বিতীয়ত, মক্কায় ফেরার পথে কিছুদূর যাওয়ার পরে তারা এজন্য অনুতপ্ত হয়। তারা বলে, কী জঘন্য কাজই না করেছ তোমরা! তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে। এরপর যখন তারা পরাজিত ও বিতাড়িত হল তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসলে। তোমরা আবার ফিরে চল। মুসলিমগণ পুনরায় শক্তি ফিরে পাওয়ার আগেই তাদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে আসতে হবে। তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন এবং পুনরাক্রমণ না করেই তারা মক্কায় ফিরে যায়।

(১৮) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।"[৮১]

এভাবে আল্লাহ্ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্ডিত তা জানেন। ইসলামের শত্রুগণ, মুসলিম নামধারী গোপন যিনদীকগণ, মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত মু'আত্তিলা, কারামিতা ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কোনভাবে কুরআনের কিছুই বিকৃত করতে পারে নি। যুগ আবর্তনের এই দীর্ঘ সময়ে, হিজরতের পরে ১২৮০ বছরে[৮২] তারা কেউ কোন শব্দের একটি বর্ণ, কোন বাক্যের একটি অব্যয়, একটি বিভক্তি চিহ্নও পরিবর্তন করতে পারে নি। পক্ষান্তরে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে অগণিত বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে পাঠক এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে জানতে পেরেছেন।

(১৯) কুরআনের সংরক্ষণের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন : "কোন বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়। তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ।"[৮৩]

অর্থাৎ বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে কোনরূপ মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্বের মতই বাস্তবায়িত হয়েছে।

(২০) মহান আল্লাহ্ বলেন : "যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থানে।"[৮৪]

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় ছওর গুহা থেকে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ে বের হয়ে সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করে দূরবর্তী রাস্তা ধরে মদীনার পথে এগোতে থাকেন। যখন তিনি মক্কাবাসীদের থেকে নিরাপত্তা অনুভব করেন তখন

৮১. সূরা ১৫ হিজ্র, ৯ আয়াত।
৮২. এই গ্রন্থ রচনার সময়কাল, ১২৮০ হিজরী, ১৮৬৪ খৃস্টাব্দ।
৮৩. সূরা : ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস-সাজদা), ৪২ আয়াত।
৮৪. সূরা : ২৮ কাসাস, ৮৫ আয়াত।

তিনি সাধারণ পথে চলে আসেন। তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী পথে জুহফা নামক স্থানে অবতরণ করেন। মক্কায় গমনের সুপরিচিত মরুপথ তিনি চিনতে পারেন। তিনি জন্মভূমি মক্কার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর নিজের ও পিতার জন্মস্থানের কথা তাঁর মনে হতে থাকে। তখন জিবরীল (আ) অবতরণ করেন, বলেন : আপনি কি আপনার জন্মভূমি ও আবাসভূমি মক্কার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন জিবরীল (আ) বলেন, আল্লাহ্ বলছেন : "যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থানে" অর্থাৎ মক্কায় বিজয়ীরূপে ।

(২১) ইহূদীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "বল, (হে ইহূদীগণ) 'যদি আল্লাহ্র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর–যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে কখনোই (যতক্ষণ জীবন আছে) তারা তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ্ যালিমদের বিষয়ে অবহিত।"[৮৫]

এখানে মৃত্যু কামনা করা বলতে স্বভাবতই মুখে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করা বুঝানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা, চিন্তাশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে শত্রুমিত্র সকলেই একমত। এ জগতে ও পরকালীন জীবনে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি পার্থিব জীবনেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব লাভ করেছেন। তাঁর মত একজন ব্যক্তি কখনোই এমন কোন চ্যালেঞ্জ দিতে পারেন না, যার উত্তর প্রতিপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এরূপ বুদ্ধিমান একজন ব্যক্তি তাঁর কঠিনতম শত্রুকে এমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন না যার পরিণতি সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন এবং যে বিষয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁকে দলিলপ্রমাণ দিয়ে ঠকিয়ে দিতে পারে বলে তাঁর ভয় আছে। একান্তই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নিশ্চিত না হলে তিনি কখনোই এরূপ করতে পারেন না। একজন সাধারণ অনভিজ্ঞ বুদ্ধিমান মানুষও এরূপ ঝুঁকি গ্রহণ করবেন না। তাহলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কিভাবে কল্পনা করা যায় ? এ থেকে বুঝা যায় যে, একমাত্র ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সুনিশ্চিত হওয়ার পরেই তিনি এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।

অপরদিকে, আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, ইহূদীগণ তাঁর কঠিনতম শত্রু ছিল। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার বা মুসলিমদেরকে লাঞ্ছিত-লজ্জিত করার বিষয়ে তারা সর্বদা চিন্তা-গবেষণা করত। এরূপ কঠিনতম শত্রুদের থেকে তিনি এমন

৮৫. সূরা : ২ বাকারা, ৯৪-৯৫ আয়াত।

একটি বিষয় দাবি করেছেন যা কোন কঠিন বিষয় নয়, বরং অতি সহজ বিষয়–শুধু মুখে মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করা।

যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাবি সত্য না হতো তবে তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য দ্রুত এরূপ প্রার্থনা করতে এগিয়ে আসত বরং তারা বারংবার প্রকাশ্যে এরূপ মৃত্যুকামনা করে প্রমাণ করত যে, মুহাম্মাদ (সা) একজন মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র নামে এরূপ মিথ্যা কথা প্রচার করেন। তিনি দাবি করেন যে, আমরা কখনোই মৃত্যু কামনা করতে পারব না। কখনো তিনি বলেন যে, "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, কোন ইহূদী যদি এভাবে মৃত্যুর প্রার্থনা উচ্চারণ করে তবে মুখের লালা তার গলায় আটকাবে" অর্থাৎ সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। কখনো তিনি বলেন, "যদি ইহূদীগণ মৃত্যু কামনা করতো তবে তারা মারা যেত।" অথচ দেখুন আমরা বারংবার মৃত্যু কামনা করছি, অথচ আমরা সঙ্গে সঙ্গে মরছি না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার ব্যাপারে তাদের এত বেশি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এভাবে প্রকাশ্যে মৃত্যু কামনা করা থেকে তাদের বিরত থাকা তাঁর অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে এবং তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির দুটি দিক রয়েছে :

প্রথম, "তারা তা কামনা করবে না" এ কথার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন একজন ব্যক্তিও এরূপ কামনা করবে না।

দ্বিতীয়, "কখনোই" বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতের কোন যুগেই তারা তা করবে না। এভাবে কোন যুগেই কোন ইহূদী এভাবে মৃত্যু কামনা করবে না বলে ব্যক্তি ও যুগ দুটি বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

(২২) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা আনয়ন করতে না পার এবং কখনোই তা করতে পারবে না–তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"[৮৬]

এখানে আল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তারা কখনোই কুরআনের অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন করতে পারবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণীও বাস্তবায়িত হয়েছে। এই আয়াতটি ৪ দিক থেকে কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে :

প্রথম : অগণিত মানুষের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় আরবের মানুষদের উগ্রতা ছিল

৮৬. সূরা : ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

সীমাহীন। আর তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে এবং তাঁর দীনকে বাতিল প্রমাণ করতে তাদের আগ্রহও ছিল অত্যন্ত বেশি। জন্মভূমি পরিত্যাগ, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণহানীর পথ বেছে নেওয়া তার বড় প্রমাণ। এই পরিস্থিতিতে তাদেরকে বলা হলো, 'যদি তোমরা তা আনয়ন করতে না পার–এবং কখনোই তা করতে পারবে না'। স্বভাবতই এ কথা বলে তাদেরকে আহত ও অপমানিত করা হলো। এতে তাদের জিদ কঠিনতর হওয়াই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় কুরআনের মত একটি গ্রন্থ বা কুরআনের কোন একটি সূরার মত একটি সূরা রচনা করার ক্ষমতা যদি তাদের থাকত, তবে অবশ্যই তারা তা করত। তারা তা না করাতে কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত অস্বীকারকারিগণ তাঁর নবুওয়তের দাবি অবিশ্বাস করলেও তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান, বিবেচনা, বুদ্ধি, পরিণামদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির বিষয়ে তাদের কোন দ্বিমত নেই। তিনি যদি তাঁর নবুওয়তের দাবিতে মিথ্যাবাদী হতেন তবে কখনোই তাদেরকে এরূপ চিরস্থায়ী কোন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন না। ওহীর মাধ্যমে তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হলে তাঁর মত একজন বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই এভাবে তাদেরকে আহত ও অপমানিত করে নিজের জন্য ঝুঁকি ও সমূহ বিপর্যয়ের পথ উন্মুক্ত করতেন না।

তৃতীয় : তিনি যদি তাঁর নবুওয়ত ও ওহীর সত্যতা সম্পর্কে শতভাগ সুনিশ্চিত না হতেন তবে কখনোই এ দাবি করতেন না যে, তারা তাঁর বাণীর মত কোন বাণী কখনোই রচনা করতে পারবে না। কোন জালিয়াত কখনোই নিশ্চিতরূপে দাবি করতে পারে না যে, তার দেশের ও তার ভাষার অন্য মানুষেরা কখনোই তার পেশ করা কথার মত কথা রচনা করতে পারবে না।

চতুর্থ : এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়পর্বে সকল সময়ে ও যুগেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুগণ সক্রিয় ছিল ও রয়েছে। ইসলামের দুর্ণাম করতে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনায় কখনো ভাটা পড়ে নি বা প্রচারাভিযানও কখনো ক্ষান্ত হয় নি। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কখনোই কুরআনের মুকাবিলা করার ঘটনা ঘটে নি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই আয়াতটি চার দিক থেকে প্রমাণ করে যে, কুরআন অলৌকিক ও আল্লাহ্র বাণী।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। কারণ আল্লাহ্র রীতি হলো, কেউ যদি নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব দাবি করে এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে, তবে সে কথা সত্য হয় না। দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২১ আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব ? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর

নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"

কুরআনের অলৌকিকত্বের চতুর্থ বিষয়

চতুর্থ যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র অলৌকিক বাণী, তা হলো কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদাদি। কুরআনে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের বিভিন্ন সংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো লেখাপড়া করেন নি। আলিমদের সাথে উঠাবসা বা জ্ঞানীদের থেকে শিক্ষালাভ করার সুযোগও তাঁর হয় নি বরং তিনি এমন একটি জাতির মধ্যে বেড়ে উঠেন যে জাতি মূর্তিপূজা করত এবং লেখাপড়া জানত না। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তারা দূরে ছিল। তিনি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর নিজ জাতিকে ছেড়ে দূরে গমন করেন নি, যে সময়ে তিনি অন্য দেশের পণ্ডিতদের থেকে এ সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন।[৮৭] এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুটিনাটি তথ্য প্রদান প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি যদি তাঁর তথ্য সংগ্রহে ইহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্পের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতেন না।[৮৮] খৃস্টের ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন প্রচলিত

৮৭. নবুওয়াতের পূর্বে পূর্ববর্তী ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে তাঁর কোনরূপ আগ্রহ ছিল বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না। তিনি কখনো অন্য ধর্মের পণ্ডিতদের নিকট যেয়ে এ সকল বিষয়ে তাদেরকে কোন প্রশ্ন করেন নি বা আলোচনা করেন নি। চলতি পথে কোন ব্যক্তি তাঁকে কিছু বললেও তা নিয়ে পরে চিন্তা-গবেষণাও করেন নি।

৮৮. প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকাই রচিত 'The Bible, The Qur'an and Science' (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান) পুস্তকটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের অগণিত অবৈজ্ঞানিক, আজগুবি ও অবাস্তব গল্প-কাহিনী কুরআনে সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলের অতিরঞ্জনও কুরআনে পরিহার করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সন, তারিখ, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যাদি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তিনি যদি ইহূদী খৃস্টানদের থেকেই এ সকল গল্প-কাহিনী গ্রহণ করতেন তবে তিনি এগুলো বাদ দিলেন কেন ? বিশেষত, যে যুগে মানুষ এ সব সন, তারিখ, ইতিহাস ও অবাস্তব কাহিনীগুলো শোনার জন্য পাগল ছিল, এগুলোকেই অলৌকিকত্ব মনে করত এবং এ সকল গল্প দিয়ে সহজেই হৃদয় প্রভাবিত করা যেত, সে যুগে তিনি এগুলো পরিহার করলেন কেন ? আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কুরআনের বর্ণনাই সঠিক এবং বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এই বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয় অথবা তা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে : "ইস্রায়েল সন্তানগণ যে সকল বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন সেগুলোর অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।"[৮৯]

কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলো প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা গোপনে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটতো। আল্লাহ্ তাঁর মহান রাসূল (সা)-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে। প্রত্যেক বারেই তা সত্য পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইহূদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে।

কুরআনের অলৌকিকত্বের ষষ্ঠ বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের ষষ্ঠ বিষয় হলো, কুরআনে এমন সব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিষয়াবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদ (সা) জানতেন না এবং সাধারণভাবে আরবগণও জানত না। বিশেষত, শরীয়তের বিধিবিধান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ও যুক্তি, ইতিহাস, উপদেশ-ওয়ায, প্রজ্ঞাময় বাণী, পরকালীন জগতের সংবাদ, উন্নত আচরণ ও মহান চরিত্রের প্রশংসা ইত্যাদি।

এর ব্যাখ্যা হলো, জ্ঞান হয় ধর্মীয় হবে অথবা জাগতিক বিষয় কেন্দ্রিক হবে প্রথম বিষয়ের জ্ঞানই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আর ধর্মীয় জ্ঞান হয় বিশ্বাস বিষয়ক হবে, অথবা কর্ম বিষয়ক হবে। বিশ্বাস বিষয়ক ধর্মীয় জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো, মহান আল্লাহ্র পরিচয়, ফিরিশতা বা তাঁর দূতগণের পরিচয়, তাঁর গ্রন্থসমূহের পরিচয়, তাঁর প্রেরিতগণ বা ভাববাদিগণের পরিচয় এবং পরকাল বা আখিরাতের পরিচয়। আল্লাহ্র পরিচয়ের অর্থ হলো, তাঁর পবিত্র সত্তার পরিচয়, তাঁর মহান গুণাবলির পরিচয়, তাঁর মর্যাদাময় কর্মের পরিচয়, তাঁর বিধিবিধানের পরিচয় এবং তাঁর পবিত্র নামসমূহের পরিচয়। কুরআনে এ সকল বিষয় খুঁটিনাটি ব্যাখ্যাসহ এত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ও এগুলোর দলিল-প্রমাণাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এর সমতুল্য বর্ণনা তো দূরের কথা, এর কাছাকাছি বর্ণনাও নেই।

কর্মবিষয়ক জ্ঞান হয় প্রকাশ্য বিধিবিধান সম্পর্কিত হবে অথবা অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কিত হবে। প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানকে 'ফিকহ্' বলা হয়। এই পর্যায়ের জ্ঞানের মূল

৮৯. সূরা : ২৭ নাম্‌ল, ৭৬ আয়াত।

ভিত্তিই কুরআন। কুরআনের নির্দেশনার আলোকেই 'ইসলামী ফিক্‌হ'-এর সকল মূলনীতি ও বিধিবিধান প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান অন্তরের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পর্কিত। একে আত্মশুদ্ধি বা তাসাওউফ বলা হয়। কুরআনে এ বিষয়ক যে নির্দেশনা রয়েছে তার তুলনা আর কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। এ বিষয়ক দু'চারটি নির্দেশনা উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, কল্যাণের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।"[৯০]

তিনি বলেন : "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন।"[৯১]

তিনি বলেন : "ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ (আচরণ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[৯২]

এখানে আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন তাদের মূর্খতা, প্রগলভতা, সহিংসতা ও অসদাচরণ মুকাবিলা করতে অধিকতর উত্তম আচরণ দ্বারা, অর্থাৎ ধৈর্য ও মন্দের মুকাবিলা ভাল দ্বারা করতে। এরূপ আচরণের ফলাফলও তিনি জানিয়েছেন। এভাবে যাদের মন্দ আচরণের প্রতিবাদে উত্তম আচরণ করা হবে, তারা তাদের মন্দ আচরণ পরিত্যাগ করবে এবং শত্রুতা থেকে ভালবাসা এবং হিংসা থেকে আন্তরিকতায় আগমন করবে।

এরূপ বাণী কুরআনে অনেক। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন কারীমে ধর্মীয় জ্ঞানের সকল মূলনীতি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার সমন্বয় করা হয়েছে। উপরন্তু এতে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনার নির্দেশনা রয়েছে। বিভ্রান্তিকর চিন্তা ও যুক্তিতর্ক সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণাদি দিয়ে বাতিল করা হয়েছে।

যেমন, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ?"[৯৩] আরো বলেছেন : "যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তা জীবিত করবেন।"[৯৪]

---

৯০. সূরা : ৭ আ'রাফ, ১৯৯ আয়াত।

৯১. সূরা : ১৬ নাহ্‌ল, ৯০ আয়াত।

৯২. সূরা : ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস-সাজদা), ৩৪ আয়াত।

৯৩. সূরা : ৩৬ ইয়াসীন, ৮১ আয়াত।

৯৪. সূরা : ৩৬ ইয়াসীন, ৭৯ আয়াত।

বহু ঈশ্বরবাদীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে : "যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।"[৯৫]

একজন কবি বড় সুন্দর কথা বলেছেন : "কুরআনে সকল জ্ঞানই রয়েছে; কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তা বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়।"

কুরআনের অলৌকিকত্বের সপ্তম বিষয়

সপ্তম যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন কোন মানুষের রচিত নয়, বরং তা 'আল্লাহ্র বাণী', তা স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য থেকে বিমুক্ত।[৯৬] কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহ্র বাণী না হয়ে কোন মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য দেখা যেত। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এরূপ বৈপরিত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ স্ববিরোধিতা, বৈপরিত্য ও অসঙ্গতি না থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহ্র বাণী। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না ? তা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।"[৯৭]

উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ বলেন : "এ গ্রন্থ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯৮]

অর্থাৎ আকারে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র এরূপ অত্যাশ্চর্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান, অলঙ্কার ও রচনাশৈলী সংরক্ষণ করা, এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী, অদৃশ্য বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা, বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় করা এবং স্ববিরোধিতা থেকে বিমুক্ত থাকা কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ হতে পারে না। আসমান-যমিনের অণু-পরমাণু পর্যন্ত সকল রহস্য যিনি জ্ঞাত আছেন কেবল তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থই এরূপ হতে পারে।

---

৯৫. সূরা : ২১ আম্বিয়া, ২২ আয়াত।

৯৬. বাইবেলে কোথাও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল মানুষ। আবার কোথাও দেখতে পাই যে, তাঁকে অস্বাভাবিক বদরাগি ও কঠোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক ক্রোধে তিনি নিরপরাধ বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলছেন, নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে গালিগালাজ করছেন। নিঃসন্দেহে এই চিত্রায়ণ স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ২৩ বছরের দীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ কুরআনে এক্ষেত্রে দ্রুত উত্তেজিত ও দ্রুত সংযত দেখতে পাই।

৯৭. সূরা : ৪ নিসা, ৮২ আয়াত।

৯৮. সূরা : ২৫ ফুরকান, ৬ আয়াত।

কুরআনের অলৌকিকত্বের অষ্টম বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের আরেকটি দিক হলো, তা অলৌকিকরূপেই সংরক্ষিত রয়েছে, সেভাবেই তা সর্বত্র পঠিত হচ্ছে। অন্য কোন নবী-ভাবরাদীর অলৌকিক চিহ্ন সেরূপ নয়। তাঁদের তিরোধানের সাথে সাথে সেগুলো চলে গিয়েছে এবং অতীত সংবাদে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন তার অবতরণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিকল আপন অলৌকিক সত্ত্বায় সংরক্ষিত রয়েছে। ১২৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আজো তার অলৌকিকত্ব ও প্রামাণ্যতা অপ্রতিরোধ্য এবং তার মুকাবিলা অসম্ভব।

সকল যুগে সকল দেশে ও জনপদে ভাষাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী মানুষেরও অভাব ছিল না। ইসলামের বিপক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণকারীর সংখ্যাও কম ছিল না। যতদিন এই পৃথিবী ধ্বংস না হবে, ইনশা আল্লাহ্, ততদিন এভাবেই তা থাকবে।

কুরআনের তিন আয়াত বিশিষ্ট সবচেয়ে ছোট সূরাটিই একটি অলৌকিক চিহ্ন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন দুই হাজারেরও বেশি অলৌকিক চিহ্নের সমাহার।

কুরআনের অলৌকিকত্বের নবম বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্য দিক হলো, কুরআনের পাঠক বিরক্ত হন না এবং শ্রোতা ক্লান্ত হন না। বারংবার পাঠের বা শ্রবণের ফলে ক্লান্তির পরিবর্তে ভালবাসাই বৃদ্ধি পায়। এর কবি বলেছেন : "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সহচর, যার কথা কখনোই ক্লান্তিকর নয় : তুমি যতই তার সাহচর্য বাড়াবে ততই তোমার চোখে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।"

অন্যান্য গ্রন্থ্ বা রচনা যত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মানেরই হোক না কেন, বারংবার পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে ক্লান্তি ও বিরক্তি এসে যায়। তবে কুরআনের এই অলৌকিকত্ব অনুধাবন করতে নিষ্কলুষ অন্তর প্রয়োজন। অসুস্থ অন্তর কুরআনের আনন্দ নাও অনুভব করতে পারে।

কুরআনের অলৌকিকত্বের দশম বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্য দিক হলো, তা একই সঙ্গে প্রমাণিত বিষয় দুটিই বুঝিয়ে দেয়। কুরআন পাঠকারী যদি তার অর্থ বুঝতে সক্ষম হন তবে তিনি প্রমাণ ও দায়িত্ব উভয়ই বুঝতে পারেন। তিনি এর অলৌকিক ভাষাশৈলী থেকে তা যে আল্লাহ্র বাণী তা বুঝতে পারেন। আবার এর অর্থ থেকে আল্লাহ্র আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি জানতে পারেন।

কুরআনের অলৌকিকত্বের একাদশ বিষয়

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্ত করা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন : "কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য ?"[৯৯] এমনকি ছোট্ট ছোট্ট শিশুরাও অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই এই বৃহৎ গ্রন্থটি মুখস্থ করে ফেলে।

বর্তমান যুগে[১০০] অধিকাংশ দেশেই মুসলিমগণ দুর্বল। তা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোতে লক্ষাধিক হাফিযে কুরআন রয়েছেন, যাঁরা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ রেখেছেন। এদের যে কোন একজনের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কুরআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লিখে নেওয়া যায়। এতে কোন শব্দ তো দূরের কথা, একটি স্বরচিহ্নও বাদ পড়বে না।

পক্ষান্তরে বিগত ৩০০ বছর ধরে ইউরোপবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তারা জ্ঞান-চর্চার জন্য অঢেল সময় ও সুযোগ পাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও পুরো ইউরোপ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও বাইবেলের শুধু নতুন নিয়ম মুখস্থ রেখেছেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বোধহয় কয়েক জনের বেশি হবে না। পুরো ইউরোপ মহাদেশে যে কয়জন 'হাফিযে ইনজীল' পাওয়া যাবে, মিসরের ছোট্ট একটি গ্রামেও তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক 'হাফিযে কুরআন' রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি কুরআন ও কুরআনের জাতির জন্য একটি অলৌকিক গৌরব ও মর্যাদা।

কুরআনের অলৌকিকত্বের দ্বাদশ বিষয়

কুরআনের আরেকটি অলৌকিকত্ব হলো, পাঠক বা শ্রোতার মনে গভীর আল্লাহ্-প্রেমের আবহ তৈরি করা। পাঠক পাঠ করার সময় বা শ্রোতা শ্রবণ করার সময় নিজ হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র প্রেম ও ভক্তিময় ভীতি অনুভব করেন। এমনকি যে পাঠক বা শ্রোতা এর অর্থ বুঝতে পারছেন না বা ব্যাখ্যা জানেন না তার হৃদয়েও অনেক সময় তিনি এই অনুভূতি অনুভব করেন। অনেক মানুষ প্রথম বার কুরআন শুনে না বুঝেই হৃদয়ে নাড়া অনুভব করেছেন। তাদের কেউ প্রথম অনুভূতিতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেউ হৃদয়ের অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে কুফরীর মধ্যেই থেকে গিয়েছেন। কেউ কেউ হৃদয়ের অনুভূতি প্রথমে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসেছেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, এক খৃস্টান ব্যক্তি এক মুসলিম কুরআন পাঠকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। কুরআন পাঠ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন

---

৯৯. সূরা : ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত।

১০০. গ্রন্থকার তাঁর যুগের, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধের কথা বলছেন।

তাঁকে তাঁর ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, প্রভুর বাক্যের প্রভাবে হৃদয়ে যে ভক্তিময় ভীতির সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে কাঁদছি।

নবুওয়তের ৫ম বছরে (৬১৫ খৃ) মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু মুসলিম নরনারী জন্মভূমি ত্যাগ করে আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) গমন করেন। তথাকার খৃস্টান নরপতি নাজাশী (Negus) তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে (রাসূলুল্লাহ্ সা-এর চাচাতো ভাই) জা'ফর তাইয়ার তাঁদেরকে কুরআনের কিছু অংশ (সূরা মারইয়াম) পাঠ করে শোনান। তিনি যতক্ষণ কুরআন পাঠ করেন ততক্ষণ নাজাশী ও তাঁর দরবারের মানুষেরা ক্রন্দন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে নাজাশী ৭০ জন খৃস্টান পণ্ডিতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শোনান। কুরআন শ্রবণ করে তাঁরাও ক্রন্দন করতে থাকেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এই উভয় ঘটনার দিকে অথবা প্রথম ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয় : "রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।"১০১

ইতোপূর্বে জুবায়র ইবনু মুত'ইম (রা), উৎবা ইবনু রাবী'আ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্‌ফা ও ইয়াহইয়া ইবনুল হাকাম গাযাল-এর অবস্থা সম্পর্কে পাঠক জেনেছেন।

প্রসিদ্ধ শী'আ আলিম নূরুল্লাহ শোসতারী (১০১৯ হি/১৬১০ খৃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন : "আল্লামা আলী ইবনু মুহাম্মাদ কাওশাজী (৮৭৯ হি/১৪৭৪ খৃ) মধ্য এশিয়া থেকে তুরস্কে গমন করেন। তিনি যখন কন্সট্যান্টিনোপল বা ইসতাম্বুলে অবস্থান করছিলেন, তখন একজন ইহূদী পণ্ডিত তাঁর নিকট ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগমন করেন। আল্লামা কাওশাজীর সথে তিনি প্রায় মাসাধিককাল আলোচনা চালিয়ে যান। কাওশাজীর পেশকৃত দলিলগুলো তিনি গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। একদিন সকালে উক্ত ইহূদী পণ্ডিত কাওশাজীর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি নিজ বাড়ির বারান্দায় বসে কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। কাওশাজীর গলার স্বর ছিল খুবই কর্কশ। উক্ত ইহূদী পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে কাওশাজীর কর্কশ স্বরের কুরআন পাঠ শুনে বিমুগ্ধ হন। কুরআনের শব্দ তাঁর অন্তরকে খুবই প্রভাবিত করে। তিনি কাওশাজীর কর্কশ স্বরের কুরআন পাঠ শুনে বিমুগ্ধ হন। কুরআনের শব্দ তাঁর অন্তরকে খুবই প্রভাবিত করে। তিনি কাওশাজীর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করব। কাওশাজী তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এরপর তিনি তাকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আপনার মত কর্কশ কণ্ঠস্বরওয়ালা মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমি

---

১০১. সূরা : ৫ মায়িদা, ৮৩ আয়াত।

যখন আপনার বাড়িতে প্রবেশ করলাম তখন আপনার এই কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। এই কর্কশ কণ্ঠের কুরআনই আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তা আল্লাহ্র ওহী।"

উপরের বিষয়গুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, কুরআন অলৌকিক গ্রন্থ ও আল্লাহ্র বাণী (Word of God)। বস্তুত, কুরআন সকল সৌন্দর্য একত্রিত করেছে। যে কোন কথার সৌন্দর্য তিন প্রকার হতে পারে : প্রথমত, শব্দের সৌন্দর্য; দ্বিতীয়ত, বাক্যগুলোর বিন্যাসের সৌন্দর্য এবং তৃতীয়ত, অর্থের সৌন্দর্য। কুরআন সন্দেহাতীতভাবে এই তিন প্রকারের সৌন্দর্য একত্রিত করেছে। কুরআনের অলৌকিকত্বের এই পরিচ্ছেদের শেষে আমি তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি :

প্রথম বিষয় : সাহিত্য ও অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যকে আমাদের নবীর অলৌকিক চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ।

বিভিন্ন যুগে নবীদেরকে তাঁদের যুগের চাহিদা অনুসারে অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদান করা হয়। যুগের মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও উন্নতি বেশি সে যুগের নবীকে সেই জাতীয় অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করা হয়। মানুষেরা তাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যোগ্যতা দিয়ে উক্ত বিষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে অনুভব করতে পারে যে, তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কোন মানুষের পক্ষে উক্ত পর্যায় অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যখন সেই পর্যায় ও সীমা অতিক্রান্ত কোন বিষয় তারা দেখতে পান তখন সহজেই সে বিষয়ের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। তারা বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি মানবীয় নয়, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত।

মূসা (আ)-এর সময়ে মিসরীয়দের মধ্যে যাদুর চর্চা ছিল খুবই বেশি। এ বিদ্যায় তারা বিশেষ অগ্রগতি ও পূর্ণতা লাভ করে। সে দেশের শীর্ষস্থানীয় যাদুকরগণ খুব ভালভাবেই জানতেন যে, যাদু হলো চোখের ধাঁধা মাত্র, এর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই বা এতে মূল বিষয়ের প্রকৃতি পরবর্তিত হয় না। এজন্য যাদুকরগণ যখন তাদের লাঠি ও রশি মাটিতে ফেলেন তখন সেগুলোর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো লাঠি ও রশিই থাকে, তবে দর্শকদের চোখে তা সাপ বলে দৃশ্যমান হয়। এ সকল শীর্ষস্থানীয় যাদুকর যখন দেখলেন যে, মূসার লাঠির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সত্যিকারের সাপে পরিণত হলো এবং তাদের লাঠিগুলো প্রকৃতপক্ষেই গলধঃকরণ করলো তখন তারা বুঝতে পারলো যে, মূসার কর্ম যাদু নয়, বরং যাদুর সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত অলৌকিক একটি বিষয়। এ কারণে তারা ঈমান গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ফেরাউন যাদুর প্রকৃতি সম্পর্কে অত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল না। এজন্য সে মনে করে যে, মূসার কর্মও যাদু, যদিও তা তার নিজের যাদুকরদের চেয়ে উন্নত পর্যায়ের।

ঈসা (আ)-এর যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি ঘটে। মানুষ এতে আগের চেয়ে অধিক যোগ্যতা অর্জন করে। তারা যখন দেখল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করছেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করছেন, তখন তারা বুঝতে পারল যে, মানবীয় চিকিৎসা বিদ্যা দিয়ে তা কখনোই সম্ভব নয়; কাজেই তা মানবীয় নয়, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত অলৌকিক চিহ্ন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের মানুষেরা কাব্য, সাহিত্য ও সাহিত্যিক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। এ সকল বিষয়ে অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, তারা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য ও সাহিত্যকর্মগুলো কাবাঘরের দরজায় টাঙ্গিয়ে রাখতো অন্যদেরকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এ কারণে এ সকল কাব্য 'মু'আল্লাকাত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে তাঁর অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করলেন এবং কবি-সাহিত্যিকগণ এর মুকাবিলা ও প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হলেন, তখন সকলেই বুঝতে পারলেন যে, তা নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্‌র বাণী।[১০২]

---

১০২. সাহিত্য ও অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কুরআনকে কেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হলো, এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার যা বলেছেন তা তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই বাস্তব কথা। পাশাপাশি আমরা একথাও অনুভব করি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বনবী ও সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রেরিত রাসূল হওয়ার জন্য এটি ছিল অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমত, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের অলৌকিক চিহ্ন (miracle) ছিল তাঁদের সমসাময়িকদের জন্য। তাঁরা যেমন শুধু তাঁদের যুগের মানুষদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের অলৌকিক চিহ্নও ছিল শুধু তাঁদের যুগের মানুষদের জন্য। তাঁদের তিরোধানের পরে তা 'সংবাদে' পরিণত হয়েছে। একজন খৃস্টান দাবি করতে পারেন যে, যীশু মৃতকে জীবিত করতেন। কিন্তু খৃস্ট সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিকে তিনি তা দেখাতে পারবেন না। শুধু তাঁর বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু 'সংবাদ' বলবেন। এমনকি এ সকল অলৌকিকত্বের পক্ষে ইতিহাস থেকেও কিছু তথ্য দিতে পারবেন না। ঐতিহাসিকভাবে যীশুর অস্তিত্বই প্রমাণিত নয়। যীশু নামে কোন ব্যক্তি যিরূশালেমে ধর্মপ্রচার করেছেন এরূপ কোন তথ্যই তাঁর সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নি, তাঁর অলৌকিকত্বের স্বীকৃতি তো অনেক দূরের কথা। অন্যান্য নবীদের অলৌকিকত্বের অবস্থাও একই। পক্ষান্তরে কুরআন জীবন্ত ও অনন্ত অলৌকিক চিহ্ন। যে কোন যুগে যে কোন মুসলিম ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তির সামনে কুরআনকে অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে পেশ করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, নবী-রাসূলদের অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার উদ্দেশ্য হলো আগ্রহী ব্যক্তিকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করা। যীশুর মৃতকে জীবিত করা, মোশির লাঠিকে সাপ বানানো ইত্যাদি কর্ম তৎকালীন কোন কোন মানুষকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করলেও তাঁদের তিরোধানের পরে কেউ আর তা দেখে বিশ্বাসী হন না। পক্ষান্তরে কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরস্থায়ী। সকল যুগেই এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা কোনরূপ প্রচার ছাড়াই শুধু কুরআন পাঠ করে তার অলৌকিকত্ব অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করলেও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে কুরআনের অলৌকিকত্ব স্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে যে সকল অলৌকিকত্ব বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলো ছিল মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পক্ষান্তরে কুরআনের অলৌকিকত্ব গ্রন্থভিত্তিক হওয়াতে তা বিমূর্ত ও জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতশীল বিশ্বের সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ হওয়ার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান।

চতুর্থত, সকল ধর্মের ভিত্তিই হলো 'আল্লাহ্‌র বাণী' বা ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বজনীন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। কুরআনের সাহিত্যিক অলৌকিকত্বের ফলে তা কখনো বিকৃত করা সম্ভব হয় নি। একদিকে যেমন অগণিত মানুষ সহজেই তা মুখস্থ রাখতে পেরেছে, অন্যদিকে কেউই এর মধ্যে কোন সংযোগ করতে সক্ষম হয়নি।

পঞ্চমত, কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যগত অলৌকিকত্বের কারণে সকল মানুষের কাছে তা সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য। এ হলো তার বিশ্বজনীনতার বিশেষ দিক।

দ্বিতীয় বিষয় : কুরআন একবারে একত্রে অবতীর্ণ না হয়ে অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে বুঝা যায় :

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে ও তাঁর যুগের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। একবারে পুরো কুরআন অবতীর্ণ হলে সে যুগের মানুষদের জন্য একবারে তা মুখস্থ করা কষ্টকর হয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত, কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলে, সম্ভাবনা ছিল যে, সে যুগের মানুষেরা তা মুখস্থ করার পরিবর্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির উপরেই বেশি নির্ভর করত। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে যেমন তা মুখস্থ করেছেন; তাঁর সাথে তাঁর বহুসংখ্যক সাহাবীও অতি সহজে ক্রমান্বয়ে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা তা লিখে রাখলেও সেই প্রথম যুগ থেকেই কুরআন হৃদয়ে ধারণ ও মুখস্থ করার রীতি মুসলিম জাতির মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

তৃতীয়ত, কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলে ইসলামের সকল বিধানই একত্রে অবতীর্ণ হতো, এতে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা তৎকালীন সমাজের নওমুসলিমদের জন্য কষ্টকর হয়ে যেত। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে, বিশেষত আদেশ নিষেধ ও কর্ম জাতীয় বিধানাবলি অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তা পালন করা সহজ হয়। জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর অত্যন্ত করুণা করেছেন। আমরা মুশরিক ছিলাম। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দীন একবারে নিয়ে আসতেন এবং এই কুরআন একত্রে অবতীর্ণ হতো তবে আমাদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন হতো। কারণ এর বিধিবিধান আমাদের জন্য কঠিন মনে হতো। হয়তো আমরা ইসলাম গ্রহণ করতাম না। কিন্তু তিনি আমাদেরকে শুধু একটি বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেন। আমরা তা গ্রহণ করি এবং বিশ্বাসের আনন্দ উপলব্ধি করি। এরপর যখন একের পর এক বিধিবিধান অবতীর্ণ হলো আমরা সবই গ্রহণ করলাম এবং এভাবে দীন পূর্ণতা লাভ করল।

চতুর্থত, এভাবে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝে মাঝেই জিবরীল (আ)-কে দেখতে পেতেন। এতে তাঁর অন্তকরণ তৃপ্তি ও দৃঢ়তা লাভ করত। নবুওয়তের দায়িত্ব পালনে ধৈর্যধারণের ও মানুষদের দেওয়া কষ্ট মেনে নেওয়ার প্রেরণা নবায়িত হতো।

পঞ্চমত, কুরআন এভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও তার অলৌকিক ভাষাশৈলী রক্ষিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তা একবারে অবতীর্ণ হলেও তার অলৌকিকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকত।

ষষ্ঠত, সাহাবীগণের প্রশ্নের ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন অবতীর্ণ হতো। এতে তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হতো। কারণ এতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হতো, মনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হতো এবং এর সাথে সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হতো।

সপ্তমত, কুরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রতিবারে অবতীর্ণ কুরআনই তাদের প্রতি নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। প্রতিবারেই তারা অপারগ হয়েছে। এভাবে তাদের অসহায়ত্ব ও পরাজয় বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিবারের ছোট্ট অংশের অনুকরণে যখন তারা অক্ষম হয়েছে, তখন পূর্ণ কুরআনের অনুকরণ তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

অষ্টমত, জিবরীল (আ) আল্লাহ্ ও তাঁর নবীগণের মধ্যে দূতিয়ালির কাজ করতেন। আল্লাহ্র বাণী তিনি তাঁদের কাছে পৌছে দিতেন। কুরআন যদি একবারে অবতীর্ণ হতো, তবে একবারেই জিবরীলের দায়িত্ব পালিত হয়ে যেত এবং তিনি এই মহান পদে কর্ম করার মর্যাদা হারিয়ে ফেলতেন। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়াতে তাঁর এই মর্যাদা দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেছে।

তৃতীয় বিষয় : তাওহীদ বা একত্ববাদ, আখিরাত বা পরজগতের কথা, নবীগণের কাহিনী ইত্যাদি বিষয় কুরআনে বারংবার উল্লেখ করার কারণ।

এরূপ পুনরাবৃত্তির অন্যতম কারণ ছিল যে, আরবের পৌত্তলিকগণ এ সকল বিষয় মানত না। অনারবদের কেউ এগুলো মানত না, যেমন ভারত ও চীনের মানুষেরা ও অগ্নি উপাসকগণ। আবার কেউ এ সকল বিষয়ে বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস পোষণ করত, যেমন ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ। এজন্য এ সকল বিষয় বারংবার বলা খুবই জরুরী ছিল।

এছাড়াও এরূপ পুনরাবৃত্তির আরো অনেক কারণ ছিল। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(১) কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি দিক হলো সাহিত্যিক মান। এই সাহিত্যিক মানের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনের অনুরূপ কোন বাণী বা বক্তব্য পেশ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এদিক থেকে কাহিনীসমূহের পুনরাবৃত্তি কুরআনের অলৌকিকত্ব সুনিশ্চিত করে। কারণ একই কাহিনী কুরআনে কখনোই একই শব্দে ও বাক্যে পুনরাবৃত্তি করা হয় নি। সাধারণত মানুষ একই বিষয় বিভিন্নভাবে বললে সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু কুরআনে তা রক্ষা করা হয়েছে।

(২) এরূপ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কাফিরদের ওযরখাহির পথ রোধ করা হয়েছে। তারা বলতে পারত যে, যে বিষয়ে কুরআন আলোচনা করেছে সে বিষয়ের সবচেয়ে উন্নত শব্দ ও শৈলী কুরআন ব্যবহার করে ফেলেছে। এখন আমরা সে বিষয় অন্য শব্দে বললে একই মানের হবে না। অথবা তারা বলতে পারত যে, এক একজন সাহিত্যিক

একেক রচনাশৈলীতে অভ্যস্ত। কেউ দীর্ঘ বর্ণনায় অভ্যস্ত, কেউবা সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অভ্যস্ত। কুরআন যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সে পদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত নই, বরং আমরা অন্য পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। অথবা তারা বলতে পারত যে, গল্প-কাহিনী উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কুরআনে একই বিষয় বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন রচনাশৈলীতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করার কারণে তাদের এ সকল ওযরখাহির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

(৩) কাফির ও মুনাফিকগণ সদাসর্বদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট ও যাতনা প্রদান করত। এতে তিনি বেদনা অনুভব করতেন ও তাঁর অন্তর সংকুচিত হতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন : "আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।"[১০৩] এজন্য আল্লাহ্ তাঁর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলদের কাহিনী বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করতেন। এতে তিনি প্রশান্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন : "রাসূলদের এ সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান-বাণী।"

(৪) মুসলিমগণও এভাবে কাফির ও মুনাফিকগণ কর্তৃক যাতনা ও কষ্ট পেতেন। এছাড়া অনেকে নতুন ইসলাম গ্রহণ করতেন। অনেক সময় কাফিরদেরকে সতর্ক করার দরকার হতো। এ সকল কারণে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে নাযিল করা হয়েছে।

(৫) একই গল্পের মধ্যে অনেক বিষয় থাকে। কুরআনে একই কাহিনী যখন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক স্থানের আলোচনায় নতুন শিক্ষা রয়েছে।[১০৪]

---

১০৩. সূরা : ১৫ হিজর, ৯৭ আয়াত।

১০৪. কুরআন শুধু ধর্মগুরু বা তাত্ত্বিকদের জন্য 'নিয়মপুস্তক' নয়। উপরন্তু তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য সহজলভ্য আত্মিক প্রেরণার মূল উৎস। প্রত্যেক বিশ্বাসীই তা নিয়মিত পাঠ করবেন। সালাতের মধ্যে, সালাতের বাইরে, মুখস্থ অথবা দেখে দেখে তিনি পাঠ করবেন। যেখান থেকেই কিছুটা তিনি পাঠ করেন সেখানেই তিনি বিভিন্ন প্রকারের আত্মিক প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করেন। যদি প্রত্যেক ঘটনা বা বিষয় একবার মাত্র এক স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হতো, তবে সকল বিশ্বাসী এভাবে সহজে বিভিন্ন প্রকার ধারণা লাভ করতে পারতেন না। আর কুরআনে একই বিষয় একাধিকবার বলা হলেও দুই স্থানে একই কথা বলা হয় নি, বরং শব্দ, বাক্য ও অর্থের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য যিনি পুরো কুরআন পাঠ করেন তিনিও হৃদয়ে নতুন নতুন প্রেরণা অনুভব করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

প্রথম বিভ্রান্তি

আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য ও অলঙ্কারিক সুষমায় মণ্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্ধ্বে। যদি তা আমরা স্বীকার করেও নিই, তবে তা কুরআনের অলৌকিকত্বের জন্য পরিপূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে না, বরং অসম্পূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে। কারণ আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তাঁরাই এই অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন। এছাড়া এতে প্রমাণিত হবে যে, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের গ্রন্থগুলো সবই আল্লাহ্র বাণী। সর্বোপরি অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও ঘৃণিত অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথমত: পাদরিদের প্রথম কথা "আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ সাহিত্য ও অলঙ্কারিক সুষমায় মণ্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্ধ্বে" ভিত্তিহীন গলাবাজি ও সুস্পষ্ট সত্যকে বুঝার পরেও গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম পরিচ্ছেদের ১ম ও ২য় বিষয় থেকে পাঠক তা ভালভাবে জানতে পেরেছেন।[১০৫]

১০৫. খৃস্টানগণ, বিশেষত, আরব খৃস্টানগণ, যাদের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি, কুরআনের ভাষার অভাবনীয় যাদুকরি প্রভাবের কথা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। শুধু ভাষার সৌন্দর্য অর্জন ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য অনেক আরব খৃস্টান কুরআন পাঠ করেন। অনেকে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থও করেন। এজন্য আরবীয় খৃস্টান পণ্ডিতগণ দীর্ঘ কয়েক যুগ চেষ্টা করে কুরআনের শব্দ, শব্দবিন্যাস, আয়াত বিন্যাস সব কিছু চুরি করে অবিকল কুরআনী শৈলীতে একটি আরবী বাইবেল লিখেছেন। এমনকি প্রত্যেক 'অধ্যায়ের' পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেছেন। বিভিন্ন খৃস্টান বেতার কেন্দ্র থেকে এই বাইবেল কুরআনের পদ্ধতিতে 'কারিয়ানা' তিলাওয়াত করা হয়। এত কিছুর পরেও যে কোন সাধারণ আরব খৃস্টানও বুঝতে পারেন যে, এই বাইবেলে কুরআনের যাদুকরি প্রভাব নেই। কোন আরব খৃস্টান আরবী ভাষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই বাইবেল পাঠ করেন না, পড়ে মজাও পাওয়া যায় না; বরং এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন সত্যই অলৌকিক এবং এর ভাষা ও শৈলী অননুকরণীয়। দেখুন, Ahmed Deedat, The Choice : Islam and Christianity, Vol. -1, page 227-228.

দ্বিতীয়ত: তাঁদের দ্বিতীয় কথাটি "আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তাঁরাই এই অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন" ঠিক হলেও এতে প্রমাণিত হয় না যে, তা কুরআনের অলৌকিকত্বের অসম্পূর্ণ প্রমাণ।

বস্তুত, কুরআনের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক অলৌকিকত্ব ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকটেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্ভাসিত। কুরআনের মুকাবিলায় তাঁদের অক্ষমতা, অপারগতা ও তাঁদের স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করেছে। আরবী ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের স্বভাবজাত রুচি দিয়ে কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী অনুভব করেন। অন্য ভাষার পণ্ডিতগণও আরবী ভাষার সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করলে তা বুঝতে পারেন। আর সকল জাতি ও ধর্মের সাধারণ মানুষেরা হাজার হাজার আরবী ভাষী মানুষ ও অন্যান্য জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতের সাক্ষ্য থেকে তা জানতে পারেন। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষাশৈলী কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের অসম্পূর্ণ প্রমাণ নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ প্রমাণ। অনেক কিছুই প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী। সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি।

মুসলিমগণ দাবি করেন না যে, শুধু সাহিত্যমানই কুরআনের অলৌকিকত্বের একমাত্র প্রমাণ। অনুরূপভাবে তাঁরা দাবি করেন না যে, শুধু কুরআনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একমাত্র অলৌকিক চিহ্ন বরং মুসলিমগণ দাবি করেন যে, বহু বিষয় কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে, যেগুলোর একটি বিষয় হলো অলৌকিক সাহিত্যমান। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ বহুসংখ্যক অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেছিলেন, কুরআন সেগুলোর একটি। প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। ইনশা আল্লাহ, এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে আরো অনেক তথ্য জানতে পারবেন। এই অলৌকিকত্ব বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত। আরবী ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং আরবী সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই অলৌকিকত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। বিরোধীদের অক্ষমতাও প্রমাণিত। কুরআন অবতীর্ণ হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেউই এর মুকাবিলায় একটি ছোট্ট সূরাও পেশ করতে পারেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পরে ১২৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই অলৌকিকত্ব পুরাতন হয় নি।

কখনো কখনো দুএকজন 'পাগল' পণ্ডিত হয়ত দাবি করেছেন যে, 'কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা করা যায়', কিন্তু রচনা করে কেউ দেখাতে পারেন নি। পাঠক ইতোপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় আলোচনাকালে নায্যামের মত জানতে পেরেছেন এবং মতটি যে বাতিল ও ভিত্তিহীন তা জেনেছেন। অনুরূপভাবে আরেকজন মুতাযিলী পণ্ডিত ছিলেন আবূ মূসা ঈসা ইবনু সুবাইহ মাযদার (২২৬ হি)। তিনিও দাবি করতেন যে, 'মানুষ কুরআনের মত ভাষা, শৈলী ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করতে

সক্ষম।' মাযদারের কথাও নায্যামের কথার মতই ভিত্তিহীন বাতুল দাবি ছাড়া কিছুই নয়।

বস্তুত মাযদারের মস্তিষ্কের অস্থিরতা পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি এরূপ অনেক প্রলাপ বকেছেন। তিনি বলতেন, মহান আল্লাহ্ যুলুম করতে পারেন, মিথ্যা বলতে পারেন। তিনি যদি মিথ্যা বলেন ও যুলুম করেন তবে মিথ্যাবাদি ও যালিম মা'বূদ বলে গণ্য হবেন। তিনি আরো বলতেন, যে ব্যক্তি সরকার বা প্রশাসকের সাথে সংশ্রব রাখে সে কাফির। তার আত্মীয়স্বজন মারা গেলে সে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে না। আর সে মারা গেলে তার সন্তান-পরিজন তার উত্তরাধিকার লাভ করবে না ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: পাদরিগণ বলেছেন: "এতে প্রমাণিত হবে যে, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের গ্রন্থগুলো সবই আল্লাহ্‌র বাণী।" তাঁদের এ কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। কারণ :

(১) পূর্ববর্তী আলোচনায় কুরআনের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য মানের যে বিভিন্ন দিক আমরা দেখেছি এরূপ বিভিন্নমুখি সাহিত্য মান গ্রীক, ল্যাটিন বা অন্যান্য ভাষার কোন পুস্তকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না।

(২) এ সকল পুস্তকের লেখকগণ তাঁদের নিজেদের ভাববাদিত্ব বা তাঁদের পুস্তকের অলৌকিকত্ব দাবি করেন নি।

(৩) এ সকল ভাষার অন্যান্য লেখক ও সাহিত্যিক সে সকল পুস্তকের অনুরূপ পুস্তক রচনা করতে অক্ষম হয়েছেন বলেও প্রমাণিত হয় নি।

যদি কেউ এ সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয় তিনটি দাবি করেন তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। তাকে গ্রীক, ল্যাটিন বা অন্য কোন ভাষার কোন একটি পুস্তক সম্পর্কে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত পুস্তকটিতে বিভিন্নমুখি অলৌকিক সাহিত্যমান রয়েছে, উক্ত পুস্তকের লেখক তার অলৌকিকত্ব দাবি করেছিলেন এবং সেই ভাষার সাহিত্যিকগণ তার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় অক্ষম হয়েছিলেন। আর এ বিষয়গুলো প্রমাণ করতে না পারলে পাদরি সাহেবদের উপর্যুক্ত কথাটি ভিত্তিহীন ও অন্তসারশূন্য বাতিল কথা বলে গণ্য হবে।

কোন কোন খৃস্টান হয়ত দাবি করতে পারেন যে, কুরআন যেমন আরবী ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান সংরক্ষণ করেছে, গ্রীক বা ল্যাটিন বা অন্য অমুক ভাষার অমুক গ্রন্থটি সেই ভাষায় অনুরূপ উচ্চাঙ্গ সাহিত্যমান রক্ষা করেছে। কিন্তু তাঁদের এই দাবি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এরূপ 'তুলনা' করার জন্য তাঁদেরকে আরবী ভাষায় ও অন্য যে ভাষার পুস্তককে সেই ভাষায় কুরআনের অনুরূপ বলে দাবি করছেন এই দুটি ভাষাতেই সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে এরা কেউ নিজের

ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার তেমন কিছুই জানেন না। অন্য ভাষার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও বহুবচনের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারেন না। অন্য ভাষার বিভক্তি চিহ্নের পার্থক্যও করতে পারেন না। কাজেই কোন্‌টি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম, কোন্‌টি উচ্চতর তা তাঁরা কিভাবে বুঝবেন!

তাঁদের এই অজ্ঞতা শুধু আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয়। তাঁদের আরবী জ্ঞান যেমন দুর্বল, হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁদের দখলও এত বেশি নয়। এর কারণ, মূলতই তাদের ভাষা সাদামাটা। এরূপ দুর্বলতার ক্ষেত্রে ইংরেজ পণ্ডিতদের বৈশিষ্ট্য আরো বেশি। অন্যান্য দেশের খৃস্টান পণ্ডিতদের মতই তাঁরা মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় দুর্বল। তবে ইংল্যান্ডের পণ্ডিতদের এই দুর্বলতা ছাড়াও অন্য একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো, তাঁরা কোন বিদেশী ভাষার কিছু শব্দ শিখতে পারলেই মনে করেন যে, তাঁরা সেই ভাষায় মহা পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলেছেন। কোন বিদ্যার অল্প কিছু বিষয় শিক্ষা করলেই তাঁরা ভাবতে শুরু করেন যে, তাঁরা সেই বিদ্যার মহাসাগরে পরিণত হয়েছেন। ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে ইংরেজ পণ্ডিতদের নিন্দা করে থাকেন।

খৃস্টানদের ভাষা 'সাদামাটা' হওয়ার কারণে আরবী, ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রীক ইত্যাদি সকল ভাষাতেই তাদের দুর্বলতার যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করেছি তার একটি প্রমাণ দেখুন। ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম আর্বান (Urban)[১০৬]-এর নির্দেশে সিরিয়ার প্রধান বিশপ সার্কিস হারূনী আরবী , গ্রীক, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অভিজ্ঞ বহুসংখ্যক পাদরি, সন্যাসী, পণ্ডিত ও ভাষাবিদকে একত্র করেন। তিনি তাঁদেরকে বাইবেলের আরবী অনুবাদটিকে পরিমার্জিত করতে দায়িত্ব দেন; কারণ আরবী অনুবাদটি অগণিত ভুলে ভরা ছিল। পোপের নির্দেশে ও বিশপের তত্ত্বাবধানে এ সকল পণ্ডিত প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করে ১৬২৫ খৃস্টাব্দে বাইবেলের আরবী অনুবাদটি পরিমার্জন ও সংশোধন করে প্রকাশ করেন। কিন্তু এভাবে পরিপূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জনের পরেও এই অনুবাদের মধ্যে অগণিত ভুলভ্রান্তি থেকে যায়; কারণ ভুলভ্রান্তি খৃস্টীয় প্রকৃতির সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য তাঁরা উপর্যুক্ত অনুবাদটির ভূমিকায় এ বিষয়ে ওযরখাহি পেশ করেন। আমি তাঁদের ভাষাতেই তাঁদের ওযরখাহি উল্লেখ করছি। তাঁরা লিখেছেন :

"অতঃপর আপনি এই অনুবাদের মধ্যে কিছু কথা এমন দেখবেন যা ভাষার নিয়মের বাইরে বরং ভাষার নিয়মনীতির উল্টো। কোথাও স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং

---

১০৬. পোপ আর্বান ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ খৃস্টাব্দে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৪৩/১৬৪৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কোথাও দ্বিবচনের স্থলে রয়েছে বহুবচন। কোথাও ভুল বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে : ইসমের মধ্যে যের বা যবরের স্থানে এবং ফি'লের মধ্যে জযমের স্থলে পেশ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও স্বরচিহ্নের স্থলে অতিরিক্ত বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া অনুরূপ অন্যান্য বিষয় দেখবেন। এর কারণ হলো খৃস্টানদের ভাষা সাদাসিধে। এজন্য এরূপ ভুলভ্রান্তি ভরা ভাষা তাদের বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টি শুধু আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, বরং ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ সকল ভাষাতেও ভাববাদী ও প্রেরিতগণ এবং পূর্ববর্তী ধর্মগুরুগণ ভাষার নিয়মনীতি বর্জন করতেন। কারণ, পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিক শব্দের প্রশস্ততাকে ভাষার ব্যাকরণের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চান নি। এজন্য ভাষার বিশুদ্ধতা, সাহিত্যমান ও অলঙ্কার ছাড়াই তিনি ঐশ্বরিক রহস্যাবলি আমাদেরকে প্রদান করেছেন।”

আর ইংরেজদের সম্পর্কে এ বিষয়ে যে অতিরিক্ত কথা উল্লেখ করেছি তার একটি প্রমাণ হলো, আবূ তালিব খান নামক একজন পর্যটক 'তালেবের সফরনামা' নামে ফার্সী ভাষায় তাঁর সফরনামা রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁর সফরের ঘটনাবলি লিখেছেন। প্রত্যেক দেশে প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় যা কিছু দেখেছেন তা তিনি পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এভাবে তিনি ইংল্যান্ডবাসীদের প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অষ্টম নিন্দনীয় বিষয়টি অনুবাদ করছি। তিনি বলেন :

“অষ্টমত, অন্যান্য জাতির বিদ্যা ও ভাষা জানার ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তি। অন্য কোন জাতির কোন বিদ্যার সামান্য কয়েকটি বিষয় বা অন্য ভাষার অল্প কিছু শব্দ জানতে পারলেই তারা নিজেদেরকে সেই বিদ্যার বা সেই ভাষার মহাপণ্ডিত বলে মনে করেন। তারা তখন এ বিষয়ে বই-পুস্তক লিখতে শুরু করেন। এরপর এ সকল আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা ছেপে প্রকাশ করেন। ফরাসী ও গ্রীকদের সাক্ষ্য থেকে প্রথমে আমি বিষয়টি জানতে পারি। কারণ এই দুটি ভাষা শিক্ষার রেওয়াজ ইংল্যান্ডবাসীদের মধ্যে রয়েছে। এরপর আমি যখন ফার্সী ভাষার ব্যাপারে তাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করলাম তখন তাদের এই বদঅভ্যাসটির বিষয়ে নিশ্চিত হলাম।... লন্ডনে এ জাতীয় অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে এ সকল ভুলভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তকের ভিড়ে বিশুদ্ধ পুস্তক খুঁজে বের করা কষ্ট হয়ে যাবে।”

চতুর্থত: পাদরিগণ বলেছেন, “অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও নিন্দনীয় অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।”

তাঁদের এই কথাটি এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার কোন অবকাশই নেই। কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণময় ও প্রশংসনীয় কথায় পরিপূর্ণ। কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোকে আমরা নিম্নোক্ত ২৭ টি

বিষয়ে বিভক্ত করতে পারি। কুরআনের যে কোন একটি দীর্ঘ আয়াতে এ সকল বিষয়ের কোন একটি বিষয় দেখতে পাওয়া যাবে।

(১ম) আল্লাহ্র মহান গুণাবলি। যেমন তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, বক্তব্যদাতা, প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, মহা দয়ালু, পরম করুণাময়, ধৈর্যশীল, ন্যায়পরায়ণ, মহাপবিত্র, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা ইত্যাদি।

(২য়) ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা। যেমন নূতনত্ব, অক্ষমতা, অজ্ঞতা, অত্যাচার ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা।

(৩য়) বিশুদ্ধ একত্ববাদের প্রচার এবং সকল প্রকারের শিরক, বহু উপাস্য উপাসনা নিষেধ করা, এবং বিশেষ করে ত্রিত্ববাদ নিষেধ করা। পাঠক ইতোপূর্বে চতুর্থ অধ্যায় থেকে জেনেছেন যে, নিঃসন্দেহে 'ত্রিত্ববাদ' শিরক ও বহু-ঈশ্বরবাদিতার একটি প্রকাশ।

(৪র্থ) নবীগণের বা ভাববাদিগণের উল্লেখ।

(৫ম) নবীগণ যে মূর্তিপূজা, অবিশ্বাস ও অন্যান্য পাপ-অন্যায় থেকে মুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ।

(৬ষ্ঠ) নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা।

(৭ম) নবীদেরকে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের নিন্দা।

(৮ম) সাধারণভাবে সকল নবীকে বিশ্বাস করার এবং বিশেষ করে যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাস করার গুরুত্ব বর্ণনা।

(৯ম) চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্বাসিগণ অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী হবেন সে সম্পর্কে ওয়াদা।

(১০ম) পুনরুত্থান, পরকাল, পারলৌকিক জীবন, পুনরুত্থান দিবসে ধার্মিক ও অধার্মিকদের কর্মের ফলাফল প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা ঘোষণা।

(১১শ) জান্নাত-জাহান্নাম বা স্বর্গ ও নরকের কথা উল্লেখ।

(১২শ) পার্থিব জগতের অস্থায়িত্ব ঘোষণা এবং জগৎমুখিতার নিন্দা।

(১৩শ) পারলৌকিক জীবনের প্রশংসা ও তার স্থায়িত্ব বর্ণনা।

(১৪শ) ধর্মব্যবস্থার বৈধ ও অবৈধ বিষয়গুলো বর্ণনা।

(১৫শ) পরিবার পরিচালনার বিধানাবলি বর্ণনা।

(১৬শ) দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানাবলি বর্ণনা।

(১৭শ) আল্লাহ্র প্রেম ও আল্লাহ্র প্রিয় মানুষদের প্রেম অর্জনে উৎসাহ প্রদান।

(১৮শ) আল্লাহ্‌র প্রেম ও নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির বর্ণনা।

(১৯শ) পাপী ও অধার্মিকদের সাহচর্য গ্রহণ থেকে নিষেধ।

(২০শ) দৈহিক ইবাদত, ধন-সম্পদ ব্যয় বা জনকল্যাণমূলক কর্ম, সকল ক্ষেত্রে অন্তরের বিশুদ্ধতা ও শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দয়া লাভের জন্য কর্ম করার গুরুত্ব বর্ণনা।

(২১শ) লোক দেখানো বা লোক শোনানো কর্ম বা মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য কর্ম করার নিন্দা।

(২২শ) উত্তম আচরণ অর্জনের জন্য সাধারণভাবে ও বিস্তারিতভাবে উৎসাহ প্রদান।

(২৩শ) অসদাচরণ ও অসৎ স্বভাবের নিন্দা।

(২৪শ) সদাচরণ ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা। যেমন ধৈর্য, বিনয়, দানশীলতা, বীরত্ব, চারিত্রিক পবিত্রতা ইত্যাদি।

(২৫শ) খারাপ স্বভাব ও অসদ্ব্যবহারের নিন্দা। যেমন ক্রোধ, অহংকার, কৃপণতা, কাপুরুষতা, অত্যাচার ইত্যাদি।

(২৬শ) আল্লাহ্‌র ভয় অর্জনের জন্য ওয়ায-উপদেশ।

(২৭শ) আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) ও ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান।

নিঃসন্দেহে জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও সকল ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে এ বিষয়গুলো প্রশংসিত। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং পাঠকের মনের গভীরে তাকে স্থায়ী আসন দেওয়ার জন্য কুরআনে এগুলো বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল বিষয় যদি নিন্দনীয় হয়, তবে প্রশংসনীয় বিষয় কী হবে?

তবে লক্ষণীয় যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না :

(১) কোন ভাববাদী তার কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচার করেছেন।[১০৭]

(২) কোন ভাববাদী অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং এরপর মহিলার স্বামীকে কৌশলে হত্যা করেছেন।[১০৮]

(৩) কোন ভাববাদী গোবৎসের প্রতিমা পূজা করেছেন।[১০৯]

১০৭. বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে, ভাববাদী লোট (লূত আ) মদ পান করে মাতাল হয়ে তাঁর কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। দেখুন আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।

১০৮. বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ূদ উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং উরিয়কে কৌশলে হত্যা করেন। দেখুন ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।

১০৯. বাইবেলে আছে যে, হারোণ গোবৎসের প্রতিমা তৈরি করে তার পূজা করেন। দেখুন যাত্রাপুস্তক ৩২/১-৬।

(৪) কোন ভাববাদী শেষজীবনে ধর্মত্যাগ করে বিপথগামী হন এবং প্রতিমা পূজা করেন।[১১০]

(৫) কোন ভাববাদী ঈশ্বরের নামে মিথ্যা কথা বলেছেন, ধর্মপ্রচারের নামে মিথ্যা বলেছেন, অন্য একজন অসহায় নিরাপরাধ ভাববাদীকে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে সদাপ্রভুর কোপ ও শাপের মধ্যে নিপতিত করেন।[১১১]

(৬) দায়ূদ, শলোমন ও যীশু সকলেই জারজ সন্তানের বংশধর ছিলেন। যিহূদার পুত্র পেরস ছিলেন যিহূদার জারজ সন্তান। আর এ সকল ভাববাদী সকলেই তার বংশধর।[১১২]

(৭) ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র এবং ভাববাদিগণের আদি পিতার প্রথমজাত পুত্র তারই পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।[১১৩]

(৮) ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।[১১৪]

ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র এই মহান ভাববাদী তার এই দুই প্রিয় পুত্রের অপকর্মের কথা জানতে পারেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে শাস্তি প্রদান করেন নি। তবে তিনি তার মৃত্যুর সময় প্রথম পুত্রকে তার অপকর্মের জন্য অভিশাপ প্রদান করেন। আর অন্য পুত্রকে তিনি অভিশাপ করেছেন বলেও বর্ণিত হয় নি, বরং এই ব্যভিচারী পুত্রকে তিনি মৃত্যুর সময় সকল প্রকার কল্যাণের বর প্রদান ও আশীর্বাদ করেন।[১১৫]

(৯) ঈশ্বরের অপর প্রথমজাত পুত্র এবং মহান ভাববাদী, যিনি নিজেই অপরের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, তার প্রিয় পুত্র তারই প্রিয় কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত

১১০. বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমন শেষ জীবনে বিপথগামী হয়ে প্রতিমা পূজা করতে শুরু করেন। ১ রাজাবলি ১১/১-১৩।

১১১. বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ভাববাদী একান্তই হিংসাবশত অন্য একজন ভাববাদীকে ঈশ্বরের ভাববাণীর নামে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দেন এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করে প্রথম ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে নিপতিত হয়ে নিহত হন। ১ রাজাবলি ১৩/১-৩০।

১১২. আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

১১৩. ইস্রায়েল বা যাকোবকে বাইবেলে ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের সকল ভাববাদী বা সকল হিব্রু ভাববাদীর মূল পিতা তিনিই। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর প্রথম পুত্র রূবেন তার পিতার 'বিলহা' নাম্নী উপপত্নীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। যাত্রাপুস্তক ৪/২২-২৩; আদিপুস্তক ৩৫/২২, ৪৯/৩-৪।

১১৪. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইস্রায়েল বা যাকোবের দ্বিতীয় পুত্র যিহূদা তার পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

১১৫. আদিপুস্তক ৪৯/১-১২।

হয়। ঈশ্বরের এই প্রথমজাত পুত্র তার পুত্র ও কন্যার ব্যভিচারের সংবাদ জানতে পারেন। মোশির ব্যবস্থা অনুসারে ব্যভিচারীর যে শাস্তি পাওনা সে শাস্তি তিনি তার পুত্র-কন্যাকে প্রদান করেন নি। এর কারণ সম্ভবত, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজেই ব্যভিচারী ছিলেন, কাজেই তিনি আর কিভাবে অন্যকে ব্যভিচারের শাস্তি দেবেন। বিশেষত নিজের পুত্র-কন্যাকে আর কি শাস্তি দেবেন।[১১৬]

ইহূদী ও খৃস্টান উভয় ধর্মের অনুসারিগণ উপরের তথ্যগুলো সঠিক, নির্ভুল ও ধর্মগ্রন্থের বাণী বলে বিশ্বাস করেন। এগুলো সবই পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোতে বিধৃত রয়েছে। আর এ সকল পুস্তক উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই ঈশ্বরের বাণী হিসেবে স্বীকৃত।

(১০) যোহন বাপ্তাইজক সম্পর্কে যীশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আবার যীশুই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি স্বর্গ-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্রর চেয়েও ক্ষুদ্র ছিলেন।[১১৭] এই যোহন বাপ্তাইজক তাঁর প্রেরণকারী ঈশ্বরের দ্বিতীয় অংশ ঈশ্বরকে চিনতে পারেন নি। ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক না থাকার কারণে ত্রিশ বছর পর্যন্ত যোহন তাঁর প্রেরণকারী ঈশ্বরকে ভাল করে চিনতে পারলেন না। যতক্ষণ না স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রেরিত দাসের নিকট যেয়ে নিজেই তাঁর শিষ্য হলেন এবং তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হলেন ততক্ষণ তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। যখন দ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রেরিত দাসের নিকট যেয়ে বাপ্তাইজিত হলেন এবং তৃতীয় ঈশ্বর কপোতের বেশে দ্বিতীয় ঈশ্বরের উপর অবতীর্ণ হলেন[১১৮] তখন তা দেখে তিনি প্রথম ঈশ্বর পিতার কথা স্মরণ করলেন যে, এই দ্বিতীয় ঈশ্বরই তাঁর প্রভু, মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।[১১৯]

---

১১৬. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে সদাপ্রভু ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে, দায়ূদ ঈশ্বরের জন্ম দেওয়া পুত্র (begotten son) এবং প্রথমজাত (firstborn) পুত্র। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বরের এই প্রথমজাত পুত্র নিজেই উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর দায়ূদের পুত্র অম্মোন দায়ূদের কন্যা তামরের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। দেখুন : গীতসংহিতা ২/৭, ৮৯/২৭, ২ শমূয়েল ১৩/১-৩৯।

১১৭. মথি ১১/৯-১১।

১১৮. মথি ৩/১৩-১৭; মার্ক ১/৯-১১; লূক ৩/২১-২২।

১১৯. বস্তুত যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে বাপ্তাইজ করার পরে এবং পবিত্র আত্মার কপোতের বেশে তাঁর নিকট আগমনের পরেও যীশুকে ভাল করে চিনতে পারেন নি। যোহনের শিষ্যগণ যীশুর কর্মকাণ্ডে সন্দেহ পোষণ করে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। (মথি ৯/১৪) এছাড়া স্বয়ং যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে বাপ্তাইজ করার অনেক পরে, কারাগার থেকে যখন যীশুর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের খবর শুনতে পেলেন, তখনও তিনি তাঁর পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। "পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্মের বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি ? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব ?" মথি ১১/২-৩।

(১১) খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু খৃস্টের ১২ জন প্রেরিতের মর্যাদা মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়েও বেশি। এই মহান মর্যাদার অধিকারী প্রেরিত শিষ্যদের একজন ছিলেন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscariot), যিনি অলৌকিক চিহ্নাদির অধিকারী প্রেরিত রাসূল ছিলেন। এই মহান প্রেরিত একজন চোর ছিলেন। তার কাছে টাকার থলি থাকত এবং তাতে যা রাখা হতো তিনি তা চুরি করতেন।[১২০] এই মহান প্রেরিত শিষ্য মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দেন। এই সামান্য অর্থের জন্য তিনি তার ঈশ্বরকে ইহূদীদের হাতে তুলে দিতে রাযি হয়ে যান। ইহূদীরা তার ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করে। সম্ভবত এই সামান্য অর্থই তার কাছে অনেক বড় ছিল; কারণ তিনি একজন দরিদ্র জেলে ও চোর ছিলেন। তিনি যদিও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী প্রেরিত ছিলেন[১২১], তবুও মনে হয় এই ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা তার কাছে তার ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের চেয়েও বেশি মর্যাদাময় ও প্রিয় ছিল।[১২২]

(১২) ইহূদী মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী (prophet) ছিলেন বলে সুসমাচার লেখক যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১২৩] এই ভাববাদী তার ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁকে হত্যা করার রায় প্রদান করেন।[১২৪]

এই ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের প্রেরিত তিনজন ভাববাদী তিনটি অদ্ভুৎ কর্ম করেছেন। ত্রিত্ববাদের সংখ্যার সাথে এই সংখ্যা মিলে গেল!

(ক) ইস্রায়েলী সকল ভাববাদীর শ্রেষ্ঠ ভাববাদী–যোহন বাপ্তাইজক–ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁকে ভাল করে চিনতে পারেন নি। যতক্ষণ না এই ঈশ্বর স্বয়ং যেয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয় ঈশ্বর কপোতের বেশে দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকট আগমন করলেন ততক্ষণ তাঁকে তিনি চিনতে পারলেন না।[১২৫]

(খ) এই ঈশ্বরের দ্বিতীয় ভাববাদী–ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা–মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তাঁর ঈশ্বরকে ইহূদীদের হাতে সমর্পণ করতে রাযী হন। তার ঈশ্বরের মর্যাদা ও তার প্রতিশ্রুত মর্যাদা ও রাজত্বের চেয়ে এই ত্রিশ দিরহামই তার কাছে মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হলো।

১২০. যোহন ১২/৬।

১২১. মথি ১০/১-৮; মার্ক ৩/১৪-১৫; লূক ৬/১৩।

১২২. মথি ২৬/১৪-১৬, ২৭/৩-৯; মার্ক ১৪/১০-১১; লূক ২২/৩-৬; যোহন ১৮/১-৫।

১২৩. যোহন ১১/৪৯-৫১।

১২৪. মথি ২৬/৫৭-৬৮; মার্ক ১৪/৫৩-৬৫; লূক ২২/৫৪-৭১; যোহন ১৮/১২-২৪।

১২৫. আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ ঘটনার পরেও যোহন যীশুকে ভাল করে চিনতে পারেন নি বরং তাঁকে প্রশ্ন করেছেন : যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি ? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব ? মথি ১১/৩।

(গ) এই ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের তৃতীয় ভাববাদী তাঁকে হত্যা করার ফতওয়া প্রদান করেন। তিনি তাঁকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন।

ভাববাদিগণের সম্পর্কে এরূপ জঘন্য বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমি শুধু খৃস্টান প্রচারকদেরকে তাদের মতামতের বিভ্রান্তি ধরে দেওয়ার জন্যই এগুলো উল্লেখ করলাম। আমি প্রার্থনা করি, বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বাধ্য হয়ে ভাববাদিগণের বিষয়ে ইহূদী-খৃস্টানদের মনগড়া যে অপবাদগুলো উল্লেখ করলাম, সেজন্য তিনি আমাকে দায়ী করবেন না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, আমি কখনোই ভাববাদিগণের বিষয়ে ইহূদী খৃস্টানদের বানানো এ সকল অপবাদে বিশ্বাস করি না। তাঁরা এগুলো থেকে পবিত্র ছিলেন।

আমরা বলেছি যে, উপরের উল্লিখিত ১২টি বিষয়ের আলোচনা কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান নেই। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৯টি বিষয় পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। আর শেষোক্ত তিনটি বিষয় নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় আরেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না। এগুলো এমন মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বুঝতে আমাদের মানবীয় বুদ্ধি অক্ষম। শুধু আমাদের বুদ্ধিই নয়, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য এই মহান বিষয়গুলো খৃস্টানদের মূলধারা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ 'ক্যাথলিক' সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। এই সম্প্রদায়ের কোন কোন গুরুর দাবি অনুসারে এদের সংখ্যা বর্তমান যুগে দুইশত কোটির উর্ধ্বে। খৃস্টধর্মের মহান ধর্মগুরুগণ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যে সকল মহান বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(১) মরিয়মের মাতা তার স্বামীর নৈকট্য ছাড়াই মরিয়মকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ মরিয়মও পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই মহাসত্যটি কিছুদিন আগে পোপদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মরিয়ম প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরের মাতা ছিলেন।

(৩), পবিত্র নৈশভোজের অনুষ্ঠানে (Eucharist/Holy Communion /Lord's Supper) প্রতিটি রুটি–তা যদি কোটি কোটি রুটিও হয়–বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে রুটি-খণ্ড কুমারী মেরীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া রক্ত-মাংসের যীশুখৃস্টে পরিণত হয়। এভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ পাদরি পবিত্র নৈশভোজের অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ করছেন এবং তাদের হাতের কোটি কোটি রুটি কোটি কোটি রক্তমাংসের যীশুখৃস্টে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

(৪) এ সকল অনুষ্ঠানে যাজক মহাশয় তার হাতের রুটিটি ভেঙে টুকরো করলে প্রত্যেক টুকরোই যীশুতে পরিণত হবে। যাজক যদি তার রুটিটি এক লক্ষ টুকরো

করেন তবে প্রত্যেক টুকরোই রক্তমাংসের পরিপূর্ণ যীশুখৃষ্টে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যদিও রুটির জন্য ব্যবহৃত গম বা যবের দানা, সেগুলো পিষে আটা তৈরি করা, আটাকে খামির বানানো এবং রুটি তৈরি করা সবই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অনুসারে মানবীয় কর্ম মাত্র, তবুও সকল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য বাতিল করে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেককে তালাক দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রতিটি রুটি-খণ্ডই প্রকৃত রক্তমাংসের যীশুখৃষ্ট!

(৫) ছবি, মূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরি করতেই হবে এবং সেগুলোর সামনে প্রণতি জানাতে হবে বা সাজদা করতে হবে।[১২৬]

(৬) পোপের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। পোপ যদি নিজে অসৎ ও অধার্মিকও হন তবুও তাঁকে মানতেই হবে।

(৭) রোমের (ভ্যাটিকানের) প্রধান বিশপই পোপ হবেন, অন্য কোন স্থানের বিশপ তা হতে পারবেন না। আর পোপ খৃস্টীয় চার্চের প্রধান। তিনি সকল ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত (তাঁর কোন কর্ম বা সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে করা যাবে না। তিনি যা বলবেন তাই সঠিক)।[১২৭]

---

১২৬. খৃস্টান পাদরিগণের রচিত 'খৃস্টীয় চার্চের ইতিহাস' নামক আরবী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্পেনের টলেডোতে এক খৃস্টান যুবক তার বাড়িতে বাইবেলের 'দশ আজ্ঞা' লিখে রেখেছিল। দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় আজ্ঞায় মূর্তি-প্রতিমা তৈরি করতে এবং মূর্তি-প্রতিমাকে প্রণতি জানাতে বা সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। উক্ত বালক এই দ্বিতীয় আজ্ঞাটিকে বাদ না দিয়ে দশটি আজ্ঞাই তার বাড়িতে লিখে রেখেছিল। এজন্য ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে উক্ত বালককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

১২৭. প্রথম যুগের খৃস্টানগণ তাদের প্রধান ধর্মীয় নেতা ও ধর্মগুরুকে Patriarch বলে অভিহিত করতেন। এর অর্থ হলো ধর্মের নেতা বা ধর্মগুরু। তাঁকে যীশু খৃস্টের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি বলে মনে করা হতো। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতেন। তাঁর অধিকার ছিল তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলে bishop বা যাজক নিয়োগ ও প্রেরণ করার। বিশপ অর্থ পেট্রিয়ার্কের প্রতিনিধি। প্রথম যিনি পেট্রিয়ার্ক উপাধি ধারণ করেন তিনি ছিলেন সুসমাচার রচয়িতা মার্কের ছাত্র আন্নিআনাস Annianus। মার্কের মৃত্যুর পরে ৬২ খৃস্টাব্দের দিকে তিনি আলেকজান্ড্রিয়ার চার্চের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশপগণ পেট্রিয়ার্ককে সম্মান করে 'পিতা' বা 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। ক্রমান্বয়ে বিশপগণ পেট্রিয়ার্ককে 'বাবা' বা পিতৃগণের পিতা বলে সম্বোধন করতে থাকেন। এ থেকে তিনি 'বাবা' বা পোপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথম দিকে মিসরের আলেকজান্ড্রিয়ার বিশপই এই পদের দাবিদার ছিলেন। পরবর্তী কালে রোমে সেন্ট পিটারের চার্চের প্রধানকে এই পদের দাবিদার বলে গণ্য করা হয়। ১০৮১ খৃস্টাব্দে খৃস্টীয় যাজকীয় মহাসম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রোমের প্রধান যাজকই সকল যাজকের গুরু বলে গণ্য হবেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ভ্যাটিকানে অনুষ্ঠিত যাজকীয় মহাসম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পোপ নিষ্পাপ ও নির্ভুল। তিনি সকল ভুলের উর্ধ্বে। প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থোডক্স সম্প্রদায় পোপের কোনরূপ নেতৃত্ব বা মর্যাদা স্বীকার করেন না।

(৮) রোমের চার্চই সকল চার্চের মাতা ও সকল চার্চের শিক্ষয়িত্রী।

(৯) পোপ এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের জন্য মহা পবিত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে, যে ক্ষমতাবলে তাঁরা ক্ষমাপত্র (Paper of Indulgence) প্রদান করতে পারবেন। বিশেষত যারা ভাল দামে তা ক্রয় করতে পারবেন তাদেরকে তাঁরা এরূপ ক্ষমাপত্র বিক্রয় করার অধিকার রাখেন। তাঁদের মধ্যে এরূপ ক্ষমাপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে।

(১০) কোন কিছুকে ধর্মীয়ভাবে বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার পোপের।

ইতোপূর্বে পাঠক জেনেছেন যে, মীখাঈল মাশাকা লেবাননের একজন প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত। তাঁর লেখা একটি আরবী পুস্তক হলো : "আজয়িবাতুল ইনজীলিয়্যীন 'আলা আবাতিলিত-তাকলীদিয়্যীন" (প্রাচীনপন্থিদের বাতিলসমূহের প্রতিবাদে ইঞ্জিলপন্থিদের উত্তর)। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত উক্ত পুস্তকে লেখক লিখেছেন:

"এখন আমরা দেখি যে, তাঁরা ভাতিজির সাথে চাচার বিবাহ দিচ্ছেন, অনুরূপভাবে মামার সাথে ভাগ্নীর বিবাহ দিচ্ছেন, সন্তানসন্ততিসহ ভায়ের স্ত্রীর সাথে ভায়ের বিবাহ দিচ্ছেন। অথচ এগুলো সবই পবিত্র গ্রন্থাবলি বা বাইবেলের শিক্ষার বিরোধী। অনুরূপভাবে তাদের 'নিষ্পাপ যাজকীয় সম্মেলনগুলো'ও এ সকল কর্ম নিষেধ করেছে। কিছু টাকা দিলেই এ সকল নিষিদ্ধ ও অবৈধ কর্ম তাঁরা বৈধ করে দিচ্ছেন।

"যাজকগণের দ্বারা তাঁরা কত প্রকারের বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ব্যবস্থার প্রভু ঈশ্বরের নির্দেশিত, বৈধ ও ধর্মসম্মত বিবাহ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।... কত প্রকার খাদ্য তাঁরা নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এরপর আবার তাদের অবৈধকৃত বিষয়কে বৈধ করেছেন। আমাদের যুগে তাদের বড় উপবাসের মধ্যে মাংস ভক্ষণ বৈধ করে দিয়েছেন। অথচ ইতোপূর্বে কত কঠিনভাবে তা নিষিদ্ধ করেছেন।

"খৃস্টান পণ্ডিতগণের 'পুস্তিকা ত্রয়োদশ' নামে একটি আরবী সংকলন ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের দ্বিতীয় পুস্তিকার ৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে : কার্ডিনাল ফ্রান্সিস ড্য বাদলা বলেন, 'পোপের জন্য অনুমতি আছে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। এমনকি অবৈধ কর্ম করার অনুমতিও তাঁর রয়েছে। তিনি ঈশ্বরের চেয়েও বড়।' তারা যা বলছে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র!"

(১১) একজন খৃস্টান যত বড় ধার্মিক ও সৎকর্মশীলই হোক না কেন, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের আগে 'মধ্যবর্তী স্থানে' তাকে শাস্তির মধ্যেই থাকতে হবে, যতক্ষণ না মহামান্য পোপ তাকে ক্ষমা প্রদান করবেন, অথবা পাদরি ও বিশপগণ উচিৎ মূল্য গ্রহণ করে তাকে সেই শাস্তি থেকে উদ্ধার করবেন। এই শাস্তি নরকের শাস্তি নয়, বরং নরকের পূর্বের মধ্যবর্তী শাস্তি। এই পর্যায়ের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ক্যাথলিকগণ পোপের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে 'ক্ষমাপত্র' ক্রয় করে থাকেন।

আমি অবাক হয়ে যাই, এ সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষেরা পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যে, 'ঈশ্বরের এই প্রতিনিধির নির্দেশ পৃথিবী ও স্বর্গে সর্বত্র কার্যকর।। এজন্য তারা তাঁর নিকট থেকে 'ক্ষমাপত্র' ক্রয় করেন। কিন্তু যাদেরকে তিনি শাস্তি থেকে মুক্ত করলেন তারা সত্যই মৃত্যুর পরে মুক্তি পেয়েছে, এই মর্মে এ সকল ক্ষমাকৃতদের স্বাক্ষরিত কোন রশিদ তারা কখনোই দাবি করেন না!

পবিত্র আত্মার কল্যাণে পোপদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পোপ দশম লিওঁ (Leo X)[১২৮] ক্ষমা বিক্রয়ের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি ক্ষমার টিকেট আকারে ক্ষমাপত্র বিক্রয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। যে ব্যক্তি পোপ বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট থেকে তা ক্রয় করতেন তাকে তার সকল অতীত পাপের ক্ষমার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সকল পাপের ক্ষমার নিশ্চয়তা বিক্রয় করা হতো। এই টিকেট বা 'ক্ষমাপত্রে' (Paper of Indulgence) লেখা থাকত :

"আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ট তাঁর পবিত্র বেদনা ও কষ্টের অধিকারে তোমাকে দয়া করুন এবং ক্ষমা করুন। অতঃপর, তাঁর প্রেরিত শিষ্য পিটার, পৌল ও পোপের মাধ্যমে তিনি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তোমাকে ক্ষমা করার। আমি প্রথমত তোমার সকল যাজকীয় অন্যায় ক্ষমা করছি তা যত বেশিই হোক না কেন। এরপর আমি ক্ষমা করছি তোমার সকল পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, যদিও সেগুলি অগণিত হয়। উপরন্তু যে সকল পাপের ক্ষমা করার অধিকার শুধু পোপের জন্য নির্ধারিত সেগুলিও ক্ষমা করছি। রোমান চার্চের চাবি যতদূর বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত আমি তোমার সকল শাস্তি ক্ষমা করছি। মৃত্যুর পরে মধ্যবর্তী সময়ে তোমার যত প্রকার শাস্তি পাওনা হয়েছিল আমি তা সবই ক্ষমা করছি। আমি তোমাকে পবিত্র মণ্ডলীর রহস্যের মধ্যে এবং তার ঐক্যের মধ্যে ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমার প্রথম বাপ্তাইজের দিনে যে পবিত্রতা ও বিমুক্তি লাভের অধিকার তোমার ছিল সেই অবস্থায় আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি যখনই মৃত্যুবরণ কর না কেন, তোমার সামনে সকল শাস্তির দরজা বন্ধ করা হবে এবং তোমার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তুমি যদি এখন মৃত্যুবরণ না কর তবে এই ক্ষমার ঘোষণা তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

১২৮. দশম লিও ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৩ খৃস্টাব্দে পোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৫২২ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সময়েই মার্টিন লুথার পোপের দুর্নীতি, অনাচার ও ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পোপ দশম লিওঁ লুথার ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে তাদেরকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারার জন্য খৃস্টান রাজাদেরকে নির্দেশ দান করেন। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ১৫১-১৫৩।

Contents

পরিপূর্ণভাবে কার্যকর থাকবে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আমীন! দ্বিতীয় প্রতিনিধি ভ্রাতা জোহান টেটযেল (Johann Tetzel)-এর হাতে লিখিত।"

(১২) নরকের আয়তন হলো পৃথিবীর মধ্যস্থলের আয়তক্ষেত্র যার প্রতি দিকের আয়তন দুই শত মাইল।

(১৩) পোপ ক্রুশ অঙ্কন করবেন তাঁর নিজের জুতা জোড়ার উপরে। আর অন্য সবাই ক্রুশ অঙ্কন করবেন তার নিজের মুখের উপরে। সম্ভবত পোপের জুতাজোড়া ক্রুশের চেয়ে কম মর্যাদাশীল নয় এবং অন্যান্য বিশপ ও যাজকের মুখের চেয়েও কম মর্যাদাশীল নয়।

(১৪) কোন কোন সাধুর মুখমণ্ডল কুকুরের মত এবং দেহ ছিল মানুষের মত। এই কুকুর-মানব সাধু তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করবেন।

পূর্বে উল্লিখিত আরবীয় খৃস্টান পণ্ডিত মীখাঈল মাশাকা তাঁর পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিন্দা করে বলেন : "এরা অনেক সময় এমন সব আকৃতির সাধু-সন্তানদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে যে আকৃতি কখনোই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি। যেমন তারা মানুষের দেহের উপর কুকুরের মাথা লাগিয়ে একটি প্রতিকৃতি বানিয়ে তাকে 'সাধু ক্রিস্টোফার' বলে নাম রেখেছে। তারা এই কুকুর-মানব 'সাধু ক্রিস্টোফার'-কে বিভিন্নভাবে পূজা অর্চনা করে। তার মুর্তিকে চুম্বন করে, তার সামনে প্রণতি বা সাজদা করে, তার জন্য মোমবাতি জ্বালায়, ধুপ জ্বালায় এবং তার সুপারিশ প্রার্থনা করে। খৃস্টানদের জন্য কি শোভনীয় হলো যে, তারা কুকুরের মগজের মধ্যে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেন ? তাদের চার্চগুলি নাকি ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে? এই কি তার নমুনা ?"

পণ্ডিত মাশাকা ঠিকই বলেছেন। কিভাবে একজন বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করতে পারেন যে, মানুষের কাঁধে কুকুরের মাথা থাকতে পারে ? ক্যাথলিকদের এই দেবতার সাথে ভারতীয় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কোন কোন দেবতার মিল আছে। সম্ভবত এ কারণেই ইউরোপের খৃস্টানগণ কুকুর এত ভালবাসেন। কারণ কুকুর যে তাদের দেবতার আকৃতির!

(১৫) ক্রুশের কাঠ, অনাদি-অনন্ত পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, পুত্রের প্রতিমূর্তি ও পবিত্র আত্মার প্রতিমূর্তিকে প্রকৃতভাবে পূজার উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করতে হবে বা 'ইবাদাতের সাজদা' করতে হবে। আর সাধু, সন্যাসী বা সেন্টদের প্রতিমূর্তিকে সম্মানের জন্য প্রণতি জানাতে হবে বা 'সম্মানের সাজদা' করতে হবে।

আমি কোনভাবেই বুঝতে পারি না, প্রথম পর্যায়ের বস্তুগুলি কিভাবে খৃস্টানদের উপাসনা, আরাধনা বা পূজার যোগ্য হতে পারল ? প্রথমত তারা ক্রুশের কাঠ পূজা করেন। ক্রুশের কাঠ আরাধ্য ও উপাস্য হওয়ার পিছনে আমরা এই তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাই না :

ক্রুশ-কাষ্ঠের উপাসনা করা হয়, কারণ তা খৃষ্টের দেহ স্পর্শ করেছিল। কারণ খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশু ক্রুশে আরোহণ করেছিলেন অথবা ক্রুশ-কাষ্ঠ উপাসনা করা হয়। তার কারণ, তা ছিল খৃষ্টের জীবনদানের মাধ্যম অথবা — আরাধ্য হওয়ার কারণ, খৃষ্টের রক্ত তাতে লেগেছিল।

যদি প্রথম কারণে ক্রুশ-কাষ্ঠের পূজা-উপাসনা করতে হয় তবে গর্দভ জাতি খৃস্টানদের উপাস্য হওয়ার বেশি অধিকার রাখে। এদিক দিয়ে যীশুর সাথে ক্রুশের চেয়ে গর্দভ জাতির সম্পর্ক অনেক বেশি। যীশু খৃষ্ট গর্দভীর পিঠে ও গাধার বাচ্চার পিঠে আরোহণ করেছেন। খৃষ্টের দেহ এদের দেহ স্পর্শ করেছে। গর্দভ জাতি ছিল খৃষ্টের আরাম ও প্রশান্তির স্থল। তেমনি তা ছিল সমর্যাদায় খৃষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশের বাহন। এছাড়া গর্দভ জাতির সাথে মানুষ জাতির একটি নিকট সম্পর্ক আছে, তা হলো গাধাও প্রাণী এবং মানুষও প্রাণী। গাধাও মানুষের মত বর্ধনশীল, সংবেদনশীল, প্রাণবন্ত, চলৎশক্তিসম্পন্ন দেহের অধিকারী ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। পক্ষান্তরে কাঠ একটি জড় পদার্থ, যার কোন প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই ও চলৎশক্তি নেই।

যদি দ্বিতীয় কারণে ক্রুশ-কাষ্ঠ পূজা করা হয় তবে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscariot) পূজিত হওয়ার বেশি অধিকার রাখেন। কারণ যীশু খৃষ্টের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানব জাতিকে পাপমুক্ত করার প্রধান ও প্রথম মাধ্যম ছিলেন তিনি। বস্তুত তার মাধ্যমেই যীশুখৃষ্টের আগমনের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তিনি যদি যীশুকে ইহূদীদের হাতে সমর্পণ না করতেন তবে ইহূদীরা তাঁকে ধরতেও পারত না, ক্রুশেও চড়াতে পারত না (ফলে যীশুর মিশনও সফল হতো না এবং মানব জাতিও পাপ থেকে মুক্তি পেত না)। এ সব কিছুর মূল উৎস ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা। উপরন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন যীশু খৃষ্টের সমান। এছাড়া তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বড় অবাক লাগে যে, যীশুর আত্মত্যাগের প্রধান ও প্রথম মাধ্যম তাদের নিকট অভিশপ্ত, কিন্তু ছোট ও গৌণ মাধ্যম তাদের কাছে পবিত্র, মহাসম্মানিত ও পূজনীয়।

যদি তৃতীয় কারণে ক্রুশ-কাষ্ঠকে পূজা করা হয় তবে কাঁটাও খৃস্টানদের উপাস্য হওয়ার অধিকার রাখে। কারণ ক্রুশারোহণের পূর্বেই খৃষ্টের মাথায় কাঁটার মুকুট (Crown of thorns) পরানো হয়।[১২৯] কাঁটাগুলিতে যীশু খৃষ্টের দেহের পবিত্র রক্ত লাগে। কাজেই যীশুর রক্তে রঞ্জিত হওয়ার কারণে যদি পূজা করতে হয় তবে কাঁটাকেও পূজা করা প্রয়োজন। অথচ আমরা দেখি যে, কাঁটার মোটেও সম্মান করা হচ্ছে না, পূজাও করা হচ্ছে না, বরং পোড়ানো হচ্ছে, অথচ কাঠের উপাসনা করা হচ্ছে!

---

১২৯. মথি ২৭/২৯; মার্ক ১৫/১৭; যোহন ১৯/২, ৫।

হ্যাঁ, যদি খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ক্রুশ-বন্দনা এমন একটি গোপন রহস্য যা যুক্তি বা মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে বুঝা যাবে না, তবে তা ভিন্ন কথা। তাঁদের ধর্মে এমন অনেক রহস্য রয়েছে। যেমন ত্রিত্ববাদ, পবিত্র নৈশভোজের রুটির খণ্ডগুলির রক্তমাংসের দেহধারী যীশুতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলি সবই অযৌক্তিক ও মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির বিরোধী।

ক্রুশ-কাষ্ঠ পূজার চেয়েও জঘন্যতম কর্ম হলো পিতা ঈশ্বরের বা ঈশ্বরের পিতা-সত্ত্বার প্রতিমূর্তি তৈরি করে তার পূজা করা। চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ঈশ্বরের কোন তুলনা বা নমুনা নেই, কেউ কোনদিন তাঁকে দেখেনি এবং এই জগতে কেউ কখনো তাঁকে দেখতে পারে না।[১৩০] যদি তাই হয়, তবে তাদের কোন্ ধর্মগুরু ঈশ্বরকে দেখে তার ছবি বা প্রতিকৃতি একে রেখে গিয়েছিলেন ? তাঁরা কিভাবে জানলেন যে, ঈশ্বরের আকৃতির সাথে এই ছবি বা প্রতিকৃতিটির মিল আছে ? এটি যে কোন অবিশ্বাসী ধর্মবিরোধীর আকৃতির সাথে মিলছে না তাই বা তারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন ?

সর্বোপরি তাঁরা কেন মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষের পূজা করেন না ? বাইবেলে তো সুস্পষ্টই বলা হয়েছে, ঈশ্বরের আকৃতিতে, ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৩১]

বড় অবাক বিষয় হলো, পোপ ঈশ্বরের বা পিতার এই কাল্পনিক প্রাণহীন অনুভূতিহীন জড় প্রতিমূর্তিকে প্রণিপাত বা সাজদা করছেন, অথচ ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি মানুষকে অবজ্ঞা করছেন, তার দিকে তার পা বাড়িয়ে দিচ্ছেন যেন মানুষটি তার জুতা চুম্বন করতে পারে। বস্তুত এ সকল খৃস্টান ও ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের মধ্যে কোন পার্থক্য আমি দেখতে পাই না। সাধারণ খৃস্টানগণ অবিকল সাধারণ পৌত্তলিক হিন্দুদের মতই এবং অসাধারণ পণ্ডিতগণ যে সকল কথা বলে তাদের পৌত্তলিকতার পক্ষে যুক্তি ও ওযর পেশ করেন, খৃস্টান পণ্ডিতগণও অবিকল একই কথা বলে তাদের পৌত্তলিকতার পক্ষে সাফাই গান।

(১৬) পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা দেওয়ার সর্বোচ্চ অধিকার একমাত্র পোপের। তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন যে, কোন্ ব্যাখ্যা সঠিক। এই বিশ্বাসটি পরবর্তী যুগে

---

১৩০. বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে এ কথাগুলি বারংবার বলা হয়েছে। দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৪/১২-১৫; যোহন ১/১৮; ১ যোহন ৪/১২; ১ তিমথীয় ৬/১৬।

১৩১. "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ... পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন ...." (And God said, Let us make man in our image, after our likeness .... So God created man in his own image, in the image of God created him). আদিপুস্তক ১/২৬-২৭।

আবিষ্কৃত। চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীর পণ্ডিত সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine), স্বর্ণমুখি যোহন নামে পরিচিত যোহন ক্রীযসটম (John Chrysostom) এবং অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিত বাইবেলের সকল পুস্তকের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা পোপ ছিলেন না এবং পোপ থেকে এ বিষয়ে কোন অনুমতিও তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা নিজস্ব উদ্দীপনা ও আগ্রহে বাইবেলের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁদের এ সকল ব্যাখ্যা তৎকালীন সকল চার্চে ও খৃস্টীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সকল যুগে বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল না। সম্ভবত এ সকল প্রাচীন পণ্ডিতের এ সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার পর সেগুলি পাঠ করে পোপগণের এই মহান অধিকার সম্পর্কে জানা যায়।

(১৭) বিশপ ও অধস্তন পুরোহিতগণ (Deaxons)-এর জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ। আর এজন্যই বিবাহিতগণ যা করেন না তা তারা করেন।

খৃস্টানদের কোন কোন পণ্ডিত পোপদের এ সকল সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করেছেন। এ বিষয়ে 'পুস্তিকা ত্রয়োদশ' নামক আরবী সংকলনের তৃতীয় পুস্তিকার ১৪৪ ও ১৪৫ পৃষ্ঠা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

"সাধু বার্নার্ডোস (St. Bernard of Clairvaux, d. 1153) বলেন : তারা চার্চ থেকে পবিত্র ও সম্মানিত বিবাহ ও পাপমুক্ত শয়নকে বের করে দিয়েছে। আর এর ফলে তারা চার্চকে ব্যভিচার, সমকামিতা, মাতা ও ভগ্নিগণের সাথে যৌনতা এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নোংরামি দিয়ে ভরে ফেলেছে।

"পর্তুগালের সালভা অঞ্চলের বিশপ আলফারোয বিলাগিয়াস ১৩০০ খৃস্টাব্দে বলেছেন : "হায়! যদি যাজকগণ অবিবাহিতভাবে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা না করতো তবে কতই না ভাল হতো! বিশেষত স্পেনের যাজকগণ। কারণ সে দেশে জনগণের বৈধ সন্তানের সংখ্যা যাজকদের অবৈধ সন্তানদের চেয়ে সংখ্যায় তেমন বেশি হবে না!"

"পঞ্চদশ শতকে অস্ট্রিয়ার সালযবুর্গের বিশপ যোহন লিখেছেন যে, "তিনি খুব কম যাজককেই পেয়েছেন, যারা মেয়েদের সাথে ভয়ঙ্করভাবে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত নয়। আর সন্ন্যাসিনীদের ধর্মাশ্রম বা মঠগুলি তো ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত বেশ্যালয়ের চেয়েও অপবিত্র।"

"এ সকল যাজক-যাজিকা, সন্ন্যাসী, যারা যৌবনকালেই নিজেদেরকে ঈশ্বরের নামে সপে দিয়েছে এবং তাদের জন্য মদপানও বৈধ করা হয়েছে, তাদের থেকে কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা পবিত্র থাকবে ? অথচ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ভাববাদিগণ ও তাদের পুত্রকন্যাগণও পবিত্র থাকতে পারেন নি।

"বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যাকোবের পুত্র রূবেন তার পিতার 'বিলহা' নাম্নী উপপত্নীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন।[১৩২] যাকোবের অন্য পুত্র যিহূদা তার পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন।[১৩৩] দায়ূদের বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন।[১৩৪] লোট মদ পান করে মাতাল অবস্থায় নিজের কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন।[১৩৫]

"এই যদি হয় ভাববাদিগণ ও তাঁদের পুত্রকন্যাদের অবস্থা, তাহলে অন্যদের থেকে কিভাবে আশা করা যায় যে, ধর্মের নামে তারা কৌমার্য রক্ষা করবেন ? বস্তুত আলফারোয বিলাগিয়াস ও যোহন সঠিক কথাই বলেছেন। তাদের দেশে জনগণের বৈধ সন্তানের সংখ্যা যাজকদের অবৈধ সন্তানদের চেয়ে সংখ্যায় তেমন বেশি হবে না এবং সন্ন্যাসিনীদের ধর্মাশ্রম বা মঠগুলি ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত বেশ্যালয়ের চেয়েও অপবিত্র।"

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির মত আরো অনেক 'মহান' বিষয় তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে বিদ্যমান। আমি এগুলির তালিকা আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। আমি মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি। আমার বক্তব্য হলো, উপরে উল্লিখিত উচ্চাঙ্গের ভাব ও 'মহান' বিষয়গুলি বা অনুরূপ বিষয় কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ সকল ভাব ও অর্থ- যেগুলি আমি এখানে উল্লেখ করলাম-এগুলি যদি কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান থাকত তবে হয়ত খৃস্টান পাদরি ও যাজকগণ কুরআনকে 'ঈশ্বরের বাণী' (God's Word) বলে মেনে নিতেন। কিন্তু যেহেতু কুরআনের মধ্যে এ সকল 'মহান' বিষয় ও অনুরূপ বিষয়াদি আলোচিত হয় নি, সেহেতু তাঁরা কুরআনকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানতে পারছেন না।

বস্তুত, কুরআনের মধ্যে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি তাদের মতে উচ্চাঙ্গের ভাব বা সুন্দর অর্থবহ বিষয় নয়। তাঁদের বিশ্বাসে উচ্চাঙ্গের ভাব ও সুন্দর অর্থবহ বিষয় হলো উপরের বিষয়গুলি (ব্যভিচার, অনাচার, অগম্য-গমন, মিথ্যা, ঈশ্বর ও ভাববাদিগণের নিন্দাজ্ঞাপক কথা, মূর্তিপূজা, ব্যক্তিপূজা, জড়পূজা, বুদ্ধি বিরোধী কথা ইত্যাদি) ও এগুলির মতই অন্যান্য বিষয়। আর যেহেতু এগুলি কুরআনের মধ্যে নেই, সেহেতু কিভাবেই বা তাঁরা কুরআনকে ঈশ্বরের বাণী বলে স্বীকৃতি দেবেন বা তাকে গ্রহণ করবেন ?

কুরআনে আলোচিত জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের কিছু কথাকে খৃস্টান পাদরিগণ অসুন্দর ও খারাপ বলে দাবি করেন। পাদরিগণের তৃতীয় বিভ্রান্তি

১৩২. আদিপুস্তক ৩৫/২২, ৪৯/৩-৪।

১৩৩. আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

১৩৪. ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।

১৩৫. আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।

Contents

আলোচনায় আমি সেগুলি উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ্। পাঠক ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : "অনেক স্থানে কুরআনের বক্তব্য পুরাতন ও নতুন নিয়মের বক্তব্যের বিরোধী, কাজেই কুরআন ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না।"

বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথমত: প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি।

(১) পুরাতন ও নতুন নিয়মের এ সকল পুস্তক যে সকল ভাববাদী বা লেখকের নামে প্রচলিত সে সকল ভাববাদী বা লেখক থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরায় বর্ণিত ও প্রচারিত হয়নি। কাজেই এ সকল ভাববাদী বা লেখক যে সত্যিই এগুলি রচনা করেছেন তার কোন প্রমাণ নাই।

(২) পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক ঐশ্বরিক নয় এবং ভাববাদীদের রচিত নয়।

(৩) পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক স্থানে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে।

(৪) এ সকল পুস্তক অগণিত ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

যেহেতু প্রচলিত বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির বিষয়ে উপরের চারটি বিষয় সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু বাইবেল দিয়ে কুরআন যাচাই করার কোন উপায় নেই। কুরআনে যদি এ সকল পুস্তকের বিপরীত বা অতিরিক্ত কোন তথ্য থাকে তাতে কুরআনের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয় না, বরং প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে কুরআন বিরোধী যে সব তথ্য রয়েছে তা মিথ্যা, ভুল বা বিকৃত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক দেখেছেন যে, বাইবেলের পুস্তকাদিতে অগণিত ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি রয়েছে। কুরআনে নির্দেশিত এ সকল ভুল ও বিকৃতি সেগুলির সাথে যুক্ত হবে। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বাইবেলের পুস্তকাদিতে উল্লিখিত বা ইহূদী-খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত তথ্য ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কুরআনে এ সকল তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেল বিরোধী তথ্যাদি দেখে কোনভাবেই কল্পনা করার অবকাশ নেই যে, ভুলক্রমে বুঝি এই সব তথ্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে বরং এ সকল তথ্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলের বিভ্রান্তি প্রমাণ করার জন্যই।

দ্বিতীয়ত: পাদরিগণের দাবি অনুসারে কুরআনের সাথে বাইবেলের পুস্তকাদির বৈপরীত্য তিন প্রকারের :

প্রথম প্রকার বৈপরীত্য : রহিতকৃত বিধানাবলি সম্পর্কিত;

দ্বিতীয় প্রকার বৈপরীত্য : এমন কিছু বিষয় যেগুলি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোন পুস্তকে নেই।

তৃতীয় প্রকার বৈপরীত্য : কিছু বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা এ সকল বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনার বিপরীত।

এই তিন প্রকার বৈপরীত্যই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই এগুলির কোনটিকেই কুরআনের ত্রুটি হিসেবে নির্দেশ করার অধিকার পাদরিগণের নেই।

প্রথম প্রকার বৈপরীত্য : রহিতকরণ

এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে নতুন সংযোজন নিষ্প্রয়োজন। পাঠক দেখেছেন যে, রহিতকরণ শুধু কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং পূর্ববর্তী ধর্ম ও ব্যবস্থাগুলিতেও এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ রয়েছে। কাজেই কুরআন যদি পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু বিধান রহিত করে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। পাঠক দেখেছেন যে, খৃস্টীয় ব্যবস্থায় তোরাহ ও মোশির ব্যবস্থার সকল বিধান রহিত করা হয়েছে, শুধু প্রসিদ্ধ দশ আজ্ঞার নয়টি আজ্ঞা বলবত রাখা হয়েছে। এরপর এই নয় আজ্ঞার ক্ষেত্রেও তাদের দাবি অনুসারে পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে। আর তাদের ভাষায় পূর্ণতা প্রদানের অর্থই হলো রহিতকরণ। এভাবে এ আজ্ঞাগুলিও রহিত করা হয়েছে।

এভাবে নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত করার পরে কোন বুদ্ধিমান খৃস্টান নতুন বা পুরাতন নিয়মের কোন বিধান রহিত করার কারণে কুরআনকে দোষ দিতে পারেন না। তাহলে তো প্রমাণিত হবে যে, নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি 'ঈশ্বরের বাণী' নয় ; কারণ তা পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার বৈপরীত্য : নতুন তথ্য

বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মে উল্লেখ করা নেই এরূপ কোন তথ্য কুরআনে বিদ্যমান থাকলে তা কুরআনের কোন ত্রুটি বলে গণ্য করা খৃস্টানদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এরূপ তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ যদি ত্রুটি বলে গণ্য করা হয় তবে তাতে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির ত্রুটি প্রমাণিত

হবে।[১৩৬] এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। আমি এখানে শুধু তেরটি প্রমাণ উল্লেখ করছি :

প্রথম প্রমাণ : যিহূদার পত্রের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন।"

দ্বিতীয় প্রমাণ : উক্ত পত্রেই রয়েছে : "১৪ আর আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও এই লোকদের উদ্দেশ্যে এই ভাববাণী বলিয়াছেন, 'দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন ; ১৫ আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে এবং ভক্তিহীন পাপিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যেন ভর্ৎসনা করেন।"

হনোকের এই ভাববাণী বা এই সংবাদের অস্তিত্ব পুরাতন নিয়মের কোন গ্রন্থেই নেই।

তৃতীয় প্রমাণ : ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ের ২১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, 'আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি।"

এখানে পৌল মোশি ও তাঁর সিনয় পর্বতে গমন ও তথায় মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে।[১৩৭] কিন্তু সেখানে বা পুরাতন নিয়মের কোথাও মোশির এই কথা উল্লেখ করা হয়নি। "মোশি কহিলেন, 'আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি" এ কথা কোথাও নেই।

চতুর্থ প্রমাণ : ২ তিমথীয় ৩য় অধ্যায়ের ৮ আয়াতে রয়েছে : "আর যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহারা সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে।"

ফরৌণের মন্ত্রবেত্তাগণ কর্তৃক মোশির প্রতিরোধের ঘটনা বিস্তারিত যাত্রাপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি নামের উল্লেখ সেখানে নেই। যাত্রা পুস্তকের অন্য কোন অধ্যায়ে বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোন পুস্তকের কোথাও এই নাম দুটির অস্তিত্ব নেই।

---

১৩৬. বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা নেই এরূপ অনেক তথ্য নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। আবার পুরাতন নিয়মের পূর্ববর্তী পুস্তকে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য পরবর্তী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য প্রেরিতগণের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৭. যাত্রাপুস্তক ১৯/১৪-২৫।

পঞ্চম প্রমাণ : ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের পরে বিভিন্ন শিষ্যকে সাক্ষাত দানের বিষয়ে বলা হয়েছে : "(৫ আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন) তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে।"

সুসমাচার চতুষ্টয়ে এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণের কোথাও এই পাঁচশতাধিক শিষ্যকে দেখা দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ নেই। এ সকল বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে লূকের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল সবচেয়ে বেশি। অথচ তিনিও এ বিষয়ে কিছুই লিখেন নি।

ষষ্ঠ প্রমাণ : প্রেরিত ২০ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে : "এবং প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা উচিত, কেননা তিনি নিজে বলিয়াছেন, গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয়।"

যীশুর এই বক্তব্যও সুসমাচার চতুষ্টয়ের কোনটিতেই নেই।

সপ্তম প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে যীশু খৃস্টের বংশাবলি পত্রে সরুব্বাবিলের পরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কারো কোনরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।[১৩৮]

অষ্টম প্রমাণ : প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ৭ অধ্যায়ে মোশির বিষয়ে বলা হয়েছে: "২৩ পরে তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের, ইস্রায়েল-সন্তানগণের, তত্ত্বাবধান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উঠিল। ২৪ তখন এক জনের প্রতি অন্যায় করা হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার পক্ষ হইলেন, সেই মিসরীয় ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া উপদ্রুতের পক্ষে অন্যায় প্রতিকার করিলেন। ২৫ তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বুঝিয়াছে যে, তাঁহার হস্ত দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতেছেন ; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। ২৬ আর পর দিবস তাহারা যখন মারামারি করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদের কাছে দেখা দিয়া মিলন করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, ওহে তোমরা পরস্পরে ভ্রাতা, এক জন অন্যের প্রতি অন্যায় করিতেছ কেন ? ২৭ কিন্তু প্রতিবাসীর প্রতি অন্যায় করিতেছিল যে ব্যক্তি, সে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে ? ২৮ কাল যেমন সেই মিসরীয়কে বধ করিলে, তেমনি কি আমাকেও বধ করিতে চাহিতেছ ?"

---

১৩৮. সরুব্বাবিল ও যোষেফ-এর মধ্যে নয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন : অবীহূদ, ইলীয়াকীম, আসোর, সাদোক, আখীম, ইলীহূদ, ইলিয়াসর, মত্তন ও যাকোব। এদের কারো কোনরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।

এই ঘটনা যাত্রাপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রেরিতদের কার্য-বিবরণে কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে যা যাত্রাপুস্তকে নেই। যাত্রাপুস্তকের ভাষ্য নিম্নরূপ : "১১ সেকালে একটি ঘটনা ঘটিল: মোশি বড় হইলে পর এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদের ভার বহন দেখিতে লাগিলেন। আর দেখিলেন, এক জন মিসরীয় একজন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনকে মারিতেছে। ১২ তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিসরীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। ১৩ পর দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখ, দুইজন ইব্রীয় পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার ভাইকে কেন মারিতেছ ? ১৪ সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে ? তুমি যেমন সেই মিসরীয়কে বধ করিয়াছ, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহ ?"

নবম প্রমাণ : যিহূদার পত্রের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "আর যে স্বর্গদূতেরা (angels) আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।"

দশম প্রমাণ : ২ পিতরের ২য় অধ্যায়ের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে (angels that sinned) ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ করিলেন।"

যিহূদা ও পিতর এই দুই প্রেরিত শিষ্য যে বিষয়টি উল্লেখ করলেন তার কোন অস্তিত্ব পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকে নেই। উপরন্তু এই দুই প্রেরিতের তথ্যটি মিথ্যা বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পাপে পতিত বা বাসস্থান ত্যাগকারী দূত বলতে দিয়াবল বা শয়তানগণকে বুঝানো হয়েছে। আর বাইবেল থেকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, শয়তানগণ অনন্তকালীন শৃঙ্খলে বদ্ধ নয়। ইয়োবের প্রথম অধ্যায়, মার্কলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ১২ আয়াত, ১ পিতরের ৫ অধ্যায়ে ৮ আয়াত ও অন্যান্য বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শয়তানগণ আবদ্ধ নয়, বরং মুক্ত ও কর্মরত।

একাদশ প্রমাণ : আরবী অনুবাদ গীতসংহিতার ১০৪ নং গীত এবং অন্যান্য অনুবাদে গীতসংহিতার ১০৫ নং গীতের ১৮ আয়াতে যোষেফের মিসরে দাসরূপে বিক্রীত হওয়ার ঘটনায় বলা হয়েছে : "(যোষেফ দাসরূপে বিক্রীত হইলেন) লোকে বেড়ি দ্বারা তাঁহার চরণকে ক্লেশ দিল : তাঁহার প্রাণ লৌহে বদ্ধ হইল।"

যোষেফের দাসত্ব ও কারাবাসের কথা আদিপুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাঁর চরণে বেড়ি দেওয়া ও লৌহ দ্বারা তাঁর প্রাণ বদ্ধ করার

কোনরূপ উল্লেখ নেই। কারাবন্দিকে বেড়ি পরানো বা মারধর করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে যোষেফ কারাগারে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে এরূপ করা হয়েছিল তারও কোন প্রমাণ নেই।[১৩৯]

দ্বাদশ প্রমাণ : ঈশ্বরের সাথে বা ঈশ্বরের দূতের সাথে যাকোবের মল্লযুদ্ধের বিষয়ে হোশেয় ১২ অধ্যায়ের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "হাঁ, সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিল; সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিয়াছিল (He wept, and made supplication unto him)"।

ঈশ্বরের সাথে যাকোবের মল্লযুদ্ধের ঘটনা আদিপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪০] কিন্তু সেখানে যাকোবের ক্রন্দনের কোন উল্লেখ নেই।

ত্রয়োদশ প্রমাণ : নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে স্বর্গ, নরক, পুনরুত্থান, বিচার, কর্মের প্রতিদান ইত্যাদির কথা সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪১] কিন্তু মোশির পাঁচটি পুস্তকে (Torah or Pentateuch) এ সকল বিষয়ের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না বরং সেগুলিতে শুধু জাগতিক লাভক্ষতির বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, পরকাল বা স্বর্গ-নরকের কথা কিছুই নেই। ঈশ্বর সদাপ্রভুর নির্দেশ যারা পালন করবে তাদের পৃথিবীতে কত প্রকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং যারা ঈশ্বরের নির্দেশ না মানবে পার্থিব জীবনে তাদের কি কি শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া হবে সেগুলিই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

এরূপ আরো অনেক উদাহরণ বাইবেলের পুস্তকাদিতে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এমন কোন তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হলে তা কখনোই পরবর্তী গ্রন্থের ঐশ্বরিকত্বের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে না। তাই যদি হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে, ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলি মিথ্যা, কারণ এতে অনেক কথা আছে যা তোরাহ্ বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোন পুস্তকে নেই।

---

১৩৯. বরং আদিপুস্তকের বিবরণ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, যোষেফ কারাগারে সম্মানে ও আরামে ছিলেন : "অতএব যোষেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কারাগারে রাখিলেন, যে স্থানে রাজার বন্দিগণ বদ্ধ থাকিত; তাহাতে তিনি সেখানে, সেই কারাগারে থাকিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন ; ও তাঁহাকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। তাহাতে কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোষেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন, আর তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম যোষেফের আজ্ঞা অনুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কেননা সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্তী ছিলেন এবং তিনি যাহা কিছু করিতেন সদাপ্রভু তাহা সফল করিতেন।" আদিপুস্তক ২৯/২০-২৩।

১৪০. আদিপুস্তক ৩২/২২-৩২।

১৪১. মথি ৫/২২, ১০/২৮, ২৩/১৫, ২৫/৪৬; মার্ক ৯/৪৩-৪৪; লূক ২৩/৪৩ ... ।

বস্তুত, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে সবকিছুই উল্লেখ থাকা জরুরী নয়। যেমন, তোরাহ বা মোশির গ্রন্থগুলিতে আদম, শেথ, ইনোশ প্রমুখের সকল সন্তানের নাম উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলিও বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি।

২ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ে ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস গাৎ-হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যোনা ভাববাদীর (His servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gathhepher) দ্বারা যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি হমাতের প্রবেশস্থান অবধি অরাবার সমুদ্র পর্যন্ত ইস্রায়েলের সীমা পুনর্বার হস্তগত করিলেন।"

ডাওয়ালী ও রজার্ডমেন্ট (G. D'oyley and R. Mant)-এর প্রণীত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (Notes, practical and Explanatory to the Holy Bible) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "এই যোনা (ইউনূস) ভাববাদীর উল্লেখ এই একটি মাত্র আয়াত এবং নীনবী বিষয়ক 'যোনা ভাববাদীর পুস্তক' নামক ছোট্ট একটি পুস্তিকা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষত, এখানে যে ভাববাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে ভাববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম (Jerboam the son of Joash)[১৪২] সিরিয়ার শাসকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ভাববাণী ও ঘটনাবলি বাইবেলের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো পূর্ববর্তী ভাববাদীদের অনেক পুস্তকই আমাদের হাতে পৌছে নি। কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয়। উপরন্তু এ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ হলো, ভাববাদিগণ তাঁদের অনেক ভাববাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী লিখে রাখেন নি।"

বাইবেল ব্যাখ্যাকারদের এ কথা আমার উপরের কথাই প্রমাণিত করে।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে : "যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্নকার্য করিয়াছিলেন ; সেই সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই।"

যোহনের ২১ অধ্যায়ের ২৫ আয়াত নিম্নরূপ : "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে, জগতেও তাহা ধরিত না।"

এ কথা, যদিও এর মধ্যে কিছুটা বাগাড়ম্বর রয়েছে– নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, যীশুর সকল অবস্থা, সকল অলৌকিক কর্ম ও সকল বক্তব্য সুসমাচারগুলিতে লিখিত হয় নি।

১৪২. দ্বিতীয় যারবিয়াম উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্যের ১৩শ রাজা ছিলেন। রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব ৭৮৬-৭৪৬ অব্দ। তিনি সিরিয়ার রাজা বেনহাদাদ (Benhadad)-এর সাথে যুদ্ধ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের কোন বিষয় রহিত করা যেমন কোন অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়, তেমনি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি এরূপ কোন তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ থাকাও কোন অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয়। প্রথম কারণে যেমন ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করা যায় না, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় কারণেও ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তৃতীয় প্রকার বৈপরীত্য : বিরোধিতা

কুরআনের মধ্যে বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের পুস্তাকাবলিতে উল্লিখিত তথ্যাদির বিপরীত বা বিরোধী তথ্য উল্লেখ করার কারণে কুরআনের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার কোন সুযোগ খৃস্টানদের নেই ; কারণ এ জাতীয় বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বাইবেলের মধ্যেই বিদ্যমান। এরূপ বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বিদ্যমান রয়েছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের, নতুন নিয়মের এক পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের এবং নতুন নিয়মের সাথে পুরাতন নিয়মের। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা দেখতে পেরেছেন। অনুরূপভাবে তোরাহ-এর তিন সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপি, অর্থাৎ হিব্রু, গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণের মধ্যেও অনুরূপ বৈপরীত্য ও বিরোধিতা রয়েছে। পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সকল বৈপরীত্য সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

পাদরি ও মিশনারিগণ অধিকাংশ সময় সাধারণ মুসলমানদেরকে এইসব বৈপরীত্যের কথা বলেই ধোঁকা দিয়ে থাকেন। এজন্য আমি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বৈপরীত্যের ও স্ববিরোধিতার বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা উত্তম মনে করছি। এতে হয়ত আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হবে, কিন্তু আমি তাতে ভয় পাচ্ছি না। কারণ দীর্ঘ হলেও তা নিরর্থক পুনরাবৃত্তি হবে না, বরং অনেক অর্থবহ তথ্য এতে সংযোজিত হবে।

১ম বৈপরীত্য : আদমের সৃষ্টি থেকে নোহ-এর প্লাবন পর্যন্ত সময়পর্ব বাইবেলের তিন সংস্করণে তিন প্রকার লেখা হয়েছে। হিব্রু সংস্করণে আদম থেকে নোহের প্লাবন পর্যন্ত সময়পর্ব এক হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (১৬৫৬) বছর, গ্রীক সংস্করণ অনুসারে এই সময় দুই হাজার দুই শত বাষট্টি (২২৬২) বছর, আর শমরীয় সংস্করণ অনুসারে এই সময় এক হাজার তিনশত সাত (১৩০৭) বছর।

২য় বৈপরীত্য : নোহের প্লাবন থেকে অবরাহামের (ইবরাহীম আ) জন্ম পর্যন্ত সময়পর্ব হিব্রু সংস্করণ অনুসারে দুইশত বিরানব্বই (২৯২) বছর, গ্রীক সংস্করণ অনুসারে এক হাজার বাহাত্তর (১০৭২) বছর এবং শমরীয় সংস্করণ অনুসারে নয়শত বিয়াল্লিশ (৯৪২) বছর।

৩য় বৈপরীত্য : পুরাতন নিয়মের গ্রীক সংস্করণে নোহের পৌত্র অর্ফকষদ এবং তাঁর পুত্র শেলহের মাঝে কৈনন নামে একজনের নাম অতিরিক্ত বলা হয়েছে, যার নাম হিব্রু ও শমরীয় সংস্করণে নেই।[১৪৩] সুসমাচার লেখক লূক গ্রীক সংস্করণের উপর নির্ভর করেন। এজন্য তিনি যীশু খৃস্টের বংশাবলি-পত্রে অর্ফকষদ ও শেলহের মধ্যে কৈননকে বৃদ্ধি করেছেন। এখন খৃস্টানগণের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেল গ্রীক সংস্করণকেই বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করতে এবং হিব্রু ও শমরীয় সংস্করণকে বাতিল ও ভুল বলে ঘোষণা করতে; অন্যথায় তাদের সুসমাচারের মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে।[১৪৪]

৪র্থ বৈপরীত্য : হিব্রু সংস্করণ অনুসারে ধর্মধাম বা মসজিদ নির্মাণের স্থান হলো এবল পাহাড়। আর শমরীয় সংস্করণ অনুসারে ধর্মধাম নির্মাণের স্থান হলো গরিষীম পাহাড়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক উপরের বৈপরীত্যগুলোর বিষয়ে জানতে পেরেছেন। এজন্য এগুলোর আলোচনা আর লম্বা করছি না।

৫ম বৈপরীত্য : আদমের সৃষ্টি থেকে যীশু খৃস্টের জন্ম পর্যন্ত সময়পর্ব হিব্রু সংস্করণ অনুসারে ৪০০৪ বছর, গ্রীক সংস্করণ অনুসারে ৫৮৭২ বছর এবং শমরীয় সংস্করণ অনুসারে ৪৭০০ বছর।

হেনরী ও স্কট (M. Henry and T. Scoot) রচিত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থের (A Commentary upon the Holy Bible) প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে : যোষেফের ভুলত্রুটি সংশোধনের পরে হেলয এ বিষয়ক সঠিক ইতিহাস নির্ধারণ করেছেন। তাঁর গবেষণা অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি থেকে খৃস্টের জন্ম পর্যন্ত সময়পর্ব ৫৪১১ বছর। আর মহাপ্লাবন থেকে খৃস্ট পর্যন্ত ৩১৫৫ বছর।

চার্লস তাঁর পুস্তকে বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর পুস্তকে তিনি বিশ্বসৃষ্টি থেকে যীশুর জন্ম পর্যন্ত সময়পর্ব নির্ধারণে এবং তখন থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল নির্ধারণের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের ২৫টি মত উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি স্বীকার করেছেন যে, কোন দুজন ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে একমত পোষণ করতে পারেন না। প্রত্যেকের মতই ভিন্ন। এ কারণে এ বিষয়ে

---

১৪৩. হিব্রু ও শমরীয় তোরাহ-এ স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেলহ অর্ফকষদের পুত্র। "অর্ফকষদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন" (আদিপুস্তক ১১/১২)। পক্ষান্তরে গ্রীক তোরাহ অনুসারে অর্ফকষদের পুত্র কৈনন ও কৈননের পুত্র শেলহ।

১৪৪. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগে খৃস্টানগণ হিব্রু সংস্করণকেই সঠিক বলে বিশ্বাস করেন এবং সকল ভাষায় তার অনুবাদ প্রচার করেন। এজন্য এস্থলে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। প্রচলিত বাইবেলের আদিপুস্তকে রয়েছে অর্ফকষদের পুত্র শেলহ। পক্ষান্তরে লূকের সুসমাচারে রয়েছে অর্ফকষদের পুত্র কৈনন এবং কৈননের পুত্র শেলহ।

ভুল মত থেকে সঠিক মত চিহ্নিত করা অসম্ভব। আমি এখানে তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ উল্লেখ করছি। বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে যীশু খৃস্টের জন্ম পর্যন্ত সময়পর্ব নির্ধারণে যে মতভেদ তিনি উল্লেখ করেছেন আমি শুধু তাই উল্লেখ করব। যীশুখৃস্টের জন্ম থেকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ সময়পর্বের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ নেই। কাজেই সে বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নং	ঐতিহাসিকের নাম	তাঁর মতে আদম সৃষ্টি থেকে খৃষ্ট পর্যন্ত সময়পর্ব
১	মারিয়ানোস স্কটাস	৪১৯২
২	লারেন্টিউস কোডোমানোস	৪১৪১
৩	টোম লিডিথ	৪১০৩
৪	মিখাঈল মিস্টলি নোস	৪০৭৯
৫	জি বাবস্টাট রেক কিউলোস	৪০৬২
৬	জ্যাকব স্লিয়ানোস	৪০৫৩
৭	হেনরি কোস বোনডানোস	৪০৫১
৮	উইলিয়াম লেনক	৪০৪১
৯	আরাযেমস রেনহল্ট	৪০২১
১০	জিকোরোস কিবালোস	৪০০৫
১১	আর্চ বিশপ আশার	৪০০৩
১২	ডিওনি সিওস বিটাভিওস	৩৯৮৩
১৩	বিশপ বেক	৩৯৭৪
১৪	কর্ন যীম	৩৯৭১
১৫	এলিয়েস রেয়স নিরোস	৩৯৭০
১৬	জোহানেস ক্লাওরিওস	৩৯৬৮
১৭	ক্রিসটিয়ানোস লোঙ্কো মোন্টিয়ানোস	৩৯৬৬
১৮	ফিলিপ মিলানেখটন	৩৯৬৪
১৯	জ্যাকব হেনরি নোস	৩৯৬৩
২০	আলফানসোস সালমেয়ান	৩৯৫৮
২১	এসকে লেকর	৩৯৪৯
২২	মিটহাউস প্রোলডিওস	৩৯২৭
২৩	এন্ড্রিয়াস হেল ভি কিওস	৩৮৩৬
২৪	ইহূদীদের সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে	৩৭৬০
২৫	খৃস্টানদের সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে	৪০০৪

চার্লস রজার বলেন : "এ সকল মতের কোন দুটি মত মিলে না। যে কোন সময়ে যদি কেউ এ সকল মত নিয়ে একটু চিন্তা করেন তবে তিনি অনুভব করবেন যে, বিষয়টি অদ্ভুৎ ও অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তবে বাহ্যত মনে হয় যে, পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ধর্মগুরু-ভাববাদী ইতিহাসবেত্তাগণ কখনোই সঠিক সুসমঞ্জস ইতিহাস উল্লেখ করতে চান নি। বর্তমানে কারো পক্ষেই সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব নয়।"

তাঁর কথা থেকে জানা গেল যে, বর্তমানে সঠিক ইতিহাস ও সঠিক সন-তারিখ জানা একেবারেই অসম্ভব। পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকাবলির রচয়িতাগণ যা কিছু লিখেছেন তা সবই আন্দাযে ঢিল ছুড়ে লিখেছেন। আর এ বিষয়ে ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসের সাথে খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস মিলে না।

প্রাজ্ঞ পাঠক! আপনি এবার ইনসাফ করুন, আপনি তো বাইবেলের পবিত্র পুস্তকাদিতে বর্ণিত ইতিহাসের অবস্থা জানতে পারলেন। এখন যদি কুরআনের কোন তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, তা বাইবেলে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিপরীত, তবে আপনি কি এই বৈপরীত্যের কারণে কুরআনের বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ করবেন ? কখনোই হতে পারে না, বরং আমরা বলব যে, তাদের পবিত্র ধর্মগুরুগণই ভুল করেছেন এবং যা কিছু লিখেছেন তা সবাই আন্দাযে লিখেছেন। বিশেষত আমরা যখন বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন নিশ্চিত হই যে, ইহূদী-খৃস্টান ভাববাদী ধর্মগুরুগণের এ সকল লেখার সামান্যতম মূল্য নেই। এগুলো ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণে এ সকল দুর্বল মতামতের উপর আমরা কোনভাবেই নির্ভর করতে পারি না।

আল্লামা তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫ হি) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রসিদ্ধ স্পেনীয় আলিম ও ফকীহ্ হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হায্ম (৪৫৬ হি)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "আমরা মুসলিমগণ বিশ্বের সৃষ্টি বা বয়স সম্পর্কে কোন নির্ধারিত সংখ্যায় বিশ্বাস করি না। যারা দাবি করেন যে, বিশ্বের বয়স ৭ হাজার বছর বা তার চেয়ে বেশি বা কম তাদের দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এই অর্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কোন কথা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি বরং এর বিপরীত কথাই তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের বয়স আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহ্ বলেছেন : "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখি নি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়।"[১৪৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "পূর্ববর্তী জাতিগণের তুলনায় তোমাদের অবস্থান কাল ষাড়ের দেহের

১৪৫. সূরা ১৮ কাহ্ফ, ৫১ আয়াত।

একটি সাদা পশম অথবা সাদা ষাড়ের দেহের একটি কাল পশমের ন্যায়।"[১৪৬] কেউ যদি এই তুলনাটি চিন্তা করেন এবং বর্তমানে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে লক্ষ্য করেন তবে বুঝতে পারবেন যে, এই বিশ্বের বয়স অনেক বেশি, যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।"

আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। আমিও এই মত পোষণ করি। আর পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট। তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন।[১৪৭]

৬ষ্ঠ বৈপরীত্য : হিব্রু তোরাহ ও শমরীয় তোরাহ-এর মধ্যে বৈপরীত্যের আরেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ 'দশ আজ্ঞা' (the ten commandments)। হিব্রু তোরাহ-এ যে আজ্ঞাগুলো রয়েছে, শমরীয় তোরাহ-এ সেগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত একটি আজ্ঞা রয়েছে।[১৪৮] এই একাদশতম আজ্ঞাটি হিব্রু তোরাহ-এ নেই।

৭ম বৈপরীত্য : যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে : "ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।"

এখানে শমরীয় ও গ্রীক তোরাহ-এ বলা হয়েছে : "ইস্রায়েল-সন্তানগণ এবং তাদের পিতা-পিতামহগণ কনান দেশে এবং মিসরে সর্বমোট চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল প্রবাস করিয়াছিল।"

এখানে শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণের বক্তব্যই সঠিক। হিব্রু তোরাহ-এর বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে ভুল।[১৪৯]

---

১৪৬. হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। দেখুন : বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২২১, ৪/১৭৬৭, ৫/২৩৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০০-২০১।

১৪৭. পাঠক এখানে কুরআনের আরেকটি অলৌকিকত্ব লক্ষ্য করুন। আমরা আগেই বলেছি যে, কুরআনে আদম, নোহ ও অন্যান্য সকল প্রাচীন নবীর কাহিনী আলোচনা করা হলেও পৃথিবীর বয়স বিষয়ক বাইবেলের বর্ণনাগুলো কুরআনে সর্বোতভাবে পরিহার করা হয়েছে। আর এ কারণেই কুরআন-নির্ভর মানুষেরা এ বিষয়ক কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। যে যুগে প্রায় সকল মানুষই বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবীর বয়স মাত্র ৬/৭ হাজার বছর, মুসলিম সমাজেরও অনেক আলিম, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক তাওরাত ও ইহুদী-খৃস্টানদের বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ সকল কথা তাদের পুস্তকে লিখতেন, সে যুগেও কুরআন-নির্ভর মানুষেরা এ সকল কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছেন।

১৪৮. এই আজ্ঞাগুলো যাত্রাপুস্তক ২০/২-১৭ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৬-২১ এ রয়েছে। যাত্রাপুস্তকের বক্তব্য উভয় সংস্করণে মূলত একই। দ্বিতীয় বিবরণের বক্তব্যে শমরীয় তোরাহ-এ অতিরিক্ত একটি আজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে যা হিব্রু সংস্করণে নেই। আজ্ঞাটি গরিষীম পর্বতে যজ্ঞবেদি ও মন্দির তৈরি বিষয়ক।

১৪৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ (বিয়োজনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ)-এর প্রথম প্রমাণ।

৮ম বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর কয়িন (কাবিল) আপন ভ্রাতা হেবলকে কহিল[১৫০]। পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।"

'শমরীয় ও গ্রীক তোরাহ্-এর পাঠ এখানে নিম্নরূপ : "আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলকে কহিল, আইস আমরা ক্ষেত্রে গমন করি। পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।"

খৃস্টান পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণের পাঠই সঠিক।[১৫১]

৯ম বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে হিব্রু তোরাহ্-এ বলা হয়েছে : "আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।" গ্রীক অনুবাদের এই বাক্যটি নিম্নরূপ : "আর চল্লিশ দিবস ও রাত্রি পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।" এখানে গ্রীক অনুবাদের পাঠই সঠিক।[১৫২]

১০ম বৈপরীত্য : হিব্রু তোরাহ্-এর আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে রয়েছে : "যতক্ষণ পাল সকল একত্র না হয়"। এখানে শমরীয় সংস্করণ, গ্রীক সংস্করণ, কেনিকটের (Benjamin Kennicott) সংস্করণ এবং হিউবি কেন্ট-এর আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে : "যতক্ষণ রাখালগণ একত্র না হয়।" এ সকল সংস্করণের পাঠই সঠিক। হিব্রু তোরাহ্-এর পাঠ এখানে সঠিক নয়।[১৫৩]

১১শ বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের ২২ আয়াতটি হিব্রু সংস্করণে নিম্নরূপ : "রূবেন (যাকোবের প্রথম পুত্র) গিয়া আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল (যাকোব) তাহা শুনিতে পাইলেন।" এখানে গ্রীক সংস্করণের পাঠ নিম্নরূপ : "... আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল (যাকোব) তাহা শুনিতে পাইলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তা অন্যায় হইল।" গ্রীক সংস্করণের পাঠই সঠিক।[১৫৪]

---

১৫০. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। প্রচলিত বাইবেলে বাক্যটি নিম্নরূপ : "আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল।" 'কহিল' শব্দটিকে 'কথোপকথন করিল' করা হয়েছে বাক্যটির সংশোধনের জন্য।

১৫১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২য় প্রমাণ।

১৫২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩য় প্রমাণ।

১৫৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ (পরিবর্তনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ)-এর ৪র্থ প্রমাণ।

১৫৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪র্থ প্রমাণ।

১২শ বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৪৪ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতে গ্রীক সংস্করণে রয়েছে: "তোমরা কেন আমার বাটি চুরি করিলে ?"[১৫৫] হিব্রু তোরাহ-এ এ বাক্যটি নাই। এখানে গ্রীক সংস্করণের পাঠই সঠিক।[১৫৬]

১৩শ বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৫০ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে : "আর তোমরা এ স্থান হইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবে।" গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণে রয়েছে : "তোমরা এ স্থান হইতে আমার অস্থি তোমাদের সহিত লইয়া যাইবে।"[১৫৭]

১৪শ বৈপরীত্য : যাত্রাপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ২২ আয়াতটির শেষে গ্রীক সংস্করণে নিম্নের কথাগুলো রয়েছে : "এবং ঐ স্ত্রী দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিলেন।মোশি তাহার নাম আলিয়াসর রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমার পিতার ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাকে ফরৌণের হস্ত হইতে মুক্তি দিয়াছেন।" এই কথাগুলি হিব্রু তোরাহ-এ নেই। গ্রীক পাঠই সঠিক। আরবী অনুবাদে অনুবাদকগণ এ কথাগুলি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।[১৫৮]

১৫শ বৈপরীত্য : যাত্রাপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে রয়েছে : "অম্রম আপন পিসি যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন।" শমরীয় সংস্করণে এবং গ্রীক অনুবাদে রয়েছে " "আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে, মোশিকে ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিলেন।" এখানে শমরীয় ও গ্রীক পাঠই সঠিক।[১৫৯]

১৬শ বৈপরীত্য : গণনাপুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ৬ আয়াতটির শেষে গ্রীক অনুবাদে রয়েছে : "এবং তোমরা তৃতীয়বার রণবাদ্য বাজাইলে পশ্চিমদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকের শিবির উঠাইবে এবং তোমরা চতুর্থবার রণবাদ্য বাজাইলে উত্তরদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকের শিবির উঠাইবে।" এ কথাগুলি হিব্রু সংস্করণে নেই। গ্রীক অনুবাদের পাঠই সঠিক।[১৬০]

১৭শ বৈপরীত্য : গণনা পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১০ ও ১১ আয়াতের মাঝে শমরীয় তোরাহ-এ নিম্নের কথাগুলি রয়েছে : "আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মোশিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা এই পর্বতে অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছ ; এখন

১৫৫. এখানে যোষেফ (ইউসুফ আ)-এর ভাইয়ের ছালার মধ্যে তাঁর বাটি রাখা ও পরে তা বের করার ঘটনা বলা হয়েছে। উপরের বাক্যটি যোগ না করলে কথা অপূর্ণ থাকে।

১৫৬. বিস্তারিত দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫ম প্রমাণ।

১৫৭. বিস্তারিত দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ প্রমাণ।

১৫৮. বিস্তারিত দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৭ম প্রমাণ।

১৫৯. বিস্তারিত দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৮ম প্রমাণ।

১৬০. বিস্তারিত দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৯ম প্রমাণ।

ফির, তোমরা যাত্রা কর, ইমোরীয়দের পর্বতময় দেশ এবং তন্নিকটবর্তী সকল স্থান, অরাবা তলভূমি, পাহাড় অঞ্চল, নিম্নভূমি, দক্ষিণ প্রদেশ ও সমুদ্রতীর, মহানদী ফরাৎ নদী পর্যন্ত কনানীয়দের দেশে ও লিবানোনে প্রবেশ কর। ৮ দেখ, আমি সেই দেশ তোমাদের সম্মুখে দিয়াছি ; তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে এবং তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে সদাপ্রভু দিব্য করিয়াছিলেন .....।" হিব্রু তোরাহ-এ এ স্থানে এই বাক্যগুলি নেই।

বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : দ্বিতীয় বিবরণের ১ম অধ্যায়ের ৬, ৭ ও ৮ আয়াতের কথাগুলি শমরীয় সংস্করণের গণনা পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১০ ও ১১ আয়াতের মাঝে বিদ্যমান। প্রোকোপিয়াসের (Procopius)[১৬১] যুগেই বিষয়টি ধরা পড়েছিল।

১৮শ বৈপরীত্য : দ্বিতীয় বিবরণের ১০ অধ্যায়ে হিব্রু সংস্করণে রয়েছে : "৬ ইস্রায়েল-সন্তানগণ বেরোৎ-বেনেয়াকন হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে হারোণ সেই স্থানে মরিলেন এবং সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল ; এবং তাঁহার পুত্র ইলিয়াসর তাঁহার পরিবর্তে যাজক হইলেন। ৭ সেই স্থান হইতে তাহারা গুধগোদায় যাত্রা করিলে, এবং গুধগোদা হইতে যট্‌বাথায় প্রস্থান করিল; এই স্থান জলস্রোতের দেশ। ৮ সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিতে, সদাপ্রভুর পরিচর্যা করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে এবং তাঁহার নামে আশীর্বাদ করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক করিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে।"

এই বিষয়টি গণনা পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রাপথের বর্ণনায় গণনা পুস্তকের বিবরণের সাথে এই বিবরণের বৈপরীত্য রয়েছে। শমরীয় সংস্করণে এখানেও গণনা পুস্তকের কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করা রয়েছে। গণনা পুস্তকের বক্তব্য নিম্নরূপ : "৩০ হশ্‌মোনা হইতে যাত্রা করিয়া মোষেরোতে শিবির স্থাপন করিল। ৩১ মোষেরোৎ হইতে যাত্রা করিয়া বনেয়াকনে শিবির স্থাপন করিল। ৩২ বনেয়াকন হইতে যাত্রা করিয়া হোর্-হগিদ্‌গদে শিবির স্থাপন করিল। ৩৩ হোর্-হগিদ্‌গদ হইতে যাত্রা করিয়া যট্‌বাথাতে শিবির স্থাপন করিল। ৩৪ যট্‌বাথা হইতে যাত্রা করিয়া অব্রোণাতে শিবির স্থাপন করিল। ৩৫ অব্রোণা হইতে যাত্রা করিয়া ইৎসিয়োন-গেবরে শিবির স্থাপন করিল। ৩৬ ইৎসিয়োন -গেবর হইতে যাত্রা করিয়া সিন প্রান্তরে অর্থাৎ কাদেশে শিবির স্থাপন করিল। ৩৭ কাদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ইদোম দেশের প্রান্তস্থিত হোর পর্বতে শিবির স্থাপন করিল। ৩৮ আর হারোণ যাজক

---

১৬১. সম্ভবত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু Procopius-কে বুঝানো হয়েছে। রোমান সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ানের (Diocletian) নির্দেশে ২৯২ খৃষ্টাব্দের দিকে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে হোর পর্বতে উঠিয়া মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইবার চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে সেই স্থানে মরিলেন। **৩৯ হোর পর্বতে হারোণের মৃত্যুকালে তাঁহার একশত তেইশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।** ৪০ আর কনান দেশের দক্ষিণ অঞ্চল নিবাসী কনানীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েল-সন্তানগণের আগমন সংবাদ শুনিলেন। ৪১ পরে তাহারা হোর পর্বত হইতে যাত্রা করিয়া সলমোনাতে শিবির স্থাপন করিল। ৪২ সলমোনা হইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে শিবির স্থাপন করিল।"

বাইবেল-ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭৭৯ ও ৭৮০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় বিবরণের ১০ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় কেনিকটের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপে হলো, এস্থলে শমরীয় তোরাহ-এর পাঠই সঠিক। হিব্রু তোরাহ-এর পাঠ ভুল। এখানে ৫ আয়াতের মধ্যবর্তী ৪টি আয়াত, অর্থাৎ ৬ থেকে ৯ আয়াত একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও অতিরিক্ত সংযোজন। এগুলিকে ফেলে দিলেই পূর্ব ও পরের বক্তব্য সমন্বিত হয়ে যাবে। বাইবেল লেখকের ভুলে এই আয়াত ৪টি এখানে লেখা হয়েছে। এগুলি দ্বিতীয় বিবরণের ২য় অধ্যায়ের।

কেনিকটের এই মত উল্লেখ করার পরে আদম ক্লার্ক মতটির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন: 'এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য ব্যস্ত হবেন না।'

আমার বক্তব্য হলো, ৮ আয়াতের শেষে 'অদ্যাপি সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে' কথাটুকু প্রমাণ করে যে, এই আয়াতগুলি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে।

১৯শ বৈপরীত্য : দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ৫ আয়াতটি হিব্রু তোরাহ অনুসারে নিম্নরূপ : "ইহারা নিজেদেরকে ভ্রষ্টাচারী করিয়াছে। ইহাদের কলঙ্ক তাঁহার (ঈশ্বরের) সন্তানদের কলঙ্ক নয়। ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ (They have corrupted themselves, their spot is not the spot of his children : they are a perverse and crooked generation)।"[১৬২]

গ্রীক ও শমরীয় তোরাহ-এর পাঠ এ স্থলে নিম্নরূপ : "ইহারা তাহাদেরকে ভ্রষ্টাচারী করিয়াছে। ইহারা তাঁহার নয়। ইহারা ভুল ও অন্যায়ের সন্তান।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণের পাঠই মূলের অধিক নিকটবর্তী।"

বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "শমরীয় সংস্করণ, গ্রীক অনুবাদ, হিউবি কেন্ট-এর অনুবাদ ও কেনিকট সম্পাদিত

১৬২. বাংলা বাইবেলের পাঠ : "ইহারা তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান নয়, এই ইহাদের কলঙ্ক; ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ।"

বাইবেলের পাঠ অনুসারে এখানে বাক্যটি সংশোধন করতে হবে। হিব্রু পাঠ এখানে বিকৃত।"

১৮৩১, ১৮৪৪ ও ১৮৪৮সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এই আয়াতটি নিম্নরূপ : "ইহারা তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রষ্টাচারী। তিনি অন্যায়ের সন্তানদের থেকে বিমুক্ত, হে বিপথগামী ও কুটিল বংশ।"

২০শ বৈপরীত্য : হিব্রু তোরাহ-এ আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ২ আয়াত নিম্নরূপ: "আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতটি গ্রীক অনুবাদে নিম্নরূপ : "আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভগিনী; কারণ তিনি তাঁহাকে নিজের স্ত্রী বলিতে ভীত হইলেন: তিনি ভাবিলেন যে, তাহার কারণে নগরবাসী তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহাতে ফিলিস্তিনের রাজা অবীমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন।"

"কারণ তিনি তাঁহাকে নিজের স্ত্রী বলিতে ভীত হইলেন; তিনি ভাবিলেন যে, তাহার কারণে নগরবাসী তাঁহাকে হত্যা করিবে"-কথাটুকু হিব্রু তোরাহ-এ নেই।

২১শ বৈপরীত্য : আদিপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতের পরে শমরীয় তোরাহ-এ নিম্নের কথাগুলি রয়েছে : "এবং ঈশ্বরের দূত যাকোবকে বলিলেন, হে যাকোব ; আর তিনি কহিলেন, দেখুন, এই আমি। তিনি বলিলেন, তোমার চক্ষু তুলিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলেই রেখাঙ্কিত, চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র; কেননা, লাবন তোমার প্রতি যাহা যাহা করে, তাহা সকলই আমি দেখিলাম। যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠ , এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও।"

এই কথাগুলি হিব্রু তোরাহ-এক স্থানে নেই।[১৬৩]

২২শ বৈপরীত্য : যাত্রাপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ৩ আয়াতের প্রথম বাক্যের পরে শমরীয় তোরাহ-এ রয়েছে : "আর মোশি ফরৌণকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে ; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে বধ করিব।"

---

১৬৩. কথাগুলি হিব্রু, শমরীয় ও অন্যান্য সকল সংস্করণে ৩১ অধ্যায়ে (১১-১৩ আয়াত) রয়েছে। আর শমরীয় তোরাহ-এ কথাগুলি ৩০ অধ্যায়ে ৩৬ আয়াতের পরে অতিরিক্ত সংযুক্ত।

এই কথাগুলি হিব্রু তোরাহে নেই।[১৬৪]

২৩শ বৈপরীত্য : গণনা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৭ আয়াত হিব্রু তোরাহ-এ নিম্নরূপ: "উহার কলস হইতে জল উথলিয়া উঠিবে, উহার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে, উহার রাজা অগাগ অপেক্ষাও উচ্চ হইবেন, উহার রাজ্য উন্নত হইবে।"

গ্রীক সংস্করণে রয়েছে : "তাহার থেকে একমন মানুষ প্রকাশিত হইবেন। আর তিনি অনেক জাতির উপর রাজত্ব করিবেন। তাহার রাজ্য অগাগের রাজ্য হইতেও উচ্চ হইবে, উহার রাজ্য উন্নত হইবে।"

২৪শ বৈপরীত্য : লেবীয় পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে রয়েছে : "আর হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দুই বক্ষ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে দোলাইলেন ; যেমন মোশি আজ্ঞা দিয়াছিলেন।"

গ্রীক ও শমরীয় তোরাহে "যেমন মোশি আজ্ঞা দিয়াছিলেন" কথাটির পরিবর্তে রয়েছে : "যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।"

২৫শ বৈপরীত্য : গণনা পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ১০ আয়াত হিব্রু তোরাহে নিম্নরূপ: "সেই সময়ে পৃথিবী মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে ও কোরহকে (কারূন) গ্রাস করিয়াছিল, তাহাতে সেই দল মারা পড়িল; এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করিল, আর তাহারা নিদর্শন-স্বরূপ হইল।"

আয়াতটি শমরীয় তোরাহে নিম্নরূপ : "পৃথিবী তাহাদেরকে গ্রাস করিল। যখন সেই দল মারা পড়িল এবং অগ্নি কোরহকে দগ্ধ করিল, দুই শত পঞ্চাশ জনের সহিত। আর তাহারা নিদর্শন-স্বরূপ হইল।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "এই পাঠই ঘটনা বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গীতসংহিতার ১০৬ নং গীতের বর্ণনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।[১৬৫]

২৬শ বৈপরীত্য : প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিত ও গবেষক লিক্লার্ক হিব্রু ও শমরীয় তোরাহের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যগুলির একটি সমীক্ষা তৈরী করেছেন। তিনি উভয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যগুলিকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে হিব্রু তোরাহের চেয়ে শমরীয় তোরাহই সঠিকতর। এই প্রকারের বৈপরীত্যের সংখ্যা ১১।

দ্বিতীয় প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে পারিপার্শিক বর্ণনা ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শমরীয় তোরাহের পাঠই বিশুদ্ধ (অর্থাৎ হিব্রু তোরাহের পাঠ ভুল)। এই প্রকার বৈপরীত্যের সংখ্যা ৭।

---

১৬৪. হিব্রু, শমরীয় ও অন্যান্য সংস্করণের অনুরূপ যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ের ২২-২৩ আয়াতে রয়েছে। শমরীয় তোরাহে কথাগুলি ১১ অধ্যায়ের এস্থানে সংযোজিত রয়েছে।

১৬৫. দেখুন গীতসংহিতা ১০৬/১৭-১৮।

তৃতীয় প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে শমরীয় তোরাহে অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে। এরূপ বৈপরীত্যের সংখ্যা ১৩।

চতুর্থ প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে শমরীয় তোরাহে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। বিকৃতিকারী গবেষক ও বুদ্ধিমান। এরূপ বৈপরীত্যের সংখ্যা ১৭।

পঞ্চম প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে শমরীয় তোরাহের পাঠ অপেক্ষাকৃত সুন্দর। এই প্রকারের বৈপরীত্যের সংখ্যা ১০।

ষষ্ঠ প্রকার : যে সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে শমরীয় তোরাহে কমতি রয়েছে। এরূপ বৈপরীত্যের সংখ্যা ২।

উপর্যুক্ত বৈপরীত্যগুলির তালিকা নিম্নরূপ :

প্রথম প্রকার বৈপরীত্য : ১১টি (শমরীয় তোরাহ্ বিশুদ্ধতর)

আদিপুস্তকে ৯টি : ২ অধ্যায় ৪ আয়াত, ৭ অধ্যায় ২ আয়াত, ১৯ অধ্যায় ১৯ আয়াত, ২০ অধ্যায় ২ আয়াত, ২৩ অধ্যায় ১৬ আয়াত, ৩৪ অধ্যায় ১৪ আয়াত, ৪৯ অধ্যায় ১০ ও ১১ আয়াত এবং ৫০ অধ্যায় ২৬ আয়াত। যাত্রাপুস্তকে ২টি : ১ অধ্যায় ২ আয়াত ও ৪ অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রকার বৈপরীত্য : ৭টি (শমরীয় তোরাহ্ই বিশুদ্ধ, হিব্রু বিকৃত)

যাত্রাপুস্তকে ৬টি : ৩১ অধ্যায় ৪৯ আয়াত, ৩৫ অধ্যায় ২৬ আয়াত এবং ৪১ অধ্যায় ৩৪ ও ৪৩ আয়াত এবং ৪৭ অধ্যায় ৩ আয়াত। দ্বিতীয় বিবরণে একটি : ৩২ অধ্যায়ের ৫ আয়াত।

তৃতীয় প্রকার বৈপরীত্য : ১৩টি (শমরীয় তোরাহে অতিরিক্ত সংযোজন)

আদিপুস্তকে ৩টি : ২৯ অধ্যায় ১৫ আয়াত, ৩০ অধ্যায় ৩৬ আয়াত এবং ৪১ অধ্যায় ১৬ আয়াত। যাত্রাপুস্তকে ৭টি : ৭ অধ্যায় ১৮ আয়াত, ৮ অধ্যায় ২৩ আয়াত, ৯ অধ্যায় ৫ আয়াত, ২১ অধ্যায় ২০ আয়াত, ২৩ অধ্যায় ১০ আয়াত এবং ৩২ অধ্যায় ৯ আয়াত। লেবীয় পুস্তকে ২টি : ১ অধ্যায় ১০ আয়াত, ১৭ অধ্যায় ৪ আয়াত।

চতুর্থ প্রকার বৈপরীত্য : ১৭টি (শমরীয় তোরাহ্ বিকৃত)

আদিপুস্তকে ১৩টি : ২ অধ্যায় ২ আয়াত, ৪ অধ্যায় ১০ আয়াত, ৯ অধ্যায় ৫ আয়াত, ১০ অধ্যায় ১৯ আয়াত, ১১ অধ্যায় ২১ আয়াত, ১৮ অধ্যায় ৩ আয়াত, ১৯ অধ্যায় ১২ আয়াত, ২০ অধ্যায় ১৬ আয়াত, ২৪ অধ্যায় ৩৮ ও ৫৫ আয়াত, ৩৫ অধ্যায় ৭ আয়াত, ৩৬ অধ্যায় ৬ আয়াত এবং ৪১ অধ্যায় ৫০ আয়াত। যাত্রাপুস্তকে ৩টি : ১ অধ্যায় ৫ আয়াত, ১৩ অধ্যায় ৬ আয়াত ও ১৫ অধ্যায় ৫ আয়াত।

পঞ্চম প্রকার বৈপরীত্য : ১০টি (শমরীয় তোরাহের পাঠ সুন্দরতর)

আদিপুস্তকে ৬টি : ৫ অধ্যায় ৮-আয়াত, ১১ অধ্যায় ৩১ আয়াত, ১৯ অধ্যায় ৯ আয়াত, ২৭ অধ্যায় ৩৪ আয়াত, ৩৯ অধ্যায় ৪ আয়াত এবং ৪৩ অধ্যায় ২৫ আয়াত। যাত্রাপুস্তকে ২টি : ১২ অধ্যায় ৪০ আয়াত এবং ৪০ অধ্যায়ে ১৭ আয়াত। দ্বিতীয় বিবরণে একটি : ২০ অধ্যায় ১৬ আয়াত।

ষষ্ঠ প্রকার বৈপরীত্য : ২টি (শমরীয় তোরাহে কমতি)

আদিপুস্তকে ২টি : ২০ অধ্যায় ১৬ আয়াত এবং ২৫ অধ্যায় ১৪ আয়াত।

প্রসিদ্ধ খৃস্টান গবেষক হর্ন তাঁর ১৮২২ সালে প্রকাশিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন, প্রসিদ্ধ গবেষক লিক্লার্ক সূক্ষ্মতা ও গভীরতার সাথে হিব্রু তোরাহ ও শমরীয় তোরাহের তুলনা করে দেখেছেন। তিনি এই বৈপরীত্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। এ সকল স্থানে হিব্রু তোরাহের তুলনায় শমরীয় তোরাহই বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান।

কেউ যেন মনে না করেন যে, হিব্রু ও শমরীয় তোরাহের মধ্যকার বৈপরীত্য লিক্লার্ক চিহ্নিত উপরের ৬০টি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ উপরে আমি যে ২৫টি বৈপরীত্য উল্লেখ করেছি সেগুলির মধ্য থেকে ৪র্থ, ৮ম, ১০ম, ১৫শ, ১৭শ, ১৮শ, ২২শ, ২৪শ এবং ২৫শ বৈপরীত্য লিক্লার্ক চিহ্নিত এই ৬০টি বৈপরীত্যের মধ্যে ধরা হয়নি। লিক্লার্কের উদ্দেশ্য হলো, যে সকল স্থানে হিব্রু ও শমরীয় তোরাহের মধ্য বড় ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে সে স্থানগুলি চিহ্নিত করা। আমি যে বৈপরীত্যগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলির মধ্য থেকে তিনি মাত্র ৪টি বৈপরীত্য তাঁর তালিকায় উল্লেখ করেছেন। আমার ২৬টি বৈপরীত্য ও তাঁর ৬০টি বৈপরীত্য থেকে উক্ত ৪টি বৈপরীত্য বাদ দিলে তোরাহ্-এর তিনটি সংস্করণের মধ্যে বৈপরীত্যের মোট ৮২টি প্রমাণ পাওয়া গেল। আমার মনে হয় এগুলিই যথেষ্ট।

পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের হিব্রু সংস্করণ ও গ্রীক অনুবাদের মধ্যে যেসব বৈপরীত্য রয়েছে তা আর উল্লেখ করতে চাচ্ছি না; কারণ তাতে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে জ্ঞানী পাঠকের কাছে একথা পরিষ্কার যে, বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোন তথ্যের সাথে কুরআনের কোন তথ্যের বৈপরীত্যের কারণে কুরআনের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ তাহলে পারস্পরিক বৈপরীত্যের কারণে বাইবেলের সকল পুস্তকের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের কোন বিধান রহিত করার কারণে কুরআনকে দোষ দেওয়া সম্ভব নয় এবং বাইবেলে নেই এমন তথ্য উল্লেখ করার কারণেও কুরআনের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে বাইবেলের বিপরীত বা বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক কোন তথ্য প্রদানও কুরআনের কোন দুর্বলতা নয়।

তৃতীয় বিভ্রান্তি : কুরআনের মধ্যে কয়েকটি আপত্তিকর বিষয় রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, কুরআন ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না। কুরআনে আছে : (১) সুপথপ্রাপ্তি ও বিভ্রান্ত হওয়া আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, (২) জান্নাতের মধ্যে নদনদী, প্রাসাদ ও হূর রয়েছে এবং (৩) কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক। এই তিনটি বিষয়ই ঘৃণিত ও আপত্তিকর, যেগুলি প্রমাণ করে যে, কুরআন ঈশ্বরের বাণী নয়।

এ বিষয়টিও খৃস্টান পাদরিদের প্রচারিত বিভ্রান্তিগুলির অন্যতম। ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত তাঁদের প্রায় সকল পুস্তিকাতেই এই বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ইসলামের বিরুদ্ধে এই বিষয়গুলি খুব বড় করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা এমন গোঁড়ামি ও উগ্রতা নির্ভর যা দেখে পাঠককে অবাক হতে হয়।

বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথম বিষয় : সুপথপ্রাপ্তি ও বিভ্রান্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন স্থানে ঠিক একই প্রকার কথা বলা হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ের জন্য যদি কুরআনের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করতে হয়, তবে তাঁদেরকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের পবিত্র বাইবেলও ঈশ্বরের বাণী নয়। আমি এখানে বাইবেল থেকে এ বিষয়ক কিছু আয়াত পাঠকের পর্যালোচনার জন্য উল্লেখ করছি :

যাত্রাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে রয়েছে : "আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যখন মিসরে ফিরিয়া যাইবে, দেখিও, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত কর্মের ভার দিয়াছি, ফরৌণের সাক্ষাতে সেই সকল করিও; কিন্তু আমি তাহার হৃদয় কঠিন করিব, সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে না।"

এরপর যাত্রাপুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে রয়েছে : "কিন্তু আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব এবং মিসর দেশে আমি বহুসংখ্যক চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব।"

যাত্রাপুস্তকের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাও; কেননা আমি তাহার ও তাহার দাসগণের হৃদয় কঠিন করিলাম, যেন আমি তাহাদের মধ্যে আমার এই সকল চিহ্ন প্রদর্শন করি, ... ২০ কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না। .... ২৭ কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না।"

যাত্রাপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে রয়েছে : "ফলে মোশি ও হারোণ ফরৌণের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম করিয়াছিলেন; আর সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয়

কঠিন করিলেন, আর তিনি আপন দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।"

বাইবেলের উপর্যুক্ত আয়াতগুলি থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং ঈশ্বরই ফরৌণ ও তার দাসগণের বা জনগণের বিভ্রান্তির জন্য দায়ী। তিনি নিজেই ফরৌণের ও তার দাসগণের হৃদয়কে কঠিন করেছিলেন মোশির অলৌকিক চিহ্নাবলি বৃদ্ধি করার জন্য।

দ্বিতীয় বিবরণের ২৯ অধ্যায়ের ৪ আয়াত নিম্নরূপ : "তথাচ সদাপ্রভু অদ্যাপি তোমাদিগকে জানিবার হৃদয়, দেখিবার চক্ষু ও শুনিবার কর্ণ দেন নাই।"

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ২০ আয়াত নিম্নরূপ : "আমি এই জাতির অন্তঃকরণ স্থূল করিব, ইহাদের কর্ণ ভারী করিব, ও ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দিব, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।"১৬৬

রোমীয় ১১ অধ্যায়ের ৮ আয়াত নিম্নরূপ : "যেমন লিখিত আছে, 'ঈশ্বর তাহাদিগকে জড়তার আত্মা দিয়াছেন; এমন চক্ষু দিয়াছেন, যাহা দেখিতে পায় না; এমন কর্ণ দিয়াছেন, যাহা শুনিতে পায় না, অদ্য পর্যন্ত।"

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "এই জন্য তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, কারণ যিশাইয় আবার বলিয়াছেন, 'তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।১৬৭

এভাবে তোরাহ-এর আয়াত, যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্য ও সুসমাচারের বক্তব্যগুলি থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষদের বিভ্রান্ত করেন। তিনিই ইস্রায়েল-সন্তানদের চক্ষু অন্ধ করেন, অন্তঃকরণ কঠিন করেন, কর্ণ ভারী করেন ; যেন তারা ফিরে না আসে এবং ঈশ্বরকেও তাদের সুস্থ করতে না হয়। আর এজন্যই তারা সত্যকে দেখতে পায় না, সত্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না এবং সত্যক শুনতেও পায় না। এর অর্থই হলো 'হৃদয় ও কর্ণ মোহরাঙ্কিত করা'।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৬৩ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি ১৬৭১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "হে সদাপ্রভু, তুমি কেন আমাদিগকে

১৬৬. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। যোহন তাঁর রচিত সুসমাচারে যিশাইয়র যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার সাথে এই অনুবাদের মিল রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত বাংলা ও ইংরেজি বাইবেলে এবং ১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ : "তুমি এই জাতির অন্তকরণ স্থূল কর, ইহাদের কর্ণ ভারী কর, ও ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, অন্তঃকরণে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে, ও সুস্থ হয়।" সম্ভবত যোহনের উদ্ধৃতি ও মূল পাঠের বৈপরীত্য দূর করার জন্য পূর্ববর্তী আরবী অনুবাদে এরূপ পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৬৭. রোমীয় ১২/৩৯-৪০।

তোমার পথ হইতে ভ্রান্ত করিয়া দিতেছ ?[১৬৮] তোমাকে ভয় না করিতে আমাদের অন্তকরণকে কেন কঠিন করিতেছে ? (Why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear?) তুমি আপন দাসদের, আপন অধিকারস্বরূপ বংশগণের জন্য ফির।"

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের ৭ আয়াতটি উপর্যুক্ত আরবী অনুবাদগুলিতে নিম্নরূপ : "কোন ভাববাদী যদি বিভ্রান্ত হয় এবং কিছু কথা বলে, তবে জানিও, আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে বিভ্রান্ত করিয়াছি (if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the LORD have deceived that prophet)। আমি তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।"[১৬৯]

এখানেও সুস্পষ্টতই যিশাইয় ভাববাদীর বাক্যে ঈশ্বরের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তুমি আমাদেরকে ভ্রান্ত করিতেছ এবং আমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিতেছ' এবং যিহিষ্কেল ভাববাদীর বক্তব্যে বলা হয়েছে : "আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে বিভ্রান্ত করিয়াছি।"

১ রাজাবলি ২২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৯ আর মীখায় কহিলেন, এই জন্য আপনি সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন; আমি দেখিলাম, সদাপ্রভু তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান। ২০ পরে সদাপ্রভু কহিলেন, আহাব যেন যাত্রা করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্য কে তাহাকে প্রবঞ্চনা[১৭০] (মুগ্ধ) করিবে ? তাহাতে কেহ এক প্রকারে, কেহ বা অন্য প্রকারে কহিল। ২১ শেষে এক আত্মা (spirit) গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা (মুগ্ধ) করিব। ২২ সদাপ্রভু কহিলেন, কিসে ? সে কহিল, আমি গিয়া তাহার সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হইব (I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets)। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে প্রবঞ্চনা (মুগ্ধ) করিবে, কৃতকার্যও হইবে; যাও, সেইরূপ কর। ২৩

---

১৬৮. বাংলা বাইবেল : পথ ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইতে দিতেছ।

১৬৯. প্রচলিত বাংলা বাইবেলের অনুবাদ : "কোন ভাববাদী যদি প্ররোচিত হইয়া কথা কহে, তবে জানিও, আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে প্ররোচনা করিয়াছি।"

১৭০. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী অনুবাদে এখানে ও পরবর্তী স্থানে يخدع বলা হয়েছে, যার অর্থ প্রবঞ্চনা করা বা ধোঁকা দেওয়া। ১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে يغوى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ বিভ্রান্ত করা। আর ইংরেজি অথোরাইজড ভার্সনে persuade এবং রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে entice শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের অর্থই প্ররোচিত করা বা বুঝিয়ে রাজি করানো। বাংলা বাইবেলে "মুগ্ধ করিবে" বলা হয়েছে।

অতএব দেখুন, সদাপ্রভু আপনার এই সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়াছেন (the Lord hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets); আর সদাপ্রভু আপনার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।"

এই বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর নিজের সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর নিকট প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা প্রদানের জন্য পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক সেভাবেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের পার্লামেন্ট বসে। সেখানে স্বর্গের সৈন্যসামন্ত সকলে উপস্থিত হন। সলা-পরামর্শের পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যার আত্মাকে প্রেরণ করেন। তারা ভাববাদীদের মুখে বসে ভাববাদীদেরকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে।

বিজ্ঞ পাঠক, এবার চিন্তা করুন! স্বয়ং ঈশ্বর এবং স্বর্গের বাহিনী যদি মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চান, তবে অসহায় দুর্বল সেই মানুষ কিভাবে মুক্তি লাভ করবে?

এখানে আরো একটি অদ্ভুৎ বিষয় রয়েছে। স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গের বাহিনীর সাথে সলা-পরামর্শ করছেন এবং পরামর্শের পরে আহাবকে প্রবঞ্চনা করার জন্য মিথ্যার আত্মাকে প্রেরণ করছেন। আর সেই ঈশ্বরের এক ভাববাদী মীখা কিভাবে ঈশ্বরের সেই গোপন পরামর্শ সভার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিচ্ছেন এবং আহাবকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ২ অধ্যায়ে রয়েছে: "১১ আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; ১২ যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"

মথিলিখিত সুসমাচারের একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে, যে সকল নগর মন ফিরায় নাই সে সকল নগরের অধিবাসীদের ভর্ৎসনা করার পরে যীশু খৃস্ট বলেন: "হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের নিকট হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ; হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।"[১৭১]

এখানে খৃস্ট স্পষ্টত বলছেন যে, ঈশ্বরই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান মানুষদের থেকে সত্যকে গুপ্ত রেখেছেন এবং শিশুদের নিকট তা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের এই কর্মের জন্য তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। এভাবে ঈশ্বরের এই সত্য গোপনের কর্মে তাঁর নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন।

---

১৭১. মথি ১১/২৫-২৬।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ের ৭ আয়াতের অনুবাদে ১৬৭১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী সংস্করণে রয়েছে : "আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্তা।"

১৮৩৮ সালে প্রকাশিত ফার্সী অনুবাদেও একইভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ভাল-মন্দ, কল্যাণ ও অনিষ্ট সবকিছুরই স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর।

যিরমিয়ের বিলাপের ৩ অধ্যায়ের ৩৮ আয়াতে রয়েছে : "পরাৎপরের (মহাপ্রভু : the most High) মুখ হইতে কি বিপদ ও সম্পদ (evil and good) দুই বাহির হয় না ?"

১৮৩৮ সালের ফার্সী অনুবাদে 'বিপদ ও সম্পদ' স্থলে 'কল্যাণ ও অকল্যাণ' বলা হয়েছে। এখানেও প্রশ্নাকারে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়।

উপর্যুক্ত সকল অনুবাদেই মীখা ভাববাদীর পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা যিরূশালেমের দ্বার পর্যন্ত সদাপ্রভু হইতে অমঙ্গল উপস্থিত (evil came down from the Lord unto the gate of Jerusalem)।"

এ আয়াত থেকেও স্পষ্ট যে, অমঙ্গল ও অকল্যাণ আল্লাহর সৃষ্টি।

রোমীয় ৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৯ কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত জন। ৩০ আর তিনি যাহাদিগকে পূর্বে নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন.. (For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. 30 Moreover whom he did predestinate, them he also called...)

রোমীয় ৯ অধ্যায়ে ইসহাকের দুই যমজ পুত্র যাকোব ও এষৌ-এর জন্মের পূর্বেই তাঁদের ভাগ্যনির্ধারণের বিষয়ে বলা হয়েছে " "যখন সন্তানেরা (যাকোব ও এষৌ) ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল-মন্দ কিছুই করে নাই, তখন ঈশ্বরের নির্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, ১২ 'জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে' ১৩ যেমন লিখিত আছে, 'আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি'। ১৪ তবে আমরা কি বলিব ? ঈশ্বরের কি অন্যায় আছে ? তাহা দূরে থাকুক। ১৫ কারণ তিনি মোশিকে বলেন, 'আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব।' ১৬ অতএব যে ইচ্ছা করে, বা যে দৌড়ে, তাহা হইতে

Contents

এটি হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইতে হয়। ১৭ কেননা শাস্ত্র ফরৌণকে বলে, 'আমি এই জন্যই তোমাকে পাঠাইয়াছি (উঠাইয়াছি), যেন তোমাকে আমার পরাক্রম দেখাই, আর যেন সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্তিত হয়।' ১৮ অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন। ১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি আবার দোষ ধরেন কেন ? কারণ তাহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করে ? ২০ হে মনুষ্য, বরং, তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ ? নির্মিত বস্তু কি নির্মাতাকে বলিতে পারে, আমাকে এইরূপ কেন গড়িলে ? ২১ কিংবা কাদার উপরে কুম্ভকারের কি এমন অধিকার নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে একটি সমাদরের পাত্র, আর একটি অনাদরের পাত্র গড়িতে পারে ?"

ভাগ্য যে পূর্ব নির্ধারিত এবং সুপথপ্রাপ্তি এবং বিভ্রান্ত হওয়া সবই যে ঈশ্বরের পক্ষ থেকেই হয় তা প্রমাণ করতে খৃস্টধর্মের পবিত্রপুরুষ মহামতি পৌলের এই বক্তব্যই যথেষ্ট।

যিশাইয় ভাববাদী তাঁর পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে সুন্দর কথাই বলেছেন: "ধিক্ তাহাকে, যে আপন নির্মাতার সহিত বিবাদ করে; সে ত মাটির খোলার মধ্যবর্তী খোলা মাত্র। মৃত্রিকা কি কুম্ভকারকে বলিবে, 'তুমি কি নির্মাণ করিতেছ ?' তোমার রচিত বস্তু কি বলিবে, 'উহার হস্ত নাই ?'

সম্ভবত বাইবেলের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর ভিত্তিতেই প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মহান নেতা মি. লুথার মত প্রকাশ করেন যে, মানুষের ন্যায়-অন্যায় কর্মের মূল্য নেই। মানুষ যা কিছু করে তা সবই সে করতে বাধ্য বলেই করে। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে তাঁর এই মত প্রকাশ পেয়েছে। ক্যাথলিক হেরাল্ড পুস্তকের ২৭৭ পৃষ্ঠায় এই মহান নেতার বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে তাঁর দুটি বক্তব্য উল্লেখ করছি :

(১) "মানুষের প্রকৃতি হলো অশ্বের মত। যদি ঈশ্বর তাতে আরোহণ করেন তবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলে। আর যদি দিয়াবল তাতে আরোহণ করে তবে দিয়াবল যেভাবে চলে সেভাবেই সে চলে। আর মানুষ নিজের ইচ্ছায় আরোহী বাছাই করতে পারে না বরং আরোহীরাই তার পিঠে আরোহণের জন্য চেষ্টা করে। যে পারে সেই তার উপর আরোহণ করে এবং তাকে তার অধীন বানিয়ে ফেলে।"

(২) "যদি পবিত্র বাইবেলের পুস্তকাদিতে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় যে, তোমরা অমুক কর্ম কর, তাহলে তোমরা বুঝবে যে, এ সকল পবিত্র পুস্তকে তোমাদেরকে সেই কর্ম করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ সে কর্ম করার ক্ষমতাই তোমাদের নেই।"

লুথারের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের স্বাধীন কর্ম করার ক্ষমতা নেই বরং যা কিছু সে করে তা বাধ্য হয়েই করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

ক্যাথলিক পণ্ডিত পাদরি টমাস এঙ্গেলস ১৮৫১ সালে মুদ্রিত তাঁর 'মিরআতুস সিদ্‌ক' বা সত্যের দর্পণ নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নিন্দায় লিখেছেন :

"এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রচারকগণ নিম্নলিখিত ঘৃণ্য কথাগুলো প্রচার করতেন :

প্রথমত, ঈশ্বরই অবাধ্যতার উদ্ভাবক ও স্রষ্টা।

দ্বিতীয়ত, পাপ বর্জনের কোন ক্ষমতাই মানুষের নেই।

তৃতীয়ত, দশ আজ্ঞা অনুসারে কর্ম করা মোটেও সম্ভব নয়।

চতুর্থত, ভয়ঙ্কর পাপসমূহ, সেগুলো যত বড় ভয়ঙ্করই হোক না কেন, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার কারণে মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ছোট হয় না।

পঞ্চমত, শুধু বিশ্বাসই মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আমাদেরকে শুধু বিশ্বাসের জন্যই হিসাব নেওয়া হবে। এই শিক্ষাটি অবশ্যই অধিকতর কল্যাণকর। এই শিক্ষা প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

ষষ্ঠত, সংস্কার আন্দোলনের পিতা মি. লুথার বলেছেন : "তোমরা শুধু বিশ্বাস কর। আর সুনিশ্চিতরূপে জেনে রাখ যে, এতেই তোমাদের মুক্তি লাভ হবে। মুক্তির জন্য কোন উপবাসের কষ্ট করতে হবে না, সৎ থাকার কষ্ট করতে হবে না, পাপের স্বীকারোক্তির কষ্ট করতে হবে না, কোনরূপ সৎকর্ম পালনের কষ্ট করতে হবে না। খৃস্টের জন্য যেমন সুনিশ্চিত মুক্তি, তোমাদের জন্যও ঠিক তেমনি সুনিশ্চিত মুক্তি, যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তোমরা পাপ কর। পরিপূর্ণ সাহসিকতার সাথে পাপ করতে থাক এবং শুধু বিশ্বাস কর। শুধু বিশ্বাসই তোমাদেরকে মুক্তি প্রদান করবে, যদিও তোমরা প্রতিদিন এক হাজার বার ব্যভিচার বা হত্যার মত পাপে লিপ্ত হও। তোমরা শুধু বিশ্বাস কর। আমি তোমাদেরকে বলছি, শুধু বিশ্বাসই তোমাদেরকে মুক্তি দিবে।"

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, "সুপথপ্রাপ্তি ও বিভ্রান্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার" কথা কুরআনে উল্লেখ থাকাকে আপত্তিকর বলার বিন্দুমাত্র অধিকার প্রটেস্ট্যান্ট[172] প্রচারকদের নেই। কারণ কুরআনের যে কথা তাঁরা 'আপত্তিকর' বা 'খারাপ' বলে দাবি করছেন সে কথা তাদের পবিত্র বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া তাঁদের ধর্মগুরুগণও এ কথাই বলেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্‌ই কল্যাণ ও অকল্যাণের স্রষ্টা। কিন্তু এর দ্বারা ঈশ্বরের অমর্যাদা করা হয় নি বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করা হয় নি। খারাপ সৃষ্টি করার অর্থ খারাপ হওয়া নয়। যেমন সাদা বা কালো ইত্যাদির সৃষ্টি করার অর্থ সাদা বা কালো হওয়া নয়।

১৭২. আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, গ্রন্থকারের যুগে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ খৃস্টধর্ম প্রচারে ও ইসলাম বিরোধী লিখনিতে অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁদের সাথেই মূলত গ্রন্থকারের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য গ্রন্থকার বিশেষভাবে তাঁদের বিভ্রান্তিগুলো উল্লেখ করেন।

ইহূদী-খৃস্টান সকলের মতেই ঈশ্বর দিয়াবলকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর অনাদি-অনন্ত জ্ঞানে জানতেন যে, দিয়াবলই সকল খারাপ, অকল্যাণ, অশান্তি ও অমঙ্গলের মূল উৎস। তিনি জানতেন যে, দিয়াবল অমুক, অমুক কর্ম করবে। তবুও যে কারণে তিনি দিয়াবলকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সে কারণেই তিনি খারাপ সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ কারণেই তিনি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ ও লোভ সৃষ্টি করেছেন, যদিও তিনি তার অনাদি-অনন্ত জ্ঞানে জানতেন যে, এই আকর্ষণ ও লোভের কারণে মানুষ কি কি কাজ করবে। ঈশ্বরের ক্ষমতা ছিল যে, তিনি দিয়াবলকে সৃষ্টি করবেন না, অথবা মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ তাকে দেবেন না এবং তাকে খারাপ কিছু করার ক্ষমতা দেবেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুযোগ ও ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁর এই কাজ নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময় এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ও কারণেই তিনি তা করেছেন। একইভাবে তিনি ইচ্ছা করলে খারাপ সৃষ্টি না করতে পারতেন। কিন্তু তবুও তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : জান্নাতের মধ্যে নদনদী, প্রাসাদ ও হূর থাকা

জান্নাতের মধ্যে হূর, প্রাসাদ ও অন্যান্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক বিষয় থাকা জ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিতে কোন আপত্তিকর বিষয় নয়। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ অজ্ঞতাবশত অথবা জ্ঞাতসারে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলে থাকেন যে, মুসলিম বিশ্বাসে জান্নাতের একমাত্র আনন্দই হলো দেহ নিয়ে ফুর্তি করা। মুসলিমগণ কখনোই বলেন না যে, দৈহিক আনন্দ ও তৃপ্তিই জান্নাতের একমাত্র আনন্দ;[১৭৩] বরং

১৭৩. খৃস্টানগণ শুরু থেকেই মানবীয় প্রকৃতির বিষয়ে বিকৃত ও একপেশে ধারণা পোষণ করেছেন। আত্মাকে স্বীকার করতে যেয়ে দেহকে অস্বীকার করেছেন। মানুষের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিকাশ ও পরিতৃপ্তির পূর্ণতার ধারণায় মানুষের দৈহিক পরিতৃপ্তিকে অস্বীকার করেছেন। এজন্যই তারা বিবাহ, সংসার ইত্যাদিকে ঘৃণা করতেন। স্বয়ং যীশুই বিবাহের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। বিবাহকে অনন্ত জীবনের পথে অন্তরায় বলে উল্লেখ করেছেন। বিবাহের নিন্দা করে তিনি বলেন : "এই জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবাহিতা হয়। কিন্তু যাহারা সেই জগতের এবং মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহ করে না এবং বিবাহিতাও হয় না। তাহারা আর মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের সমতুল্য, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান (লূক ২০/৩৪-৩৬)। এ ধারণার জঘন্য পরিণতি সম্পর্কে আমরা জানি। পারলৌকিক জীবন সম্পর্কেও তাঁরা একই রূপ একপেশে ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ দৈহিক ও আত্মিকভাবে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু তার পরেও তাঁরা দাবি করেন যে, স্বর্গীয় আনন্দ হবে শুধু আত্মিক। সেখানে দৈহিক বা জৈবিক আনন্দের কোন স্থান থাকবে না। পক্ষান্তরে ইসলামী বিশ্বাসে মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বিত সৃষ্টি। আত্মাই মূল। কিন্তু দেহকে বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তি কল্পনা করার অর্থ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং অসম্ভব-অবাস্তব কিছু কথা কল্পনা করা। এজন্যই বিবাহ, সংসার, খাওয়া-দাওয়া ও বৈধ বিনোদনের সাথে সাথে আত্মিক অনুশীলন ও ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। অনুরূপভাবে পারলৌকিক পুনরুত্থান যেহেতু দৈহিক ও আত্মিক হবে, সেহেতু জান্নাতেও পানাহার, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি দৈহিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তি আল্লাহর সান্নিধ্যের মহান আত্মিক পরিতৃপ্তির প্রেক্ষাপট হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতে দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বিদ্যমান থাকবে। আত্মিক পরিতৃপ্তিই মূল ও প্রধান। তবে মু'মিনদের জন্য উভয় প্রকারের আনন্দই বিদ্যমান থাকবে।

সূরা তাওবায় মহিমাময় আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই মহা-সাফল্য।"[১৭৪]

এখানে স্পষ্টই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ জান্নাত, নদী ও ঝর্ণা, উত্তম বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুর উর্ধ্বে ও সবচেয়ে বড় পুরস্কার আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এ থেকে বুঝা যায় যে, যদিও জান্নাতে দৈহিক পুরস্কার, পরিতৃপ্তি ও আনন্দ প্রদান করা হবে, তবে জান্নাতের সর্বোচ্চ পুরস্কার হবে আত্মিক।

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে দুই প্রকার প্রকৃতি রয়েছে : আত্মিক ও দৈহিক। মানুষ যখন দৈহিক আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও কল্যাণ লাভ করে এবং এর সাথে সর্বোচ্চ আত্মিক আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও কল্যাণ সম্মিলিত ও সংযোজিত হয়, তখনই তার পুরস্কার ও সফলতা পূর্ণতা লাভ করে। এই পর্যায়েই আত্মা তার যোগ্যতম ও পূর্ণতম আনন্দ লাভ করে। দেহ আত্মার পূর্ণতম ও যথাযোগ্য সফলতা লাভের বাহন মাত্র। আর এটিই মহা-সাফল্য।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ হয়ত বলতে পারেন যে, জান্নাতে এভাবে দৈহিক ও আত্মিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তির সমন্বয় ঘটায় বিষয়টি আমাদের জ্ঞান-বিবেক অনুসারে অশোভনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করব যে, আপনাদের এজন্য অস্থির বা ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ, আপনারা এরূপ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করবেন না।

প্রথম অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ যে বাণী বা বাক্য প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন, তাই শুধু আমাদের বিশ্বাসে 'ইনজীল' বলে গণ্য, ঈসা মাসীহের নিজের ব্যাখ্যা ইনজীল বলে গণ্য নয়। আমরা জানি যে, প্রচলিত ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলোতে যীশু খৃস্টের যে সকল বাক্য বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই, বরং দু'একজন মানুষের দ্বারা তা প্রচারিত ও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই খৃস্টের বাণী হিসেবে এগুলোর আদৌ কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সর্বোপরি এগুলো পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির তথ্যের বিপরীত। খৃস্টান পাদরিদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তির আলোচনায় পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

---

১৭৪. সূরা : ৯ তাওবা, ৭১ আয়াত।

এমতাবস্থায় যদি প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে উদ্ধৃত খৃস্টের বাক্যগুলোকে সঠিক ধরা হয় এবং এ সকল বাক্যের কোনটি এ বিষয়ে কুরআনের বিপরীত হয়, তবে তা কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা বা সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে না, বরং এক্ষেত্রে কুরআন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বিপরীতে খৃস্টের নিজস্ব বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেই হবে।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসিগণ 'ঈশ্বরের দূত' বা ফিরিশতাদের মতই হবেন। আর খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ফিরিশতাগণ পানাহার জাতীয় দৈহিক কাজকর্মের ঊর্ধ্বে নন। আদিপুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের তিন জন দূত এলোন বনের নিকট অবরাহামের দর্শন দেন। অব্রাহাম তাঁদেরকে বিশ্রাম ও পানাহারের জন্য অনুরোধ করেন। এরপর তিন মণ উত্তম ময়দার পিঠা প্রস্তুত করলেন এবং কোমল এক গোবৎস জবাই করে তা পাক করেন। অতঃপর 'তিনি দধি, দুগ্ধ ও পক্ক মাংস নিয়ে উক্ত তিন জন দূত বা ফিরিশতার সম্মুখে দিলেন, এবং তাঁদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়ালেন, ও তাঁরা ভোজন করলেন।'[১৭৫]

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে রয়েছে যে, দুই জন ফিরিশতা বা ঈশ্বরের দূত সদোমে লোটের নিকট আগমন করেন। লোট অতিশয় আগ্রহে তাঁদেরকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং "তাঁদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলেন, ও তাড়ীশুন্য রুটি পাক করলেন, আর তাঁরা ভোজন করলেন।"[১৭৬]

অদ্ভুৎ ও অবাক বিষয় যে, খৃস্টানগণ দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন, অথচ স্বর্গে দৈহিক আনন্দলাভে বিশ্বাস করেন না। পুনরুত্থান যদি দৈহিক হয় তবে স্বর্গে দৈহিক পরিতৃপ্তি লাভ অসম্ভব হয় কিভাবে ?

আরবের মুশরিক-পৌত্তলিকগণ পুনরুত্থানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো। খৃস্টানগণ যদি এভাবে পুনরুত্থান অস্বীকার করতেন অথবা দৈহিক পুনরুত্থান অস্বীকার করে শুধু আত্মিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন, তাহলে হয়ত তাঁদের বক্তব্যের একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে,' পরকালে মানুষ দেহ নিয়েই পুনরুত্থিত হবে, আবার তাঁরাই দাবি করেন যে, স্বর্গে দেহের চাহিদা মেটানোর কোনই ব্যবস্থা থাকবে না!

এর চেয়েও অদ্ভুত বিষয় আছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর দেহ গ্রহণ করে যীশুখৃস্টরূপে ধরায় আগমন করেন। সেই ঈশ্বরও দেহ ধারণ করার পরে পানাহার ও সকল দৈহিক কর্ম করতে বাধ্য ছিলেন, কিছুই বাদ দিতে পারেন নি। তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে মানুষের দেহ ধারণ করার কারণে স্বয়ং ঈশ্বর এগুলো করতে

১৭৫. আদিপুস্তক, ১৮/৬-৮।

১৭৬. আদিপুস্তক, ১৯/৩।

বাধ্য ছিলেন! যীশুখৃস্ট শুধু পানাহার করতেন তাই নয়। যোহন বাপ্তাইজক যেমন পানাহারে খুবই সংযমী ছিলেন, যীশু তেমন সংযমী ছিলেন না। এজন্য সমাজের লোকেরা যীশুর নিন্দা করে তাঁকে পেটুক ও মদ্যপায়ী বলত। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে তা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৭]

আমাদের মতে যীশুকে পেটুক ও মদ্যপ বলে অভিযুক্ত করা ভিত্তিহীন। তবে খৃস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে আমরা বলব যে, নিঃসন্দেহে মানবীয় দেহের দিক থেকে যীশু খৃস্ট একজন মানুষ ছিলেন। আর সে জন্যই দেহের চাহিদা অনুসারে মজাদার তৃপ্তিদায়ক খাদ্য গ্রহণ এবং মদ পানের কারণে তাঁর আত্মিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তির কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নি। এই জগতে থেকেও তিনি পরিপূর্ণ আত্মিক আনন্দ লাভ করেছেন, বরং আত্মিক পরিতৃপ্তিই তাঁর মধ্যে প্রধান ছিল। অনুরূপভাবে স্বর্গে বা ঈশ্বরের রাজ্যেও দৈহিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তির কারণে স্বর্গবাসীদের আত্মিক আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে কোন ব্যাঘাত হবে না। বিশেষত তারা তো জাগতিক ব্যস্ততার বাইরে পরজগতে থাকবেন।

তৃতীয় বিষয় : কুরআনে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ থাকা

খৃস্টান পাদরিগণের তৃতীয় বিভ্রান্তির তৃতীয় বিষয় কুরআনে জিহাদের নির্দেশ থাকা। ইনশা আল্লাহ, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে করব। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাঁরা যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন জিহাদ সেগুলোর অন্যতম। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসসমূহের আলোচনার মধ্যে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

পাদরি মহোদয়দের চতুর্থ বিভ্রান্তি : আত্মা যা চায় এবং যার আকাঙ্খা করে তা কুরআনের মধ্যে নেই।

বিভ্রান্তির অপনোদন

আত্মা চায় ও কামনা করে দু'টি বিষয় : বিশুদ্ধ বিশ্বাস বা পরিপূর্ণ আস্থা এবং সৎকর্ম। এ দুটি বিষয় কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চভাবে বিদ্যমান। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় পাঠক তা জেনেছেন। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ হয়ত দাবি করবেন যে, অমুক বিষয়টি আমাদের আত্মা কামনা করে অথচ তা কুরআনে নেই, অথবা অমুক বিষয়টি আত্মার কামনার বিপরীত, অথচ তা কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু তাঁদের এই দাবিতে কুরআনের দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। যেমন ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এরূপ অনেক দাবি করেন, কিন্তু সেগুলির কারণে কুরআন বা বাইবেলের অপূর্ণতা প্রমাণিত হয় না। আমি অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বলতে শুনেছি যে,

১৭৭. মথি ১১/১৮-১৯।

মানুষের ভক্ষণের জন্য ও পরিতৃপ্তি লাভের জন্য প্রাণী বধ করা আত্মার কামনার পরিপন্থি এবং জ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণ্য কাজ। ঈশ্বর এরূপ কাজে অনুমতি দেবেন তা কখনোই চিন্তা করা যায় না। কাজেই যে পুস্তকে এরূপ কাজের অনুমতি রয়েছে সে পুস্তক কখনোই ঐশ্বরিক পুস্তক বা ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে না।

পাদরিগণের পঞ্চম বিভ্রান্তি : তাঁরা দাবি করেন যে, কুরআনের মধ্যে অর্থগত বৈপরীত্য বিদ্যমান। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : "দীন সম্পর্কে জবরদস্তি নেই।"[১৭৮] সূরা গাশিয়ায় বলা হয়েছে : "অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও"[১৭৯], সূরা নূরে বলা হয়েছে, " বল, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া।"[১৮০]

আবার এ সকল আয়াতের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ রয়েছে জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলিতে।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যীশুখৃষ্ট একজন মানুষ ও ভাববাদী মাত্র। কিন্তু দুই স্থানে এর বিপরীত বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষ ছিলেন না, বরং তাঁর মর্যাদা ছিল মানবত্বের ঊর্ধ্বে। প্রথম স্থানে সূরা নিসায় বলা হয়েছে : "মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর আত্মা (আদেশ)।"[১৮১]

দ্বিতীয়স্থানে সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে : "এবং ইমরান-তনয় মরিয়মের (দৃষ্টান্ত), যে তারা সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।"[১৮২]

কুরআনের মধ্যে অর্থগত বৈপরীত্যের বিষয়ে খৃস্টান পাদরিগণ যে সকল দাবি করেন, এ দুটি বিষয়ই সেগুলির অন্যতম। এ কারণেই মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা (ড. ফানডার) তাঁর গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে (কুরআনের বৈপরীত্য আলোচনায়) শুধু এই বিষয় দুটিই উল্লেখ করেছেন।

---

১৭৮. সূরা বাকারা : ২৫৬ আয়াত।

১৭৯. সূরা গাশিয়া, ২১-২২।

১৮০. সূরা নূর, ৫৪ আয়াত।

১৮১. সূরা নিসা ; ১৭১ আয়াত।

১৮২. সূরা তাহরীম : ১২ আয়াত।

বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথমত, ইসলাম গ্রহণের স্বাধীনতা বিষয়ক আয়াতগুলির সাথে জিহাদ বিষয়ক আয়াতগুলির কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। ইসলামের প্রথম পর্যায়ে শুধু দাওয়াত ও প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। জিহাদের বিধানের মাধমে দাওয়াতের আয়াতগুলির বিধান আংশিক পরিবর্তন বা 'নসখ' করা হয়। আর 'নসখ' বা রহিতকরণ কখনোই অর্থগত বৈপরীত্য নয়। যদি রহিতকরণকে অর্থগত বৈপরীত্য ধরা হয় তবে বাইবেলের বৈপরীত্য আরো বাড়বে। সেক্ষেত্রে খৃস্টান পাদরিগণকে স্বীকার করতে হবে যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যে সকল বিধান নতুন নিয়মে রহিত করা হয়েছে সেগুলি সবই অর্থগত বৈপরীত্য। অনুরূপভাবে পুরাতন নিয়মের মধ্যেও অনেক বিধান নতুন নিয়মে রহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নতুন নিয়মের অনেক বিধান নতুন নিয়মেই রহিত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা বিস্তারিত জেনেছেন, যে বিষয়ে আর কিছু বলার অবকাশ নেই। কাজেই রহিতকরণকে বৈপরীত্য বলে দাবি করলে এগুলিকে বৈপরীত্য বলে পাদরিগণকে স্বীকার করতে হবে।

সর্বোপরি, 'ধর্মে কোনো জরবদস্তি নেই' বিধানটি রহিত নয়, বরং তা বলবত রয়েছে।[১৮৩]

---

১৮৩. ধর্মগ্রহণের স্বাধীনতা বা ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে জিহাদের বা যুদ্ধের আয়াতগুলির বৈপরীত্য কল্পনা ভিত্তিহীন। কারণ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে জিহাদ একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়। কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করতে বা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে জিহাদ বাধ্যতামূলক করা হয় নি বরং মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিহাদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। আমেরিকা ও ইসরাঈলের ধর্মপ্রাণ ইহুদী ও খৃস্টানগণ ফিলিস্তীন, ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপরে জোর করে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। তারা কখনোই স্বীকার করবে না যে, তাদের এই যুদ্ধ ধর্মীয় স্বাধীনতার বিপরীত। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই তার স্বাধীনতা, সাবভৌমত্ব, নিরাপত্তা, নাগরিকদের নিরাপত্তা ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। কাজেই যুদ্ধের বিধান সকল ধর্ম ও সভ্যতাতেই রয়েছে। ইসলামে যুদ্ধকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানবিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যেখানে বাইবেলে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরে পরাজিত বিজিত দেশের নাগরিকদের নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ঢালাওভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, (দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৩-১৬) সেখানে ইসলামে শুধু যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রধারী যোদ্ধা পুরুষ ছাড়া কাউকে হত্যা করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে অবস্থানরত নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পাদরি, সন্যাসী ও অসুস্থ মানুষদেরকে হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত, ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই জিহাদ করা হয়েছে। জিহাদের বিধানের আগে ও পরে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এবং তাঁর পরে তাঁর মহান খলীফাগণ কেউই কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করেন নি বা কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করেন নি। খৃস্টান দেশগুলিতে ইহুদীগণ অত্যন্ত অত্যাচারিত ছিল। মুসলিম বিজয়ের পরে তারা এবং তাদের সাথে একইভাবে খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন ও ভোগ করেছে।

দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থের ভূমিকার ৭ম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, যীশুখৃস্ট সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যের যে বৈপরীত্যের কথা পাদরিগণ দাবি করেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। সেখানে পাঠক দেখেছেন যে, এই দুই আয়াতে যীশুখৃস্টের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাতে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, যীশু মানুষ ছিলেন না বা মানবীয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে কিছু ছিলেন। এরূপ কিছু বুঝা একান্তই বিভ্রান্তি ও বাতুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।

সবচেয়ে অবাক বিষয় হলো, এ সকল জ্ঞানী পণ্ডিত তাঁদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান হাজার হাজার ব্যাখ্যাতীত সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি দেখতে পান না, অথচ কুরআনের মধ্যে বৈপরীত্য খুঁজে বেড়ান! পাঠক ইতোপূর্বে এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত অর্থগত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির কিছু নমুনা দেখেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সংরক্ষিত বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থাবলিতে সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতার প্রমাণ

এই অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইহূদী-খৃস্টধর্মে মৌখিক বর্ণনা নির্ভরতা

অতীতকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল যুগে প্রায় সকল ইহূদী ও খৃস্টান লিখিত ধর্মগ্রন্থের (বাইবেলের) মতই অলিখিত মৌখিক বর্ণনার (tradition) উপর নির্ভর করেছেন। উপরন্তু ইহূদীরা লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেলের চেয়েও অধিকতর নির্ভর করে অলিখিত মৌখিক বর্ণনার উপর। ক্যাথলিক খৃস্টানগণ লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেল ও অলিখিত মৌখিক বর্ণনা উভয়কেই সমান গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বর্ণনাই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভর করতে হবে। ইহূদীদের মধ্যে সাদূকী সম্প্রদায় (Sadducees) অলিখিত মৌখিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করত। ইহূদী সম্প্রদায়ের সাদূকীদের মত খৃস্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান অলিখিত মৌখিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করেন। প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের জন্য তা অস্বীকার না করে কোন উপায় ছিল না। কারণ মৌখিক বর্ণনা অস্বীকার না করলে তারা তাদের নতুন ধর্মমত বা ক্যাথলিক ধর্মমতের বিভ্রান্তি প্রমাণ করতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রটেস্ট্যান্টগণ তাদের ধর্মমত প্রমাণ করতে বিভিন্ন স্থানে মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই এরূপ মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করার নির্দেশনা রয়েছে। ইনশা আল্লাহ্, পরবর্তী আলোচনা থেকে পাঠক এ বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আদম ক্লার্ক ১৮৫১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইয্রার পুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেছেন :

"ইহূদীদের ধর্মীয় বিধান বা শরীয়ত (Law) দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ লিখিত শরীয়ত (scriptural laws) যাকে তারা তোরাহ বলত এবং দ্বিতীয় ভাগ মৌখিক শরীয়ত (oral laws), যেগুলো ধর্মগুরু ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের (elders) মাধ্যমে যুগ-পরম্পরায় তাদের নিকট পৌঁছেছে। তারা দাবি করেন যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর

মোশিকে সিনাই পর্বতে এই দুই প্রকার বিধানই প্রদান করেন। আমাদের নিকট এক প্রকারের বিধান লিখিতভাবে পৌঁছেছে এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিধান ধর্মগুরুদের মাধ্যমে মৌখিকভাবে পৌঁছেছে। এজন্য তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বিধানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, উভয়ই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এবং উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। বরং তারা দ্বিতীয় প্রকার বিধান বা অলিখিত মৌখিকভাবে বর্ণিত বিধানকেই অধিকতর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তারা বলেন, লিখিত বিধান (scriptural laws) অনেক স্থানেই অসম্পূর্ণ ও অবোধগম্য। কাজেই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর না করে কেবল লিখিত বিধান পরিপূর্ণভাবে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না। মৌখিক বর্ণনাগুলো সুস্পষ্ট ও পূর্ণতর। সেগুলো লিখিত বিধানের ব্যাখ্যা করে এবং পূর্ণতা প্রদান করে। এ কারণে লিখিত বিধানের কোন অর্থ মৌখিক বিধানের বিপরীত হলে ইহূদীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

"ইহূদীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যে, ইহূদীদের থেকে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তা লিখিত বিধান পালনের জন্য নয়, বরং এ সকল মৌখিক লোকমুখে প্রচারিত বিধিবিধানের জন্য। এভাবে তারা প্রকৃতপক্ষে লিখিত বিধান বা তোরাহকে বাতিল বলে পরিত্যাগ করেন এবং অলিখিত বা মৌখিকভাবে প্রচলিত বিধানগুলোকেই তাদের ধর্মের ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন, যেভাবে রোমান ক্যাথলিকগণ লিখিত ধর্মগ্রন্থ বাদ দিয়ে মৌখিক বর্ণনা ও জনশ্রুতিকেই তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ সকল মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই ইহূদীগণ ঈশ্বরের বাণীর ব্যাখ্যা করেন, যদিও অনেক স্থানেই এ সকল মৌখিক বর্ণনার অর্থ লিখিত বক্তব্যের বিরোধী। যীশু খৃস্টের সময়ে এ বিষয়ে তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তিনি তাদেরকে এভাবে প্রচলন বা মৌখিক বর্ণনার কারণে ঈশ্বরের বাণী বাতিল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। যীশুর যুগের পরে তারা মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন, এমনকি তারা এ বিষয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন এবং মৌখিক বর্ণনাকে লিখিত বিধানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করতে থাকেন।

"ইহূদীদের গ্রন্থাবলিতে তারা উল্লেখ করেন যে, ধর্মগুরুগণের বা আলিমগণের বাণী তোরাহ্-এর বাণীর চেয়েও বেশি প্রিয়। তোরাহ্-এর বাণী কোনটি সুন্দর ও কোনটি অসুন্দর। আর পণ্ডিতগণ বা ধর্মগুরুদের বাণী সবই সুন্দর। ধর্মগুরুগণের বাণী ভাববাদিগণের বাণীর চেয়েও সুন্দরতর। তারা পণ্ডিতগণের বা ধর্মগুরুগণের বাণী বলতে এ সকল মৌখিক বর্ণনা বুঝান, যেগুলো ধর্মগুরু বা পণ্ডিতগণের মাধ্যমে তাদের নিকট পৌঁছেছে।

"তাদের পুস্তকাদিতে আরো রয়েছে যে, লিখিত বিধান (scriptural laws) বা তোরাহ পানির মত। আর এ সকল মৌখিক বর্ণনার সংকলিত রূপ মিশনা

(Mishna) ও তালমুদ (Talmud) উপাদেয় মশলা মিশ্রিত মদের মত। তাদের গ্রন্থাবলিতে আরো আছে, লিখিত বিধান বা তোরাহ লবণের মত, আর মিশনা ও তালমূদ উপাদেয় ঝাল-মশলার মত। এরূপ আরো অনেক কথা তাদের পুস্তকাদিতে রয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, তারা লিখিত তোরাহ-এর চেয়ে অলিখিত মৌখিক বর্ণনাগুলোকে বেশি মর্যাদা প্রদান করেন। এ সকল মৌখিক বর্ণনা যেভাবে ব্যাখ্যা করে, তারা সেভাবেই ঈশ্বরের বাণীর ব্যাখ্যা করেন। এভাবে মনে হয় যে, তাদের বিশ্বাসে লিখিত তোরাহ প্রাণহীন দেহের মত, আর মৌখিক বর্ণনাসমূহ আত্মার মত, যদ্বারা তোরাহ প্রাণলাভ করে।

"এ সকল মৌখিক বর্ণনা ধর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন মোশিকে তোরাহ প্রদান করেন, তখন তোরাহ-এর অর্থও তাঁকে প্রদান করেন। তিনি প্রথমটিকে লিখে রাখতে নির্দেশ দেন। আর দ্বিতীয়টির বিষয়ে নির্দেশ দেন যে, তা মুখস্থ রাখতে হবে এবং একমাত্র মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই তা সবাইকে জানাতে হবে। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম মৌখিকভাবে তা বর্ণনা করেছে। এজন্য তারা প্রথমটিকে লিখিত বিধান (scriptural laws) এবং দ্বিতীয়টিকে মৌখিক বিধান (oral laws) বলে অভিহিত করেন। এ সকল মৌখিক বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা রায়কে তারা সিনাই পর্বতে প্রাপ্ত 'মোশির বিধান' বলে অভিহিত করেন।

"ইহূদীগণ বিশ্বাস করেন যে, সিনাই পর্বতে চল্লিশ দিনের অবস্থানকালে মোশি ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করেন এবং সেখানেই তিনি তোরাহ লাভ করেন এবং মৌখিক বিধানগুলোও সেখানেই লাভ করেন। মোশি উভয় প্রকারের বিধান নিয়ে পর্বত থেকে ফিরে আসেন। ইস্রায়েল সন্তানগণকে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি পর্বত থেকে ফিরে এসে হারোণকে তাম্বুর মধ্যে ডাকেন। তিনি তাঁকে প্রথমে লিখিত বিধান (তোরাহ) শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি তাঁকে লিখিত তোরাহ-এর অর্থ হিসেবে ঈশ্বর থেকে যে মৌখিক বর্ণনা লাভ করেছিলেন তা শিক্ষা দেন। হারোণ তা শিক্ষালাভ করার পরে মোশির দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করেন। হারোণের দুই পুত্র ইলীয়াসর (Eleazar) ও ঈথামর (Ithamar) তথায় প্রবেশ করেন এবং তাদের পিতার ন্যায় তারাও তা শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর ৭০ জন ধর্মগুরু বা গোত্রপতি তথায় প্রবেশ করেন। তারা উভয় বিধান শিক্ষালাভ করে তাঁবুর মধ্যে উপবেশন করেন। এরপর যারা শিখতে আগ্রহী ছিলেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর মোশি উঠে যান। তখন হারোণ যা শিক্ষা করেছেন তা পাঠ করেন এবং উঠে যান। এরপর ইলীয়াসর ও ঈথামর যা শিখেছিলেন তা পাঠ করে উঠে যান। এরপর ৭০ জন ধর্মগুরু যা শিখেছিলেন তা উপস্থিত মানুষদেরকে পাঠ করে শুনান। এভাবে উপস্থিত মানুষেরা

চারবার বিধানগুলো শ্রবণ করেন এবং উত্তমরূপে তা মুখস্থ করেন। তারা বেরিয়ে সকল ইস্রায়েল সন্তানকে এ বিষয়ে জানান। এভাবে তারা লিখিত বিধানকে লিখিতভাবে ও মৌখিক বিধানকে মৌখিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দেন। লিখিত বিধানে (তোরাহে) বিধিবিধানের সংখ্যা ছিল ৬১৩। এজন্য তারা মৌখিক বিধানকেও এভাবে ভাগ করেন।

"তারা বলেন যে, মিসর থেকে বের হওয়ার ৪০তম বছরের একাদশ মাসের প্রথমে মোশি ইস্রায়েল সন্তানদেরকে একত্রিত করে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, ঐশ্বরিক যে বিধান তিনি তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন সেগুলো থেকে কোন বিধান যদি কেউ ভুলে যায়, তবে সে যেন আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করে। অনুরূপভাবে এ সকল বিধিবিধানের কোন বক্তব্যের বিষয়ে যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তবে সে যেন আমার নিকট আগমন করে, যেন আমি আপত্তিটি নিরসন করতে পারি। তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলো, অর্থাৎ একাদশ মাসের শুরু থেকে দ্বাদশ মাসের ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত তিনি এভাবে শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন এবং লিখিত ও অলিখিত বিধানাবলি শিক্ষা দান করেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদেরকে তাঁর নিজের হাতে লেখা তোরাহ-এর ১৩টি পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। কারণ তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের প্রত্যেক বংশকে একটি করে পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন যেন তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া লেবীয়গণকে তিনি একটি অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন যেন তা ধর্মধামের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। তিনি অলিখিত বিধান বা মৌখিক বর্ণনা যিহোশূয়কে পাঠ করে শোনান এবং উক্ত মাসের ৭ম দিনে নেবো পর্বতে (mountain of Nebo) আরোহণ করে তথায় মৃত্যুবরণ করেন।

"মোশির মৃত্যুর পর যিহোশূয় এ সকল মৌখিক বর্ণনা ধর্মগুরু বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রদান করেন। তাঁরা সেগুলোর দায়িত্ব ভাববাদিগণকে প্রদান করেন। প্রত্যেক ভাববাদী সেগুলো পরবর্তী ভাববাদীকে পৌঁছে দিতেন। এভাবে যিরমিয় ভাববাদী তা বারূক (Baruch)-কে তা প্রদান করেন। বারূক তা ইস্রাকে প্রদান করেন। ইস্রা তা ধর্মীয় পণ্ডিতগণকে প্রদান করেন। এ সকল পণ্ডিতের সর্বশেষ ছিলেন শিমিয়োন সাদোক। তিনি তা এনিটি কোন্সকে পৌঁছে দেন। তিনি যোয়ী বেন ইয়াখনানকে, তিনি যোসি বেন যাসেরকে, তিনি নাথান ইরবিলি ও যোশূয়া বেন পারাখিয়াকে (Joshua ben Perachia), তারা যিহূদা বেন বেহা ও মিশিয়োন বেন শাত্তাহকে, তারা শাম্মাই (Shammai) ও আবি তিলিওন, তারা হিল্লেল (Hillel)-কে এবং তিনি তার পুত্র শিমিয়োনকে তা প্রদান করেন। ধারণা করা হয় যে, যীশু খৃস্টের মাতা মরিয়ম শুচি হওয়ার পরে শিশু যীশুকে নিয়ে যিরূশালেমে ধর্মধামে গমন করলে যে শিমিয়োন তাঁকে দু' হাতে কোলে তুলে নেন, সেই

শিমিয়োনই হিল্লেলের পুত্র এই শিমিয়োন।[১৮৪] শিমিয়োন তার পুত্র গমলীয়েল (Gamaliel)-কে তা প্রদান করেন। এই গমলীয়েল ছিলেন সাধু পৌলের শিক্ষক।[১৮৫] গমলীয়েল তার পুত্র মিশিয়োনকে তা প্রদান করেন। তিনি তা তার পুত্র যিহূদা হা-নাসি/হা-কাদোশ (Judah ha-Nasi/Judah ha-qadosh: 135-220 AD)-কে প্রদান করেন। তিনি এ সকল মৌখিক বর্ণনা গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং গ্রন্থের নামকরণ করেন 'মিশনা'।"

আদম ক্লার্ক আরো বলেন, "ইহূদীগণ এই পুস্তকটিকে অত্যন্ত বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই পুস্তকের মধ্যে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে। লিখিত বিধান বা তোরাহের মত এ পুস্তকের বিধানগুলোকেও ঈশ্বর সিনাই পর্বতে মোশিকে প্রদান করেছিলেন। কাজেই এই মিশনা পুস্তকে যা কিছু আছে তা সবই তোরাহ্-এর মতই অবশ্য পালনীয়।

"এই পুস্তকটি 'মিশনা' রচিত হওয়ার পর থেকে ইহূদীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ও প্রচলন লাভ করে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান করতে থাকেন। বড় বড় ইহূদী পণ্ডিত এই পুস্তকটির দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। একটি তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে যিরূশালেমে রচিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনে রচিত হয়। প্রত্যেক ব্যাখ্যাগ্রন্থকেই 'জেমারা (Gemara) বলা হয়। জেমারার আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণতা'। তাদের ধারণায় এই দুই ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'মিশনা' গ্রন্থটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এজন্য এগুলোকে 'জেমারা' বলা হয়। মিশনার মূল পাঠ ও ব্যাখ্যাকে একত্রে 'তালমূদ' (Study of learning) বলা হয়। উভয় ব্যাখ্যাকে পৃথক করার জন্য প্রথমটিকে বলা হয় 'যিরূশালেমীয় তালমূদ' বা ফিলিস্তিনী তালমূদ' (Palestinian Talmud/Talmud/Talmud Yerushalmi) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'ব্যাবিলনীয় তালমূদ' (Babylinian Talmud/Talmud Bavli)। বর্তমান প্রচলিত ইহূদী ধর্মের সবকিছুই মূলত এই

---

১৮৪. বাইবেলের বক্তব্য আদম ক্লার্কের এই ধারণা সমর্থন করে না। হিল্লেল ছিলেন ইহূদীদের অন্যতম নেতা ও ইহূদী ধর্মগুরুদের সর্বোচ্চ পরিষদ সানহেদ্রিন (Sanhedrin)-এর প্রেসিডেন্ট। তারপর তার পুত্র শিমিয়োন এবং তার পর তার পুত্র গমলীয়েল এই পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু যে শিমিয়োন শিশু যীশুকে কোলে নেন তার বিষয়ে লূক ২/২৫-এ বলা হয়েছে: "শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্মিক ও ভক্ত... আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভু খ্রীস্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না।" এ থেকে বুঝা যায় যে, যিরূশালেমের ইহূদীদের প্রধান শিমিয়োন তিনি নন। এছাড়া শিমিয়োনের পিতা হিল্লেল খৃস্টের জন্মের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি খৃস্টের সমসাময়িক ছিলেন। ১০ খৃস্টাব্দে বা তার পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই হিল্লেলের পুত্র শিমিয়োন শিশু যীশুকে দেখে মৃত্যু বরণ করার জন্য অপেক্ষা করবেন তা কল্পনা করা যায় না।

১৮৫. দেখুন প্রেরিত ২২/৩।

দুই তালমূদের মধ্যে গ্রন্থিত, ভাববাদিগণের পুস্তক বা পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি এগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যিরূশালেমীয় তালমূদ দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে ব্যাবিলনীয় তালমূদের উপর তাদের নির্ভরতা বর্তমানে বেশি।"

আদম ক্লার্কের বক্তব্য এখানেই শেষ।

হর্ন ১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ের প্রথম অংশে বলেন : 'মিশনা' গ্রন্থটির মধ্যে ইহূদীদের বিভিন্ন মৌখিক বর্ণনা এবং বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্যের ব্যাখ্যা সংকলন করা হয়েছে। এই পুস্তকটির বিষয়ে ইহূদীদের ধারণা যে, ঈশ্বর যখন সিনাই পর্বতে মোশিকে তোরাহ প্রদান করেন, তখনই তিনি তাঁকে এ সকল মৌখিকভাবে বর্ণিত কথাগুলো প্রদান করেন। মোশির থেকে তা হারোণ, ইলীয়াসর, ঈথামর ও যিহোশূয়ের নিকট পৌঁছায়। তাঁর মাধ্যমে তা অন্যান্য ভাববাদীর নিকট পৌঁছায়। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা গ্রহণ করে। অবশেষে তা শিমিয়োনের নিকট পৌঁছায়। এই শিমিয়োনই সেই শিমিয়োন যে শিশু যীশুখৃস্টকে দু'হাতে গ্রহণ করেন। শিমিয়োন থেকে তা তার পুত্র গমলীয়েল, তার থেকে যিহূদা হা-কাদোশ তা গ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের শেষে চল্লিশ বছর কঠিন পরিশ্রম করে তা গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এই সময় থেকে এই পুস্তকটি ইহূদীদের মধ্যে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত। অনেক সময় এই পুস্তকের মর্যাদা তোরাহ বা লিখিত বিধানের চেয়েও বেশি দেওয়া হয়।"

অতঃপর তিনি বলেন : "মিশনা পুস্তকের দুটি ব্যাখ্যা আছে, যেগুলোকে 'জেমারা' বলা হয়। একটি যিরূশালেমীয় জেমারা। কোন কোন গবেষক পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থটি খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে লিখিত হয়। ফাড্রিমনের মতে তা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ব্যবিলনীয় জেমারা। এই গ্রন্থটি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ব্যবিলনে লিখিত হয়। জেমারাগুলো অবাস্তব ভিত্তিহীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তবে ইহূদীদের নিকট তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এগুলোর পঠন ও পাঠন তাদের মধ্যে অতি প্রচলিত। সকল সমস্যায় তারা এগুলোর স্মরণাপন্ন হন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই পুস্তকই তাদের পথের দিশারী। একে জেমারা বলার কারণ, জেমারা অর্থ পূর্ণতা। তারা মনে করেন, এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তোরাহ পূর্ণতা পেয়েছে, এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যাখ্যা আর সম্ভব নয় এবং আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নেই। মিশনা গ্রন্থের মূল পাঠের সাথে যিরূশালেমীয় জেমারা একত্রিত হলে তাকে 'যিরূশালেমীয় তালমূদ' বলা হয়। অনুরূপভাবে ব্যবিলনীয় জেমারার সাথে মিশনার মূল পাঠ একত্রে 'ব্যবিলনীয় তালমূদ' বলা হয়।"

উপর্যুক্ত দু'জন পণ্ডিত বাইবেল-ব্যাখ্যাকারের আলোচনা থেকে চারটি বিষয় প্রকাশ পায় :

প্রথম বিষয় : ইহূদীগণ মৌখিক বর্ণনাকে তোরাহ-এর মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন বরং অনেক সময় তারা এ সকল মৌখিক বর্ণনাকে তোরাহ-এর চেয়েও বেশি সম্মান করেন ও গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা মনে করেন যে, এ সকল মৌখিক বর্ণনা প্রাণতুল্য আর তোরাহ দেহ মাত্র। যদি মোশির তোরাহ (পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক)-এর অবস্থা এই হয়, তাহলে পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের অবস্থা কি হবে ?

দ্বিতীয় বিষয় : যিহূদা হা-কাদোশ (Judah ha-Nasi/Judah ha-qadosh) বা পবিত্র যিহূদা খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে এই মৌখিক বর্ণনাগুলো লিখিতভাবে সংকলন করেন। এ থেকে জানা যায় যে, এই বর্ণনাগুলো ১৭০০ বছর শুধু মৌখিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণিত হয়েছে।[১৮৬] এই দীর্ঘ ১৭ শতাব্দী ইহূদীদের উপর দিয়ে কঠিনতম বিপদাপদ ও বিপর্যয় অতিবাহিত হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম ছিল খৃস্টপূর্ব ৫৮৮/৫৮৬ সালে নেবুকাদনেযার কর্তৃক যিরূশালেম নগরী ও ইহূদী রাষ্ট্র ধ্বংস, গণহত্যা ও সকল ইহূদীকে বন্দি করে ব্যবিলনে গমন, খৃ. পূ. ১৬৮ অব্দে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes) কর্তৃক পুনরায় যেরুশালেম ও ইহূদী রাজ্য ধ্বংস এবং রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ানের সময়ে (৭১-৭৯ খৃস্টাব্দ) তদীয় পুত্র পরবর্তী সম্রাট টিটো (Titus) কর্তৃক ৭০ খৃস্টাব্দে যিরূশালেমে গণহত্যা পরিচালনার পর তা ধ্বংস করে সকল ইহূদীকে যিরূশালেম থেকে চিরতরে বিতাড়িত করার ন্যায় ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ। এ সকল ঘটনায় তাদের ধর্মগুরু ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ নিহত হন, সকল ধর্মগ্রন্থ হারিয়ে যায় এবং তাদের ধর্মীয় সকল বর্ণনার সূত্র-পরম্পরা বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও তারা সকল যোগসূত্রবিহীন এ সকল মৌখিক বর্ণনাকে তোরাহ-এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন।

তৃতীয় বিষয় : এ সকল মৌখিক বর্ণনা অধিকাংশ পর্যায়ে মাত্র এক ব্যক্তির একক বর্ণনা যা একব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ১ম ও ২য় গমলীয়েল (Gamaliel), ২য় ও ৩য় শিমিয়োন (Simon)। ইহূদীগণের বিশ্বাস অনুসারে এরা কেউ ভাববাদী ছিলেন না। আর খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে এরা ছিলেন নিকৃষ্টতম অবিশ্বাসীদের অন্যতম, যারা যীশুখৃস্টকে অবিশ্বাস করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও এ সকল মৌখিক বর্ণনাই ইহূদীদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি এবং ধর্মের মূলনীতি। আমাদের মুসলমানদের নিকট বিশুদ্ধ সূত্র-পরম্পরায় বর্ণিত বিশুদ্ধতার প্রমাণে উত্তীর্ণ হাদীসও যদি কোন পর্যায়ে শুধু একজন থেকে একজন গ্রহণ করেন তবে তা বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১৮৬. সিনাই পর্বতে মোশি কর্তৃক এগুলো গ্রহণ থেকে যিহূদা হা-কাদোশ কর্তৃক এগুলো লিখিত সংকলন করা পর্যন্ত সময়পর্ব প্রায় ১৭০০ বছর।

চতুর্থ বিষয় : ব্যাবিলনীয় জেমারা লিখিত হয়েছে খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে। হর্ন-এর বক্তব্য অনুসারে এর মধ্যে ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী সংকলিত রয়েছে। এ সকল ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী ২ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে শুধু মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে মুখস্থ করা হয়েছে।

অলিখিত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে ইহূদীদের অবস্থা আমরা প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের বর্ণনা অনুসারে জানতে পারলাম। এবার আসুন এ বিষয়ে প্রাচীন খৃস্টানদের অবস্থা পর্যালোচনা করি। খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মযাজক ও ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস প্যাম্ফিলাস (Eusebius Pamphilus) (২৬৩-৩৩৯ খৃ)। তাঁর রচিত 'যাজকীয় ইতিহাস' (Ecclesisatical History) প্রথম তিন শতকের খৃস্ট ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই পুস্তকটিকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করেছেন। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে এই পুস্তকটি মুদ্রিত হয়েছে। ইউসেবিস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি ১০টি পুস্তকে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেক পুস্তকে অনেকগুলো অধ্যায় রয়েছে।

(১) ইউসেবিস তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের নবম অধ্যায়ে, ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় যীশুর প্রেরিত শিষ্য যাকোব (James) -এর বর্ণনায় বলেন : "এই যাকোবের বিবরণে ক্লিমেন্ট (Clement) তাঁর ৭ম পুস্তকে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা মুখস্থ রাখার যোগ্য। স্পষ্টতই তিনি এই ঘটনাটি তাঁর পূর্বসূরীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌখিক বর্ণনা (tradition) -এর উপর নির্ভর করেই লিখেছেন।"

(২) অতঃপর ইউসেবিস তাঁর গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায়, ৩য় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে, (দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মগুরু ও নেতা) আরিনাউস (Irenaeus)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "ইফিষ বা ইফেসাস (Ephesus) শহরের চার্চটি পৌল কর্তৃক স্থাপিত। যীশুর প্রেরিত শিষ্য যোহন রোমান সম্রাট ট্রাজানের (Trajan) সময়কাল (৯৮-১১৭ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত উক্ত চার্চে অবস্থান করেন। ইফিষীয় এই চার্চটি প্রেরিতগণের মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসসমূহের (Apostolic Tradition) বিশ্বস্ত সাক্ষী।"

(৩) অতঃপর উক্ত পৃষ্ঠাতেই তিনি ক্লিমেন্টের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "প্রেরিত যোহনের বিষয়ে তোমরা একটি ঘটনা শুন। ঘটনাটি মোটেও কল্প-কাহিনী নয়, বরং প্রকৃত সত্য ঘটনা, যা যুগ-পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে এবং সতর্কতার সাথে মুখস্থ রাখা হয়েছে।"

(৪) অতঃপর উক্ত গ্রন্থের ১২৬ পৃষ্ঠায়, ৩য় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "যীশুর অন্যান্য শিষ্য, যেমন ১২ জন প্রেরিত শিষ্য, ৭০ জন শিষ্য ও অন্যান্য আরো অনেক শিষ্য যে এ সকল ঘটনা (সুসমাচারে বর্ণিত ঘটনাবলি) জানতেন না তা নয়।

কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন শিষ্য মথি ও যোহনই এ সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। মৌখিক বর্ণনা (tradition) থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও বিশেষ প্রয়োজনে তা করেছিলেন।"

(৫) অতঃপর গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায়, ৩য় পুস্তকের ২৮ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "আরিনাউস (Irenaeus) তাঁর তৃতীয় পুস্তকে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন, যে ঘটনাটি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে পোলিকার্পের (St. Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) সূত্রে তিনি জেনেছেন।"

(৬) অতঃপর ১৪৭ পৃষ্ঠায়, ৪র্থ পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে তিনি বলেন : "যিরূশালেমের বিশপগণের বিষয়ে সুবিন্যস্ত কোন বিবরণ কোন পুস্তকে আমি পাই নি। তবে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, তারা অল্প সময় বেঁচে ছিলেন।"

(৭) উক্ত গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায়, ৩য় পুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, খৃস্টধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে রোমান সৈন্যরা ইগনাটিয়াসকে (Ignatius) [১৮৭] গ্রেফতার করে সিরিয়া থেকে রোমে নিয়ে যায় তথায় বন্য পশুর পদতলে তাঁকে হত্যা করার জন্য। সৈন্যদের হেফাযতে তিনি এশিয়া (এশিয়া মাইনর) দিয়ে রোমে নীত হন। যাত্রাপথে তিনি বিভিন্ন চার্চমণ্ডলীকে তাঁর বাণী ও উপদেশ দিয়ে উজ্জীবিত করেন। বিশেষত তিনি খৃস্টধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্ত মতগুলো (heresies) সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন। এ সকল নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্ত মত সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বা প্রচারিত হচ্ছিল। প্রেরিতদের থেকে বর্ণিত মৌখিক বর্ণনাগুলোকে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে ও সেগুলোর উপর নির্ভর করতে তিনি তাদেরকে উপদেশ দেন। ভালভাবে মুখস্থ রাখার উদ্দেশ্যে তিনি এ সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে তাতে তাঁর সাক্ষ্য সংযুক্ত করেন।"

(৮) অতঃপর ১৪২ পৃষ্ঠায়, ৩য় পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "প্যাপিয়াস (Papias)[১৮৮] তাঁর পুস্তকের[১৮৯] ভূমিকায় লিখেছেন : "পূর্ববর্তী গুরুগণ (elders) থেকে আমার নিকট যা কিছু পৌছেছে তা সবকিছু আমি আপনাদের জন্য লিপিবদ্ধ করছি। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার পরে আমি এগুলোকে মুখস্থ করেছি এবং এগুলোর সত্যতার বিষয়ে আমার সাক্ষ্য সংযুক্ত করছি। কারণ, প্রথম থেকেই যারা অনেক কথা বলেন বা বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ প্রদান করেন তাদের কথা আমি শুনতে রাজি হই

---

১৮৭. এন্টিয়কের (Antioch) দ্বিতীয় বিশপ। ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত হন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History., page 104, 476.

১৮৮. দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও হেরাপোলিসের (Hierapolis) বিশপ।

১৮৯. Explanation of the Sayings of the Lord/Interpretation of our Lord's Declarations.

নি। আমি শুধু তাদের কথাই শুনেছি, যারা আমাদের সত্য প্রভুর থেকে বর্ণিত সঠিক উপদেশগুলোই শিক্ষা দেন। প্রাচীন গুরুগণের কোন সহচর বা অনুসারীকে পেলে আমি জিজ্ঞেস করতাম : টমাস (Thomas), যাকোব (James), যোহন (John), মথি (Matthew) বা আমাদের প্রভুর অন্যান্য শিষ্য কি বলেছেন ? এরিসটিওন (Aristion) কি বলেছেন ? আমাদের প্রভুর শিষ্য যাজক যোহন (the Presbyter John) কি বলেছেন ? কারণ, জীবিতদের মুখ থেকে শ্রুত মৌখিক বর্ণনা থেকে আমি যে কল্যাণ লাভ করেছি সেরূপ কল্যাণ আমি লিখিত পুস্তক (সুসমাচারগুলো) থেকে লাভ করিনি।"

(৯) অতঃপর ১৫১ পৃষ্ঠায়, ৪র্থ পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "হেজিসিপার্স (Saint Hegesippus)[১৯০] চার্চের ইতিহাস রচনায় একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর রচনাবলি থেকে অনেক তথ্যই পরবর্তীরা গ্রহণ ও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এগুলো মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রেরিতগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রেরিতগণের যে সকল নীতিমালা (Apostolic Doctrine) তিনি পেয়েছিলেন, সেগুলোকে খুব সহজ ভাষায় তিনি পাঁচটি পুস্তকে সংকলিত করেছেন।"

(১০) অতঃপর ১৫৮ পৃষ্ঠায়, ৪র্থ পুস্তকের ১৪শ অধ্যায়ে পোলিকার্পের (St. Polycarp) বিষয়ে আরিনাউসের (Irenaeus) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "পোলিকার্প প্রেরিতগণ থেকে যা কিছু শিক্ষা করতেন সর্বদা তা শিক্ষা দিতেন। চার্চ তা মৌখিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে পৌছে দিয়েছে। আর এটিই একমাত্র সঠিক ধর্মমত (the only true doctrine)।"

(১১) অতঃপর ২০১ পৃষ্ঠায়, ৫ম পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রোমের বিশপগণের তালিকা বর্ণনায় আরিনাউসের নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "বর্তমানে তথাকার বিশপের দায়িত্ব এলিউথেরাসের (Eleutherus)। তিনি রোমের দ্বাদশ বিশপ। প্রেরিতগণ থেকে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে যে উত্তরাধিকার নীতিমালা ও বিন্যাস আমাদের নিকট পৌছেছে তার হুবহু অনুসরণে তা সম্পন্ন হয়েছে।"

(১২) অতঃপর ২০৬ পৃষ্ঠায়, ৫ম পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে তিনি (তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ধর্মগুরু) ক্লিমেন্টের (Clement of Alexandria) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "আমি উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য এ সকল পুস্তক রচনা করছি না বরং আমার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে চিন্তা করে এবং ভুলে যাওয়ার প্রতিষেধক হিসেবে এই পুস্তকগুলো সংকলন করলাম। এগুলো ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে

১৯০. দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক, ১৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাপ্ত ধর্মনীতির (inspired doctrines) ব্যাখ্যা। পবিত্র আইওনিকাস (Ionicus), যিনি গ্রীসে বসবাস করতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মাগনা গ্রাসিয়ায় (Magna Gracia) বসবাস করতেন। তাঁদের একজন ছিলেন সিরীয় এবং অন্যজন্ ছিলেন মিসরীয়। অন্যরা পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন আসিরিয়ার (Assyria) অধিবাসী এবং অন্যজন ফিলিস্তিনের অধিবাসী। সর্বশেষ যে শিক্ষকের সাথে আমার সাক্ষাত হয় তিনি মিসরে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনিই ছিলেন আমার শিক্ষকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে আমি আর কোন শিক্ষক সন্ধান করি নি; কারণ তাঁর চেয়ে ভাল শিক্ষক কেউ হতে পারে না। পিতর (Peter), যাকোব (James), যোহন (John) এবং পৌল (Paul) থেকে যে সকল শিক্ষা ও বাণী এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে, সে সকল সত্য বর্ণনাগুলো তাঁরা মুখস্থ করেছেন।"

(১৩) অতঃপর ২১৯ পৃষ্ঠায়, ৫ম পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে আরিনাউসের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "ঈশ্বরের করুণায়, আমি এ সকল বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেছি এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি, কাগজে নয়, বরং আমার হৃদয়ে। আর প্রথম থেকেই আমার অভ্যাস যে, এ সকল বিষয় আমি আমার স্মৃতিতে পুনরাবৃত্তি করি।"

(১৪) অতঃপর ২২২ পৃষ্ঠায়, ৫ম পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "বিশপ পোলিক্রেটস (Polycrates) মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত কথাগুলো একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে তা ভিক্টর (Victor) ও রোমের চার্চের নিকট প্রেরণ করেন।"

(১৫) অতঃপর ২২৬ পৃষ্ঠায়, ৫ম পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "ফিলিস্তিনের বিশপ নার্সিসাস (Narcissus), থিওফিলাস (Theophilus) এবং ক্যাসিয়াস (Cassius), সোর (Tyre) নগরের চার্চের বিশপ, তালিমায়ির (ptolemais) ক্লারাস (Clarus) এবং অন্যান্য যারা এ সকল বিশপের সাথে এসেছিলেন, সকলেই মৌখিক বর্ণনার বিষয় অনেক কথা পেশ করলেন। নিস্তারপর্ব (Passover) বিষয়ক যে সকল মৌখিক বর্ণনা যুগ-পরম্পরায় প্রেরিতগণ থেকে তাঁদের নিকট পৌঁছেছে সেগুলো তাঁরা পেশ করেন। পত্রের শেষে তাঁরা লিখেন, এই পত্রের প্রতিলিপি চার্চসমূহে প্রেরণ করা হোক যেন যারা দ্রুত সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়, তাদের পলায়নের স্থান না থাকে।"

(১৬) আলেকজান্দ্রীয় ক্লিমেন্ট (Clement of Alexandria), যিনি ছিলেন প্রেরিতগণের শিষ্যদের শিষ্য, তাঁর বিষয়ে ইউসেবিয়াস তাঁর গ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে লিখেছেন : "নিস্তারপর্ব (Passover) বিষয়ে তিনি যে পুস্তিকা

রচনা করেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে অনুরোধ করেন যে, তিনি মৌখিক যে সকল বর্ণনা পাদরি ও বিশপগণ থেকে শ্রবণ করেছেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে যেন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।"

(১৭) অতঃপর ২৬৩ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "আফ্রিকানাস (Africanus) তাঁর একটি পত্র এরিস্টিডেসের (Aristides) উদ্দেশ্যে লিখেন। এই পত্রটি এখনো বিদ্যমান। মথি ও লূকের সুসমাচারের মধ্যে যীশুখৃস্টের বংশাবলির বর্ণনায় যে বৈপরীত্য আছে বলে ধারণা করা হয় সে বিষয়ে তিনি পত্রটি লিখেন। পূর্ববর্তী প্রজন্মের পূর্বপুরুষদের থেকে যুগ-পরম্পরায় যে সকল মৌখিক বক্তব্য তাঁর নিকট পৌঁছে সেগুলোর ভিত্তিতে তিনি উভয় বংশাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।"

উপর্যুক্ত ১৭টি উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, প্রথম শতাব্দীগুলোর খৃস্টানগণ মুখে মুখে বর্ণিত অলিখিত বর্ণনাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন এবং সেগুলোর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন।

ক্যাথলিক জন মিলনার ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকের ১০ম পত্রে, যে পত্রটি তিনি জেমস ব্রাউনের কাছে লিখেছিলেন, বলেন :

(১) ইতোপূর্বেও আমি লিখেছি যে, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস শুধু ঈশ্বরের লিখিত বাণী (Scripture) -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আরো প্রশস্ত। লিখিত ও অলিখিত সকল বাণী, অর্থাৎ বাইবেলের পুস্তকাদি এবং মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীগুলোকে ক্যাথলিক চার্চ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেগুলোই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি।

(২) অতঃপর এই পত্রেই তিনি লিখেছেন : "আরিনাউস তাঁর পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বলেছেন : সত্য-সন্ধানীদের জন্য এর চেয়ে সহজতর কোন বিষয় আর নেই যে, তাঁরা সকল চার্চে মৌখিক বর্ণনাগুলোর অনুসন্ধান করবেন, যেগুলো প্রেরিতগণ থেকে বর্ণিত এবং যেগুলোকে তাঁরা বিশ্বের জন্য প্রকাশ করেছিলেন।"

(৩) অতঃপর এই পত্রে তিনি লিখেন : "আরিনাউস তাঁর গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে বলেন : "বিভিন্ন জাতির ভাষা যদিও ভিন্ন, তবে অলিখিত মৌখিক বর্ণনা ও রীতি সকল স্থানেই একইরূপ। শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসে ফ্রান্স, স্পেন, পূর্বাঞ্চল, মিসর ও লিবিয়ার চার্চের সাথে জার্মান চার্চের পার্থক্য নেই।"

(৪) এই পত্রে তিনি আরো লিখেন : "আরিনাউস তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে লিখেছেন, সকল চার্চের অবস্থার বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করা দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করবে। এজন্য আমরা অলিখিত বর্ণনা-রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রোমের চার্চের

উপর নির্ভর করব। এই চার্চটি প্রাচীন, বৃহৎ ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পিতর ও পৌল চার্চটি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য সকল চার্চ এর সাথে একমত। প্রেরিতগণ থেকে যে সকল অলিখিত বাণী বা রীতিনীতি যুগ-পরম্পরায় মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছে সে সবই এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।"

(৫) এই পত্রে তিনি আরো বলেন, "আরিনাউস তাঁর চতুর্থ পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ে লিখেছেন : যদি আমরা ধারণা করি যে, প্রেরিতগণ আমাদের জন্য কোন গ্রন্থ বা লিখিত তথ্য রেখে যান নি, তাহলে আমরা কি করতাম ? সেক্ষেত্রে কি মুখে মুখে প্রচারিত বর্ণনা গ্রহণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হতো না ? এ সকল বর্ণনা প্রেরিতদের থেকে বর্ণিত, তাঁরা এগুলোকে মানুষদেরকে শুনিয়েছেন এবং মানুষদের থেকে চার্চগুলো তা গ্রহণ করেছে। বর্বর জাতিগুলোও খৃষ্টে বিশ্বাস করার পরে এরূপ মৌখিক বিবরণের ভিত্তিতেই তাদের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা করে। তারা কোনরূপ কাগজ-কলমের ব্যবহারই করে না।"

(৬) উক্ত পত্রে তিনি আরো বলেন, টার্টুলিয়ান (Tertullian)[১৯১] ধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্তি (heresy) সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যে পুস্তক রচনা করেন সেই পুস্তকটি রেহনান শহরে মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: "বিভ্রান্তদের (heretics) অভ্যাসই যে, তারা পবিত্র পুস্তক বাইবেল আঁকড়ে ধরে এবং বাইবেল থেকে প্রমাণাদি পেশ করে। তারা বলে, পবিত্র পুস্তক বা বাইবেল ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বা তার ভিত্তিতে কিছু বলা হবে না। এভাবে তারা শক্তিমানদেরকে দুর্বল বানিয়ে ফেলে, দুর্বলদেরকে তাদের জালের মধ্যে আটকে ফেলে এবং মধ্যবর্তীদের অন্তরের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। এজন্য আমরা বলছি যে, এদেরকে বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করতে সুযোগ দেবেন না। কারণ, মগজ ও পেট খালি করা ছাড়া বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করে কোন ফায়দা হবে না। এজন্য পবিত্র পুস্তক বা বাইবেলের উপর নির্ভর করার পন্থা ভুল; কারণ বাইবেলের পুস্তকাদি থেকে কিছু বের করা যায় না। যদি কিছু পাওয়া যায়ও তবে তা অসম্পূর্ণ। যদি এরূপ নাও হতো তবুও কোন মানুষকে কোন্ সময়ে সেই বর্ণনাটি শেখালেন, যে বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা খৃস্টান হয়েছি ? বস্তুত, খৃস্টধর্মের বিধিবিধান, ধর্মবিশ্বাস, বাইবেলের বা নতুন নিয়মের পুস্তকাদির সত্যতা, সেগুলোর ব্যাখ্যা এবং খৃস্ট ধর্মের সকল বিবরণ কেবল মৌখিক বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়।"

(৭) অতঃপর তিনি এই পত্রে বলেন : "ওরিগেন (Origen)[১৯২] বলেছেন : কোন কোন মানুষ বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেয় এবং এরপর বলে যে, আপনাদের বাড়িতেই

১৯১. খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মগুরু, আফ্রিকার কার্থেজে ১৫৫ খৃস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২. তৃতীয় শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার খৃস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান।

তা রয়েছে, আপনারা দেখে নিন। এ সকল মানুষকে গ্রহণ করা বা মূল্যায়ন করা আমাদের উচিত নয়। কারণ চার্চের মধ্যে যে প্রথম বর্ণনা রয়েছে তাতে ধাক্কা দেওয়া আমাদের উচিত নয়। ঈশ্বরের চার্চমণ্ডলীগুলো যুগ-পরম্পরার বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদেরকে যে বর্ণনা প্রদান করেছে তার বাইরে কোন কিছু বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়।"

(৮) উক্ত পত্রে তিনি আরো লিখেছেন : "ব্যাসিলাস লিখেছেন যে, চার্চের মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আলোচনা-উপদেশে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর কিছু পবিত্র বাইবেল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আর কিছু মৌখিক বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। ধর্মের মধ্যে উভয় বিষয়ের গুরুত্ব ও শক্তি সমান। খৃস্টীয় ধর্মের বিষয়ে যার জ্ঞান আছে সে এ বিষয়ে আপত্তি করবে না।"

(৯) উক্ত পত্রে তিনি আরো লিখেছেন : "বিভ্রান্তদের (heretics) বিরুদ্ধে এপিফান্স যে পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হবে; কারণ বাইবেলের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায় না।"

(১০) উক্ত পত্রে তিনি আরো বলেন : "থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ আয়াতের[১৯৩] ব্যাখ্যায় ক্রীযস্টম (John Chrysostom) বলেছেন, এ থেকে সুস্পষ্টত প্রকাশ পেল যে, প্রেরিতগণ সব কিছু লিখিতভাবে প্রচার করেন নি বরং অনেক বিষয় তাঁরা অলিখিতভাবে বা শুধু মৌখিকভাবে প্রচার করেছেন। লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকারের শিক্ষাই সমান গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চার্চের বর্ণনাই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। কোন বিষয় যদি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে সে বিষয়ে আমরা আর কিছু দাবি করি না।"

(১১) উক্ত পত্রেই তিনি লিখেছেন : "যে সকল বিভ্রান্ত মানুষের (heretics) বাপ্তাইজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের বিষয়ে অগাস্টিন (St. Augustine) লিখেছেন যে, যদিও এ বিষয়ে লিখিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই রীতিটি মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ চার্চ অনেক বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সেগুলো প্রেরিতগণের শিক্ষা, যদিও তা লিখিত নয়।"

(১২) অতঃপর তিনি উক্ত পত্রে লিখেছেন : "বিশপ ভিনসেন্ট বলেছেন, বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর (heretics) উচিত চার্চের সাধারণ বর্ণনার ভিত্তিতে পবিত্র পুস্তকের ব্যাখ্যা করা।"

---

১৯৩. রোমান ক্যাথলিক ভার্সনে আয়াতটি ১৪ নং হলেও, প্রচলিত প্রটেস্ট্যান্ট ভার্সনে তা ১৫ নং।

উপর্যুক্ত ১২টি উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, অলিখিত মৌখিকভাবে প্রচারিত বাণী বা বক্তব্যই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। পূর্ববর্তী খৃস্টান ধর্মগুরুগণ এভাবেই সেগুলোর মূল্যায়ন করতেন।

ক্যাথলিক হেরাল্ড পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

(১) রাব্বী (ইহূদী পণ্ডিত) মোশি কোদসী অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস ও মৌখিক বর্ণনার সহযোগিতা গ্রহণ ছাড়া বাইবেলের বক্তব্য বুঝা সম্ভব নয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরুগণ সর্বদা এই নীতি অনুসরণ করেছেন।

(২) টার্টুলিয়ান (Tertullian) বলেছেন, খৃস্ট প্রেরিতদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন তা জানতে হলে প্রেরিতগণ যে চার্চগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে যেতে হবে এবং তাদেরকে যে সকল লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য শিক্ষা দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে হবে।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে জানা গেল যে, ইহূদীগণ হাদীস ও মৌখিক বর্ণনাসমূহকে পবিত্রগ্রন্থ বা বাইবেলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়। অনুরূপভাবে প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ক্লিমেন্ট (Clement), আরিনাউস (Irenaeus), হেজিসিপাস (Saint Hegesippus), পোলিকার্প (St. Polycarp), পোলিক্রেটস (Polycrates), নার্সিসাস (Narcissus), থিওফিলাস (Theophilus), ক্যাসিয়াস (Cassius), ক্লারাস (Clarus), আলেকজান্দ্রীয় ক্লিমেন্ট (Clement of Alexandria), আফ্রিকানাস (Africanus), টার্টুলিয়ান (Tertullian), ওরিগেন (Origen), এপিফান্স, ক্রীযস্টম (John Chrysostom), অগাস্টিন (St. Augustine), বিশপ ভিনসেন্ট ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও পণ্ডিত।

ইগনাটিয়াস (Ignatius) তাঁর জীবনের অন্তিম উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন মৌখিক বর্ণনাগুলোর উপর নির্ভর করতে। ক্লিমেন্ট (Clement of Alexandria) তাঁর শিক্ষকদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, পিতর (Peter), যাকোব (James), যোহন (John) এবং পৌল (Paul) থেকে যে সকল শিক্ষা ও বাণী এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে তাদের নিকট পৌছেছে, সে সকল সত্য বর্ণনাগুলো তাঁরা মুখস্ত করেছিলেন। প্যাপিয়াস (Papias) বলেছেন যে, জীবিতদের মুখ থেকে শ্রুত মৌখিক বর্ণনা থেকে যে কল্যাণ আমি লাভ করেছি সেরূপ কল্যাণ আমি লিখিত পুস্তক (সুসমাচারগুলো) থেকে লাভ করিনি।

আরিনাউস (Irenaeus) বলেছেন, "ঈশ্বরের করুণায়, আমি এ সকল বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেছি এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি, কাগজে নয়, বরং আমার হৃদয়ে। আর প্রথম থেকেই আমার অভ্যাস যে, এ সকল বিষয় আমি আমার স্মৃতিতে পুনরাবৃত্তি করি।" তিনি আরো বলেছেন, "সত্যের সন্ধানীদের জন্য

Contents

এর চেয়ে সহজতর কোন বিষয় আর নেই যে, তারা সকল চার্চে মৌখিক বর্ণনাগুলোর অনুসন্ধান করবেন, যেগুলো প্রেরিতগণ থেকে বর্ণিত এবং যেগুলোকে তাঁরা বিশ্বের জন্য প্রকাশ করেছিলেন।" তিনি আরো বলেছেন : "যদি আমরা ধারণা করি যে, প্রেরিতগণ আমাদের জন্য কোন গ্রন্থ বা লিখিত তথ্য রেখে যান নি, তাহলে আমরা কি করতাম ? সেক্ষেত্রে কি মুখে মুখে প্রচারিত বর্ণনা গ্রহণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হতো না ?"

ওরিগেন ও টার্টুলিয়ান হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা অস্বীকারকারীদেরকে নিন্দা করেছেন। ব্যাসিলাস বলেছেন, "পবিত্র বাইবেল থেকে গ্রহণ করা এবং মৌখিক বর্ণনা থেকে নেওয়া উভয় বিষয়ের গুরুত্ব ও শক্তি সমান।" ক্রীযস্টম বলেছেন, "লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকারের শিক্ষাই সমান গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চার্চের বর্ণনাই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। কোন বিষয় যদি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে সে বিষয়ে আমরা আর কিছু দাবি করি না।" অগাস্টিন বলেছেন যে, সাধারণ চার্চ অনেক বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সেগুলো প্রেরিতগণের শিক্ষা, যদিও তা লিখিত নয়।"

এজন্য প্রকৃত সত্য কথা এই যে, পবিত্র গ্রন্থের বাইরে আর কিছুই না মানা বা সকল প্রকার মৌখিক বর্ণনা ঢালাওভাবে অস্বীকার করা মূর্খতা ও গোঁড়ামির প্রকাশ মাত্র। তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থও এরূপ দাবির মিথ্যাচারিতা প্রমাণ করে :

(১) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে রয়েছে : "আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই বলিতেন না; পরে বিরলে আপন শিষ্যদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন।"

এখানে জানা যায় যে, যীশু নিজের সকল কথা পুনরায় শিষ্যদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। স্বভাবতই বুঝা যায় যে, যীশুর এ সকল ব্যাখ্যার সবকিছু বা আংশিকভাবে শিষ্যগণ পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি দাবি করেন যে, এ সকল ব্যাখ্যা কিছুই তারা কাউকে শিক্ষা দেন নি, অথবা শিষ্যদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাণী বুঝার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো, তবে পরবর্তী মানুষদের জন্য তার কোন প্রয়োজন নেই, তবে তার দাবি অবাস্তব বলে গণ্য হবে।

(২) যোহনলিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে; "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে, জগতেও তাহা ধরিত না।"

সুসমাচার লেখকের বক্তব্য যদিও অতিরঞ্জিত ও অতিকথন থেকে মুক্ত নয়, তবুও নিঃসন্দেহে "আরও অনেক-কর্ম" বলতে তিনি যীশুর অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য

কর্ম বুঝিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, বাইবেলে বর্ণিত হয় নি এরূপ অনেক অলৌকিক ও সাধারণ কর্ম যীশু করেছেন। সেগুলোর কিছুই মৌখিকভাবে বর্ণিত হয় নি— একথা দাবি করা অবাস্তব।

(৩) থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের ২য় পত্রের ২ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত নিম্নরূপ : "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ! স্থির থাক এবং আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা (whether by word, or our epistle) যে সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধরিয়া রাখ।"

'আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা' কথা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, কিছু বিষয় তাদের কাছে লিখিতভাবে পৌছে এবং কিছু বিষয় মৌখিক কথাবার্তার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছেন। কাজেই দুটি বিষয়ই খৃস্টানদের নিকট সমান গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। পূর্বের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, জন ক্রীযস্টম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন।

(৪) করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১১ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত অনুবাদে রয়েছে : "আর সকল বিষয়, যখন আমি আসিব, তখন আদেশ করিব।" বাহ্যত এ সকল অবশিষ্ট বিষয় পৌল তাদেরকে সাক্ষাতে বলেছিলেন এবং সেগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে লিখিত হয় নি। কাজেই সে সকল শিক্ষার কিছু মৌখিকভাবে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব নয়।

(৫) ২ তিমথীয় ১ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে : "তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ খ্রীস্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর।"

এখানে 'আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ' কথাটি থেকে জানা যায় যে, কিছু কথা তিমথীয় মৌখিকভাবেই শিক্ষালাভ করেছিলেন।

(৬) উক্ত পত্রের ২ অধ্যায়ের ২ আয়াত নিম্নরূপ : "আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।"

এখানে সাধু পৌল তিমথীয়কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁর নিকট থেকে মৌখিকভাবে শেখা বিষয়গুলো অন্যান্য বিশ্বস্ত মানুষদেরকে শেখাতে যেন তারা আবার অন্যান্য বিশ্বস্ত মানুষদেরকে শিক্ষা দেন। এভাবেই মৌখিক বর্ণনা প্রচারিত হতে থাকবে।

(৭) যোহনের ২য় পত্রের শেষে রয়েছে : "তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল; কাগজ ও কালি ব্যবহার করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, আমি তোমাদের কাছে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্তা কহিব, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।"

(৮) যোহনের ৩য় পত্রের শেষে রয়েছে : "তোমাকে লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু কালি ও লেখনী দ্বারা লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশা করি, অবিলম্বে তোমাকে দেখিব, তখন আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্তা কহিব।"

এই দুই বক্তব্য থেকে প্রমণিত হয় যে, যোহন ওয়াদা অনুসারে 'অনেক কথা' তাদেরকে মৌখিকভাবে বলেছেন। এ সকল মৌখিক শিক্ষার সবকিছু বা অল্পকিছু মৌখিকভাবে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রকাশ পেল যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি যদি খৃস্টধর্মে হাদীসের বা মৌখিক বর্ণনার গুরুত্ব অস্বীকার করেন তবে তিনি মূর্খ বা গায়ের জোরে ঝগড়াকারী বলে গণ্য হবেন। তার এই বক্তব্য তার নিজের ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থী এবং তার ধর্মের পূর্ববর্তী ধর্মগুরুদের শিক্ষার পরিপন্থী। পূর্ববর্তী কোন কোন ধর্মগুরুর বক্তব্য অনুসারে এই প্রটেস্ট্যান্ট ব্যক্তি বিভ্রান্ত (heretic) বলে গণ্য।

সর্বোপরি খৃস্টধর্মে বাইবেলের অতিরিক্ত সকল মৌখিক বর্ণনা বা হাদীস অস্বীকার করার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের দাবি মিথ্যা হতে বাধ্য। কারণ এক্ষেত্রে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের অধিকাংশ মূলনীতিই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের এরূপ ভিত্তিহীন কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে :

(১) সারবস্তু ও মূলে (Substance and essence) পুত্র (যীশুখৃস্ট) পিতার (ঈশ্বরের) সমান।

(২) পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র উভয়ের থেকে নির্গত।

(৩) খৃস্টের দুটি ইচ্ছা ছিল : মানবীয় ও ঐশ্বরিক।

(৫) খৃস্ট মৃত্যুর পরে নরকে প্রবেশ করেন।

অনুরূপ অনেক কাল্পনিক 'ধর্মবিশ্বাস' তাদের রয়েছে। এ সকল বিশ্বাস এরূপ বাক্যে বা শব্দে স্পষ্টত নতুন নিয়মের কোথাও নেই। মৌখিক বিবরণ বা হাদীস ও চার্চীয় প্রচলনই এ সকল বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি।

এ ছাড়া মৌখিক বর্ণনা অস্বীকার করলে তাদেরকে বাইবেলের অনেক অংশ অস্বীকার করতে হবে। যেমন লূকলিখিত সুসমাচার, মার্কলিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর প্রথম থেকে ১৯টি অধ্যায় বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। মার্ক ও লূক খৃস্টের শিষ্য বা সহচর ছিলেন না এবং এ সকল ঘটনা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন নি। অপরদিকে তাঁরা ভাববাদী বা প্রেরিত ছিলেন না, কাজেই ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁরা লিখেন নি। একান্তই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে তাঁরা এগুলো লিখেছেন। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে জেনেছেন।

অনুরূপভাবে শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs) পুস্তকের ২৫ অধ্যায় থেকে ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় তাকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কারণ যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)-এর যুগে সমাজে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে এই অধ্যায়গুলো সংকলন করা হয়। শলোমনের মৃত্যুর ২৭০ বছর পরে এভাবে মৌখিক বর্ণনার উপরে নির্ভর করে এগুলো সংকলন করা হয়।

এই পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "নিম্নলিখিত হিতোপদেশগুলিও শলোমনের; যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা (men of Hezekiah) এইগুলি লিখিয়া লন।"

বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক ১৮৫১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "এ কথা থেকে জানা যায় যে, এই পুস্তকটির শেষে কিছু হিতোপদেশ রয়েছে যেগুলো হিষ্কিয় রাজার নির্দেশে মৌখিক বর্ণনা থেকে সংকলন করা হয়। শলোমনের সময় থেকে হিষ্কিয় রাজার সময় পর্যন্ত মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে এ সকল হিতোপদেশ বর্ণিত ও প্রচলিত হয়েছিল। সেগুলো থেকে কিছু হিতোপদেশ সংকলন করে মূল পুস্তকের 'সংযোজনী' হিসেবে যুক্ত করা হয়। এমনও হতে পারে যে, 'যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা' বলতে যিশাইয়, শিনিয় ও অন্যান্য ভাববাদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা তৎকালে জীবিত ছিলেন। এক্ষেত্রে এই 'সংযোজন'টিও মূলের মত ভিত্তি লাভ করবে। তা নাহলে কিভাবে তাঁরা এগুলোকে পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করলেন।"

আদম ক্লার্কের "রাজা হিষ্কিয়ের নির্দেশে মৌখিক বর্ণনা থেকে সংকলন করা হয়..." কথাটি আমার উপরের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণ করে। এরপর আদম ক্লার্ক বলেছেন : "এমনও হতে পারে..."। তাঁর এ কথাটি ভিত্তিহীন ও বাতিল। কারণ কথাটি একান্তই প্রমাণবিহীন সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। কোনরূপ সূত্র বা প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা ভিন্নমতাবলম্বীর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর কথাটি অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ছাড়া কিছুই নয়।[১৯৪]

তিনি বলেছেন : "তা নাহলে কিভাবে তাঁরা এগুলোকে পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করলেন।" তাঁর এ কথাটিও বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ ইহূদীগণ মৌখিক বর্ণনাকে লিখিত তোরাহের চেয়েও বেশি মূল্য ও মর্যাদা প্রদান করতেন। পূর্বপুরুষ ও ধর্মগুরুদের মাধ্যমে প্রায় ১৭০০ বছর ধরে মৌখিকভাবে বর্ণিত ও প্রচারিত শিক্ষা 'মিশনা' পুস্তকে সংকলন করার পরে পুস্তকটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তোরাহ-এর মতই বা তার চেয়েও বেশি মর্যাদা লাভ করে। ব্যাবিলনীয় জেমারার

---

১৯৪. আদম ক্লার্কের কল্পনাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, উপরন্তু তা বাইবেলের বক্তব্যের পরিপন্থী। কোন ভাববাদী কর্তৃক তা সংকলিত হলে এখানে ভাববাদীর নাম থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কোন ভাববাদীর নাম উল্লেখ না করে 'হিষ্কিয়ের লোকেরা' বলাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এখানে কোন ভাববাদীর ভূমিকা ছিল না।

কাহিনীগুলো ২০০০ বছর ধরে মৌখিক বর্ণনার পরে সংকলন করা হয়েছে। তাহলে মাত্র ২৭০ বছর ধরে মৌখিকভাবে বর্ণিত কথাগুলো সংকলন করে মূল গ্রন্থের সাথে সংযোজন করতে তাদের অসুবিধা কী ছিল ?

কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, লিখিত ধর্মগ্রন্থের ন্যায় মৌখিক বর্ণনাও গ্রহণ করতে হবে। ক্যাথলিক হেরাল্ড পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "ড. ব্রেট একজন প্রসিদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত। তিনি তাঁর পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : বাইবেলের পুস্তকাদি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রথম যুগের বিশপগণ ও প্রেরিতদের শিষ্যগণকে খৃস্টীয় ধর্মের দায়িত্ব বুঝে দেওয়া হয়। এগুলোকে সংরক্ষণ করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তা পৌঁছে দিতে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাইবেলের কোন পুস্তক থেকে পৌলের পুস্তক বা অন্য কোন প্রেরিতের পুস্তক থেকে এ কথা জানা যায় না যে, মুক্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু প্রেরিতগণ একত্রিতভাবে বা পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, অথবা এমন কোন নিয়ম তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুই অলিখিত থাকবে না।

"উক্ত পুস্তকের ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন : আমরা দেখছি যে, পৌল এবং অন্যান্য প্রেরিত যেমন তাঁদের বাণীগুলো লিখিতভাবে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনভাবে তাঁরা মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেও তাঁদের বাণী আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। যারা উভয় প্রকারের বাণী সংরক্ষণ না করে তারা দুর্ভাগা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে খৃস্টীয় মৌখিক বাণীও লিখিত বাণীর মত প্রামাণ্য।"

ড. ব্রেট-এর বক্তব্য এখনেই শেষ।

"বিশপ মোন নেক বলেন : প্রেরিতগণের মৌখিক বক্তব্যও তাঁদের লিখিত বক্তব্যের মতই। কোন একজন প্রটেস্ট্যান্টও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, প্রেরিতগণের মৌখিক শিক্ষা তাঁদের লিখিত শিক্ষার চেয়ে বেশি। গ্রিন্‌ক ভিরতে বলেন, কোন্ সুসমাচার গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি অগ্রহণযোগ্য সে বিষয়ক বিতর্ক একমাত্র মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হয়। মৌখিক বর্ণনাই সকল বিতর্কে সমাধানের ভিত্তি।"

ক্যাথলিক হেরাল্ডের বক্তব্য এখানেই শেষ।

ক্যাথলিক পাদরি টমাস এঙ্গেলস ১৮৫১ সালে মুদ্রিত তাঁর 'সত্যের দর্পণ' নামক পুস্তকের ১৮০ ও ১৮১ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত বিশপ মানিসিক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈশ্বর ধর্মের মধ্যে ৬০০ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং চার্চগুলোতে তা পালিত হয়। এগুলোর একটি বিষয়েও বাইবেলের কোথাও কোন বর্ণনা বা শিক্ষা নেই বলে স্বীকার করতে হবে।"

তাহলে এই পণ্ডিতের স্বীকারোক্তি অনুসারে ধর্মের ৬০০টি বিষয় শুধু মৌখিক বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলো প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নিকটও অবশ্য স্বীকার্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মৌখিক বর্ণনা মুখস্থ রাখার প্রেক্ষাপট

বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আশ্চর্য বিষয় বা যে বিষয়ে মানুষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সে বিষয় অধিকাংশ মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে। অন্যান্য বিষয় সাধারণত অমনোযোগিতার কারণে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে না। যারা সর্বদা এক প্রকারের বা একই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত নন, তাদেরকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন, গতকাল বা গত পরশু আপনারা কি খেয়েছিলেন ? তবে তাদের অধিকাংশ মানুষই এর উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ এই অতি সাধারণ বিষয়টি গুরুত্বহীন হওয়ার কারণে অধিকাংশেরই স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। অধিকাংশ সাধারণ ও নৈমিত্তিক কাজকর্ম ও কথাবার্তার ক্ষেত্রেই এই অবস্থা।

১২৫৯ হিজরীর সফর মাসে, মোতাবেক ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে যে দীর্ঘ পুচ্ছধারী ধুমকেতুটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রায় মাসাধিককাল আকাশে দেখা গিয়েছিল সেই ধুমকেতুটির বিষয়ে যদি আপনি মানুষদেরকে প্রশ্ন করেন তবে অনেকেই সে বিষয়ে বলতে পারবেন। ধুমকেতুটি প্রকাশ পাওয়ার বছর ও মাসের কথা মনে না থাকলেও এর অবস্থাদি সম্পর্কে অনেক কথাই অনেকে বলতে পারবেন, যদিও ধুমকেতুটির প্রকাশ পাওয়ার পরে ২১ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে সকল অস্বাভাবিক বা বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনা, বড় ভুমিকম্প, বড় যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় মানুষের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন অম্লান থাকে।

ধর্মীয় বিষয় মুখস্থ রাখার বিষয়ে মুসলমানদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রথম থেকেই। এজন্য প্রথম যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগেই তাঁরা কুরআন মুখস্থ রাখার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারিয়েছেন। অধিকাংশ দেশেই ধর্মীয় বিষয়ে তাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলোতে লক্ষাধিক হাফিয রয়েছেন যাঁরা পূর্ণ কুরআন কণ্ঠস্থ রেখেছেন। এ বিষয়ে কোন খৃস্টান পণ্ডিতের সন্দেহ হলে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তিনি যদি শুধু মিসরের জামে আযহার বা আযহার মসজিদে প্রবেশ করেন তবে তথায় সর্বদা এক হাজারেরও বেশি হাফিয দেখতে পাবেন যাঁরা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার সাথে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছেন। যদি তিনি মিসরের গ্রামগুলোতে খোঁজ নেন তবে একটি গ্রামও এমন পাবেন না যেখানে কয়েকজন হাফিযে কুরআন নেই। অনেক মিসরীয় শ্রমিক, গাড়িওয়ালা বা মুটে তিনি দেখবেন যাঁরা হাফিযে কুরআন। তিনি যদি সত্য স্বীকার করেন তবে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এ সকল শ্রমিক, গাড়িওয়ালা বা মুটে এ ক্ষেত্রে পোপ, বিশপ ও পাদরিদের চেয়ে উত্তম। বর্তমান যুগ খৃস্টানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের যুগ। এ যুগেও পোপ, বিশপ ও পাদরিগণ বাইবেল মুখস্থ

রাখেন না। আর পূর্ববর্তী যুগগুলোর অবস্থা তো আরো অনেক খারাপ ছিল। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন যে, ৭ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়পর্ব মূর্খতার যুগ। এ সময়ে নিরক্ষরতা ও মূর্খতাই ছিল খৃস্টান ধর্মগুরুদের পরিচয় ও প্রতীক।

আমার ধারণা যে, বর্তমানে উন্নতির যুগেও পুরো ইউরোপে এমন ১০ জন খৃস্টানও পাওয়া যাবে না[১৯৫] যারা নতুন নিয়ম বা পুরাতন নিয়ম, অথবা উভয় নিয়ম মুখস্থ রেখেছেন। এ সকল মিসরীয় শ্রমিক বা মুটে যেভাবে কুরআন মুখস্থ করেছেন এভাবে বিশুদ্ধভাবে উভয় নিয়ম বা একটিমাত্র নিয়ম মুখস্থ রেখেছেন এমন মানুষ আপনি পাবেন না।

প্রথম অনুচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, আরিনাউস (Irenaeus) বলেছেন, "ঈশ্বরের করুণায়, আমি এ সকল বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেছি এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি, কাগজে নয়, বরং আমার হৃদয়ে। আর প্রথম থেকেই আমার অভ্যাস যে, এ সকল বিষয় আমি আমার স্মৃতিতে পুনরাবৃত্তি করি।" তিনি আরো বলেন : "বিভিন্ন জাতির ভাষা যদিও ভিন্ন, তবে অলিখিত মৌখিক বর্ণনা ও রীতি সকল স্থানেই একইরূপ। শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসে ফ্রান্স, স্পেন, পূর্বাঞ্চল, মিসর ও লিবিয়ার চার্চের সাথে জার্মান চার্চের পার্থক্য নেই।"

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত 'যাজকীয় ইতিহাসের' ৩য় অধ্যায়ে উইলিয়াম মূর বলেছেন: "প্রাচীন খৃস্টানদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের কোন লিখিতরূপ ছিল না। মুক্তির জন্য যে বিশ্বাসের প্রয়োজন তার কোন লিখিত রূপ ছিল না। শিশুদেরকে এবং যারা খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতেন তাদেরকে মৌখিকভাবে এগুলো শিক্ষা দেওয়া হতো। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল স্থানেই এগুলো একই প্রকার ছিল। যখন তারা এগুলো লিপিবদ্ধ করলেন এবং মিলিয়ে দেখলেন তখন তারা দেখলেন যে, এগুলোর মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। সামান্য কিছু শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য ছিল না।"

এ থেকে জানা গেল যে, যে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সে বিষয়টি স্মৃতিতে অম্লান ও সংরক্ষিত থাকে, দীর্ঘ সময় বা যুগের কারণে তাতে পরিবর্তন আসে না। কুরআনের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর ১২৮০ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ সময়ে কুরআন যেমন লিখিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনিভাবে তা হাজার হাজার মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। পক্ষান্তরে খৃস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষেরা তো দূরের কথা, তাদের অধিকাংশ বড় বড় পণ্ডিত ও ধর্মগুরুও তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন না, মুখস্থ করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাদের বড় বড় ধর্মগুরুদের অবস্থার দিকে তাকালেই তা জানা যায়।

১৯৫. প্রকৃতপক্ষে একজনও পাওয়া যাবে না। পুরো বাইবেল বা শুধু নতুন নিয়ম মুখস্থ রেখেছেন এমন একজন খৃস্টানও পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত পাদরি মীখাঈল মাশাকা তাঁর ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত 'আদ-দালীল ইলা তা'আতিল ইনজীল' (ইনজীলের আনুগত্যের প্রমাণ) নামক পুস্তকের শেষে ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "একদিন আমি জনৈক (ক্যাথলিক) ধর্মযাজককে বললাম, আমাকে সত্য জবাব দেবেন, আপনি জীবনে কতবার বাইবেল পাঠ করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, 'আগে তিনি মাঝে মাঝে বাইবেল থেকে কিছু পাঠ করতেন। বাইবেলের অনেক পুস্তক তিনি কোনদিনই পাঠ করেন নি। তবে গত ১২ বছর যাবৎ জনগণের সেবায় নিমগ্ন থাকার কারণে তিনি বাইবেল পাঠ করার কোন সুযোগই পান নি।' সাধারণ জনগণের অনেকেই যাজকদের এরূপ মুর্খতার কথা জানেন। এরপরেও যাজকগণ যখন তাদেরকে বাইবেল পাঠে উৎসাহ প্রদানকারী ভাল বই পড়তে নিষেধ করেন, তখন তারা তাদের সে নিষেধ মেনে নেন।"

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিশুদ্ধ হাদীসের পরিচয়

মুসলমানরা সহীহ বা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হাদীসকে ধর্মীয় বিষয়ে গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে মুসলিমগণ অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমরা আমার হাদীস বর্ণনা করা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে, শুধু যা তোমরা নিশ্চিতরূপে জান তা ছাড়া কিছু বলবে না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"

এই হাদীসটি ইসলামী পরিভাষায় 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের। যে হাদীস বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে বহু সংখ্যক তাবিঈ বর্ণনা করেছেন এবং এভাবে অগণিত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। এই হাদীসটি ৬২ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এঁদের মধ্যে ১০ জন প্রসিদ্ধ সাহাবী রয়েছেন যাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতের বিশেষ সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

এ কারণে প্রথম প্রজন্ম থেকেই 'হাদীস' বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থ করার বিষয়ে মুসলিমগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সকল যুগেই কুরআনের বিষয়ে মুসলিমদের আগ্রহ-উদ্দীপনা যেমন বাইবেলের বিষয়ে খৃস্টানদের আগ্রহ-উদ্দীপনার চেয়ে অনেক বেশি, ঠিক তেমনি সকল যুগেই হাদীসের বিষয়েও মুসলিমদের আগ্রহ-উদ্দীপনা খৃস্টধর্মীয় হাদীসের বিষয়ে খৃস্টানদের আগ্রহ-উদ্দীপনার চেয়ে অনেক বেশি।

সাহাবীগণ বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহচরগণ তাঁর মৌখিক নির্দেশাবলি, শিক্ষা, আচরণ ও উপদেশাবলি বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করেছেন ও প্রচার করেছেন, কেউ কেউ কিছু বিষয় লিখেও রেখেছেন। তবে তাঁরা তাঁদের যুগে সেগুলো গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি। এর অন্যতম কারণ ছিল কুরআনের বিশুদ্ধ সংরক্ষণ, যেন লিখিত কোন হাদীসকে কেউ ভুলক্রমে কুরআনের অংশ মনে করে বিভ্রান্ত না হয়।

তাবিয়ীগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণের শিষ্যগণ বা দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংকলন শুরু করেন। এ সকল সংকলকের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব যুহরী (মৃত্যু ১২৪ হি/৭৪২ খৃ), রাবী' ইবনু

সাবীহ (মৃত্যু ১৬০ হি/৭৭০ খৃ), সাঈদ ইবনু জুবায়র (মৃত্যু ৯৫ হি/৭১ খৃ)। তাঁরা প্রাথমিকভাবে তথ্যসূত্র ও বর্ণনাকারীর পরিচয়সহ তাঁদের সমসাময়িক সাহাবীগণ ও দ্বিতীয় প্রজন্মের তাবিয়ীগণ থেকে 'হাদীস' সংগ্রহ ও সংকলন করেন। কিন্তু তাঁরা সংকলিত হাদীস কোনরূপ বিষয় বিন্যাস করে সাজান নি। তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা এ সকল হাদীস বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে সংকলন করেন।

তৃতীয় প্রজন্মের (তাবি-তাবিয়ী) সংকলকদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (মৃত্যু ১৭৯ হি)। তিনি ৯৫ হিজরীতে (৭১৪ খৃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় হাদীস সংকলন করেন। তাঁর সমসাময়িক হাদীস সংকলকদের মধ্যে ছিলেন মক্কায় আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনু আবদুল আযীয ইবনু জুরায়জ (৮০-১৫০ হি), সিরিয়ার আবদুর রাহমান ইবনু আমর আল-আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি), কূফায় সুফিয়ান ইবনু সাঈদ ছাওরী (৯৭-১৬১ হি) এবং বসরায় হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (মৃত্যু ১৬৭ হি)।

তাঁদের পরে যাঁরা হাদীস সংকলন করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হি), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশায়রী (২৬২ হি)। তাঁরা শুধু সহীহ বা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হাদীসগুলো সংকলন করেন। দুর্বল বা সন্দেহযুক্ত হাদীসগুলো পরিত্যাগ করেন।

হাদীস সংকলন, যাচাই ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। 'আসমাউর রিজাল' বা হাদীস বর্ণনাকারিগণের নাম-পরিচয়' নামে হাদীস-বিজ্ঞানের পৃথক শাখায় (প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে) তাঁরা সকল বর্ণনাকারীর পরিচয়, তাঁর ধার্মিকতা, হাদীস বর্ণনায় তাঁর নির্ভুলতার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সকল তথ্য সংকলন করেছেন।[১৯৬] 'সহীহ' হাদীসের সংকলকগণ প্রত্যেকটি হাদীস সনদ বা

১৯৬. দ্বিতীয় প্রজন্ম বা তাবিয়ীগণের যুগ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংকলনে মুসলিম আলিমগণ বা মুহাদ্দিসগণ যাচাই ও নিরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কার্যপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : (১) সংগ্রহ, (২) ব্যক্তি যাচাই, (৩) তথ্য যাচাই ও (৪) সংকলন। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা মুসলিম বিশ্বের সকল শহর ও গ্রামে পরিভ্রমণ করে তাঁরা বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও তাঁর শিক্ষকদের নামসহ 'হাদীস' সংগ্রহ করতেন। বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও তাঁর শিক্ষকদের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের বিশ্বস্ততা যাচাই করতেন। এরপর সংগৃহীত সকল 'হাদীস' তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য যাচাই করতেন। যেমন কূফার এক ব্যক্তি একটি হাদীস বলেছেন এবং দামেশকের এক ব্যক্তি একটি হাদীস বলেছেন। তাঁরা উভয় বর্ণনার তুলনার মাধ্যমে বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাই করতেন, ঠিক যেভাবে ক্রস-একজামিনের মাধ্যমে কোর্টে প্রদত্ত তথ্য ও সাক্ষ্য যাচাই করেন আইনজীবি ও বিচারকগণ। এই প্রক্রিয়ার সংগৃহীত সকল হাদীস ও ব্যক্তি সম্পর্কীয় তথ্যাদি তাঁরা গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। অনেকে সংগৃহীত সকল হাদীস সনদ বা বর্ণনাকারিগণের পরিচয়-সহ সংকলন করেছেন। অনেকে যাচাই বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসগুলোই সংকলন করেছেন। এছাড়া পৃথক গ্রন্থে বর্ণনাকারীদের পরিচয় এবং তাঁদের দেওয়া তথ্যের সাথে অন্যদের দেওয়া তথ্যের তুলনার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি সংকলন করেছেন। এভাবে রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাদিতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জীবন, কর্ম, তাঁদের বর্ণিত হাদীসের পরিসংখ্যান, তাঁদের বর্ণনার নির্ভুলতার মান ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি সংকলন করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা ধর্মীয় তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এর শতভাগের একভাগ সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠা ও নিরীক্ষার প্রমাণও দেখাতে পারে নি।

বর্ণনাকারীদের নামধাম-সহ সংকলন করেছেন। গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত কতজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তিনি হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। বুখারী সংকলিত হাদীস গ্রন্থের অনেক হাদীসই 'তিনব্যক্তির বর্ণিত', অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে মাত্র তিন ব্যক্তি রয়েছেন।[১৯৭]

বিশুদ্ধ বা সহীহ্ হাদীস[১৯৮] তিন প্রকারের : (১) মুতাওয়াতির (অতি প্রসিদ্ধ), (২) মশহূর (প্রসিদ্ধ) ও (৩) খাবারুল ওয়াহিদ (একক বর্ণনা)।

(১) মুতাওয়াতির (অতি-প্রসিদ্ধ) : যে হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক তাবিয়ী থেকে অনেক তাবি-তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সংকলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। কোন যুগেই এতগুলো মানুষের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা বানানোর কোন আশংকা থাকে না। যেমন সালাতের ওয়াক্ত ও রাকআত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়।

(২) মশহূর (প্রসিদ্ধ) : যে হাদীস সাহাবীদের যুগে দু'/চারজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মে (তাবিয়ীদের যুগে) বা তৃতীয় প্রজন্মে (তাবি-তাবিয়ীদের যুগে) তা মুতাওয়াতিরের মতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং

১৯৭. তাবিয়ীগণ বা দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকেই মুহাদ্দিসগণ লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক পাঠ উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষা দিতেন। শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা থেকে হাদীস শিক্ষা তাঁরা হাদীস বর্ণনার সময় 'হাদ্দাছানা' বা আমাদেরকে বলেছেন কথাটি বলতেন। হাদ্দাছানা অর্থ শুধু মৌখিক বর্ণনা নয়, বরং পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে মৌখিক পাঠ শ্রবণ। বিস্তারিত প্রমাণাদির জন্য দেখুন, ড. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর কৃত হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৮৪-৯৬।

১৯৮. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয় : (১) 'আদালত' : হাদীসের সকল রাবী (বর্ণনাকারী) পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) 'যাবত' : তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩) 'ইত্তিসাল' : সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) 'শুযূয মুক্তি' : হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) 'ইল্লাত মুক্তি' : হাদীসটির মধ্যে সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত। প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ তাকে "সহীহ" বা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন। বিস্তারিত দেখুন : ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ. ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীছ, পৃ. ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ ১/২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহহান, তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬-১২৩।

অগণিত মানুষ তা বর্ণনা করেছেন— তাকে 'মশহূর' বা প্রসিদ্ধ বলা হয়। যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান।

(৩) **খাবারুল ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) :** যে হাদীস একজন আরেকজন থেকে বর্ণনা করেছেন, অথবা অনেক মানুষ থেকে একজন বর্ণনা করেছেন বা একজন থেকে অনেক মানুষ বর্ণনা করেছেন তাকে 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক বর্ণনা বলা হয়।

মুতাওয়াতির বা 'অতি-প্রসিদ্ধ' হাদীস সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। এজন্য এই প্রকারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাস (কুফরী) বলে বিবেচিত হয়। মশহূর বা প্রসিদ্ধ হাদীস নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করে। এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা পাপ ও বিভ্রান্তি বলে গণ্য। খাবারুল ওয়াহিদ বা একক বর্ণনা সুনিশ্চিত বা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করে না বরং তা কার্যকর ধারণা প্রদান করে।[১৯৯] এরূপ 'খাবারুল ওয়াহিদ' হাদীসকে কর্ম বিষয়ে গ্রহণ করা হয়, তবে 'ধর্মবিশ্বাস'-এর ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা হয় না। যদি এরূপ হাদীস কোন 'সুনিশ্চিত প্রমাণ' অর্থাৎ কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের অথবা জ্ঞান-বিবেকের সুস্পষ্ট নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তাকে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করা হয়, অথবা তাকে পরিত্যাগ করে সুনিশ্চিত প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয়।[২০০]

---

১৯৯. যে কোন বিচারালয়ে উত্থাপিত মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারক একটি দৃঢ় ধারণা লাভ করেন। তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন যে, এই সম্পদটি সত্যই এই লোকের বলেই মনে হয়, অথবা এই লোকটি সত্যই এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল বলে বুঝা যায়। তিনি এও জানেন যে, তাঁর এই 'ধারণা'র মধ্যে ভুল হতে পারে। সকল বিচারকেরই কিছু রায় ভুল হয়। কিন্তু এ জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন বিচারের রায় প্রদান বন্ধ রাখা হয় না। অনুরূপভাবে সামগ্রিক সনদ বিচার ও অর্থ যাচাইয়ের পরে 'এককভাবে বর্ণিত' সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস অনুরূপ 'কার্যকরী ধারণা' লাভ করেন যে, কথাটি সত্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন। তবে বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের থাকার ক্ষীণ আশংকা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে আশংকা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যত নির্ভুল বলে গণ্য করা হয়। যখন এরূপ বর্ণনা 'অতি-প্রসিদ্ধ' বা 'প্রসিদ্ধ' পর্যায়ের হয় তখন ভুল-ভ্রান্তির সামান্য আশংকাও রহিত হয়।

২০০. প্রকৃত সত্য হলো, মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত 'হাদীস' ইহূদী খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলের সাথেই তুলনীয় বরং 'হাদীসের' বিশুদ্ধতা বাইবেলের বিশুদ্ধতার চেয়েও অধিক প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। শুধু নতুন নিয়মের সাথে তুলনা করলে যে কোন খৃস্টান গবেষককেও স্বীকার করতে হবে যে, মার্কলিখিত সুসমাচার ও লূকলিখিত সুসমাচারের বিশুদ্ধতা স্বীকার করলে হাদীসের বিশুদ্ধতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই দুই সমাচারের লেখক যীশুর প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। যীশুর তিরোধানের প্রায় শতবছর পরে মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে এগুলো সংকলন করেছেন। হাদীসও মুহাম্মাদ (সা)-এর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। তবে বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে এই দুই সুসমাচারের সাথে হাদীসের কিছু পার্থক্য রয়েছে :

প্রথমত, মার্ক ও লূক কার নিকট থেকে শুনে তা সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। তাঁরা সব কথা যে যীশুর শিষ্যদের থেকে শুনেছেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। তাঁদের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকের নিকট থেকেও তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে,

কুরআনের সাথে সহীহ হাদীসের তিনটি পার্থক্য রয়েছে :

প্রথমত, কুরআন পুরোপুরিই 'মুতাওয়াতির'ভাবে বর্ণিত। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-র উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই শতশত সাহাবী তা লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের থেকে হাজার হাজার তাবিয়ী তা সেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। কেউ একটি শব্দকে সমার্থক কোন শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করেন নি। সহীহ হাদীস তদ্রূপ নয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অর্থের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতেন। আরবী ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রয়োজনে একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ

লোকমুখে যা কিছু প্রচলিত হয়েছে, নির্বিচারে বা বিবেকবুদ্ধির বিচারের মাধ্যমে তাঁরা তা গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতা, বিশুদ্ধতা বা বিশ্বস্ততা যাচাই করেন নি। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদীস পৃথকভাবে কার নিকট থেকে শ্রবণ করা তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখনো যে কোন গবেষক যাচাই করতে পারবেন যে, কোন্ ঘটনা কত জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ও কতগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে...।

দ্বিতীয়ত, মার্ক ও লূক তাঁদের গ্রন্থদ্বয় সংকলন করার পর এগুলোর কি অবস্থা ছিল তা মোটেও জানা যায় না। প্রায় ২০০ বছর এগুলোর হালহকিকত কিছুই জানা যায় না। তাঁদের নিকট থেকে কে বা কারা গ্রন্থ দুটি গ্রহণ করেছিল ? তারা কি লিখিত পুস্তক নিয়ে গিয়েছিল, না পুরো বই লেখকের নিকট পড়ে বুঝে নিয়ে গিয়েছিল ? তাদের নিকট থেকে কে বা কারা পুস্তকগুলো গ্রহণ করেছিল ? কিছুই জানা যায় না। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত, খৃস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুলিপিকরণে শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন। এতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলোকে তারা serratum ও Various readings বলে অভিহিত করেন বলে আমরা দেখেছি। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ কখনোই শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেন নি। সর্বদা লিখিত পাণ্ডুলিপি মূল লেখকের নিকট পড়ে অথবা তাঁর মুখ থেকে শুনে নেওয়া ছাড়া কোন হাদীসের বর্ণনা তাঁরা গ্রহণ করতেন না।

ইহূদী ও খৃস্ট ধর্মের মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসের সাথে ইসলাম ধর্মের 'হাদীসে'-র মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইহূদী-খৃস্ট ধর্মের ট্রাডিশন বা মৌখিক বর্ণনা হাজার বছর ধরে মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের হাদীস মুহাম্মাদ (সা)-এর তিরোধানের দুই শতাব্দীর মধ্যেই সংকলিত হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণের মৌখিক বর্ণনার কোনরূপ সূত্র বা তথ্য-নির্দেশনা নেই। কে, কবে, কখন, কার নিকট থেকে কথাটি শুনেছেন, কে বলেছেন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। এজন্য ভিত্তিহীন মিথ্যা, কাল্পনিক কাহিনী ও ধর্মীয় নির্দেশনা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কোন্‌টি বিশুদ্ধ ও কোন্‌টি বানোয়াট তা বিচার করার কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে প্রতিটি হাদীসের তথ্য সূত্র সংরক্ষিত রয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়ে ক'জন ব্যক্তি তা বর্ণনা করেছেন, তা মুতাওয়াতির, মশহুর, না একক বর্ণনা তা নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোপরি সবকিছুই ডকুমেন্টারী, কোন কিছুই কোন ধর্মগুরু বা পণ্ডিতের ব্যক্তিগত রুচি বা মতের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহূদী-খৃস্ট ধর্মে মূল ধর্মগ্রন্থকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, বরং ট্রাডিশন বা হাদীসকেই ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তির মূল মন্ত্রটিও নাকি ধর্মগ্রন্থে নেই। পক্ষান্তরে ইসলামে কুরআনকেই ধর্মবিশ্বাসের মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির ব্যবহারিক ব্যাখ্যার জন্য হাদীস।

ব্যবহার করতেন। মূল হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল।

দ্বিতীয়ত, কুরআন যেহেতু অগণিত মানুষ কর্তৃক 'মুতাওয়াতির'-রূপে বর্ণিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত, সেহেতু কুরআনের একটি বাক্যও অস্বীকার করলে তা ধর্মত্যাগ ও অবিশ্বাস বলে গণ্য। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু মুতাওয়াতির হাদীসই এরূপ পর্যায়ের যা অস্বীকার করলে কুফরী বলে গণ্য হবে। মশহূর ও খাবারুল ওয়াহিদ অস্বীকার করলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না।

তৃতীয়ত, কুরআন যেহেতু আক্ষরিক ও শাব্দিকভাবে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত, সেহেতু কুরআনের শব্দ ও বাক্যের সাথে অনেক ইবাদত জড়িত। যেমন সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠ করতে হয়। এছাড়া কুরআনের শব্দ ও বিন্যাস অলৌকিক। হাদীস তদ্রূপ নয়; হাদীসের অর্থের সাথে ইসলামের বিধিবিধান জড়িত, শব্দের সাথে নয়।

উপরের তিনটি অনুচ্ছেদে পাঠক 'হাদীস' বা মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে ইহূদী, খৃস্ট ও ইসলাম ধর্মের অবস্থা জানতে পারলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে পদ্ধতি ও পর্যায়ে ইসলামে বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় তা কখনোই অবাস্তব বা অন্যায় বলে গণ্য হতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাদীস সম্পর্কে পাদরিগণের বিভ্রান্তির অপনোদন

পাদরিগণ হাদীসের বিষয়ে যে সকল বিভ্রান্তি ছড়ান সেগুলোর অন্যতম ৫টি এখানে আলোচনা করব।

প্রথম বিভ্রান্তি : হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ (সা)-এর স্ত্রীগণ, তাঁর আত্মীয়গণ এবং সহচরগণ। তাঁর পক্ষে এঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

বিভ্রান্তির অপনোদন

হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁদের এই বক্তব্য সামান্য একটু পরিবর্তন করলে তাঁদের বিরুদ্ধেই লাগবে। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে, সুসমাচারগুলোর মধ্যে যীশুখৃস্টের যে সকল কথা, কর্ম বা অবস্থা সংকলিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করেছেন তাঁর মাতা, তাঁর কল্পিত পিতা যোষেফ এবং তাঁর শিষ্যগণ। যীশুর পক্ষে এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়!!

পাদরিগণ হয়ত বলতে পারেন যে, সম্ভবত মুহাম্মাদ (সা)-এর আত্মীয় ও সঙ্গীগণ তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন জাগতিক আধিপত্য ও লাভের উদ্দেশ্যে; কাজেই তাঁদের সততার উপর নির্ভর করা যায় না। পাদরিদের দাবিকৃত এই 'আশংকা' একান্তই ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। মুহাম্মাদ (সা) ১৩টি বছর অত্যন্ত কষ্ট, বেদনা ও কাফিরদের অত্যাচারের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সঙ্গীগণও এ সময়ে কঠিনতম কষ্ট ও বর্বরতম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। এমনকি তাঁদেরকে নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁরা ইথিওপিয়ায় এবং মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, তাঁদের কেউ এ সময়ে জাগতিক কোন লোভে এরূপ করেছেন।

প্রকৃত সত্য কথা যে, পাদরিদের উথাপিত এই আশংকা মূলত যীশুখৃস্টের প্রেরিতগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ তাঁরা ছিলেন দরিদ্র জেলে। তাঁরা ইহুদীদের থেকে শুনেছিলেন যে, খৃস্ট একটি বড় শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই যখন মরিয়মের পুত্র যীশু নিজেকে প্রতিশ্রুত 'খৃস্ট' বা মসীহ বলে দাবি করলেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারলে তারা আগত রাজ্যের বড় বড় পদ অধিকার করতে পারবেন এবং জাল টানা ও মাছ শিকার করার কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।

শুধু তাই নয়, উপরন্তু স্বয়ং যীশুর বিভিন্ন ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা তাঁদের এই আশাকে উজ্জীবিত করে। তিনি ওয়াদা করেন যে, "তিনি যখন প্রতাপের সিংহাসনে বসবেন; তখন তাঁরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবেন।" মথিলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০১] তিনি আরো ওয়াদা করেন যে, যদি কেউ তাঁর জন্য এবং তাঁর সুসমাচারের জন্য জাগতিক ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে, তবে সে এই পার্থিব জগতেই সেগুলোর শতগুণ বেশি লাভ করবে। আর আগত পারলৌকিক জীবনে অনন্ত জীবন লাভ করবে। মার্কলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০২]

অনুরূপভাবে আরো অনেক কিছুর তিনি ওয়াদা করেন। এ সকল ওয়াদা থেকে তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেন যে, অচিরেই তাঁরা শাসকে পরিণত হবেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে ইস্রায়েলীয়দের এক এক বংশের উপর রাজত্ব করবেন। এই রাজত্ব অর্জনের পথে তাঁর অনুসরণ করতে যেয়ে এখন যদি তাঁদের সাময়িক কিছু ক্ষতি হয় তবে অচিরেই তাঁরা তা শতগুণে লাভ করবেন। এই বিশ্বাস তাঁদের মন-মগজে এত গভীর ছিল যে, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন অথবা তাঁদের মাতা— সুসমাচার লেখকগণের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে[২০৩]–যীশুর কাছে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন যে, তিনি যখন ক্ষমতা লাভ করবেন তখন দু' ভাইয়ের একজন যেন তাঁর দক্ষিণ দিকে এবং অপরজন যেন তাঁর বাম দিকে উপবেশনের অধিকার পায়। মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে এবং মার্কলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু শেষদিকে তাঁরা দেখলেন যে, তাঁদের সেই কাল্পনিক রাজত্ব লাভের কিছুই হলো না। এ জগতে শতগুণ ধন-সম্পদ লাভও হলো না। স্বয়ং যীশুও কোন রাজত্বই লাভ করতে পারলেন না। তিনি নিজেই অসহায় দুর্বল অবস্থায় ইহূদীদের ভয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা দেখলেন যে, রাজত্ব পাওয়া তো দূরের কথা, ইহূদীরা তাঁকে গ্রেফতার করে হত্যার আয়োজন করছে। তখন তাঁরা

---

২০১. মথি ১৯.২৮।

২০২. মার্ক ১০/২০-৩০ : "যীশু বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে; সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে।"

২০৩. মথি লিখেছেন যে, সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা যীশুর কাছে বিষয়টি যাচ্ঞা করেন। পক্ষান্তরে মার্ক লিখেছেন যে, সিবদিয়ের পুত্রদ্বয় নিজেরাই যীশুর কাছে বিষয়টি যাচ্ঞা করেন। দেখুন : ২/২০-২১; মার্ক ১০/৩৫-৩৭।

বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা যা বুঝেছিলেন তা সবই ভুল ছিল। যীশুর ওয়াদাগুলো সবই ছিল মটকার মত যাকে পিপাসার্ত পানি মনে করে। যখন এভাবে তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হলো, তখন তাঁদের একজন কাল্পনিক রাজত্ব ও অলীক 'শতগুণ বৃদ্ধি'র পরিবর্তে ৩০টি রৌপ্যমুদ্রাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সেগুলোর বিনিময়েই যীশুকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে রাজি হলেন। ইহূদীরা যখন তাঁকে গ্রেফতার করে তখন বাকিরাও তাঁকে রেখে পালিয়ে যায়। যীশুর সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে মহান শিষ্য, তাঁর মণ্ডলীর (চার্চের) ভিত্তিপ্রস্তর, তাঁর মেষপালের রক্ষক এবং তাঁর প্রতিনিধি, মহামতি মহাপবিত্র সাধু পিতর তিন বার তাঁকে অস্বীকার করেন, অভিশাপ প্রদান করেন এবং শপথ করে বলেন যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি না। তাঁদের নেতার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তাঁদের সকল কল্পনা নষ্ট হয়ে যায় ও তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান।

পুনরুত্থিত হওয়ার পরে যখন তাঁরা আবার তাঁকে দেখতে পান, তখন আবারও তাঁদের রাজত্বের স্বপ্ন-সাধ ফিরে আসে। তাঁরা ধারণা করেন যে, এবারে হয়ত তাঁরা রাজা-বাদশাহ হয়ে যাবেন। এজন্য ঊর্ধ্বারোহণের সময়ে তাঁরা একত্রিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন ?" প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের প্রথম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০৪]

যীশুর ঊর্ধ্বরোহণের পূর্ব পর্যন্ত 'জাগতিক বাদশাহী' অর্জিত না হলেও, ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রেরিতগণ 'জাগতিক বাদশাহী'-র চেয়েও বড় এক কল্পনায় জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা কল্পনা করেন যে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই যীশুখৃষ্ট আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অতি নিকটবর্তী। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অচিরেই যীশুখৃস্ট পুনরায় আগমন করে খ্রীষ্টারি (Antichrist) বা দাজ্জালকে বধ করবেন, এক হাজার বছরের জন্য দিয়াবল বা শয়তানকে বন্দি করবেন, তাঁর অবতরণের পরে তাঁরা সকলে সিংহাসনে উপবেশন করবেন এবং এই এক হাজার বছর সুখে-শান্তিতে এই পৃথিবীতে বসবাস করবেন। যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্যের ১৯ ও ২০ অধ্যায়[২০৫] এবং করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ৬ অধ্যায়ের ২ আয়াত থেকে এ সকল বিষয় বুঝা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এরপর, দ্বিতীয় উত্থানের পরে, স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁরা অনন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করবেন।

এ কারণেই তাঁরা যীশুখৃষ্টের প্রশংসায় এবং তাঁর অবস্থাদি বর্ণনায় অতিকথন ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন। যেমন চতুর্থ সুসমাচারের লেখক যোহন বলেছেন : "যীশু

২০৪. নিজেরাই যীশুর কাছে বিষয়টি যাঞ্চা করেন। দেখুন : মথি ২/২০-২১; মার্ক ১০/৩৫-৩৭। প্রেরিত ১/৬।

২০৫. প্রকাশিত বাক্য ১৯/১১-২১ ও ২০/১-১৫।

আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এতে গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে, জগতেও তাহা ধরিত না।"[২০৬]

নিঃসন্দেহে কথাটি একান্তই মিথ্যা এবং আপত্তিকর কাব্যিক অতিরঞ্জন। এভাবেই তাঁরা তাঁর বিষয়ে অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলতেন সাধারণ নির্বোধ সরল মানুষদেরকে তাঁদের জালের মধ্যে আবদ্ধ করার জন্য। এভাবে করতে করতেই তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের রাজত্ব, সিংহাসন কিছুই তাঁরা লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তাঁদের সাক্ষ্যের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

উপরে যা কিছু বললাম সবই খৃস্টান পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদনে তর্কের খাতিরে বললাম। এগুলি আমার বিশ্বাস নয়। আমি অনেকবারই এ কথা বলেছি। যীশু এবং তাঁর প্রকৃত প্রেরিতদের ক্ষেত্রে যেমন এরূপ সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের ক্ষেত্রেও এরূপ সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতায় সন্দেহ সৃষ্টির জন্য পাদরিগণ সাহাবীগণের বিষয়ে দ্বাদশ ইমাম পন্থী শী'আদের আপত্তিকর কথাবার্তা উদ্ধৃত করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন। এর উত্তরে প্রথমত আমরা বলব যে, শী'আদের ভিত্তিহীন প্রমাণবিহীন কথাবার্তা যদি সাধারণ মুসলিমদের জন্য মান্য করা বাধ্যতামূলক হয়, তবে খৃস্ট ধর্মের বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কথাবার্তাও সাধারণ খৃস্টানদের মান্য করা বাধ্যতামূলক হবে। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মের ভিত্তিই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে।

ঐতিহাসিক মোশিম তাঁর পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন : "এবোনাইট সম্প্রদায় (Ebionites) প্রথম খৃস্টীয় শতকে বিদ্যমান ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, যীশু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। অন্যান্য মানুষ যেমন তাদের পিতামাতার সন্তান, যীশুও তেমনি মরিয়ম ও যোষেফের স্বাভাবিক সন্তান ছিলেন। তারা বিশ্বাস করত যে, মোশির ব্যবস্থার অনুসরণ শুধু ইহূদীদেরই দায়িত্ব নয়, বরং অন্যদেরও দায়িত্ব। মোশির ব্যবস্থার সকল বিধান পালন করাই মুক্তির একমাত্র পথ। যেহেতু পৌল মোশির ব্যবস্থা পালনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এ বিষয়ে এবোনাইটদের সাথে কঠিন বিতর্কে লিপ্ত হতেন, সেহেতু তারা পৌলকে অত্যন্ত নিন্দা করত এবং কঠিনভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করত।"

লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "প্রাচীন ধর্মগুরুগণ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এই সম্প্রদায় পৌলকে এবং পৌলের পত্রাবলিকে প্রত্যাখ্যান করত।"

---

২০৬. যোহন ২১/২৫।

বেল তাঁর ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনায় লিখেছেন : "এই সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্য থেকে শুধু তোরাহ-কে মানত। তারা দায়ূদ, যিরমিয় ও যিহিস্কেল-এর নামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করত। নতুন নিয়মের শুধু 'মথিলিখিত সুসমাচার' তারা মানত। কিন্তু তারা এই সুসমাচারটিকে অনেক স্থানে বিকৃত করে নিয়েছিল। তারা এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বাদ দিয়ে দিয়েছিল।"

বেল তাঁর ইতিহাসে 'মারসিওনীয় সম্প্রদায়' (Marcionites)-এর বর্ণনায় বলেন: "এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, দু'জন ঈশ্বর বিদ্যমান : একজন কল্যাণের স্রষ্টা এবং অন্যজন অকল্যাণের স্রষ্টা। তারা বলত যে, তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্য সকল পুস্তক অকল্যাণের স্রষ্টা দ্বিতীয় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। এগুলো সবই নতুন নিয়মের বিরোধী।"

অতঃপর বেল বলেন: "এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরে যীশুখৃস্ট নরকে গমন করেন। তিনি নরক থেকে (ভ্রাতৃহন্তা আদমপুত্র) কয়িনকে এবং (সমকামী) সদোমবাসীদেরকে মুক্ত করেন। কারণ তারা তাঁর কাছে এসেছিল এবং তারা অমঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বরের আনুগত্য করতো না। পক্ষান্তরে যীশু (নিহত আদমপুত্র) হেবল, নোহ, অবরাহাম ও অন্য সকল প্রাচীন ভাববাদী ও সৎ মানুষকে নরকের মধ্যে রেখে আসেন। কারণ এঁরা প্রথম দলের মানুষদের বিরোধিতা করেছিল। এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, যে ঈশ্বর যীশুকে প্রেরণ করেছিলেন তিনিই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা নন (বরং বিশ্বের স্রষ্টা দু'জন : মঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বর ও অমঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বর)। এজন্য তারা পুরাতন নিয়মের কোন গ্রন্থই ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ বলে বিশ্বাস করত না। আর নতুন নিয়মের শুধু লূকলিখিত সুসমাচারটি মানত, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় তারা মানত না। তারা পৌলের দশটি পত্র মানত। তবে সেগুলোর মধ্যে যে সকল কথা তাদের মতের বিরোধী সেগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করত।"

লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মানিকীয় সম্প্রদায়ের (Manichees/Manichaen) বর্ণনায় অগাস্টিনের (St Augustine) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলত যে, মোশিকে যিনি তোরাহ দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয় ভাববাদীদের সাথে যিনি কথা বলেছেন তিনি ঈশ্বর নন, বরং একটি শয়তান বা দিয়াবল। এরা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোকে মান্য করত, তবে সেগুলোর মধ্যে বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি প্রবেশ করেছে বলে স্বীকার করত। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো থেকে যে সকল কথা তাদের পছন্দ হতো সেগুলো তারা গ্রহণ করত এবং বাকি বিষয় বাদ দিত। কিছু মিথ্যা গসপেল বা সুসমাচারকে তারা নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সুসমাচারের চেয়ে অগ্রগণ্য বলে মনে করত। তারা বলত যে, এগুলোই নির্ভেজাল সত্য গসপেল।"

এরপর লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের এই খণ্ডেই বলেন, ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এই সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকে কোন সময়েই স্বীকার করত না। আরক্লাসের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল নিম্নরূপ : 'শয়তান ইহূদী-ভাববাদিগণকে ধোঁকা দিয়েছিল। শয়তানই মোশির সাথে এবং ইহূদী ভাববাদিগণের সাথে কথা বলেছিল।' যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতে যীশু বলেন : "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু।" খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তারা এভাবে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণকে 'চোর ও দস্যু' ঘা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত বলে বিশ্বাস করত।

খৃস্টানদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থাও একইরূপ। তবে আমি এখানে শুধু এই তিনটি সম্প্রদায়ের কথাই উল্লেখ করলাম। কারণ তিন সংখ্যাটির সাথে খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের মিল রয়েছে। এখন আমার বক্তব্য যে, এ সকল সম্প্রদায়ের বক্তব্য কি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় গ্রহণ বা স্বীকার করবেন ? এ সকল কথার ভিত্তিতে কি তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস সংশোধন করবেন ? যদি তা হয় তবে তাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলো স্বীকার করতে হবে :

(১) যীশু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। যোষেফের ঔরসে মরিয়মের গর্ভে স্বাভাবিকভাবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

(২) মুক্তির জন্য তোরাহ-এর ব্যবস্থা অনুসারে কর্ম করা অত্যাবশ্যক।

(৩) পৌল অত্যন্ত খারাপ মানুষ ছিলেন। তার রচিত পত্রগুলো রহিত করা জরুরী।

(৪) ঈশ্বর দুইজন, একজন কল্যাণের স্রষ্টা ও অন্যজন অকল্যাণের স্রষ্টা।

(৫) যীশুর মৃত্যুতে কয়িন ও সদোমবাসীরা নরকের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করেছে, তবে হেবল, নোহ, অব্রাহাম ও প্রাচীন যুগের সকল ধার্মিক মানুষের আত্মা যীশুর মৃত্যুর পরেও নরকে অব্যাহতভাবে শাস্তিভোগ করছে।

(৭) তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্য সকল পুস্তক শয়তানের পক্ষ থেকে পাওয়া।

(৮) মোশি ও অন্যান্য ইস্রায়েলীয় ভাববাদীদের সাথে যিনি কথা বলেছিলেন তিনি ঈশ্বর নন, বরং শয়তান।

(৯) নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে বিকৃতি প্রবেশ করেছে।

(১০) নতুন নিয়মের সুসমাচার চারটি ছাড়াও বিশুদ্ধ নির্ভেজাল সত্য গসপেল রয়েছে।

যদি এ সকল কথা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকার্য না হয়, তবে কোন কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত কথা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলিমদের গ্রহণ করতে হবে ? বিশেষত সাহাবীদের বিরুদ্ধে তাদের এ সকল কথা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলির বিরোধী এবং শীআদের পবিত্র ইমামগণের বক্তব্যের বিরোধী।

সম্মানিত পাঠক! কুরআন বারংবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, বড় বড় সাহাবীরা কখনোই ঈমান বা ইসলামের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নি। এখানে আমি এ বিষয়ক কিছু আয়াত উল্লেখ করছি :

(১) সূরা তাওবায় মহান আল্লাহ্ বলেন : "মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহা-সাফল্য।"২০৭

এখানে আল্লাহ্ প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

প্রথম বিষয় : তাঁদের প্রতি আল্লাহ্র প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টি।

দ্বিতীয় বিষয় : আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের সন্তুষ্টি।

তৃতীয় বিষয় : তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

চতুর্থ বিষয় : জান্নাতে তাঁদের অনন্ত ও চিরস্থায়ী অবস্থান।

নিঃসন্দেহে আবূ বক্র সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান যুন্নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে আলী (রা)-ও প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব এই চারটি বিষয় তাঁদের চার জনের জন্যই সমানভাবে প্রমাণিত এবং তাঁদের চারজনেরই খিলাফতের বৈধতা প্রমাণিত। কাজেই কেউ যদি প্রথম তিনজনের নিন্দা করে বা তাঁদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলে তবে এই আয়াতের ভিত্তিতে তার বক্তব্য বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

(২) সূরা তাওবার মধ্যে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন : "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি। সেথায় তারা অনন্তকাল স্থায়ী হবে। আল্লাহ্র নিকটেই আছে মহা-পুরস্কার।"২০৮

---

২০৭. সূরা তাওবা, ১০০ আয়াত।

২০৮. সূরা তাওবা, ২০-২২ আয়াত।

এখানে আল্লাহ্ হিজরতকারী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদকারী মু'মিনদের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

প্রথম বিষয় : তাঁদের মর্যাদা অধিকতর।

দ্বিতীয় বিষয় : তাঁরা সফলকাম।

তৃতীয় বিষয় : তাঁদের জন্য আল্লাহ্র দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের সুসংবাদ।

চতুর্থ বিষয় : চিরস্থায়ীভাবে অনন্তকাল তাঁদের জান্নাতে অবস্থানের সুসংবাদ। এই স্থায়িত্বের বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতে সমার্থক তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে : 'স্থায়ী সুখ-শান্তি', 'চিরস্থায়ী' ও 'অনন্তকাল'।

নিঃসন্দেহে প্রথম তিন খলীফা হিজরতকারী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদকারী মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেমন চতুর্থ খলীফা আলী (রা) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁদের সকলের জন্যই এই চারটি বিষয় প্রমাণিত।

(৩) সূরা তাওবার অন্য স্থানে আল্লাহ্ বলেছেন : "কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে; এটাই মহা-সাফল্য।"[২০৯]

এখানে আল্লাহ্ মুজাহিদ মু'মিনদের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

প্রথম বিষয় : কল্যাণ তাঁদের জন্য।

দ্বিতীয় বিষয় : তাঁরা সফলকাম।

তৃতীয় বিষয় : জান্নাতের ওয়াদা।

চতুর্থ বিষয় : জান্নাতে অনন্ত ও চিরস্থায়ী অবস্থান।

নিঃসন্দেহে তাঁরা তিনজন-প্রথম তিন খলীফা–মুজাহিদ মু'মিনদের অন্যতম ছিলেন। কাজেই এই চারটি বিষয় তাঁদের জন্য প্রমাণিত।

(৪) সূরা তাওবায় অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে তার বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এই মহা-সাফল্য। তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সাজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা,

২০৯. সূরা তাওবা, ৮৮-৮৯ আয়াত।

অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।"২১০

এখানে আল্লাহ্ মুজাহিদ মু'মিনদেরকে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তাঁদের জন্য নয়টি গুণ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু খলীফাত্রয় মুজাহিদ মু'মিন ছিলেন সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, এ সকল গুণ তাঁদের মধ্যে ছিল এবং তাঁরা জান্নাতের সফলতা লাভ করবেন।

(৫) সূরা হজ্জে আল্লাহ্ বলেছেন : "তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে...। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকার্যের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে।"২১১

এখানে ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে, আনসারদেরকে বুঝানো হয় নি; কারণ তাঁরা এভাবে ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হন নি। এখানে মুহাজিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করলে তাঁরা চারটি কাজ করবেন : সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকার্যে আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা। আল্লাহ্ খলীফা চতুষ্টয়কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা এই চারটি কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা সত্যপন্থী ও সঠিক ছিলেন। আল্লাহ্ এখানে বলেছেন যে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল তা আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছাতেই হয়েছিল এবং সকল কিছুর পরিণামই তাঁর হাতে। তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্ব সদা প্রতিষ্ঠিত।

(৬) সূরা হজ্জে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : "এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি। এ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!"২১২

এখানে আল্লাহ্ সাহাবীগণকে 'মুসলিম' বলে নামকরণ করেছেন।

২১০. সূরা তাওবা, ১১১-১১২ আয়াত।

২১১. সূরা হাজ্জ, ৪১ আয়াত।

২১২. সূরা হাজ্জ, ৭৮ আয়াত।

(৭) সূরা নূরে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যার অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"[২১৩]

এখানে 'তোমাদের মধ্য থেকে' কথা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে যে সকল মু'মিন জীবিত ও বিদ্যমান ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আল্লাহ্ এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। তাঁরা সবাই নয়, বরং তাঁদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ 'প্রতিনিধিত্ব' বা 'স্থলাভিষিক্তি' লাভ করবেন।

এখানে আল্লাহ্ বললেন, তিনি এদেরকে 'খলীফা' অর্থাৎ 'প্রতিনিধি' বা 'স্থলাভিষিক্ত' বানাবেন। এ থেকে জানা যায় যে, এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে (কারণ তাঁর পরেই তো তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের প্রশ্ন আসে)। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। কাজেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব বলতে এখানে 'নবুওয়ত' বুঝানো হয় নি, বরং 'ইমামত' বুঝানো হয়েছে। এখানে 'তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন' থেকে... 'তারা আমার সাথে কোন শরিক করবে না' পর্যন্ত সবগুলো সর্বনামে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীর (সা) পরে যাঁদেরকে এভাবে ইমামত বা খিলাফত প্রদান করবেন তাঁরা তিনজনের কম হবেন না; কারণ আরবীতে তিনের কমকে বহুবচন করা হয় না।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে...'। এখানে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁদেরকে শক্তি, ক্ষমতা ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদান করবেন। এ থেকে জানা যায় যে, এ সকল ইমাম বা খলীফা শক্তি, ক্ষমতা ও বিশ্বব্যাপী প্রতিপত্তি অর্জন করবেন।

আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন।" এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সকল ইমামের যুগে যে দীন প্রতিষ্ঠিত ও আচরিত হবে সে দীন আল্লাহ্র মনোনীত দীন।

আল্লাহ্ বলেছেন : "তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।" এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের ইমামত, খিলাফত বা শাসনামলে তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবেন, তাঁরা কোন ভয়-ভীতির মধ্যে

---

২১৩. সূরা নূর, ৫৫ আয়াত।

থা‍কবেন না এবং 'তাকিয়্যাহ' আত্মরক্ষামূলক মিথ্যা কথা বলারও কোন প্রয়োজন তাঁদের যুগে থাকবে না।

আল্লাহ্ বলেছেন : "তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।" এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের খিলাফত বা শাসনামলে তাঁরা মু'মিন থাকবেন, মুশরিক হবেন না।

এভাবে এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পরের চার খলিফার ইমামত বা প্রতিনিধিত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে প্রথম তিন খলীফা : আবূ বক্‌র সিদ্দীক, উমার ফারূক এবং উসমান যুন্নুরাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ইমামত ও শাসন প্রমাণিত হয়। কেননা এই আয়াতে প্রতিশ্রুত 'সুদৃঢ়করণ' তাঁদের সময়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় বিজয়, পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রতাপ, দীনের বিজয় ও প্রকাশ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা তাঁদের যুগে যেভাবে ছিল ৪র্থ খলীফা আলী (রা)-এর যুগে সেভাবে ছিল না। তাঁর পবিত্র যুগে তিনি বিদ্রোহী মুসলিমদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতে বাধ্য হন। ফলে বিজয় ও নিরাপত্তার ধারা ব্যাহত হয়।

এভাবে এই আয়াত দ্বারা খলীফা চতুষ্টয়ের ইমামত প্রমাণিত হয়। কাজেই প্রথম তিন খলীফার বিরুদ্ধে শীআদের ভিত্তিহীন কথাবার্তা এবং শেষ দুই খলীফা উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে খারিজী সম্প্রদায়ের ভিত্তিহীন কথাবার্তা মোটেও গ্রহণেযোগ্য নয়।

(৮) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে সকল মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন, তাঁদের বিষয়ে সূরা ফাতহে আল্লাহ্ বলেন : "যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা, অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন, আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ়-স্থায়ী করলেন, এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।"[২১৪]

এখানে আল্লাহ্ এ সকল সাহাবী সম্পর্কে চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

প্রথম বিষয় : আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভে তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে শরিক ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় : তাঁদের ঈমানের সাক্ষ্য। আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা মু'মিন।

তৃতীয় বিষয় : তাকওয়ার বাক্য তাঁদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত যা কখনোই তাঁদের থেকে পৃথক হবে না।

---

২১৪. সূরা ফাত্‌হ, ২৬ আয়াত।

চতুর্থ বিষয় : তাকওয়ার বাক্যের জন্য তাঁরা ছিলেন অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

নিঃসন্দেহে আবূ বক্‌র (রা) ও উমার (রা) এ সকল সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। কাজেই এই চারটি বিষয় উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীদের সাথে তাঁদের জন্যও প্রমাণিত। কেউ যদি এর বিপরীত কোন বিশ্বাস তাঁদের সম্পর্কে পোষণ করে তবে তার বিশ্বাস বাতিল ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৯) সূরা ফাতহের মধ্যে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : "মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের পরিচিতি চিহ্ন রয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাবে।"২১৫

এখানে আল্লাহ্ সাহাবীগণের প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা কাফিরদের বিষয়ে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু-সাজদায় রত থাকেন। যদি কেউ নিজেকে কুরআনে বিশ্বাসী ও মুসলিম বলে দাবি করার পরেও সাহাবীদের বিষয়ে এর বিপরীত কোন ধারণা পোষণ করে তবে নিঃসন্দেহে সে বিভ্রান্ত।

(১০) সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ বলেন, "কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"২১৬

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সাহাবীগণ ঈমান ভালবাসতেন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতা ঘৃণা করতেন এবং তাঁরা সৎপথ অবলম্বনকারী ছিলেন। সাহাবীদের বিষয়ে এর বিপরীত কোন বিশ্বাস পোষণ করা বিভ্রান্তি।

(১১) সূরা হাশরে আল্লাহ্ বলেন : "অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যপরায়ণ। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।"২১৭

---

২১৫. সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত।

২১৬. সূরা হুজুরাত, ৭ আয়াত।

২১৭. সূরা হাশর, ৮-৯ আয়াত।

এই আয়াতে আল্লাহ্ মুহাজির ও আনসারদের ৬টি গুণ উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন :

প্রথম : এ সকল মুহাজিরের হিজরত বা দেশত্যাগ জাগতিক কোন স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনাতেই তাঁরা হিজরত করেন।

দ্বিতীয় : তাঁরা আল্লাহ্র দীন ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন।

তৃতীয় : তাঁরা কথা-কর্মে সামগ্রিকভাবে সত্যপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন।

চতুর্থ : যাঁরা হিজরত করে মদীনায় গমন করেছিলেন আনসারগণ তাঁদের ভালবাসতেন।

পঞ্চম : মুহাজিরগণ কোন কিছু লাভ করলে আনসারগণ খুশি হতেন।

ষষ্ঠ : আনসারগণ নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

এ সকল দরিদ্র মুহাজির আবূ বক্র (রা)-কে বলতেন, হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ সকল মুহাজির সত্যবাদী ছিলেন। কাজেই আবূ বকরের এই উপাধিও সত্য হওয়া জরুরী। আর এমতাবস্থায় আবূ বকরের ইমামতে সন্দেহ পোষণের কোন সুযোগ থাকে না।

(১২) সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ বলেন : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[২১৮]

এখানে আল্লাহ্ সাহাবীগণকে তিনটি গুণ উল্লেখ করে প্রশংসা করলেন :

প্রথম: তাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মত।

দ্বিতীয়: তাঁরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করতেন এবং অসৎকার্যে নিষেধ করতেন।

তৃতীয়: তাঁরা আল্লাহে বিশ্বাস করতেন।

এরূপ আরো অনেক আয়াতে সাহাবীগণের সততা, ঈমান ও ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আমি ভয় পাই যে, এ বিষয়ক অন্যান্য আয়াত উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, এজন্য আমি যীশুর প্রেরিতদের সংখ্যানুসারে এখানে ১২টি আয়াত উল্লেখ করলাম।

শীআ সম্প্রদায়ের মানুষেরা আলী (রা) ও তাঁর বংশের যে সকল মহান ব্যক্তিকে ইমাম বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা সকলেই সাহাবীগণের সততা ও ধার্মিকতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখন আমি শীআদের 'পাঁচ-পবিত্র'-র সংখ্যানুসারে শীআ সম্প্রদায়ের ইমামগণ থেকে ৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করব।

২১৮. সূরা আলে-ইমরান, ১১০ আয়াত।

(১) 'নাহজুল বালাগা' নামক গ্রন্থটি শীআ সম্প্রদায়ের একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তক।[২১৯] এই পুস্তকে আলীর (রা) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আল্লাহ্ পুরস্কৃত করুন 'অমুককে'। তিনি (১) বক্রতাকে সোজা করেছেন, (২) মনের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করেছেন, (৩) সুন্নত (রাসূলুল্লাহ্ সা-এর বিশুদ্ধ রীতি) প্রতিষ্ঠা করেছেন, (৪) বিদ'আত (ইসলামের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্তিকর মত বা কর্ম) পশ্চাতে রেখেছেন, (৫) পরিচ্ছন্ন পোশাকে প্রস্থান করেছেন, (৬) অতি অল্প ভুলত্রুটিতে আক্রান্ত হয়েছেন, (৭) কল্যাণ অর্জন করেছেন, (৮) অকল্যাণ থেকে বিমুক্ত থেকেছেন, (৯) আল্লাহ্র আনুগত্য আদায় করেছেন, (১০) সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং তিনি প্রস্থান করেছেন জাতিকে বহুমুখি পথের সামনে রেখে, যেখানে বিভ্রান্ত পথ পায় না, কিন্তু সুপথপ্রাপ্ত নিশ্চিত হতে পারে।"

প্রসিদ্ধ শীআ পণ্ডিত ও 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার মায়সাম ইবনু আলী আল-বাহরানী (৬৮১ হি/১২৮ খৃ) এবং 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের অন্যান্য অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এখানে 'অমুক' বলতে আবূ বক্র (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, 'অমুক' বলতে এখানে 'উমার' (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।[২২০] সর্বাবস্থায় এখানে আলী (রা) আবূ বক্র (রা) বা উমার (রা)-এর ১০টি গুণ উল্লেখ করেছেন। এগুলো অবশ্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আবু বক্র (রা) বা উমার (রা)-এর মৃত্যুর পরেই আলী (রা) এ সকল গুণের কথা বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা এরূপই ছিলেন এবং আলীর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে সত্যপরায়ণ ও সঠিক ইমাম ও খলীফা ছিলেন।

(২) আলী ইবনু ঈসা আল-আরদাবীলী (৬৯২ হি/১২৯৩ খৃ) একজন প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ইমামপন্থী শীআ ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীআগণ তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বলে গণ্য করেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ "কাশফুল গুম্মাহ ফী মা'রিফাতিল আইম্মাহ" (ইমামদের পরিচয়ে অন্ধকারের অপসারণ)। এই

---

২১৯. হিজরী পঞ্চম শতকে 'আলীর (রা) বক্তৃতা-সংকলন'-রূপে এই পুস্তকটি প্রকাশ পায়। বইটির সংকলক কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মনে করা হয় যে, বাগদাদের প্রসিদ্ধ শীআ নেতা আলী ইবনুল হুসাইন শরীফ মুরতাযা (৩৫৫-৪৩৬ হি) আলী (রা)-র বক্তৃতার সংকলন হিসেবে বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, মুরতাযার ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন শরীফ রাযী (৩৫৯-৪০৬ হি) বইটি সংকলন করেন।

২২০. আবূ বক্র (রা) ও উমার (রা)-এর বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগের শীআদের ঘৃণা এত বেশি ছিল যে, তাঁদের নাম নেওয়াকেও তাঁরা পাপ ও অপবিত্র কাজ বলে মনে করত। এজন্য আলী (রা)-এর এই বক্তব্য থেকে মূল নামটি তারা মুছে ফেলে সেখানে 'অমুক' শব্দ উল্লেখ করেছে। এভাবেই সংকলক বক্তৃতাটি সংকলন করেছেন। এজন্য শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন : "ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ আল-বাকির[২২১]-কে তরবারিতে কারুকার্য করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তা করা যায়; কারণ আবূ বক্র সিদ্দীক নিজের তরবারি কারুকার্য করাতেন। তখন বর্ণনাকারী বলেন, আপনি এভাবে আবূ বক্রকে 'সিদ্দীক' (মহা-সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক) উপাধিতে ভূষিত করছেন ? তখন ইমাম বাকির নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক। যে ব্যক্তি তাঁকে সিদ্দীক বলবে না, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন কথাই সত্য বলে গ্রহণ করবেন না।"

এখানে ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আবূ বক্র (রা) সত্যিকার 'সিদ্দীক' বা মহা-সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক ছিলেন। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মিথ্যাবাদী।

(৩) 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) এক পত্রে আবূ বক্র (রা) ও উমার (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, "আল্লাহ্র শপথ, ইসলামে তাঁদের দু'জনের মর্যাদা অত্যন্ত মহান। তাঁদের সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলা ইসলামের জন্য বড় কঠিন আঘাত। আল্লাহ্ তাঁদের উভয়কে তাঁদের মহান কর্মগুলির জন্য পুরস্কার প্রদান করুন।"

(৪) মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-হুরর আল-আমিলী (১১০৪ হি/ ১৬৯৩ খৃ) হিজরী একাদশ শতকের প্রসিদ্ধতম দ্বাদশ-ইমাম পন্থী শী'আ ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-ফুসূল আল-মুহিম্মাহ ফী উসূলিল আইম্মাহ" (ইমামগণের মূলনীতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ)। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ বাকির (১১৪ হি) কিছু মানুষকে দেখতে পান যে,তারা আবূ বক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সমালোচনা করছে। তিনি তাদেরকে বলেন, কুরআনে মুমিনদেরকে তিন দলে বিভক্ত করা হয়েছে : মুহাজির, আনসার ও পরবর্তী মুমিন যারা মুহাজির ও আনসারদের জন্য দু'আ করেন ও তাঁদের ভালবাসেন। তোমরা (এই তিন দলের) কোন্ দলের তা আমাকে বল। তোমরা কি সে সকল মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "মুহাজিরগণ যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে'[২২২]? তারা বলে : না, আমরা তা নই।

---

২২১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দৌহিত্র ইমাম হুসায়নের পৌত্র মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনু আলী যায়নুল আবেদীন (৫৭-১১৪ হি/৬৭৬-৭৩২ খৃ)। শী'আ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ইমামগণের পঞ্চম ইমাম। পূর্ববর্তী চার জন : (১) আলী (রা), (২) আলীর পুত্র হাসান (রা), (৩) আলীর পুত্র হুসায়ন (রা) এবং (৪) হুসায়নের পুত্র (বাকিরের পিতা) আলী যায়নুল আবেদীন (রা)।

২২২. সূরা হাশর, ৮ আয়াত।

তখন তিনি বলেন, তাহলে তোমরা কি সে সকল আনসারদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন : "মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাঁরা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে"[২২৩]? তারা বলে, না, আমার তাও নই।

তখন তিনি বলেন, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিলে যে, কুরআনে উল্লিখিত এই দুই দলের সাথে তোমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। আর আমি তোমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কুরআনে উল্লিখিত তৃতীয় দলের সাথেও তোমাদের সম্পর্ক নেই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন : "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোন হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি পরম দয়ার্দ্র ও মহা করুণাময়।"[২২৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম বাকিরের ঘোষণা অনুসারে, যে ব্যক্তি আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা), উমার ফারূক (রা) বা উসমান যুন্নূরায়ন (রা)-এর বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তিকর কথা বলবে সে কুরআন প্রশংসিত এই তিন দলের বহির্ভূত বিভ্রান্ত বলে গণ্য হবে।

(৫) হাসান আল-আসকারী (২৩১ হি/ ৮৪৫ হি-২৬০ হি/ ৮৭৪ খৃ) ছিলেন দ্বাদশ ইমামপন্থী শী'আগণের একাদশ ইমাম। তাঁর লিখিত বলে 'কাশফুল হুজুব ফিত-তাফসীর' (তাফসীরের পর্দা উন্মোচন) নামে একটি 'তাফসীরগ্রন্থ' শী'আদের মধ্যে প্রচলিত। এই গ্রন্থে রয়েছে : "আল্লাহ্ আদম (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে অবগত করান যে, মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণকে যারা ভালবাসবে তাদেরকে আল্লাহ্ মহান সীমাহীন করুণা ও প্রেরণা প্রদান করবেন। বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সৃষ্টি যদি কাফির হতো আর তাদেরকে যদি সেরূপ করুণা ও প্রেরণা প্রদান করা হতো তবে তাতে তাদের পরিণতি শুভ হয়ে যেত, তারা আল্লাহে বিশ্বাস করার সৌভাগ্য লাভ করত এবং জান্নাত লাভ করত। আর কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধর, পরিজন এবং সাহাবীগণকে, অথবা তাঁদের কোন একজনকে বিদ্বেষ করে বা অপছন্দ করে আল্লাহ্ তাকে এত কঠিন ও ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করবেন, যে শাস্তি বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করে দিলে সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যেত।"

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তিলাভের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবার, বংশধর এবং তার সাহাবীগণ সকলকেই ভালবাসতে হবে। শুধু এক শ্রেণীকে ভালবাসলে মুক্তি

২২৩. সূরা হাশর, ৯ আয়াত।

২২৪. সূরা হাশর, ১০ আয়াত।

লাভ হবে না। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে একজনকেও বিদ্বেষ করা ধ্বংস ও শাস্তির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবার ও সাহাবীগণের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন এবং তাঁদের ভালবাসার উপরেই মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য আমাদেরকে প্রদান করুন।২২৫

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : হাদীসের সংকলকগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবস্থা ও অলৌকিক কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখেন নি এবং তাঁর কথাবার্তাও সরাসরি শুনেন নি বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর মৃত্যুর ১০০ বা ২০০ বছর পরে বহুমুখে ও লোক-পরম্পরায় বর্ণিত এ সকল কথা শ্রবণ করেছেন ও সংকলন করেছেন এবং তাঁরা এরূপ বর্ণনার অর্ধেকই অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।

বিভ্রান্তির অপনোদন

(মৌখিক বর্ণনা ঢালাওভাবে অগ্রহণযোগ্য বলার বা উড়িয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই ; বরং যাচাই বাছাই করে মৌখিক বর্ণনা গ্রহণ করা মানব সভ্যতার সকল শাখারই মূলনীতি। বিশেষত খৃস্টান পাদরিগণের ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনাকে ঢালাওভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করা আত্মহননের সমতুল্য।) পাঠক ইতোপূর্বে জেনেছেন যে,

২২৫. সাহাবীগণের সততা ও ধার্মিকতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যেমন কুরআনের অগণিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, তেমনি তা মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথেও সাংঘর্ষিক। সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ মূলত 'বিশ্বজনীন' মানবীয় মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না কোন মানুষের বিষয়ে মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে, ততক্ষণ তাকে 'সত্যবাদী' বলে গণ্য করতে হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। 'তার সাথে তার ভাইয়ের মামলা বা শত্রুতা আছে' এই অভিযোগে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বর্ণিত সংবাদ বা তথ্য বাতিল করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ এই নীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ পরস্পরে যুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন বিরোধিতা ও জাগতিক সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু কখনো কোনভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কোন অবস্থাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলেছেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে যারা বিষোদগার করেন, তারা একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, অমুক সাহাবী হাদীসের নামে মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ইতিহাসে সাহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিত রয়েছে। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলেছেন বলে কোন তথ্য প্রমাণিত হয় নি। কাজেই তাঁদের দেওয়া তথ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কোন সাধারণ সন্দেহের ভিত্তিতে, হয়ত তিনি মিথ্যা বলেছেন এই ধারণার উপরে কারো সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সাহাবীগণ নিজেরাই হাদীস গ্রহণ ও বিচারের সময় তা নিরীক্ষা করতেন। অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনা তাঁরা অনেক সময় যাচাই করেছেন। একটি ঘটনাতেও কারো ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা বা জালিয়াতি ধরা পড়ে নি। মানবীয় দুর্বলতা, ক্রোধ, দলাদলি ইত্যাদি এক বিষয় আর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা জালিয়াতি অন্য বিষয়। সাহাবীগণের সত্যবাদিতা, সততা ও এক্ষেত্রে তাঁদের আপোষহীনতা ইতিহাস খ্যাত। হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতা ছিল অতুলনীয়।

মূলধারার ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট মৌখিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। প্রচলিত সুসমাচারগুলি বা নতুন নিয়ম থেকেই মৌখিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় মৌখিক বর্ণনার অগ্রহণযোগ্যতা দাবি করলেও তাদের ধর্মমতের মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি প্রমাণ করতে তারা মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতে বাধ্য। বিশপ মানিসিকের মতে এরূপ বিষয়ের সংখ্যা ৬০০। শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs) পুস্তকের ২৫ অধ্যায় থেকে ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় শলোমনের মৃত্যুর ২৭০ বছর পরে যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)-এর যুগে শুধু মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে সংকলন করা হয়। মার্কলিখিত সুসমাচার, লূকলিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্য বিবরণের ১৯টি অধ্যায় মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। পাঠক আরো জেনেছেন, যে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সে বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে এবং দীর্ঘ সময়েও তা ভুল হয় না।

হাদীসের বিষয়ে পাঠক জেনেছেন যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ বা তাবিঈগণই হাদীস সংকলন শুরু করেন, তবে তাঁরা সেগুলি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করেন নি। তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ বা তাবি-তাবিঈগণ তা বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে সংকলন করেন। এঁদের সংকলনের উপর নির্ভর করেই বুখারী ও তৃতীয় শতকের সংকলকগণ শুধু সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলি পৃথকভাবে সংকলন করেন এবং দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলি পরিত্যাগ করেছেন। সহীহ হাদীসের সংকলকগণ প্রতিটি হাদীস সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্র-পরম্পরাসহ উল্লেখ করেছেন। 'রিজাল শাস্ত্র' নামে হাদীস বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী ও হাদীস বর্ণনায় তাঁদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে, যা থেকে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব। পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যে পদ্ধতিতে মুসলমানরা বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসকে গ্রহণ করেন তাতে কোন আপত্তির সুযোগ নেই।

পাদরিগণ বলেন : "হাদীস সংকলকগণ বহুমুখে লোকপরম্পরায় বর্ণিত এ সকল কথা শ্রবণ করেছেন এবং সংকলন করেছেন এবং তাঁরা এরূপ বর্ণনার অর্ধেকই অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।"

তাঁদের এ কথা ভুল। কারণ হাদীস সংকলক বা মুহাদ্দিসগণ বহুমুখে 'মুতাওয়াতিরভাবে' বর্ণিত একটি বর্ণনাও বাতিল করেন নি বরং 'বহুমুখে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' হাদীস তাঁদের নিকট অবশ্যই গ্রহণীয় ও পালনীয়। তবে হ্যাঁ, তাঁরা পরিপূর্ণ সূত্রবিহীন দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন । আর 'দুর্বল' বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। খৃস্টান ধর্মগুরুগণও তা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক দেখেছেন যে, আদম ক্লার্ক বলেছেন : "এ কথা সুপ্রমাণিত-সুনিশ্চিত যে, প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। অসত্য ও মিথ্যা 'সুসমাচারের' আধিক্যই লূককে তাঁর সুসমাচার লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্তরেরও বেশি এইরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফ্যাবারিসিয়াস এ সকল মিথ্যা সুসমাচার একত্রে সংকলন করে তিন খণ্ডে মুদ্রণ করেছেন।"২২৬

তৃতীয় বিভ্রান্তি : যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি গোঁড়ামি পরিত্যাগ করেন তবে জানতে পারবেন যে, অধিকাংশ হাদীসেরই অর্থ সত্য ও বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

বিভ্রান্তির অপনোদন

সহীত হাদীসের মধ্যে একটি হাদীসও নেই, মানবীয় জ্ঞান যার অর্থ অসম্ভব বলে

২২৬. মুসলিম উম্মাহর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিচার-পদ্ধতি এবং খৃষ্টানদের সুসমাচার ও পত্রাবলির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিচার-পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, খৃস্টান পণ্ডিতগণ একান্তই মন-মর্জির উপরে নির্ভর করে কোনটি সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন এবং কোনটি বাতিল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। একে তাঁরা 'অর্থ বিচার' বা 'অর্থগত সমালোচনা' বলে দাবি করেন। অমুক'সুসমাচার', 'পুস্তকটি' বা 'পত্রটি'র অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ আমার পছন্দ বা মতের সাথে মিলে না, কাজেই তা বাতিল এবং অমুক সুসমাচার, পুস্তক বা পত্রটির অর্থ সঠিক, কাজেই তা সঠিক। পক্ষান্তরে মুসলিম মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি 'হাদীস' প্রথমে সূত্রগত নিরীক্ষা করেছেন এবং এরপর অর্থগত নিরীক্ষা করেছেন। প্রথমেই তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে 'বক্তব্য'টির সূত্র বিচার করেছেন। বক্তব্যটি কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? অন্য কেউ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কিনা ? বর্ণনাকারীর সকল বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে কিনা ? ইত্যাদি বিষয় তাঁরা প্রথমে যাচাই করেছেন। যাচাইয়ে যদি বক্তব্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না হয়, তবে তার অর্থ যত সুন্দর বা পছন্দসই হোক তাঁরা তা গ্রহণ করেন নি। আর যাচাইয়ে যদি বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা তার অর্থ বিচার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ, দুর্বল বা মিথ্যা কোন বর্ণনাই মুছে ফেলেন নি। সকল বর্ণনাই তাঁরা সনদসহ সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। কেউ কেউ শুধু বিশুদ্ধ হাদীস পৃথকভাবে সংকলন করেছেন, তবে কেউই দুর্বল বা মিথ্যা বর্ণনার 'অস্তিত্বের অধিকার' অস্বীকার করেন নি। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ তাঁদের মন-মর্জি বা মতামতের বাইরে সকল বর্ণনার অস্তিত্বের অধিকার অস্বীকার করেছেন। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের পুড়িয়েছেন, হত্যা করেছেন বা অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছেন। তৃতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। ফলে বর্তমান যুগেও যে কোন হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মতামত পুনরালোচনার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যও বিনষ্ট করেছেন। ফলে বর্তমানে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো পুনর্বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। কিসের ভিত্তিতে তাঁরা নতুন নিয়মের পুস্তক ও পত্রগুলো গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য অগণিত সুসমাচার বা পত্র বাতিল করলেন তার কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই।

প্রমাণ করতে পারে। হ্যাঁ, কিছু অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার কথা আছে এবং জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা ও অদৃশ্য জগতের কিছু কথা আছে যার তুলনীয় কোন বিষয় পৃথিবীতে নেই। তাঁরা যদি দাবি করেন যে, এ সকল বিষয় জ্ঞান-বিরোধী তবে তাঁদেরকে প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং আমরা তার উত্তর দেব। আর যদি বলেন, এ সকল বিষয় অতি-প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক বা পৃথিবীতে এর কোন নমুনা পাওয়া যায় না, তবে তা কোন আপত্তিকর বিষয় হতে পারে না। কারণ কোন বিষয় স্বাভাবিক হলে তো আর তা অলৌকিক চিহ্ন বলে গণ্য হয় না।

মোশির যষ্টি সাপে পরিণত হলো এবং মিসরীয় মন্ত্রবেত্তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করল এবং আবার পুনরায় তা যষ্টিতে পরিণত হলো, এতে যষ্টিটির আকৃতি একটুও বাড়ল না। এগুলো এবং মোশির অন্য সকল অলৌকিক চিহ্ন কি অতি-প্রাকৃতিক এবং অস্বাভাবিক নয়? পরজগতের কোন বিষয়কে এই জগতের সাথে তুলনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তবে যদি কোন বিষয় মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক বা জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং নিশ্চিত প্রমাণ তা পরজগতেও অসম্ভব বলে প্রকাশ করে তবে তা ভিন্ন কথা। এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া শুধু এ জগতে নেই, কাজেই পরজগতেও থাকতে পারে না বলে দাবি করা অযৌক্তিক প্রগলভতা ছাড়া কিছুই নয়।

পৃথিবীর অবস্থাই চিন্তা করুন। পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল ভিন্ন। এক অঞ্চলে যা নেই অন্য অঞ্চলে তা বিদ্যমান। এজন্য এক অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অন্য অঞ্চলের অদ্ভুৎ বা আশ্চর্য বিষয় শুনলে তা অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে করে বরং অনেক সময় সরাসরি তার অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা অস্বীকার করে। তবে যদি বহুসংখ্যক মানুষের মুখে শোনে তবে হয়ত স্বীকার না করে পারে না।

অনেক বিষয় আছে যা এক সময়ে অসম্ভব হলেও অন্য সময়ে নয়। বর্তমান যুগে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে জলপথে জাহাজের মাধ্যমে যেভাবে দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করা যায় এবং ইঞ্জিন চালিত গাড়িতে স্থলপথে যে দ্রুততার সাথে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় তা ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে মানুষের কাছে একেবারে অসম্ভব ও কল্পনাতীত ছিল। অনুরূপভাবে টেলিগ্রাম আবিষ্কার হওয়ার আগে তারের মাধ্যমে এক দুই মিনিটে এত দূরে খবর পৌঁছানো অসম্ভব ছিল। বর্তমানে এ সকল আবিষ্কার ও ব্যবহারের পরে কেউ আর তা অসম্ভব বলে গণ্য করেন না।

সত্যিকার কথা এই যে, এ সকল পাদরি বাস্তব চিন্তা বর্জন করেন। তাঁরা অস্বাভাবিক ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য চিন্তা করতে চান না। নিজেদের মনে যা কিছু অস্বাভাবিক বলে কল্পনা করেন তাকেই তাঁরা অসম্ভব বলে দাবি করেন। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এই অভ্যাসটি গ্রহণ করেছেন তাঁদেরই স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকদের থেকে। তবে অবাক কাণ্ড যে, এ সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে

ও বৈপরীত্যের সামান্য কিছু উদাহরণ ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে তাঁরা তাঁদের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অবাস্তব বিষয়গুলো নিয়ে যে উপহাস করেন তাও তাঁরা দেখতে চান না। কিন্তু ইউরোপীয় নাস্তিকগণ যে পদ্ধতিতে বাইবেলের বিষয়গুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন, তাঁরা সেই পদ্ধতিতেই মুসলিমদের সাথে আচরণ করেন। অথচ কুরআন বা হাদীসের যে সকল বিষয় তাঁরা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে চান তার চেয়েও অনেক বেশি অবাস্তব বাইবেলের বিষয়গুলো যেগুলোকে ইউরোপীয় নাস্তিকগণ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন। ইউরোপীয় নাস্তিকগণ বাইবেলের যে সকল বিষয় নিয়ে উপহাস করেন, সেগুলোর কয়েকটি উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করছি :

(১) গণনা পুস্তকের ২২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৮ তখন সদাপ্রভু গর্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন, এবং সে বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম যে, তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে ? ২৯ বিলিয়ম গর্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছ; আমার হস্তে যদি খড়গ থাকিত, তবে আমি এখনই তোমাকে বধ করিতাম। ৩০ পরে গর্দভী বিলিয়মকে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্যন্ত যাহার উপরে চড়িয়া থাক, আমি কি তোমার সেই গর্দভী নহি ? আমি কি তোমার প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া থাকি ? সে কহিল, না।"

হর্ন ১৮২২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "কিছু দিন যাবৎ অবিশ্বাসিগণ গর্দভীর কথা বলা নিয়ে উপহাস করছে।"

(২) ১ রাজাবলির ১৭ অধ্যায়ে এলিয় ভাববাদীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে কাকেরা তাঁর জন্য প্রাতঃকালে রুটি ও মাংস এবং সন্ধ্যাকালেও রুটি ও মাংস এনে দিত।[২২৭]

এই বিষয়টি ইউরোপীয় নাস্তিকদের নিকট একটি হাস্যকর বিষয় মাত্র। এমনকি বাইবেল ব্যাখ্যাকার হর্নও এ সকল নাস্তিকের মতের দিকে ঝুঁকেছেন এবং তিনি তিনটি কারণে বাইবেলের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারদের মত বাতুল বলে গণ্য করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

(৩) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে-আমি ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ থেকে তা উদ্ধৃত করছি[২২৮] : "৪ পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ তাহার উপর রাখ; যতদিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবে, ততদিন তাহাদের অপরাধ বহন করিবে। ৫ আমি তাহাদের অপরাধ-বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্য দিনের সংখ্যা, অর্থাৎ তিন শত নব্বই দিন রাখিলাম; এইরূপে

২২৭. ১ রাজাবলি ১৭/২-৭।

২২৮. অনুবাদে উইলিয়াম কেরীর বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করেছি।

তুমি ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ বহন করিবে। ৬ সেই সকল সমাপ্ত করিলে পর তুমি আপন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে, এবং যিহূদা-কুলের অপরাধ বহন করিবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য রাখিলাম। ৭ আর তুমি আপন মুখ যিরূশালেমের অবরোধের দিকে রাখিবে, আপন বাহু অনাবৃত করিবে, ও তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী বলিবে। ৮ আর দেখ, আমি রজ্জু দিয়া তোমাকে বদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি যাবৎ তোমার অবরোধের দিন সমাপ্ত না করিবে, তাবৎ এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ফিরিবে না। ৯ আর তুমি আপনার কাছে গম, যব, মাষ, মসুরি, কঙ্গু ও জনার লইয়া সকলই এক পাত্রে রাখ, এবং তাহা দ্বারা রুটি প্রস্তুত কর; যতদিন পার্শ্বে শয়ন করিবে, ততদিন, অর্থাৎ তিনশত নব্বই দিন, তাহা ভোজন করিও। ১০ তোমার খাদ্য পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা করিয়া ভোজন করিতে হইবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা পান করিবে। ১১ আর জলও পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ হিনের ষষ্ঠাংশ করিয়া পান করিতে হইবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা পান করিবে। ১২ আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে (And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man, in their sight)।"

এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বর যিহিষ্কেল ভাববাদীকে তিনটি নির্দেশ প্রদান করলেন :

প্রথম নির্দেশ : তিনি তাঁর বাম পার্শ্বের উপর ৩৯০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের পাপের কষ্ট বহন করবেন। অতঃপর তিনি ডান পার্শ্বের উপর ৪০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং যিহূদীয়দের পাপ বহন করবেন।[২২৯]

দ্বিতীয় নির্দেশ : তিনি যিরূশালেম অবরোধের দিকে মুখ করে থাকবেন, তাঁর হস্তদ্বয় উন্মুক্ত থাকবে এবং অবরোধের দিনগুলো সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই থাকবেন, ডানে বামে কোন পাশে ফিরতে পারবেন না।

তৃতীয় নির্দেশ : এই দীর্ঘ ৩৯০ দিন তিনি মানুষের মল দ্বারা পিঠা তৈরি করে তা ভক্ষণ করবেন।

ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই বিধানগুলো নিয়ে হাসি-তামাশা ও উপহাস করেন। তারা দাবি করেন যে, এগুলো কখনোই ঐশ্বরিক বিধান হতে পারে না। এগুলো

২২৯. এক জন বা এক জাতির পাপ অন্য ব্যক্তি কিভাবে বহন করতে পারে ? তাহলে তো পাপী মহানন্দে পাপ করবে এবং মাঝে মাঝে দু একজন নিষ্পাপ ভাববাদী এসে তার পাপের জন্য দু' এক বছর মল-মূত্র ভক্ষণ করবেন! তাতেই তাদের পাপের ক্ষমা হয়ে যাবে! সবচেয়ে হতভাগা ধার্মিক ব্যক্তি! যে কষ্ট করে সৎ জীবন যাপন করে এবং এরপরও পাপীর সাথে একত্রেই তাকে স্বর্গে থাকতে হবে! হিটলার ও মাদার তেরেসা সকলেরই এক গতি!! এরূপ কুসংস্কার কী কোন বিবেকবান মানুষ বিশ্বাস করতে পারেন ?

মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক অত্যন্ত ফালতু বিষয়। ঈশ্বর কখনো তাঁর একজন পবিত্র সাধু ভাববাদীকে ৩৯০ দিন যাবৎ মানুষের মল দিয়ে তৈরি পিঠা ভক্ষণের নির্দেশ দিতে পারেন না। এছাড়া আর কোন তরকারী কি মোটেও ছিল না ? তবে হ্যাঁ, তীতের প্রতি প্রেরিত পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে মহামতি সাধু পৌলের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মলমূত্রও পবিত্র মানুষদের জন্য পবিত্র ও ভাল খাদ্য।

কিন্তু এরপরও সমস্যা থাকে। এই যিহিষ্কেল ভাববাদীর মাধ্যমেই ঈশ্বর জানিয়েছেন : "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে-(The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the inequity of the father, neither shall the father bear the inequity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him)"। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে কথাগুলো রয়েছে। তাহলে ঈশ্বর সেই ভাববাদীকে কিভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ৪৩০ দিবস ধরে ইস্রায়েলীয় ও যিহূদীয় বংশের সকল মানুষের পাপের শাস্তি ও কষ্ট বহন করবেন ?

(৪) যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে তিন বছর যাবত বিবস্ত্র-উলঙ্গ ও নগ্নপদ থাকতে নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তিনি চলাফেরা ও ভ্রমণ করতে থাকেন।[২৩০] ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিগণ এই বিধানটি নিয়েও হাসি-মশকরা ও উপহাস করে থাকেন। তাঁরা উপহাস করে বলেন, এ কথা কি সম্ভব যে, ঈশ্বর তাঁর কোন ভাববাদী-যার জ্ঞানবুদ্ধি এখনো অবশিষ্ট আছে, যে এখনো পাগল হয় নি-তাঁকে নারী, পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকল মানুষদের মধ্যে এভাবে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তিন বছর যাবৎ ভ্রমণ করে বেড়াতে নির্দেশ দেবেন ?

(৫) হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর এই ভাববাদীকে নির্দেশ দেন একজন বেশ্যা-ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করার এবং ব্যভিচারের সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করার।[২৩১] এই পুস্তকেরই ৩য় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর এই ভাববাদীকে আবার নির্দেশ দেন এমন একজন ব্যভিচারিণী মেয়ের

২৩০. যিশাইয় ২০/২-৪।

২৩১. হোশেয় ১/২-৩।

সাথে প্রেম করতে যার স্বামী আছে এবং স্বামী তাকে ভালবাসে, কিন্তু মেয়েটি ব্যভিচারিণী।[২৩২]

অথচ লেবীয় পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে ১৩ ও ১৪ আয়াতে যাজকের বিষয়ে বলা হয়েছে : "আর সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ করিবে। বিধবা, কি পতি ত্যক্তা, কি ভ্রষ্ট স্ত্রী, কি বেশ্যা, ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিবে না; সে আপন লোকদের মধ্যে এক কুমারীকে বিবাহ করিবে।" মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ে রয়েছে : "যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।"[২৩৩]

তাহলে কিভাবে স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর একজন ভাববাদীকে এরূপ ব্যভিচারিণী মহিলাকে বিবাহ করতে এবং ব্যভিচারী মহিলার সাথে প্রেম করতে নির্দেশ দিলেন ?

এরূপ অনেক অবাস্তব ও অবান্তর কথা বাইবেলের মধ্যে রয়েছে, যেগুলোকে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিগণ 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দেন। আগ্রহী পাঠক ইচ্ছা করলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এ বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করতে পারেন।

চতুর্থ বিভ্রান্তি : অনেক হাদীস কুরআনের বিপরীত। যেমন

(১) কুরআনে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোন অলৌকিক চিহ্ন (মুজিযা) দেখান নি। অথচ বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে যে, তিনি অনেক অলৌকিক চিহ্ন (মুজিযা) দেখিয়েছেন।

(২) কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ পাপী (না'উযু বিল্লাহ্!) ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন।

(৩) কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথমে মুহাম্মাদ ﷺ বিভ্রান্তি ও মুর্খতার মধ্যে ছিলেন। যেমন সূরা দুহায় বলা হয়েছে : "তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।"[২৩৪] অনুরূপভাবে সূরা শূরায় বলা হয়েছে : "তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি, কিন্তু আমি একে করেছি আলো, যদ্দারা আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি।"[২৩৫] অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঈমানের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর থেকে অনেক অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে।

---

২৩২. হোশেয় ৩/১।

২৩৩. মথি ৫/২৮।

২৩৪. সূরা দুহা, ৭ আয়াত।

২৩৫. সূরা শূরা, ৫২ আয়াত।

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য প্রমাণের জন্য পাদরি মহোদয়দের সকল চেষ্টা পরিশ্রমের চূড়ান্ত ফলাফল এগুলি। এত পরিশ্রম করেও তাঁরা এ ছাড়া আর কোন বৈপরীত্য খুঁজে বের করতে পারেন নি।[২৩৬]

বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথম ও দ্বিতীয় বিভ্রান্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত খৃষ্টান পাদরিগণের বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম। এজন্য আমি এই বিষয় দুটি ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করতে চাই। পাঠক সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

তৃতীয় বিভ্রান্তিটির অপনোদনে নিম্নে বিষয়গুলি লক্ষ্যনীয়[২৩৭] :

প্রথম আয়াতে ضالا অর্থ পথ সম্পর্কে অনবহিত। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সমাজের মানুষের পৌত্তলিকতা, অনাচার, অশ্লীলতা ও জুলুম-অত্যাচারে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মানব জাতির ইহ-পারলৌকিক মুক্তির পথের বিষয়ে চিন্তা করতেন। তবে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়েছেন যে, তিনি এই অবস্থায় তাঁকে পথের সন্ধান দান করেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কাফির বা অবিশ্বাসী ছিলেন। শুধু ضالا অর্থাৎ পথহারা বা পথ-সম্পর্কে অনবহিত বলা হলে তদ্বারা সুস্পষ্ট

---

২৩৬. বৈপরীত্য তিন পর্যায়ের : প্রথম পর্যায়ের বৈপরীত্য সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাতীত, যেমন ১০০ এবং ১০০০ এর মধ্যে বৈপরীত্য। কেউ যদি বলেন, অমুক স্থানে ১০০ মানুষ রয়েছেন, আবার পরে বলেন, তথায় ১০০০ মানুষ রয়েছেন, তবে তা সুস্পষ্টভাবে স্ববিরোধী। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈপরীত্য অস্পষ্ট, যেমন 'অনেক' ও 'অল্প'-এর মধ্যে বৈপরীত্য। কেউ যদি বলেন, সেখানে অনেক মানুষ রয়েছে, আবার পরে বলেন, সেখানে 'অল্প' মানুষ রয়েছে, তবে তার কথার মধ্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা অনুভব করা গেলেও তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। কারণ তিনি 'অনেক' এবং 'অল্প' বললেও নির্ধারিত কোন সংখ্যা বলেন নি। তৃতীয় পর্যায়ের বৈপরীত্য কাল্পনিক, যেমন, 'বহুসংখ্যক' ও 'কিছুসংখ্যক'-এর মধ্যে বৈপরীত্য। যেখানে বাইবেলের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের বৈপরীত্যের সংখ্যা হাজার হাজার, সেখানে পাদরিগণ কুরআনের মধ্যে বা কুরআন ও সহীহ হাদীসের মধ্যে এ পর্যায়ের কোন বৈপরীত্য আবিষ্কার করতে না পেরে তৃতীয় পর্যায়ের কিছু বিষয় বৈপরীত্য হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেন। এ পর্যায়েরও তাঁরা এরূপ সামান্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২৩৭. তৃতীয় বিষয়টির বিভ্রান্তি ও ফাঁক স্পষ্ট। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্যই নেই। কুরআনে বলা হয়েছে যে, ওহী লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম, শরীয়ত বা ব্যবস্থা জানতেন না। এর বিপরীতে কোন হাদীসেই বলা হয় নি যে, ওহী লাভ করার আগে তিনি নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, শরীয়ত বা ব্যবস্থা জানতেন বা পালন করতেন। পক্ষান্তরে হাদীসে বলা হয়েছে যে, জন্ম থেকেই আল্লাহ্র বিভিন্ন অনুগ্রহ তিনি লাভ করেছেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক বিষয় সংঘটিত হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআনে কোথাও বলা হয়নি যে, তিনি ওহী প্রাপ্তির পূর্বে আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বস্তুত খৃষ্টান পাদরিগণ কোন সুস্পষ্ট বৈপরীত্য খুঁজে না পেয়ে এরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন।

বা অস্পষ্ট কোনভাবেই 'অবিশ্বাসী' বুঝানো হয় না। কাজেই এই আয়াতকে পুঁজি করে বৈপরীত্য কল্পনা করার সুযোগ নেই। এ ছাড়া এই আয়াতের ব্যাখ্যার অনেক দিক রয়েছে :

প্রথম ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ছোটবেলায় আমি একবার আমার দাদা আবদুল মুত্তালিবকে হারিয়ে ফেলি। প্রচণ্ড ক্ষুধায় আমি মরণাপন্ন হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় আল্লাহ্ আমাকে দাদার সন্ধান মিলিয়ে দেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ, "তুমি তোমার শরীয়ত বা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ও অজ্ঞ ছিলে। ওহী, ইলহাম বা ঈশ্বরিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আপনি সে বিষয়ে কিছু জানতেন না। আল্লাহ্ তোমাকে এরূপ অবস্থায় পেয়ে তোমাকে তোমার শরীয়তের পথের সন্ধান প্রদান করেন। তিনি কখনো সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এবং কখনো অন্তরের মধ্যে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তোমাকে তোমার শরীয়ত বা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করেন। বায়যাবী, কাশ্শাফ ও জালালাইন এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তাফসীরে বায়যাবীতে রয়েছে : "তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন শরীয়তের বিধিবিধানের জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি ওহী ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তোমাকে সে বিষয়ে জ্ঞান দান করে পথের নির্দেশ দিলেন।"

আরবী ভাষায় এবং কুরআনে এরূপ ব্যবহারের অনেক নযির রয়েছে। এই অর্থেই মূসা (আ) বা মোশি নিজেকে ضالا অর্থাৎ পথহারা বা পথ সম্পর্কে অনবহিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথার উত্তরে মূসা (আ) বলেন : "আমি তো তা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ (ব্যবস্থা সম্পর্কে অনবহিত) ছিলাম।"[২৩৮]

তৃতীয় ব্যাখ্যা : বিভ্রান্ত, পথহারা ইত্যাদি অর্থ ছাড়াও হারিয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া ইত্যাদি অর্থেও ضل শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আরবীতে বলা হয়, ضل الماء فى اللبن। দুধের মধ্যে পানি হারিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এ অর্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যা, তুমি মক্কার মানুষদের মধ্যে সাধারণ একজন মানুষ ছিলে। এরপর আল্লাহ্ তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমার ধর্মকে প্রকাশিত করেছেন। এই অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে, পুনরুত্থান অস্বীকারকারী অবিশ্বাসিগণ বলে : "আমরা যখন মাটির মধ্যে পথহারা হয়ে যাব, অর্থাৎ মিশ্রিত-অবলুপ্ত হয়ে যাব, এরপরেও কি আবার আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে" ?[২৩৯]

চতুর্থ ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ, তুমি নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব থেকে অজ্ঞ ছিলে। তুমি এ বিষয়ে জানতে না বা কোন আশাও করতে না। তোমার অন্তরে এ বিষয়ে কোন কল্পনাও আসে নি। ইহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করত যে, ভাববাদিত্ব ইস্রায়েল

২৩৮. সূরা শু'আরা, ২০ আয়াত।

২৩৯. সূরা সাজদা, ১০ আয়াত।

সন্তানগণের জন্য নির্ধারিত, অন্য কোন বংশের কেউ ভাববাদী বা নবী হতে পারবে না। যে নবুওয়তের বিষয়ে তুমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলে এবং কোনরূপ আশা করতে না, আমি তোমাকে সেই নবুওয়তের পথের নির্দেশনা দিয়েছি।

পঞ্চম ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ, তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন হিজরতের বিষয়ে অজ্ঞ অনবহিত। কারণ হিজরতের অনুমতি ও বিধান অবতীর্ণ হয়নি, তখন তিনি হিজরতের অনুমতির মাধ্যমে তোমাকে পথ নির্দেশ দেন।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা : বিজন প্রান্তরে অবস্থিত একাকী বৃক্ষকে আরবগণ 'পথহারা বৃক্ষ' বলে। এ অর্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা, তুমি ছিলে জনমানবহীন বিজন প্রান্তরের একাকী বৃক্ষের মত, যেখানে ঈমানের ফল বহন করার জন্য তুমি ছাড়া আর কোন বৃক্ষ ছিল না। অজ্ঞানতার প্রান্তরে তুমি ছিলে জ্ঞানের একক বৃক্ষ। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন এভাবে একাকী। তখন তিনি তোমার মাধ্যমে সৃষ্টিকে পথের নির্দেশ দেন। এই অর্থে হাদীসে বলা হয়েছে : "জ্ঞান-প্রজ্ঞা বিজন প্রান্তরের একক সম্পদের মত, মু'মিন যা লাভ করতে ব্যস্ত হয়।"

সপ্তম ব্যাখ্যা : তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন 'কিবলা' সম্পর্কে অনবহিত। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ কামনা করতেন যে, 'কাবাগৃহ'-কে তাঁর কিবলা নির্ধারণ করা হোক। কিন্তু তা হবে কি না সে বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না। তখন আল্লাহ্ এ বিষয়ে তাঁকে পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন। কুরআনে ঘোষণা করা হয় : "আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ কর।"[২৪০] কিবলার বিষয়ে আশা-নিরাশার এই অস্থিরতাকে 'অজ্ঞতা' বা 'বিভ্রান্তি' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অষ্টম ব্যাখ্যা : প্রেম ও ভালবাসা অর্থেও ضلال বা বিভ্রান্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনে এই অর্থে ইয়া'কূব (আ) বা যাকোবের (ইস্রায়েল) বিষয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইউসুফ (আ)-কে (যোষেফ) হারানোর পরে এক পর্যায়ে ইয়া'কূব (আ)-এর পরিবারের সদস্যগণ ইউসুফের বিষয়ে তাঁর গভীর ও অনিয়ন্ত্রিত ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন : "আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।[২৪১] অর্থাৎ আপনি আগের মতই আপনার ভালবাসার দ্বারা আবেগতাড়িত হয়ে রয়েছেন। এ অর্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা, তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন আল্লাহ্-প্রেমের আবেগে অস্থির, তখন তিনি পথ-নির্দেশ দিলেন প্রেমাস্পদের নিকটে পৌঁছানোর বিধানাবলির।

নবম ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ, তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন তোমার জাতির মধ্যে গন্তব্যহীন অসহায়রূপে। তারা তোমাকে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও

২৪০. সূরা বাকারা, ১৪৪ আয়াত।

২৪১. সূরা ইউসুফ, ৯৫ আয়াত।

মানতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি তোমাকে পথ-নির্দেশ দেন এবং তোমাকে তাদের শাসক বানিয়ে দেন।

দশম ব্যাখ্যা : তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন **ঊর্ধ্বাকাশের** পথ সম্পর্কে অজ্ঞ-অনবহিত। অতঃপর তিনি মি'রাজের রাত্রিতে ঊর্ধ্বে আনয়নের মাধ্যমে তোমাকে সে বিষয়ে পথ-নির্দেশ প্রদান করেন।

একাদশ ব্যাখ্যা : ভুল অর্থেও ضلال বা বিভ্রান্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যা, মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের অনুভূতিতে আল্লাহ্‌র সমীপে কী বলবে তা তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তখন তিনি তোমাকে সে বিষয়ে পথ নির্দেশ দান করেন, কিভাবে আল্লাহ্‌র সঠিক প্রশংসা করতে হবে তা তিনি তোমাকে শিখিয়ে দেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "আপনার সত্যিকার গুণকীর্তন করতে আমি অক্ষম।" ভুল অর্থে 'বিভ্রান্তি বা ضلال শব্দটির ব্যবহার কুরআনে রয়েছে। দু'জন মহিলা সাক্ষী গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে : "যদি তাদের দুজনের একজন ভুলে যায় তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"[২৪২]

দ্বাদশ ব্যাখ্যা : তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ সূফী ও আলিম জুনাইদ বাগদাদী (২৯৭ হি/ ৯১০খৃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার উপরে কুরআনের যে নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়েছে তা কিভাবে মানুষকে বুঝাবে ও ব্যাখ্যা করবে সে বিষয়ে তিনি তোমাকে অজ্ঞ-অনবহিত পেয়েছিলেন। তখন তিনি এ বিষয়ে তোমাকে পথ-নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর উপরে অবতীর্ণ কুরআনী নির্দেশনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা মানুষের নিকট পেশ করতে। আল্লাহ্ বলেন : "এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[২৪৩] কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে। এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন গ্রহণ, মুখস্থকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে অস্থিরতা ছিল, পরে আল্লাহ্ সে বিষয়ে তাঁকে পথ-নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ বলেন : "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করো না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।"[২৪৪] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না এবং বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।"[২৪৫]

---

২৪২. সূরা বাকারা, ২৮২ আয়াত।
২৪৩. সূরা নাহল, ৪৪ আয়াত।
২৪৪. সূরা কিয়ামাহ্, ১৬-১৯ আয়াত।
২৪৫. সূরা তাহা, ১১৪ আয়াত।

উপরের এ সকল ব্যাখ্যার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, এই আয়াত দ্বারা পাদরিগণ যা প্রমাণ করতে চান তা একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। মুফাস্‌সিরগণ অনুরূপ আরো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

কুরআন কারীমে অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে : "তোমাদের সঙ্গী পথহারা নয় এবং বিপথগামীও নয়।"২৪৬ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনোই বিপথগামী ছিলেন না। এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মের বিষয়ে তিনি পথহারা বা বিপথগামী ছিলেন না, অর্থাৎ অবিশ্বাসী ছিলেন না, পাপীও ছিলেন না।

পাদরিগণ দ্বিতীয় যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহ্ বলেছেন : "তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি"। এ দ্বারা পাদরিগণ দাবি করতে চান যে, মুহাম্মাদ ﷺ নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে অবিশ্বাসী বা অধার্মিক ছিলেন (না'উযু বিল্লাহ্!)। তাঁদের এই দাবি একেবারেই অবান্তর। কুরআনের এই বক্তব্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনভাবেই তা বুঝায় না। এখানে 'কিতাব' বলতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। আর 'ঈমান' বলতে ধর্মব্যবস্থার বিস্তারিত বিধিবিধান বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ, তোমার প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ আগমনের পূর্বে তুমি কুরআন পাঠ করতে না এবং ধর্মের বিস্তারিত বিধিবিধানও জানতে না। এ বাস্তব সত্য কথা। কারণ ওহী প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করতেন। তবে ইসলামী শরীয়তের বিস্তারিত বিধিবিধান তিনি জানতেন না। ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা জানতে পারেন।

উপরের অর্থটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এছাড়াও এই আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যা হতে পারে। কুরআনে 'সালাত' বা নামাযকে 'ঈমান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন।"২৪৭ এখানে 'ঈমান' বলতে সালাত বা নামায বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে এই আয়াতেও ঈমান বলতে সালাত বুঝানো হতে পারে। এক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ, আপনি জানতেন না যে, কুরআন কি এবং সালাত কি ? অর্থাৎ ইসলামী ব্যবস্থায় যে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে নবুওয়তের পূর্বে তিনি অবগত ছিলেন না।

এ ছাড়া 'ঈমান' বলতে 'ঈমানদার' বা 'বিশ্বাসের অধিকারী' বুঝানো হতে পারে। অর্থাৎ আপনি জানতেন না যে কিতাব কি এবং ঈমানদার কে ? আপনার প্রতি কারা বিশ্বাস গ্রহণ করবে তা আপনি জানতেন না।

---

২৪৬. সূরা নাজম, ২ আয়াত।

২৪৭. সূরা বাকারা, ১৪৩ আয়াত।

এভাবে সম্পর্কিত শব্দ উহ্য রাখার অগণিত উদাহরণ আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। যেমন–

গীতসংহিতার ৭৮ গীতের.২১ আয়াত নিম্নরূপ : অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন; যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল; (২২ কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না, তাঁহারা পরিত্রাণে নির্ভর করিত না।)"

যিশাইয় ১৭ অধ্যায়ের ৪ আয়াত নিম্নরূপ : "আর সেই দিন এই ঘটিবে, যাকোবের গৌরব ক্ষীণ হইবে, ও তাহার মাংসের স্থূলতা কৃশ হইয়া পড়িবে।"

যিশাইয় ৪৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "২২ কিন্তু হে যাকোব, আমাকে তুমি ডাক নাই; হে ইস্রায়েল, তুমি আমার বিষয়ে ক্লান্ত হইয়াছ। .... ২৮ এই জন্য আমি পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণকে অপবিত্র করিলাম, এবং যাকোবকে অভিশাপে ও ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সমর্পণ করিলাম।"

যিরমিয়র পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৬ যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইস্রায়েল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। ৭ সে এই সকল কর্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এই কারণ প্রযুক্তই যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম। তথাপি তাহার ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল। .... ১১ আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা অপেক্ষা বিপথগামী ইস্রায়েল আপনাকে ধার্মিক দেখাইয়াছে। ১২... হে বিপথগামী ইস্রায়েল, ফিরিয়া আইস ....।"

হোশেয়র পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৫ হে ইস্রায়েল, তুমি যদ্যপি ব্যভিচারী হও, তথাপি যিহূদা দণ্ডনীয় না হউক;...... ১৬ কারণ স্বেচ্ছারিণী গাভীর ন্যায় ইস্রায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে; ..... ১৭ ইফ্রয়িম প্রতিমাগণে আসক্ত ... ।"

হোশেয় ৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩ ইস্রায়েল, যাহা ভাল, তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, ... ৮ ইস্রায়েল গ্রাসিত হইল; এখন তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায় জাতিগণের মধ্যে আছে। .... ১১ ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টায় অনেক যজ্ঞবেদি করিয়াছে ... ১৪ কারণ ইস্রায়েল আপন নির্মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছে।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে অবশ্যই 'সম্পর্কিত শব্দ' উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ 'যাকোব' বলতে 'যাকোবের বংশ', ইস্রায়েল বলতে 'ইস্রায়েলের সন্তানগণ'

বুঝতে হবে। নইলে প্রমাণিত হবে যে, যাকোব ঈশ্বরের ক্রোধ ও কোপের অধীন রয়েছে, তিনি অতি ক্ষীণ গৌরবের অধিকারী, তিনি ঈশ্বরকে ডাকতেন না, তিনি অভিশাপ ও বিদ্রূপগ্রস্ত, তিনি ব্যভিচারী, তিনি প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে যেয়ে সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করেছেন। তিনি ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন নি, যা কিছু ভাল সব তিনি দূরে ফেলে দিয়েছেন, তিনি অপ্রীতিকর পাত্রের মত, তিনি আপন নির্মাতাকে ভুলে ছিলেন। না'উযু বিল্লাহ্!

পঞ্চম বিভ্রান্তি : হাদীস পরস্পরবিরোধী

বিভ্রান্তির অপনোদন

আমরা শুধু সহীহ হাদীসই বিবেচনা করব, যে সকল হাদীস সহীহ হাদীসের সংকলন গ্রন্থসমূহে সংকলিত রয়েছে। অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে সংকলিত হাদীস আমরা গ্রহণ করি না। এ সকল অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থে সংকলিত অনির্ভরযোগ্য হাদীসকে সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে বা বিপরীতে পেশ করা যায় না। যেমন প্রচলিত চারটি সুসমাচার ছাড়াও প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খৃস্টানদের মধ্যে সত্তরেরও অধিক সুসমাচার সংকলিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ সকল অনির্ভরযোগ্য সুসমাচারকে নির্ভরযোগ্য সুসমাচারগুলির বিপরীত বা বিরোধিতায় পেশ করলে খৃস্টানগণ তা গ্রহণ করবেন না।

সহীহ হাদীসের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সামান্য; চিন্তা করলে বা ব্যাখ্যা করলেই অপনোদিত হয়। পক্ষান্তরে খৃস্টানদের পবিত্র বাইবেলের মধ্যে এখন পর্যন্ত বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাতীত বৈপরীত্য রয়েছে। এ সকল বৈপরীত্যের তুলনায় হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য কিছুই নয়। পাঠক ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে ১২৫টি বৈপরীত্য দেখতে পেয়েছেন। সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে বিদ্যমান যে সকল বৈপরীত্যের কথা পাদরি মহাশয়গণ উল্লেখ করেন, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অনুরূপ পর্যায়ের বৈপরীত্যগুলি যদি আমরা উল্লেখ করি তবে বাইবেলের কোন পুস্তকের একটি অধ্যায়ও হয়ত বাদ পড়বে না।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ যাদেরকে নাস্তিক বা ধর্মহীন বলে আখ্যায়িত করেন তারা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এইরূপ অনেক বৈপরীত্য তাঁদের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করেন এবং এগুলি নিয়ে ব্যঙ্গ ও উপহাস করেন। কেউ চাইলে এদের পুস্তকাদি পাঠ করে দেখতে পারেন। আমি নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। জন ক্লার্ক এরূপ একজন 'নাস্তিক' ছিলেন। ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত তাঁর পুস্তক, ১৩১৩ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত একসিহোমো (Ecce Homo) নামক পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তক থেকে আমি এখানে 'ঈশ্বরের বিষয়ে' ৫০টি বৈপরীত্য উল্লেখ করছি, যেগুলিকে এ

সকল লেখক বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত করে তাঁদের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করেছেন।

আমি এখানে 'ঈশ্বর বিষয়ক' এই ৫০টি বৈপরীত্যই শুধু উল্লেখ করছি। কারণ, যদিও এ সকল লেখক- আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন- এ সকল বৈপরীত্য উল্লেখের ক্ষেত্রে ভদ্রতার সীমালঙ্ঘন করেছেন, তবুও 'ঈশ্বরের বিষয়ে' তাঁদের সীমালঙ্ঘন ভাববাদিগণের নিন্দাচারে তাদের সীমালঙ্ঘনের চেয়ে কম। বিশেষত মরিয়ম ও যীশুর নিন্দাচারের ক্ষেত্রে তাঁদের সীমালঙ্ঘন খুবই কঠিন। ২৪ নং বক্তব্যের মধ্যে কিছু উদ্ধৃতি আমি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করব যাতে পাঠক এর সামান্য নমুনা দেখতে পারবেন।

আমি এখানে এ সকল বৈপরীত্য উল্লেখ করছি যাতে পাঠক বুঝতে পারেন যে, ইউরোপীয় নাস্তিকগণ পবিত্র বাইবেলের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সকল বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করেন সেগুলির তুলনায় প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ কর্তৃক উত্থাপিত হাদীসে নববীর বৈপরীত্যের উদাহরণগুলি অনেক দুর্বল। নাস্তিক পণ্ডিতগণের এ সকল বক্তব্য আমি নিজে সঠিক বলে মনে করি বলে তা উল্লেখ করছি না বরং নাস্তিক পণ্ডিতগণের এবং প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের অধিকাংশ কথাই ভিত্তিহীন প্রলাপ, যা আমি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করি। তবে কারো অবিশ্বাস উদ্ধৃত করার অর্থ অবিশ্বাস স্বীকার করা নয়।

(১) গীতসংহিতার ১৪৫ গীতের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান।"

পক্ষান্তরে ১ শমূয়েলের ৬ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও আঘাত করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলতঃ তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে, [এবং] পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন।"

এখানে ঈশ্বরের দয়ার মহত্ত্ব ও ক্রোধের ধীরত্ব লক্ষ্য করুন! সামান্য একটু ত্রুটির কারণে তিনি নিজের প্রিয় জাতির পঞ্চাশ হাজার সত্তর জন মানুষকে হত্যা করলেন!

(২) দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ : "তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর দেশে, পশুগর্জনময় ঘোর মরুভূমিতে; তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।"

পক্ষান্তরে গণনা পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪ সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সূর্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও; তাহাতে ইস্রায়েলের উপর হইতে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। .... ৯ যাহারা ঐ মহামারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।"

এখানে দেখুন কিভাবে ঈশ্বর তাঁর প্রিয় ও নির্বাচিত জাতিকে নয়ন-তারার ন্যায় রক্ষা করলেন! তিনি মোশিকে নির্দেশ দিলেন জাতির সকল অধ্যক্ষকে (নেতা ও গোত্রপতিকে) ক্রুশবিদ্ধ করতে এবং তাদের মধ্যে থেকে ২৪ হাজার মানুষ ধ্বংস করে দিলেন।

(৩) দ্বিতীয় বিবরণের ৮ অধ্যায়ের ৫ আয়াত নিম্নরূপ : "আর মনে বুঝিয়া দেখ, মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন।"

গণনা পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ৩২ আয়াতে রয়েছে : "কিন্তু সেই মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে থাকিতে কাটিবার পূর্বেই লোকদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; আর সদাপ্রভু লোকদিগকে ভারী মহামারী দ্বারা আঘাত করিলেন।"

এখানে দেখুন! কিভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর পিতা কর্তৃক পুত্রকে শাসন করার ন্যায় তাঁর জাতিকে শাসন করলেন! এ সকল অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলো যখন কিছু মাংস যোগাড় করে খাওয়া শুরু করল, তখন মুখের খাবার মুখের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে তিনি ভারী মহামারী দ্বারা আঘাত করলেন।

(৪) মীখার পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত নিম্নরূপ : "কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? ... কারণ তিনি দয়ায় প্রীত।"

আর দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ের সাতটি বড় বড় জাতি (হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়), যারা সংখ্যায় ও শক্তিতে ইস্রায়েল সন্তানদের চেয়ে বৃহৎ ও বলবান ছিল, তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে : "২ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে ; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না। ... ১৬ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কবলিত করিবে ; তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক।"

তাহলে দেখুন! কিভাবে ঈশ্বর দয়ায় প্রীত! তিনি ইস্রায়েল সন্তানদেরকে নির্দেশ দিলেন ৭টি বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে এভাবে হত্যা ও নিঃশেষে বিনষ্ট করতে এবং তাদেরকে দয়া করতে এবং ক্ষমা করতে নিষেধ করে দিলেন!

(৫) যাকোবের পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে : "প্রভুর পরিণামও দেখিয়াছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়।"

হোশেয়র পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ : "শমরিয়া দণ্ড পাইবে, কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে,

তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করা যাইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাইবে।"

এখানে শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ঈশ্বরের স্নেহ ও দয়ার আধিক্য লক্ষ্য করুন!

(৬) যিরমিয়ের বিলাপের অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতে রয়েছে : "কেননা তিনি অন্তরের সহিত দুঃখ দেন না, মনুষ্য-সন্তানগণকে শোকার্ত করেন না।"

তাঁর দুঃখ না দেওয়া ও মনুষ্য-সন্তানকে শোকার্ত না করার কয়েকটি নমুনা দেখুন। তিনি অসদোদয়ীদেরকে স্ফোটক দ্বারা আঘাত ও সংহার করেন। ১ শমূয়েলের ৫ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪৮] ৫ জন রাজার সমবেত সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যকে তিনি আকাশ থেকে মহাশিলা বর্ষণ করে হত্যা করেন। এমনকি যুদ্ধে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যত মানুষ মেরেছিল, তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ঈশ্বর এভাবে মহাশিলা বর্ষণ করে হত্যা করেন। যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪৯] ঈশ্বরের বিষয়ে ও মোশির বিষয়ে সামান্য আপত্তি প্রকাশ করাতে তিনি ইস্রায়েল বংশের অনেক মানুষকে সর্প প্রেরণ করে হত্যা করেন। গণনা পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫০]

(৭) ১ বংশাবলির ১৬ অধ্যায়ের ৪১ আয়াতে ঈশ্বরের বিষয়ে বলা হয়েছে : "কেননা তাঁহার দয়া অনন্ত কালস্থায়ী।" গীতসংহিতার ১৪৫ গীতের ৯ আয়াত নিম্নরূপ : "সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়, তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমস্ত পদার্থের উপরে আছে।"

কিন্তু ঈশ্বরের এই অনন্তকাল স্থায়ী দয়া ও সকল সৃষ্টির জন্য মঙ্গলময় করুণার নমুনা দেখুন। নোহের সময়ে কেবল নোহের জাহাজের মধ্যে অবস্থিত মানুষ ও প্রাণীগণ ছাড়া বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণী তিনি প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করেন। আর তিন সদোম ও ঘমোরার অধিবাসীদেরকে এবং পার্শ্ববর্তী সকল এলাকার মানুষদেরকে গগন থেকে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে ধ্বংস করেন। আদিপুস্তকের ৭ এবং ১৯ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।[২৫১]

(৮) দ্বিতীয় বিবরণের ২৪ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ : "সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।"

২৪৮. ১ শমূয়েল ৫/৬-১২।
২৪৯. যিহোশূয় ১০/১১।
২৫০. গণনা পুস্তক ২১/৫-৬।
২৫১. আদিপুস্তক ৭/২১-২৪, ১৯/২৩-২৫।

কিন্তু ২ শমূয়েলের ২১ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৌলের অপরাধের কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশে দায়ূদ শৌলের সন্তানদের মধ্য থেকে ৭ জনকে গিবিয়োনীয়দের নিকট সমর্পণ করেন যেন তারা শৌলের অপরাধে তার এই ৭ জন সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এভাবে ঈশ্বরের নির্দেশে পিতার অপরাধে সন্তানের প্রাণদণ্ড করা হলো। শুধু তাই নয়, এখানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গও রয়েছে। দায়ূদ শৌলের নিকট সদাপ্রভুর নামে দিব্য করেছিলেন যে, তিনি শৌলের মৃত্যুর পরে তার বংশের মানুষদের হত্যা করবেন না, বা উচ্ছিন্ন করবেন না। ১ শমূয়েলের ২৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫২] অথচ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশে দায়ূদ এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন।

(৯) যাত্রাপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসায় বলা হয়েছে: "পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান।"

পক্ষান্তরে যিহিষ্কেলের পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াত নিম্নরূপ : "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।"

এ থেকে জানা গেল যে, চতুর্থ পুরুষ তো দূরের কথা এক পুরুষ পর্যন্তও পিতার অপরাধের প্রতিফল সন্তানগণ বহন করবে না। এরপরও যদি পিতৃগণের অপরাধের শাস্তি চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তবে তা সৌভাগ্য বলে গণ্য হতো। কিন্তু ঈশ্বর উপরের দুটি বিধানই লঙ্ঘন করে পিতৃগণের অপরাধে অনেক পুরুষ পরের সন্তানগণের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছেন। ১ শমূয়েলের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিসর হইতে উহার আসিবার সময়ে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। ৩ এখন তুমি গিয়া অমালেককে আঘাত কর, ও তাহার যাহা কিছু আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দভ সকলকেই বধ কর।"

তাহলে দেখুন! মোশির সাথে মিসর থেকে বের হয়ে আসার পরে, মোশির শিষ্য যিহোশূয়ের সাথে যুদ্ধের সময়ে অমালেকগণ ইস্রায়েলীয়দের সাথে অসদাচরণ করেছিল। সে কথা ঈশ্বর ৪০০ বছর ধরে স্মৃতিতে ধরে রেখে ৪০০ বছর পরে

২৫২. ১ শমূয়েল ৪/২১-২৩।

শৌলকে নির্দেশ দিলেন সেই অসদাচরণের প্রতিশোধ নিতে। আর সে প্রতিশোধ কত নির্মম! ৪০০ বছর আগে পিতৃপুরুষদের অপরাধে তাদের বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করতে হবে! দুগ্ধপোষ্য শিশুও রক্ষা পাবে না। এমনকি অবলা জীব-জানোয়ারও রক্ষা পাবে না; গরু, মেষ, উট ও গাধা সবই বধ করতে হবে!

শৌল ঈশ্বরের এই গণহত্যার নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করলেন না। তিনি মানুষ হত্যা করলেও ভাল ভাল গরু, মেষ ইত্যাদি পশুর প্রতি দয়া (!) প্রদর্শন করেন। এতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন এবং শৌলকে রাজা বানিয়েছিলেন বলে অনুশোচনা প্রকাশ করেন।[২৫৩]

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ২ নং ঈশ্বর আরো একটু আগে বাড়লেন। তিনি ৪০০০ বছর পরে সন্তানগণকে পিতৃগণের পাপের বোঝা বহনের নির্দেশ দিলেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "যেন পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত তোমাদের উপরে বর্তে, ধার্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি, বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাঁহার রক্তপাত পর্যন্ত। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্তিবে।"[২৫৪]

এরপর ১ নং ঈশ্বর পিতা আরো একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি ধারণা করলেন, আদমের পাপের বোঝা এখন পর্যন্ত তার সন্তানদের উপর বিদ্যমান, যদিও আদমের পরে চার হাজার ত্রিশ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। লূক তাঁর সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, আদম থেকে যীশু পর্যন্ত ৭৫ পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে। পিতা ঈশ্বর ধারণা করলেন যে, এই সুদীর্ঘ ৭৫ পুরুষ পরেও আদম সন্তানগণ আদমের পাপের বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছে। যদি ভালরকম একটি প্রায়শ্চিত্ত না করা যায় তবে এই দীর্ঘ সময়ের পরেও পিতার পাপে সন্তানগণ সকলেই নরকভোগ করবে। এজন্য তিনি নিজের একমাত্র পুত্র ২ নং ঈশ্বর ছাড়া কাউকেই পেলেন না। তিনি মনে করলেন যে, এই পুত্রের পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জাতি[২৫৫] ইহুদীদের

২৫৩. ১ শমূয়েল ১৫/৭-১১।

২৫৪. মথি ২৩/৩৫-৩৬।

২৫৫. পাঠক হয়ত অবাক হচ্ছেন, ইউরোপীয় খৃস্টানগণ কিভাবে ইহুদীদেরকে 'পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জাতি' বলে আখ্যায়িত করছে। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর যাবৎ ইহুদীদের উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে খৃস্টানগণ। তাদের সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিতে ইহুদীদেরকে মানবেতর প্রাণীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

হাতে লাঞ্ছিত ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই আদমের পাপের যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত। এ ছাড়া আদম সন্তানদের মুক্তির কোন পথই তিনি বের করতে পারলেন না। এজন্য তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর চরম কষ্টের মধ্যেও তাঁকে একটু সাহায্য করলেন না। ফলে কঠিন শাস্তি ও যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করে পিতাকে ডাকতে থাকেন : "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"[২৫৬] এরপর পুনরায় চিৎকার করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে তিনি অভিশপ্ত-শাপগ্রস্ত হন এবং নরকে গমন করেন (না'উযু বিল্লাহ!)।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে যীশু দাবি করেছেন যে, ইহুদীরা বরখিয়ের পুত্র সখরিয়কে মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করেছিল। যীশুর এই দাবিটি প্রমাণিত নয়। পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকে নেই যে, বরখিয়ের পুত্র সখরিয় মন্দির ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, ২ বংশাবলির ২৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোয়াশ রাজার রাজত্বকালে যিহোয়াদা যাজকের পুত্র সখরিয় রাজার আজ্ঞায় সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে নিহত হন। পরবর্তীকালে যোয়াশ রাজাকে তার দাসেরা সখরিয়ের রক্তের প্রতিশোধে হত্যা করে।[২৫৭] সুসমাচার লেখক মথি 'যিহোয়াদা' শব্দকে বিকৃত করে তদস্থলে 'বরখিয়' শব্দ লিখেছেন। আর এজন্যই সম্ভবত লূক তাঁর সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে যীশুর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করার সময় শুধু 'সখরিয়' লিখেছেন, তাঁর পিতার নাম লিখেন নি।[২৫৮]

উপরের ৯টি উদাহরণ থেকে পাঠক বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী দয়া ও করুণার নমুনা দেখলেন।

(১) গীতসংহিতার ৩০ নং গীতের ৫ আয়াতে ঈশ্বরের বিষয়ে বলা হয়েছে : "কেননা তাঁহার ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে।"

গণনা পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত নিম্নরূপ : "তখন ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কুকর্মকারী সমস্ত লোকের নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত, তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন।"

এখানে দেখুন ঈশ্বরের নিমেষমাত্রের ক্রোধের অবস্থা এবং কিভাবে তিনি ইস্রায়েলীদের সাথে ব্যবহার করলেন।

---

২৫৬. মথি ২৭/৪৬; মার্ক ১৫/৩৪।

২৫৭. ২ বংশাবলি ২৪/১০-২৭।

২৫৮. লূক ১১/৫০-৫১।

Contents

(১১) আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে রয়েছে : "সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্তী ছিলেন, সে পর্বতময় দেশের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল; কারণ সে তলভূমি-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের লৌহরথ ছিল।"

এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের শক্তি দেখুন। তিনি তলভূমি-নিবাসীদের পরাস্ত করতে পারলেন না; কারণ তাদের লৌহরথ ছিল।

(১২) দ্বিতীয় বিবরণের ১০ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান, বীর্যবান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর।"

আমোষের পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে : "দেখ, আমি তোমাদের নিচে নিষ্পেষিত হইতেছি, যেভাবে নিষ্পেষিত হয় গমের আটিতে পরিপূর্ণ শকট (Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves)। অথোরাইজড ভার্সন বা কিং জেমস ভার্সনের ইংরেজী ভাষ্য অনুসারে ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ এবং ১৮৩৮ সালে ফারসী অনুবাদ এভাবেই করা হয়েছে।[২৫৯]

এখানে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও বীর্যবানত্ব লক্ষ্য করুন! তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের নিচে পড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছেন, যেভাবে গমের আটিতে পরিপূর্ণ শকট নিষ্পেষিত হয়।

(১৩) যিশাইয়র পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ২৮ আয়াতে রয়েছে : "অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না... ।"

বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ৫ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে : "সদাপ্রভুর দূত বলেন, মেরোসকে শাপ দেও, তথাকার নিবাসীদিগকে দারুণ শাপ দেও; কেননা তাহারা আসিল না সদাপ্রভুর সাহায্যের জন্য, সদাপ্রভুর সাহায্যের জন্য, বিক্রমীদের বিরুদ্ধে।"

তাহলে দেখুন সদাপ্রভুর ক্লান্তিহীনতা-শ্রান্তিহীনতার নমুনা! তিনি বিক্রমীদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী!!

মালাখির পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্ত; হাঁ, তোমরা, এই সমস্ত জাতি, আমাকেই ঠকাইতেছ (আমাকে লুণ্ঠন করিয়াছ : for Ye have robbed me)" ।

এ কথা প্রমাণ করে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ ঈশ্বরকে লুণ্ঠন করে, যে কারণে তারা অভিশাপে শাপগ্রস্ত হল।

২৫৯. পরবর্তী বাংলা অনুবাদে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে : দেখ, গমের আটিতে পরিপূর্ণ শকট যেমন [ঘাস] পেষণ করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে তোমাদের স্থানে নিষ্পেষণ করিব।

উপরের ৪টি উদাহরণ থেকে বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বরের ক্ষমতার অবস্থা জানা গেল।

(১৪) হিতোপদেশ ১৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ : "সদাপ্রভুর চক্ষু সর্বস্থানেই আছে, তাহা অধম ও উত্তমদের প্রতি দৃষ্টি রাখে।"

আদিপুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে রয়েছে : "তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায় ?"

তাহলে দেখুন সদাপ্রভুর চক্ষু কিভাবে সর্বস্থানে সবার প্রতি দৃষ্টি রাখে! আদম ও তাঁর স্ত্রী যখন উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন , তখন তিনি আদম কোথায় আছেন তা জানতে তাঁকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন।

(১৫) ২ বংশাবলির ১৬ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "সদাপ্রভুর চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে (the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth)।"

আদিপুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ৫ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে মনুষ্য-সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করিতেছিল তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন।"

এখানে দেখুন, সদাপ্রভুর চক্ষু কিভাবে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে! এমনকি পৃথিবীর বুকে মানুষেরা যে সকল নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করছিল তা দেখতে তিনি নিচে নেমে আসতে বাধ্য হলেন!

(১৬) গীতসংহিতার ১৩৯ গীতের ২ আয়াতে[২৬০] রয়েছে : "তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছ, তুমি দূর হইতে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ (Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought a far off) ।" এ কথা থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর মানুষদের সকল কর্ম, চিন্তা ও সঙ্কল্প অবগত আছেন।

আদিপুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "২০ পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সদোম ও ঘমোরার ক্রন্দন অত্যধিক, এবং তাহাদের পাপ অতিশয় ভারী; ২১ আমি নিচে গিয়া দেখিব, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনানুসারে তাহারা সর্বতোভাবে করিয়াছে কি না; যদি না করিয়া থাকে তাহা জানিব (I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know) ।"

এখানে দেখুন! তিনি মানুষের সকল কর্ম ও চিন্তা অবগত! অথচ সদোম ও ঘমোরাবাসীদের যে ক্রন্দন তার নিকট পৌঁছাচ্ছে তাদের কর্ম তদ্রূপ কিনা তা জানার জন্য তাঁকে নিচে নেমে স্বচক্ষে দেখতে হলো।

---

২৬০. পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ৩ আয়াত।

(১৭) উক্ত গীতের ৫ আয়াত[২৬১] নিম্নরূপ : "এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য, তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য।"

যাত্রাপুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "তোমরা এখন আপন আপন গাত্র হইতে আভরণ দূর কর, তাহাতে জানিতে পারিব, তোমাদের বিষয়ে আমার কি করা কর্তব্য।"

তাহলে দেখুন ঈশ্বরের এই মহান আশ্চর্য জ্ঞান, যা মানবীয় বোধের অগম্য, তা সত্ত্বেও ইস্রায়েল সন্তানদের গায়ের পোশাক খুলে দেহ না দেখে তিনি জানতে পারলেন না যে, তাদের বিষয়ে কী করণীয়!

যাত্রাপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ৪ আয়াত নিম্নরূপ : "তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করিব। লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের খাদ্য কুড়াইবে; যেন আমি তাহাদের এর পরীক্ষা লই যে, তাহারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কি না।"

দ্বিতীয় বিবরণের ৮ অধ্যায়ের ২ আয়াত নিম্নরূপ : "আর তুমি সেই সমস্ত পথ স্মরণে রাখিবে, যে পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে যাত্রা করাইয়াছেন, যেন তোমার পরীক্ষা করিবার জন্য, অর্থাৎ তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে কি না, এই বিষয়ে তোমার মনে কি আছে জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করেন।"

তাহলে তাদের অন্তরে কী আছে তা জানার জন্য সদাপ্রভুর প্রয়োজন হলো তাদেরকে পরীক্ষা করার। এজন্য তিনি স্বর্গ হতে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করে এবং ৪০ বছর প্রান্তরে তাদেরকে যাত্রা করিয়ে তাদের পরীক্ষা করলেন।

উপরের ৬টি উদাহরণ থেকে বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ হওয়ার অবস্থা জানা গেল।

(১৮) মালাখির পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে রয়েছে : "কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্তন নাই।"

গণনা পুস্তকের ২২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২০ পরে ঈশ্বর রাত্রিকালে বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ লোকেরা যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে, তুমি উঠ, তাহাদের সহিত যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা বলিব, কেবল তাহাই তুমি করিবে। ২১ তাহাতে বিলিয়ম প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গর্দভী সাজাইয়া মোয়াবের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল। ২২ পরে তাহার গমনে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল।"

---

২৬১. পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ৬ আয়াত।

এখানে ঈশ্বরের পরিবর্তন-হীনতা লক্ষ্য করুন! তিনিই বিলিয়মকে নির্দেশ দিলেন মোয়াবের সম্ভ্রান্ত অধ্যক্ষগণের সাথে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের নির্দেশানুসারে তাদের সাথে গেলেন তখন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হলো!

(১৯) যাকোবের পত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে পিতা ঈশ্বরের বিষয়ে বলা হয়েছে : "যাহাতে অবস্থান্তর কিংবা পরিবর্তনের ছায়া নাই।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের কোন বিধান, বাণী বা নির্দেশই পরিবর্তন হয় না। পুরাতন নিয়মের অনেক স্থানে 'শনিবার' বা সাবাথ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহু স্থানে বলা হয়েছে যে, 'সাবাথ' পালনের এই বিধান চিরস্থায়ী, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।[২৬২] পাদরিগণ শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে গ্রহণ করেছেন। এখন তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরের অবস্থান্তর ও পরিবর্তন হয় এবং তিনি তাঁর 'চিরন্তন বিধান'-ও পরিবর্তন করে দেন।

(২০) আদিপুস্তকের ১ম অধ্যায়ে আকাশ, নক্ষত্রসমূহ এবং প্রাণীসমূহের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেগুলো উত্তম (good)।[২৬৩]

ইয়োবের পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "তাঁহার (ঈশ্বরের) দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নহে (the heavens are not clean in his sight)।"

ইয়োবের পুস্তকেরই ২৫ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "দেখ, তাঁহার দৃষ্টিতে...তারাগণও নির্মল নহে (the stars are not pure in his sight)।"

লেবীয় পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে অনেক প্রাণীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেগুলো ঘৃণার্হ, অশুচি, অপবিত্র, অখাদ্য ও নিষিদ্ধ।

(২১) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "হে ইস্রায়েল-কুল, একবার শুন; আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি অসরল নয়?"

মালাখির পুস্তকের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে : "২ আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তুমি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ? সদাপ্রভু কহেন, এষৌ কি যাকোবের ভ্রাতা নয়? তথাপি আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি; ৩ কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি (I hated Esau), তাহার পর্বতগণকে ধ্বংসস্থান করিয়াছি, ও তাহার অধিকার প্রান্তরস্থ শৃগালদের বাসস্থান (his heritage waste for the dragons of the wilderness) করিয়াছি।"

---

২৬২. আদিপুস্তক ২/১০৩; যাত্রাপুস্তক ২০/৮-১১; গণনা পুস্তক ১৫/৩২০৩৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১২-১৫।

২৬৩. আদিপুস্তক ১/১৪-১৯।

এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সরল পথের অবস্থা দেখুন! তিনি কোন কারণ ছাড়াই এষৌকে বিদ্বেষ করলেন এবং তার পর্বতগুলোকে ধ্বংসস্থানে পরিণত করলেন এবং তার উত্তরাধিকারকে প্রান্তরের ড্রাগনদের বাসস্থান বানালেন।

(২২) প্রকাশিত বাক্যের ১৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে রয়েছে : "হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল (Lord God Almighty, just and true are thy ways)।"

যিহিষ্কেল ২০ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "অধিকন্তু যাহা মঙ্গলজনক নয়, এমন বিধিকলাপ, এবং যদ্দারা কেহ বাঁচিতে পারে না, এমন শাসনকলাপ, তাহাদিগকে দিলাম (I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live)।"

(২৩) গীতসংহিতার ১১৯ গীতের ৬৮ আয়াতে রয়েছে : "(হে সদাপ্রভু), তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী, তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও।"

বিচারকর্তৃগণ ৯ অধ্যায়ের ২৩ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে এক মন্দ আত্মা (an evil spirit) প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল।"

তাহলে দেখুন, সদাপ্রভু ঈশ্বর কেমন মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী যে, তিনি মন্দ আত্মা প্রেরণ করে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিলেন।

(২৪) বাইবেলের অনেক স্থানে ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পাদরিদের কথা সত্য, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, স্বয়ং ঈশ্বর অসহায় সূত্রধর যোষেফের স্ত্রী মরিয়মের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং সেই ব্যভিচারের কারণেই মরিয়ম গর্ভ ধারণ করেন (না'উযু বিল্লাহ)।

ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এ নিয়ে সীমাতীত হাসি-মস্করা ও উপহাস করেন। তারা এ নিয়ে এত বেশি উপহাস ও মস্করা করেন যা শুনলে বিশ্বাসীদের দেহ শিউরে উঠে। আমি এখানে একসিহোমো পুস্তকের লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃতি করছি, তবে তার উপহাস ও মস্করাগুলো আমি বাদ দেব।

১৮১৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তার পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "বিটিভেটি অব মেরি[২৬৪] নামে একটি সুসমাচার বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে তা অস্বীকৃত বা অনির্ভরযোগ্য (Apocryphal) বলে গণ্য। এই সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশুর মাতা মেরি বা মরিয়মকে ইহুদীদের মন্দির বা ধর্মধামের (বায়তুল মাকদিস)

২৬৪. লেখক এখানে যে সকল তথ্য উল্লেখ করেছেন তা Protevangelium of James নামক গসপেলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেবার জন্য বিমুক্ত করা হয়েছিল। তিনি তথায় ১৬ বছর পর্যন্ত অবস্থান করেন। ফাদার জিরোম যাভিয়ের এই তথ্য গ্রহণ করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করেছেন। এই বর্ণনা অনুসারে সম্ভবত মেরি মন্দিরের কোন যাজক কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সেই যাজকই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তুমি বলবে, পবিত্র আত্মা কর্তৃক আমি গর্ভবতী হয়েছি।"

এরপর এই লেখক যীশুর জন্মের বিবরণে লূক যা লিখেছেন তা নিয়ে কঠিন তামাশা ও উপহাস করেছেন। এরপর তিনি বলেন : "মেরির গর্ভধারণ ও যীশুর জন্ম সম্পর্কে ইহূদীদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, (যোষেফ পানডিরা : Joseph Pandira নামক[২৬৫]) এক সৈনিক-পুত্র মেরিকে ভালবাসত। তার সাথে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে খৃস্টানদের খৃস্টের জন্ম হয়। এতে সূত্রধর যোষেফ (Joseph the Carpenter) মেরির উপর ক্রোধান্বিত হন। তিনি এই বিশ্বাসঘাতিকা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং ব্যাবিলনে চলে যান। মেরি তার শিশুপুত্রকে নিয়ে মিসরে চলে যান। তথায় তিনি ভেল্কিবাজি বা যাদু (sorcery) শিক্ষা করেন। তা শেখার পরে তিনি ইহূদীদের নিকট ফিরে আসেন এবং মানুষদেরকে তা প্রদর্শন করেন।"

এরপর এই লেখক বলেন, "এক ঈশ্বর থেকে অন্য ঈশ্বরের জন্ম বা ঈশ্বর থেকে মানুষের জন্ম জাতীয় ভিত্তিহীন কুসংস্কার ও কল্পকাহিনী পূর্ববর্তী যুগ থেকেই বিভিন্ন পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, রোমান শিল্পকলা ও যুদ্ধের দেবী মিনার্ভা (Minerva, Greek: Athena) প্রধান দেব বা পিতা ঈশ্বর জুপিটারের (Jupiter, Jove, Greek: Zeus) মস্তিষ্ক থেকে জন্মলাভ করেন এবং বিক্স[২৬৬] জুপিটারের উরুতে ছিলেন। চীনাদের দেবতা ফূ (Fu) একজন কুমারী মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি সূর্যের রশ্মি থেকে গর্ভধারণ করেন।"

একসিহোমা গ্রন্থের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এখানেই শেষ।

এখানে প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। জন মিলনার ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে তাঁর পুস্তকে লিখেছেন : "বর্তমান সময়ের কিছু দিন আগে, জোয়ানা সুয়াতকূট নামক এক মহিলা দাবি করেন যে, আমিই সেই নারী যার বিষয়ে আদিপুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন : "সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে (it shall bruise thy head)"। আমার বিষয়েই প্রকাশিত বাক্যের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। একজন স্ত্রীলোক ছিল, সূর্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পদতলে, এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক

---

২৬৫. এ সকল বিষয় ইহূদীদের তালমূদে রয়েছে। দেখুন জাফরুল ইসলাম খান, তালমূদ: তারীখুহু ও তা'আলীমুহু, পৃ. ৬১-৬২।

২৬৬. সম্ভবত ভেনাস (Venus)।

মুকুট। ২ সে গর্ভবতী, আর ব্যথিত হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে, এবং আমি স্বয়ং যীশুর দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছি।" অনেক খৃস্টান এই মহিলার অনুগামী হন। উক্ত নারীর যীশু কর্তৃক গর্ভবতী হওয়ার কারণে তাঁর অনুগামী খৃস্টানগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লসিত হন। এ উপলক্ষ্যে তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ও উপহারাদি তৈরি করেন।" জন মিলনারের বক্তব্য এখানে শেষ।

তবে এখানে কিছু বিষয় আমাদের অজানা রয়ে গেল! যীশু কর্তৃক গর্ভধারণকারী এই মহিলা কোন পবিত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন কি না ? যদি তিনি এরূপ পবিত্র পুত্র প্রসব করে থাকেন, তবে সেই মহাসৌভাগ্যবান পুত্রও পিতার মত ঈশ্বরত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন কি না ? যদি তা করে থাকেন, তবে এতে তার অনুসারীদের ধর্ম বিশ্বাস 'ত্রিত্ব' থেকে 'চারত্বে' রূপান্তরিত হয়েছিল কি না ? এছাড়া 'পিতা ঈশ্বর' (God the Father)-এর উপাধি পরিবর্তন করে 'দাদা ঈশ্বর' করা হয়েছিল কি না ?

(২৫) গণনা পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে রয়েছে : ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্যপুত্র (সন্তান) নহেন যে অনুশোচনা করিবেন (God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent)।

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্য নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন। ৭ আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকে উচ্ছিন্ন করিব; কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে (And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart... for it repenteth me that I have made them)।"

(২৬) ১ শমূয়েল ১৫ অধ্যায়ের ২৯ আয়াত নিম্নরূপ : " আবার ইস্রায়েলের বিশ্বাসভূমি মিথ্যা কথা কহেন না ও অনুশোচনা করেন না; কেননা তিনি মুনষ্য নহেন যে, অনুশোচনা করিবেন (the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent)।"

এই পুস্তকের এই অধ্যায়েই রয়েছে : "১০ পরে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, ১১ আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে....২৯ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করিয়াছেন বলিয়া অনুশোচনা করিলেন।"

(২৭) হিতোপদেশ ১২ অধ্যায়ের ২২ আয়াতে রয়েছে : "মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত (Lying lips are abomination to the LORD)।"

যাত্রাপুস্তকের ৩য় অধ্যায়ে রয়েছে : "আর আমি বলিয়াছি, আমি মিসরের দিক হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তীয়দের, ইমোরীয়দের, পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে (a land flowing with milk and honey) লইয়া যাইব। ১৮ তাহারা তোমার রবে মনোযোগ করিবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার নিকটে যাইবে, তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইবার অনুমতি দিউন।"

উক্ত পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ : "তাঁহারা কহিলেন, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন; আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, পাছে তিনি মহামারী কি খড়গ দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেন।"

উক্ত পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ২ আয়াতে সদাপ্রভু ঈশ্বর মোশিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যালংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক।"

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ : "আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির কথা অনুসারে কার্য করিল; ফলে তাহারা মিসরীয়দের কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল।"

তাহলে দেখুন! মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর নিকট এমন ঘৃণিত যে, তিনি মোশি ও হারোণকে ফরৌণের নিকট মিথ্যা বলতে নির্দেশ দিলেন! অনুরূপভাবে প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসীর নিকট মিথ্যা বলল এবং প্রত্যেক নারী আপন আপন প্রতিবাসিনীকে মিথ্যা বলল! সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে এভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেকে এরূপ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীর সম্পদ অবৈধভাবে দখল করল। তোরাহ্-এর বিভিন্ন স্থানে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশীর অধিকার আদায় কি এই পদ্ধতিতেই হবে, যে পদ্ধতি ঈশ্বর তাদের যাত্রার সময়ে শিখিয়ে দিলেন ? ঈশ্বরের জন্য কি শোভনীয় যে, তাদেরকে তিনি ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা শিক্ষা দেবেন ?

১ শমূয়েল ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "তুমি তোমার শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ কর, যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্য এক রাজাকে দেখিয়া রাখিয়াছি। শমূয়েল কহিলেন, আমি কি প্রকারে যাইতে পারি ? শৌল যদি এই কথা শুনে, তবে আমাকে বধ করিবে। সদাপ্রভু

কহিলেন, তুমি এক গোবৎসা সঙ্গে লইয়া বল, সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে আসিলাম। আর যিশয়কে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিও, পরে তুমি কি করিবে, তাহা আমি তোমাকে জানাইব; এবং আমি তোমার কাছে যাহার নাম করিব, তুমি আমার জন্য তাহাকে অভিষেক (anoint) করিবে। পরে শমূয়েল সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে কর্ম করিলেন, তিনি বৈৎলেহমে উপস্থিত হইলেন..."।২৬৭

এভাবে ঈশ্বর শমূয়েলকে মিথ্যা বলতে নির্দেশ দিলেন। কারণ ঈশ্বর শমূয়েলকে যজ্ঞ করতে তথায় প্রেরণ করেন নি, বরং দায়ূদকে অভিষিক্ত (anointed /Christ/Messiah) করতে এবং তাঁকে রাজা নিয়োগ করতে তথায় প্রেরণ করেছিলেন।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাদরিগণের তৃতীয় বিভ্রান্তির অপনোদনে পাঠক জেনেছেন যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর বিভ্রান্তির আত্মা বা মিথ্যাবাদী আত্মা প্রেরণ করেন, যে মিথ্যাবাদী আত্মা প্রায় ৪০০ ভাববাদীর মুখে মিথ্যা প্রবেশ করায়, যেন তারা মিথ্যা বলেন এবং বিভ্রান্ত হন। উপরের চারটি উদাহরণ থেকে জানা গেল কিভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ওষ্ঠকে ঘৃণা করেন।

(২৮) যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ২৬ আয়াত নিম্নরূপ : "আর আমার বেদির উপরে সোপান দিয়া উঠিও না, পাছে তাহার উপরে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়।"

এ কথা থেকে জানা গেল যে, ঈশ্বর পুরুষের উলঙ্গতাও পছন্দ করেন না, নারী উলঙ্গতা তো দূরের কথা।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে রয়েছে : "অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের ...গুহ্যস্থান অনাবৃত করিবেন (the LORD will discover their (of the daughter of Zion) secret parts)"।

যিশাইয় পুস্তকের ৪৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "(হে অনূঢ়া বাবিল-কন্যে,...হে কলদীয়দের কন্যে,) ২ যাঁতা লইয়া শস্য পেষণ কর, তোমার ঘোমটা খুল, পদের বস্ত্র তুল, জঙ্ঘা অনাবৃত কর, পদব্রজে নদনদী পার হও। ৩ তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হইবে, হাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হইবে; আমি প্রতিশোধ দিব, কাহারও অনুরোধ মানিব না।"

আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত নিম্নরূপ : "কেননা অব্রাহামের স্ত্রী সারার নিমিত্ত সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহে সমস্ত গর্ভ রোধ করিয়াছিলেন।"

আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ৩১ আয়াতে রয়েছে : "পরে সদাপ্রভু লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাঁহার গর্ভ মুক্ত করিলেন, কিন্তু রাহেল বন্ধ্যা হইলেন।"

---

২৬৭. ১ শমূয়েল ১৬/১-৪।

এই পুস্তকের ৩০ অধ্যায়ের ২২ আয়াত নিম্নরূপ : "আর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহার গর্ভ মুক্ত করিলেন।"

তাহলে দেখুন! ঈশ্বর পুরুষের উলঙ্গতা পছন্দ করেন না, কিন্তু নারীর উলঙ্গতা প্রকাশে, তাকে অনাবৃত করতে এবং তার গর্ভ মুক্ত ও বন্ধ করতে তাঁর আগ্রহ দেখুন।

(২৯) যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে রয়েছে : "আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি (I am the LORD which exercise Loving kindness, judgment, and righteousness, in the earth)।"

উপরের আলোচনা থেকে বাইবেলীয় ঈশ্বর কিরূপ দয়া ও সত্য পছন্দ করেন তা জানতে পেরেছেন। এবার তাঁর বিচারের অবস্থা দেখুন।

যিহিষ্কেল ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩ তুমি ইস্রায়েল-দেশকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; আমি কোষ হইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়া তোমার মধ্য হইতে ধার্মিক ও দুষ্টকে (the righteous and the wicked) উচ্ছিন্ন করিব। ৪ আমি যখন তোমার মধ্য হইতে ধার্মিক ও দুষ্টলোককে উচ্ছিন্ন করিব, তখন আমার খড়্গ কোষ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধে যাইবে (shall my sword go forth out of his sheath against all flesh from the south to the north)।"

যদি আমরা স্বীকার করে নিই যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণের মতে দুষ্টলোককে হত্যা করা ন্যায়বিচার বলে গণ্য, তবুও প্রশ্ন থাকে যে, ধার্মিক মানুষকে হত্যা, বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন করা কোন্ প্রকারের ন্যায়বিচার ?

যিরমিয়র পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৩ যখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশনিবাসী সমস্ত লোককে, অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণকে এবং যাজকগণ, ভাববাদিবর্গ ও যিরূশালেম-নিবাসী সমস্ত লোককে মত্ততায় পূর্ণ করিব। ১৪ আর আমি এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে, আর পিতাদিগকে ও পুত্রদিগকে একসঙ্গে আছড়াইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; আমি মমতা করিব না, কৃপা করিব না, করুণা করিব না; তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।"

প্রশ্ন হলো, সকল মানুষকে মত্ততায় পূর্ণ করা এবং নির্বিশেষে সবাইকে বিনষ্ট করা কোন ধরনের ন্যায়বিচার ?

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ২৯ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে মধ্যরাত্রে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির

প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে হনন করিলেন।"

মিসরের সকল মানুষ প্রথমজাত সন্তান এবং পশুদের প্রথমজাত শাবক হত্যা করা কোন্ ধরনের ন্যায়বিচার ? এ কথা তো স্পষ্ট যে, মিসরীয়দের হাজার হাজার প্রথমজাত সন্তান নিষ্পাপ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ছিল। এছাড়া পশুরাও তো কোন অন্যায়-অপরাধ করেনি।

(৩০) যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২৩ আয়াত নিম্নরূপ : "দুষ্টলোকের কারণে মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ আছে ? ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন; বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার সন্তোষ হয় না ?"

এই পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াত নিম্নরূপ : "তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্টলোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্টলোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে [ইহাতেই আমার সন্তোষ]।"

উপরের আয়াতদ্বয় থেকে জানা গেল যে, প্রভু ঈশ্বর দুষ্টলোকের ধ্বংস বা ক্ষতি ভালবাসেন না; বরং তিনি ভালবাসেন যে, দুষ্টলোক ভাল হয়ে মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু যিহোশূয়ের পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ২০ আয়াত বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরই তাদের অন্তর কঠিন করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেন।[২৬৮]

(৩১) ১ তিমথীয় ২ অধ্যায়ের ৪ আয়াত নিম্নরূপ : "তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে।"

২ থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১১ আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; ১২ যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"

(৩২) হিতোপদেশ ২১ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত্ নিম্নরূপ : "দুষ্ট ধার্মিকদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ, বিশ্বাসঘাতক সরলদের পরিবর্তনস্বরূপ (The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright)।"

যোহনের প্রথম পত্রের ২য় অধ্যায়ের ২য় আয়াত নিম্নরূপ : "আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক

২৬৮. অথোরাইজড ভারসনের (AV) ইংরেজি পাঠ নিম্নরূপ : It was of the LORD to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that he might destroy them utterly : কারণ তাহাদের হৃদয়ের কঠিনীকরণ সদাপ্রভু হইতে হইয়াছিল, যেন তাহারা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করে, আর তিনি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করেন।"

(he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world)।"

প্রথম বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, দুষ্টরা ধার্মিকদের প্রায়শ্চিত্ত। আর পরবর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যীশুখৃষ্ট, যিনি খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে ধার্মিক ও নিষ্পাপ ছিলেন, তিনিই দুষ্টদের প্রায়শ্চিত্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কোন কোন পাদরি দাবি করেন যে, মুসলিমদের পাপের কোন ভাল প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি-মূল্য নেই। তাঁদের এই দাবি ভুল। কারণ হিতোপদেশের বাণী চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পাপীরাই ধার্মিকদের মুক্তিপণ ও প্রায়শ্চিত্ত। জগতে যত মুসলিম রয়েছে, তার বিপরীতে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি অবিশ্বাসীও রয়েছে। হিসাব করলে প্রত্যেক মুসলিমের বিপরীতে একজন দুষ্টকে প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি-মূল্য হিসেবে পাওয়া যাবে। এছাড়া যীশুখৃষ্ট যেহেতু সমস্ত জগদ্বাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সেহেতু তাঁর প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুসলিমগণ বাদ পড়বেন কেন ? বিশেষত মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র একত্বে, যীশুর ভাববাদিত্বে ও সত্যবাদিতায় এবং তাঁর মাতার পবিত্রতায় বিশ্বাস করেন, বরং যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তবে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, খৃস্টের শিক্ষা অনুসারে একমাত্র মুসলিমগণই অনন্ত জীবনের অধিকারী, আর কেউই নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক তা দেখেছেন।

(৩৩) যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না।"[২৬৯]

সখরিয় ১৪ অধ্যায়ের ২ আয়াত নিম্নরূপ : "কারণ আমি সমুদয় জাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল গৃহের দ্রব্য লুণ্ঠিত, ও স্ত্রীলোকেরা বলাৎকৃত হইবে।"

এভাবে এখানে ঈশ্বর তাঁর নিজের নির্বাচিত জনগণকে অর্থাৎ ইহূদীদেরকে হত্যার এবং তাদের নারীদের শ্লীলতাহানীর জন্য সকল জাতিকে ওয়াদা করলেন বা নির্দেশ দিলেন।

(৩৪) হবক্কূক ১ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে : "আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্তা।"

(৩৫) গীতসংহিতার ৩৪ গীতে রয়েছে : "১৫ ধার্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, তাহাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।... ১৭ [ধার্মিকেরা] ক্রন্দন করিল, সদাপ্রভু শুনিলেন, তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ১৮ সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্তী, তিনি চূর্ণমনাদের পরিত্রাণ করেন।"

---

২৬৯. যাত্রাপুস্তক ২০/১৩-১৪।

গীতসংহিতার ২২ গীতে রয়েছে : "১ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ? আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক ? ২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না; রাত্রিতেও [ডাকি], আমার বিরাম হয় না।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৪৬ আয়াতে রয়েছে : "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?

এখন প্রশ্ন হলো, দায়ূদ এবং যীশু কি ধার্মিক ছিলেন না ? তাঁরা কি ভগ্নচিত্ত ও চূর্ণমনা ছিলেন না ? তাহলে ঈশ্বর কেন তাঁদেরকে পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁদের আর্তনাদের প্রতি কর্ণ দিলেন না ?

(৩৬) যিরমিয় ২৯ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত নিম্নরূপ : "আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে (Ye shall seek me, and find me); কারণ তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে।"

ইয়োবের পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ : "আহা! যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারি, যদি তাঁহার আসনের নিকটে যাইতে পারি (Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat!)।"

ইয়োব (আইয়ূব আ)-এর বিষয়ে ঈশ্বর সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিলেন, তাঁহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই ছিল না।[২৭০] এই পবিত্র ব্যক্তিও ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে পান নি; এমন কি কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে তাও তিনি জানতে পারেন নি।

(৩৭) যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ৪ আয়াতে রয়েছে : "তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গ, নিচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।"

উক্ত পুস্তকেরই ২৫ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর তুমি স্বর্ণের দুই করূব (cherubims [২৭১] of gold) নির্মাণ করিবে; পাপাবরণের দুই মুড়াতে পিটান কার্য দ্বারা তাহাদিগকে নির্মাণ করিবে (১৯) এক মুড়াতে এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব... ।"

---

২৭০. ইয়োব ১/১, ৮, ২/৩।

২৭১. cherub pl. cherubim. ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে কাল্পনিক স্বর্গীয় শিশু, পশু, পাখি বা দ্বিতীয় সারির দেবদূত, যারা দেবতাদের সিংহাসন বহন করে বলে কল্পনা করা হয়।

(৩৮) যিহূদার পত্রের ৬ আয়াত নিম্নরূপ " "আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।"

এ কথা থেকে জানা গেল যে, শয়তানগণ কিয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অনন্তকালীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইয়োবের পুস্তকের ১ম ও ২য় অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শয়তানগণ বন্দি নয়, বরং পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং ঈশ্বরের রাজ্যেও উপস্থিত হয়।২৭২

(৩৯) ২ পিতর ২ অধ্যায়ের ৪ আয়াতে রয়েছে : "কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ করিলেন।"

অথচ মথিলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, পাপে পতিত দূতগণ বা শয়তানগণ মুক্ত রয়েছে; কারণ শয়তান স্বয়ং যীশুকে পরীক্ষা করে।২৭৩

(৪০) গীতসংহিতার ৯০ গীতের ৪ আয়াত নিম্নরূপ : "কেননা সহস্র বৎসর তোমার দৃষ্টিতে যেন গতকল্য, তাহা তা চলিয়া গিয়াছে, আর যেন রাত্রির এক প্রহরমাত্র।"

২ পিতর ৩ অধ্যায়ের ৮ আয়াত নিম্নরূপ " "প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর এক দিনের সমান।"

যে ঈশ্বরের কাছে এভাবে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সমান, সেই ঈশ্বরই মানুষের সাথে তাঁর চিরস্থায়ী নিয়মের স্মারক বানালেন 'রংধনু'-কে। রংধনু দেখলে তাঁর নিয়মের কথা মনে হবে, নইলে দীর্ঘ দিনের কারণে তাঁর স্মৃতি থেকে ভুল হয়ে যাবে! আদিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পরে ঈশ্বর নোহ ও তাঁর সঙ্গী পুত্রগণকে বলেন : "আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। আমি মেঘে আমার ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। যখন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মেঘের সঞ্চার করিব, তখন সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে; তাহাতে তোমাদের সহিত ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং সকল প্রাণীকে বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর হইবে না। আর মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে মাংসময় যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী নিয়ম, তাহা আমি স্মরণ করিব।"২৭৪

---

২৭২. ইয়োব ১/৬-১২, ২/১-৭।

২৭৩. মথি ৪/১-১১।

২৭৪. আদিপুস্তক ৯/১২-১৬।

বিষয়টি বড় অদ্ভুত। বিশেষত মহাজলপ্লাবন রোধের জন্য ঈশ্বরের স্মারক হিসেবে 'রংধনু' কোন সুন্দর স্মারক নয়। কারণ সকল মেঘে রংধনু হয় না, মাঝে মাঝে কোন কোন মেঘে রংধনু দেখা দেয়। সাধারণত মেঘ তখন হালকা থাকে। এরূপ মেঘ থেকে জলপ্লাবন সৃষ্টির মত বারিপাতের আশঙ্কা থাকে না। তাহলে চিহ্নটি এমন সময়ে দেখা যায়, যখন তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনের সময়ে তা দেখা যায় না।

(৪১) যাত্রাপুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে : "তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না।"

আদিপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৩০ আয়াতে যাকোব বলেছেন : "আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল (I have seen God face, and my life is preserved)।"

এভাবে যাকোব ঈশ্বরের মুখ দেখলেন অথচ তিনি বেঁচে থাকলেন। এই কাহিনীতে আরো অনেক অবাস্তব ও অসংলগ্ন বিষয় রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

প্রথম বিষয় : সদাপ্রভু ঈশ্বর ও যাকোবের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হওয়ার কথা।

দ্বিতীয় বিষয় : এই মল্লযুদ্ধ প্রভাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

তৃতীয় বিষয় : মল্লযুদ্ধে ঈশ্বর ও যাকোব কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারেন নি।

চতুর্থ বিষয় : সদাপ্রভু ঈশ্বর যাকোবের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নি, ফলে তিনি বলেন, আমাকে ছাড়।

পঞ্চম বিষয় : যাকোবও বিনা-বিনিময়ে তাঁকে ছাড়তে রাজি হন নি। বরং বলেন, আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে ছাড়ব না।

ষষ্ঠ বিষয় : ঈশ্বর যাকোবের নিকট তাঁর নাম জানতে চান। এতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর নাম জানতেন না।

(৪২) যোহনের ১ম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে ১২ আয়াত নিম্নরূপ : "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই।"

যাত্রাপুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ তখন মোশি ও হারোণ, নাদব ও অবীহূ এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জন উঠিয়া গেলেন; ১০ আর তাঁহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন; তাঁহার চরণতলের স্থান নীলকান্ত মণি-নির্মিত শিলাস্তরের কার্যবৎ, এবং নির্মলতায় সাক্ষাৎ আকাশের তুল্য ছিল। ১১ আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষগণের উপর হস্ত উঠাইলেন না, বরং তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিলেন।"

তাহলে মোশি, হারোণ, নাদব, অবীহূ ও ইস্রায়েলের ৭০ জন অধ্যক্ষ সকলেই ঈশ্বরকে দেখলেন এবং তাঁর সাথে পানাহারও করলেন।

গ্রন্থকার বলেন, এখানে আমার দুটি মন্তব্য আছে :

প্রথমত, উপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটির বাহ্যিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, তারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই ভোজন করেছিলেন। তবে সম্ভবত নাস্তিকগণ যা বুঝেছেন তাই এখানে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের সাথে ভোজন ও পান করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ইস্রায়েল সন্তানগণের ঈশ্বর ভারতীয় হিন্দুদের দেবতাদের মতই (না'উযু বিল্লাহ!)। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভারতীয় দেবতার বিষয়ে তাদের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের রং ছিল আকাশের রঙের মত।

(৪৩) ১ তিমথীয় ৬ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে রয়েছে : "যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না (whom no man hath seen, nor can see)।"

প্রকাশিত বাক্যের ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোহন ঈশ্বরকে স্বর্গে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট দেখতে পান : "যিনি বসিয়া আছেন, তিনি দেখিতে সূর্যকান্তের ও সার্দীয় মণির তুল্য।"[২৭৫]

(৪৪) যোহনের সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৩৭ আয়াতে যীশু ইহূদীদেরকে ঈশ্বরের বিষয়ে বলেছেন : "তাঁহার রব তোমরা কখনও শুন নাই, তাঁহার আকারও দেখ নাই।"

যীশুর উভয় কথাই বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইহূদীগণ মোশির সাথে ঈশ্বরের আকার দর্শন করেছিলেন। আর ঈশ্বরের রব শ্রবণের বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণের ৫ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "দেখ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের কাছে আপন প্রতাপ ও মহিমা প্রদর্শন করিলেন, এবং আমরা অগ্নির মধ্য হইত তাঁহার রব শুনিতে পাইলাম,,।"

(৪৫) যোহনের সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে রয়েছে : "ঈশ্বর আত্মা।"

লূকের সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৯ আয়াতে রয়েছে : "আত্মার অস্থি-মাংস নাই (a spirit hath not flesh and bones)।"

উপরের দুটি বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরের অস্তি-মাংস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। কিন্তু বাইবেলের পুস্তকাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গ ও অস্থি-মাংস রয়েছে। এ সকল নাস্তিক পণ্ডিত ঈশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণের জন্য বাইবেল থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ভুমিকায় পাঠক এ জাতীয় কিছু উদ্ধৃতি জানতে পেরেছেন।

---

২৭৫. প্রকাশিত বাক্য ৪/৩।

Contents

এ সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পরে নাস্তিক পণ্ডিতগণ উপহাস করে বলেছেন, এখন পর্যন্ত জানা যায় নি যে, বাইবেলীয় ঈশ্বরের পেশা কি ? তিনি কি মালি ? না রাজমিস্ত্রি ? না কুমার ? না দর্জি ? না ডাক্তার ? না নাপিত ? না ধাত্রী ? না কসাই ? না কৃষক ? না ব্যবসায়ী ? না অন্য কিছু ? এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। এ বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী।

(১) আদিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে রয়েছে : "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিক, এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন (And the LORD God planted a garden eastward in Eden)।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মালি ছিলেন। অনুরূপভাবে যিশাইয়র পুস্তকের ৪১ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত থেকেও তা বুঝা যায়।[২৭৬]

(২) ১ শমূয়েল ২ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে রয়েছে : "আমি তাহার এক স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করিব (I will build him a sure house)।"[২৭৭] এ কথা থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন নির্মাতা। অনুরূপভাবে ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ের ১১ ও ২৭ আয়াত, ১ রাজাবলি ১১ অধ্যায়ের ৩৮ আয়াত ও গীতসংহিতার ১২৭ গীতের ১ আয়াত থেকেও জানা যায় যে, তিনি একজন নির্মাতা।

(৩) যিশাইয় ৬৪ অধ্যায়ের ৮ আয়াত নিম্নরূপ : "কিন্তু এখন, হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের পিতা; আমরা মৃত্তিকা, আর তুমি আমাদের কুম্ভকার; আমরা সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন কুম্ভকার।

(৪) আদিপুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ২১ আয়াত নিম্নরূপ : "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি দর্জি।

(৫) যিরমিয় ৩০ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে রয়েছে : "আমি ...তোমার ক্ষত সকল ভাল করিব (I will heal thee of thy wounds)।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন শল্য চিকিৎসক।

(৬) যিশাইয় ৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াত নিম্নরূপ : "সেই দিন প্রভু (ফরাৎ) নদীর পারস্থ ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা, অশূররাজের দ্বারা, মস্তক ও পদের লোম ক্ষৌর করিয়া দিবেন, এবং তদ্দারা দাড়িও ফেলিবেন।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন ক্ষৌরকার বা নাপিত।

---

২৭৬. "আমি প্রান্তরে এরস, বাবলা, গুলমেঁদি ও তৈলবৃক্ষ রোপণ করিব; আমি মরুভূমিতে দেবদারু, তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্রে লাগাইব।"

২৭৭. বাংলা বাইবেলের অনুবাদ : আমি তাহার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করিব।

(৭) আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ৩১ আয়াত এবং ৩০ অধ্যায়ের ২২ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন ধাত্রী। ২৮ নং স্ববিরোধিতার আলোচনায় আয়াতদ্বয় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(৮) যিশাইয় ৩৪ অধ্যায়ের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "সদাপ্রভুর খড়্গ তৃপ্ত হইয়াছে রক্তে ও আপ্যায়িত হইয়াছে মেদে, মেষশাবকের ও ছাগের রক্তে, এবং মেষদের মেটিয়ার মেদে... ।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি কসাই।

(৯) যিশাইয় ৪১ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত নিম্নরূপ : "দেখ, আমি তোমাকে তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণীবিশিষ্ট শস্যমাড়া নূতন গুঁড়ির ন্যায় করিব; তুমি পর্বতগণকে মাড়িয়া চূর্ণ করিবে, উপপর্বতগণকে ভুসির সমান করিবে।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি একজন কৃষক।

(১০) যোয়েল ৩য় অধ্যায়ের ৮ আয়াতে রয়েছে : "আর তোমাদের পুত্রকন্যাগণকেও যিহূদার সন্তানদের হস্তে বিক্রয় করিব।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী।

(১১) যিশাইয় ৫৪ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে : "আর তোমার সন্তানেরা সকলে সদাপ্রভুর কাছে শিক্ষা পাইবে।"

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন শিক্ষক।

(১২) আদিপুস্তকের ৩২ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন মল্লযোদ্ধা।

(৪৬) ২ শমূয়েল ২২ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিষয়ে বলা হয়েছে : "তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্‌গত হইল, তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল; তদ্দ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।"

কিন্তু ইয়োব ৩৭ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ : "ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে, এবং বিস্তারিত জল সংকুচিত হইয়া পড়ে (By the breath of God frost is given: and the breadth of the waters is straitened)।"

(৪৭) হোশেয় ৫ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতে রয়েছে : "এই জন্য আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে কীটস্বরূপ, যিহূদা-কুলের পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হইয়াছি।"

এই পুস্তকেরই ১৩ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে রয়েছে : "এই জন্য আমি তাহাদের পক্ষে সিংহের ন্যায় হইলাম, চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় আমি পথের পার্শ্বে অপেক্ষায় থাকিব।"

এভাবে কখনো কীট, কখনো ক্ষয়, কখনো সিংহ এবং কখনো চিতাবাঘ।

(৪৮) যিরমিয়ের বিলাপের ৩ অধ্যায়ের ১০ আয়াত রয়েছে : "তিনি আমার পক্ষে (ক্ষেত্রে : unto me) লুক্কায়িত ভল্লুক বা অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ (তিনি আমার পথ বিপথ করিয়াছেন, আমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছেন, অনাথ করিয়াছেন)।"

যিশাইয়র পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে : "তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন।"

এভাবে কখনো তিনি ভল্লুক বা সিংহ অর্থাৎ ভক্ষক এবং কখনো তিনি পালক অথবা রক্ষক।

(৪৯) যাত্রাপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে রয়েছে : "সদাপ্রভু যুদ্ধবীর।"

ইব্রীয় ১৩ অধ্যায়ের ২০ আয়াত : "আর শান্তির ঈশ্বর।"

(৫০) যোহনের প্রথম পত্রের ৪ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে রয়েছে : "ঈশ্বর প্রেম।"

যিরমিয় ২১ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে রয়েছে : "আর আমি আপনি বিস্তারিত হস্ত ও বলবান বাহু দ্বারা ক্রোধ, রোষে ও মহাকোপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এভাবে আমরা কেবল ঈশ্বর বিষয়েই বাইবেলের ৫০টি স্ববিরোধিতা দেখতে পেলাম, যেগুলো ইউরোপীয় নাস্তিক পণ্ডিতগণ বাইবেলের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে ভয়ে আমি বিষয়টির এখানেই ইতি টানছি। কোন আগ্রহী পাঠক চাইলে এ সকল নাস্তিক পণ্ডিতের লেখা পুস্তকাদি পাঠ করতে পারেন। সেগুলোতে এরূপ আরো অনেক নমুনা দেখতে পারেন। এখানে শেষে চারটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

(১) একাধিক বিবাহ ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা জ্ঞাপন করে দ্বিতীয় বিবরণের ২১ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে..."

(২) দাস প্রথার বৈধতা ও স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোর বৈধতা জ্ঞাপন করে যিহোশূয়ের পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, গিবীয়োনীয়দের সাথে ইস্রায়েলীয়দের সন্ধি হলে যিহোশূয় তাদেরকে চিরস্থায়ী দাস্যকর্মে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির নিমিত্ত কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহনার্থে যিহোশূয় সেই দিবসে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা অদ্য পর্যন্ত তাহা করিতেছে।"

(৩) স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাস বানানো ছাড়াও তাদের অঙ্গহানি করে নপুংসক বা খোজা (eunuch) বানানোর উৎসাহ দিয়ে এবং এরূপ খোজা হওয়ার ফযীলত বর্ণনা করে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন যে, যে নপুংসক (eunuchs) আমার বিশ্রামবার পালন করে, আমার

সন্তোষকর বিষয় মনোনীত করে, ও আমার নিয়ম দৃঢ় করিয়া রাখে, তাহাদিগকে আমি আমার গৃহমধ্যে ও আমার প্রাচীরের ভিতরে পুত্রকন্যা অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম দিব; আমি তাহাদিগকে লোপহীন অনন্তকাল স্থায়ী নাম দিব।"

উপরের বাইবেলীয় বক্তব্যগুলো থেকে জানা গেল যে, ঈশ্বর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ করেছেন, ক্রীতদাস প্রথা বৈধ করেছেন এবং খোজা হওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। অথচ এগুলো সবই ইউরোপীয়দের নিকট আইন ও বিবেকের দৃষ্টিতে অবৈধ!

(৪) ১ করিন্থীয় ১ম অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল।"

যিহিষ্কেলের পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "কোন ভাববাদী যদি প্ররোচিত (প্রবঞ্চিত, বিভ্রান্ত) হইয়া কথা কহে, তবে জানিও, আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে প্ররোচনা (প্রবঞ্চনা) করিয়াছি (And if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the LORD have deceived that prophet)।"

এই দুই বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ঈশ্বরের মুর্খতা আছে এবং ঈশ্বর ভাববাদিগণকেও প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্ত করেন।

নাস্তিক জন ক্লার্ক উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করার পরে বলেন : ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর একজন খুনি, অত্যাচারী, প্ররোচনাদানকারী, বিভ্রান্তকারী এবং নির্বোধ! শুধু তাই নয় উপরন্তু তিনি গ্রাসকারী অগ্নি। মহামতি সাধু পৌলই তা বলেছেন। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১২ অধ্যায়ের ২৯ আয়াতে তিনি বলেন : "কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ (For our God is a consuming fire)।" এরূপ ঈশ্বরের হতে পড়া বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর বিষয়। এ কথাও মহামতি সাধু পৌলই বলেছেন। ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৩১ আয়াতে তিনি বলেন : "জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয় (It is a fearful thing to fall into the hands of the living God)।"কাজেই এই ঈশ্বরের দাসত্ব থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাধীনতা লাভ করা বাঞ্ছনীয়। যাঁর হাত থেকে তাঁর একমাত্র পুত্রও রক্ষা পান নি, তাঁর থেকে অন্য কে আর দয়া বা করুণা আশা করতে পারবে ? বাইবেলে যেই ঈশ্বরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা যায় না। এ ঈশ্বর অস্থিরচিত্ত এবং সকল বৈপরীত্যের সমাহার। তিনি নিজেই নিজের ভাববাদীদের বিভ্রান্ত করেন!"

এখন পাঠক দেখুন! বাইবেলের স্ববিরোধিতা সম্পর্কে উপহাসের বিষয়ে এ সকল পাদরির সমগোত্রীয় স্বদেশী পণ্ডিতদের অবস্থা কোথায় পৌঁছেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাইবেলের স্ববিরোধিতার আলোচনায় উপরে বাইবেল থেকে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সংস্করণের ভিত্তিতে নাস্তিক পণ্ডিতগণ যে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন তা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠক যদি অন্যান্য ভাষার বাইবেলে আয়াত সংখ্যা বা বিষয়বস্তুর সাথে কোন অমিল দেখতে পান তবে তা বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের প্রমাণ ও পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের প্রমাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পাদরিগণের বিভ্রান্তি অপনোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের প্রমাণ

এ পরিচ্ছেদে আমরা ৬ দিক থেকে তাঁর নবুওয়ত প্রমাণ করব :

প্রথম দিক : তাঁর অলৌকিক চিহ্নসমূহ

দ্বিতীয় দিক : তাঁর চরিত্র ও আচরণ

তৃতীয় দিক : তাঁর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ দিক : তাঁর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা

পঞ্চম দিক : মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

ষষ্ঠ দিক : পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সা)-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহ

মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণের প্রথম দিক তাঁর অলৌকিক কথা ও কর্মসমূহ। মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক বহুসংখ্যক অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা এ জাতীয় কিছু অলৌকিক কর্ম এখানে উল্লেখ করব। কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে আমরা এগুলো উল্লেখ করব। হাদীসের ক্ষেত্রে আলোচনায় আমরা হাদীসের সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা ও তথ্য সূত্র উল্লেখ করব না। সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এগুলো সংকলিত রয়েছে। দুই শ্রেণীতে আমি এ সকল অলৌকিক বিষয় আলোচনা করব। ইতোপূর্বে ৫ম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক বিস্তারিতভাবে জেনেছেন যে, এ সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসের উপর নির্ভর করা যায়। জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও ধর্মীয় নির্দেশনা সবই তা সমর্থন করে। এ জন্য আমরা কুরআনের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশুদ্ধতার শর্তাবলি পূরণকারী সহীহ হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অলৌকিক নিদর্শনাবলি উল্লেখ করব।

প্রথম প্রকারের অলৌকিক নিদর্শনাবলি ; অতীত ও ভবিষ্যতের অজানা সংবাদ

মুহাম্মাদ (সা) অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক অজানা বিষয় বলেছেন। অতীত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম পূর্ববর্তী নবীগণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ বিষয়ক

সংবাদাদি। তিনি কারো নিকট থেকে এগুলো শ্রবণ করেন নি। কোন গ্রন্থ থেকে তিনি এগুলো পাঠ করেন নি। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ বিষয় থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন : "এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।"[২৭৮]

অতীত নবীগণ ও জাতিসমূহের বর্ণনায় বাইবেলের বিবরণের সাথে কুরআনের বিবরণের কিছু পার্থক্য রয়েছে। ৫ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে খৃষ্টান পাদরিগণের দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদনের সময় এ জাতীয় পার্থক্যের কারণ আলোচনা করেছি।[২৭৯]

ভবিষ্যতের বিষয়ে মুহাম্মাদ (সা) অনেক সংবাদ প্রদান করেছেন, যেগুলো পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে সংঘটিত হয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (মৃত্যু ৩৬ হি/৬৫৬ খৃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বললেন। সেই মুহূর্ত থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সবই তিনি বললেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ তা মনে রেখেছে এবং কেউ তা ভুলে গিয়েছে। আমার এ সকল সাথী এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়টি জানেন। তিনি যে সকল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে কোন বিষয় যখন আমার সামনে প্রকাশিত বা সংঘটিত হয় তখন আমি তা চিনতে পারি এবং তাঁর সেই বক্তৃতার কথা আমার মনে পড়ে। প্রবাস থেকে আগত পূর্ব পরিচিত মানুষের চেহারা দেখলে যেমন তার কথা মনে পড়ে যায় এবং তাকে চেনা যায়, ঠিক তেমনি আমি এ সকল ঘটনা যখন ঘটে তখন সেগুলো চিনতে পারি। বর্ণনাটি বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন।

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কিছু বিষয় এখনে উল্লেখ করছি :

(ক) পাঠক দেখেছেন যে, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩য় বিষয়ের আলোচনায় আমরা কুরআনে উল্লিখিত ২২টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছি।

(খ) মহান আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন : "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নি ? অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে

২৭৮. সূরা হূদ, ৪৯ আয়াত।

২৭৯. আমরা দেখেছি, আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও বাইবেলের বর্ণনা ভুল। ডা. মরিস বুকাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ? হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিশ্চিতরূপেই নিকটবর্তী।"[২৮০]

এই আয়াতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ওয়াদা করলেন যে, ভবিষ্যতে তারা বিপদগ্রস্ত হবেন, প্রচণ্ড বিপদে প্রকম্পিত হবেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করতে থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে বলেন : "তোমাদের বিপদ কঠিন হয়ে উঠবে। আরবদের সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। তবে চূড়ান্ত পরিণতিতে তোমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করবে।" তিনি আরো বলেন : "আরবের সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। তারা নয় বা দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আসবে।"

পরবর্তী সময়ে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরবের সম্মিলিত বাহিনী মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে। একমাস ধরে তারা মুসলিমদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। এ দীর্ঘ সময় তারা মদীনার মুসলিমদেরকে অবরোধ করে রাখে। এ সময়ে মুসলিমগণ কঠিনতম কষ্ট, ভয় ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কালাতিপাত করেন। তখন তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) আমাদেরকে যে ওয়াদা করেছিলেন এতো সেই ওয়াদারই বাস্তবায়ন। তখন তাঁরা জান্নাত ও বিজয় লাভে নিশ্চিত হন। এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ্ বলেন : "মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তো সত্যই বলেছেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেল।"[২৮১]

মুহাদ্দিসগণ হাদীসগ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সংকলন করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(১) তিনি সাহাবীগণকে মক্কা, যেরূশালেম, ইয়ামন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন।

(২) তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি একজন নারী একাকী উত্তর-পূর্ব আরবের হীরা শহর[২৮২] থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না।

---

২৮০. সূরা বাকারা, ২১৪ আয়াত।

২৮১. সূরা আহযাব, ২২ আয়াত।

২৮২. বর্তমান ইরাকের কূফা শহরের প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন আরবীয় রাজ্য।

(৩) খায়বার বিজয়ের আগের দিন তিনি সংবাদ দেন যে, আগামীকাল আলী (রা)-এর হতে খায়বারের পতন ঘটবে।

(৪) তিনি সাহাবীগণকে জানান যে, তারা পারস্য সম্রাট ও রোমান (বায়যান্টাইন) সম্রাটের ধনভাণ্ডার বণ্টন করবেন এবং পারসীয়দের মেয়েরা তাঁদের খেদমত করবে।

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সাহাবীদের জীবদ্দশাতেই তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

(৫) তাঁর উম্মত ৭৩ উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

(৬) পারস্য সাম্রাজ্য একটি বা দুটি ধাক্কা, এরপর আর পারস্য সাম্রাজ্য থাকবে না। আর রোম অনেক শিঙ বিশিষ্ট; একটি শিঙ ধ্বংস হলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল করবে। বহুদূর শেষ যুগ পর্যন্ত তারা পাথর ও সমুদ্রের অধিবাসী।

এ হাদীসে রোম বলতে ইউরোপীয়গণকে এবং খৃস্টানগণকে বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে। পারস্য সাম্রাজ্যের বা সাসানীয় সভ্যতার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে (ইসলামী সভ্যতার মধ্যে তা মিশে গিয়েছে)। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা তার বিপরীত। উমার (রা)-এর যুগে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে তাদের আধিপত্য তিরোহিত হয়েছে। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heruclius II) মুসলিম বাহিনীর হাতে শোচনীয়রূপে পরাজিত হন এবং সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে তাঁর আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু রাজত্ব এতে বিলুপ্ত হয় নি। তাদের একটি শিঙ-এর পতন ঘটলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল করেছে।

(৭) তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলগুলো থেকে পশ্চিমাঞ্চলগুলো পর্যন্ত আমার জন্য গুটিয়ে সংকুচিত করেন। আমার জন্য পৃথিবীর যা কিছু গুটানো হয়েছিল আমার উম্মতের রাজত্ব তথায় পৌছবে।

অর্থাৎ পৃথিবীর দূরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানগুলো সংকুচিত করে আমাকে প্রদর্শন করান। এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি দেখতে পাই। আমার উম্মত ক্রমান্বয়ে একের পর এক এ সকল দেশ বিজয় করবে এবং তথায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। পূর্বে ভারত[২৮৩] থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত মরক্কোর তানজিয়ার (Tangier) পর্যন্ত সকল দেশে তাঁর উম্মতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর ধর্ম প্রসার লাভ করে। লক্ষণীয় যে, পূর্ব ও পশ্চিমে তাঁর ধর্ম যেভাবে প্রসার লাভ করে, উত্তরে ও দক্ষিণে ঠিক সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। আরো লক্ষণীয় যে, তিনি 'পূর্বাঞ্চলসমূহ' ও

---

২৮৩. বরং দূরপ্রাচ্য ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামের আলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'পশ্চিমাঞ্চলসমূহ' বহুবচন ব্যবহার করেছেন এবং আগে 'পূর্বাঞ্চলসমূহ' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে তাঁর ধর্ম প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর ধর্মের অনুসারী আলিমগণ প্রকাশ লাভ করবেন এবং তা পশ্চিমের চেয়ে পূর্বে বেশি হবে।

(৮) তিনি বলেছেন, "পশ্চিমের বা প্রান্তের অধিবাসিগণ সর্বদা সত্যের উপরে বিজয়ী থাকবেন, মহাপ্রলয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত।" আবূ উমামা (রা) বর্ণিত অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "আমার উম্মতের একটি অংশ সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, তাদের নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশ আগমন করা পর্যন্ত।" কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এরা কোথায় ? তিনি বলেন, বায়তুল মাকদিস বা ফিলিস্তিনে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : 'তারা সিরিয়ায়'। এজন্য অনেক ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, 'বায়তুল মাকদিস' বলতে সিরিয়া বুঝানো হয়েছে; কারণ সিরিয়া হিজায থেকে উত্তর-পশ্চিমে।

(৯) উমার (রা) যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন অশান্তি-বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হবে না। অবস্থা তাই হয়েছিল। উমার (রা)-এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে অশান্তি প্রকাশিত হয় নি। তিনি অশান্তি-বিশৃঙ্খলার দরজা উন্মোচনের পথে বাঁধা ছিলেন।

(১০) সুপথপ্রাপ্ত শাসক বা 'মাহদী'র আগমন হবে।

(১১) ঈসা মাসীহ অবতরণ করবেন।

(১২) দাজ্জাল বের হবে।

এই তিনটি বিষয় মহাপ্রলয়ের পূর্বে প্রকাশিত হবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(১৩) উসমান (রা) কুরআন পাঠরত অবস্থায় নিহত হবেন।

(১৪) আলী (রা)-এর দাড়িকে তাঁর মাথার রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করবে যে ব্যক্তি অর্থাৎ আলী (রা)-কে যে হত্যা করবে সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

উসমান (রা) ও আলী (রা) উভয়েই তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই শহীদ হন।

(১৫) 'আম্মারকে (রা) বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার যুদ্ধে মু'আবিয়া (রা)-এর সৈন্যদের হাতে 'আম্মার নিহত হন।

(১৬) আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ বছর যাবৎ খিলাফত বিদ্যমান থাকবে। এরপর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আগমন ঘটবে।

পরবর্তীকালে ঘটনা তাই ঘটেছে বলে আমরা দেখতে পাই। সত্যিকার খিলাফত তাঁর পরে ত্রিশ বছর বিদ্যমান ছিল। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ইমাম হাসানের

খিলাফতের সময়কালও গণ্য। আবূ বক্‌র (রা)-এর খিলাফত ২ বছর তিন মাস ২০ দিন, উমার (রা)-এর খিলাফত ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন, উসমান (রা)-এর খিলাফত ১১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন, আলী (রা)-এর খিলাফত ৪ বছর ১০ মাস বা ৯ মাস কয়েক দিন এবং বাকি দিনগুলি হাসান্ (রা)-এর খিলাফত।[২৮৪]

(১৭) আমার উম্মতের পতন আসবে কুরায়শ বংশের কিছু যুবকের হাতে।

এখানে এযিদ ও মারওয়ানের বংশধরকে বুঝানো হয়েছে।

(১৮) আনসারগণ কমতে থাকবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা খাদ্যের মধ্যে লবণের মত হয়ে যাবে।

প্রকৃত অবস্থা তাই হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। আনসারগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোন একত্রিত রূপ আর অবশিষ্ট থাকে না।

(১৯) সকীফ গোত্রের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী খুনির আবির্ভাব হবে।

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছিল ছাকীফ গোত্রের মুখতার ইবনু আবূ উবাইদ (মৃত ৬৭ হি/ ৬৮৭ খৃ) এবং ধ্বংসকারী খুনি ছিল হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ (মৃত্য ৯৫ হি/ ৭১৪ খৃ)।

(২০) ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম বিজয়ের পরে মহামারী দেখা দেবে।

উমার (রা)-এর শাসনামলে ফিলিস্তিন বিজয়ের তিন বছর পরে ফিলিস্তিনের আমওয়াস শহরে এই মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। এ ছিল ইসলামের আগমনের পরে মুসলিম সমাজের প্রথম মহামারী। এতে তিন দিনের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।[২৮৫]

(২১) সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাগণের ন্যায় তাঁরা সমূদ্রে অভিযান করবেন। বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দুধ-খালা উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা)-এর বাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। তিনি ছিলেন

---

২৮৪. সাধারণভাবে চার খলীফার মাধ্যমেই ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। হাসানের খিলাফত ধরলে আক্ষরিকভাবেই ৩০ বছর পূর্ণ হয়। ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তেকাল করেন। ৪০ হিজরীর রামাদান মাসে আলী (রা) শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র হাসান (রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। ৬ মাস পরে ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হাসান শান্তি স্থাপনের জন্য সেচ্ছায় খিলাফত পরিত্যাগ মু'আবিয়াকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন।

২৮৫. অন্য বর্ণনায় ২৫ হাজার মানুষ এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন, যাদের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় অবস্থানরত অনেক মুসলিম যোদ্ধাও ছিলেন।

উবাদা ইবনু সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হারামের বাড়িতে বেড়াতে যান। তিনি তাঁকে আপ্যায়ন করেন। এরপর তিনি তথায় ঘুমিয়ে পড়েন। উম্মু হারাম তাঁর শিয়রে বসে মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে উঠে হাসতে থাকেন। তখন উম্মু হারাম বলেন, আপনি হাসছেন কেন ? তিনি বলেন, আমার কিছু উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হলো, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় অভিযান করে এই সমূদ্রের মধ্যস্থল দিয়ে সিংহাসনারোহী রাজাগণের ন্যায় গমন করবে। উম্মু হারাম বলেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন এবং পুনরায় ঘুমিয়ে যান। এরপর আবার তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে উঠেন। উম্মু হারাম জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনি কেন হাসছেন ? তিনি বলেন, তিনি পূর্বের মতই বলেন, আমার কিছু উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হলো, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় অভিযান করে এই সমূদ্রের মধ্যস্থল দিয়ে সিংহাসনারোহী রাজাগণের ন্যায় গমন করবে। উম্মু হারাম বলেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, আপনিতো প্রথম দলেই থাকবেন।

পরবর্তী সময়ে (২৭ হিজরীতে, ৬৪৭ খৃস্টাব্দে) উসমান (রা)-এর শাসনামলে যখন মু'আবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি (উম্মু হারাম) সিরিয়া থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে সাইপ্রাস অভিযানে বের হন। সমূদ্র পার হয়ে সাইপ্রাসের উপকূলে অবতরণের পর তাঁর বাহন থেকে পড়ে তিনি তথায় শহীদ হন।

(২২) ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বা নক্ষত্রেও থাকে তবে পারস্যের কিছু মানুষ তা তথা থেকে গ্রহণ করবে।

এ হাদীসে পারস্যবাসীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মত মহাজ্ঞানীদের আবির্ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে।

(২৩) তাঁর বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাতিমা (রা)-ই তাঁর কাছে গমন করবেন।

কার্যত তাই হয়। তাঁর মৃত্যুর ৬ মাস পরেই ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করেন।

(২৪) আমার এই সন্তান অর্থাৎ হাসান ইবনু আলী (রা) একজন মহান নেতা; আল্লাহ্ তার দ্বারা আমার উম্মতের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করবেন।

কার্যত তাই হয়েছিল। ৪১ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার মুসলিমগণ এবং হাসানের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য এলাকার মুসলিমগণের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২৫) আবূ যর গিফারী (রা) একাকী জীবন যাপন করবেন এবং একাকী মৃত্যুবরণ করবেন।

কার্যত তাই হয়েছিল।

(২৬) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর হাত সবচেয়ে দীর্ঘ সেই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে গমন করবেন।

কার্যত তাই হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী যয়নাব বিনতু খুযায়মা (রা) ছিলেন দানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশস্ত হস্ত। তাঁর জীবদ্দশায় স্ত্রীদের মধ্য থেকে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।

(২৭) হুসায়ন ইবনু আলী (রা) তাফ্‌ফ নামক স্থানে শহীদ হবেন।

ফুরাত নদীর তীরে কূফার নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম তাফ্‌ফ। পরবর্তীকালে তা কারবালা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে ৬১ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) হুসায়ন তথায় শহীদ হন।

(২৮) তিনি সুরাকা ইবনু জু'শাম (রা)-কে বলেন, তুমি যখন কিসরার বালাগুলি পরিধান করবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে ?

পারস্য বিজয়ের পরে যখন কিসরার মহামূল্যবান মণিমুক্তাখচিত বালাগুলি উমার (রা)-এর নিকট আনয়ন করা হয় তখন তিনি তা সুরাকাকে পরিধান করান এবং বলেন, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি এগুলিকে কিসরার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং সুরাকাকে পরিধান করিয়েছেন।

(২৯) উত্তর আরবের দাওমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দিরের নিকট খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদকে বলেন, তুমি যেয়ে দেখতে পাবে যে, সে মরুভূমিতে বন্যগরু শিকারে ব্যস্ত রয়েছে। খালিদ সেখানে যেয়ে তাকে সে অবস্থাতেই পান।

(৩০) বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হিজায থেকে একটি অগ্নি নির্গত হবে যার আভায় সিরিয়ার বুসরা শহরের উটগুলির ঘাড় আলোকিত হয়ে যাবে। এই ঘটনা ঘটার আগে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় হবে না।

৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ রবিবার (২৫/৬/১২৫/৬ খৃ) মদীনার নিকটবর্তী প্রান্তর থেকে একটি বিশাল আগুন প্রকাশিত হয়।[২৮৬] রবিবার থেকে মঙ্গলবার তিন দিন তিন রাত এই আগুন কিছুটা হালকা ছিল। এজন্য কেউ

২৮৬. সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ সিরিয় ঐতিহাসিক আবদুর রাহমান ইবনু ইসমাঈল আবূ শামা (৫৯৯-৬৬৫ হি/ ১২০২-১২৬৭ খৃ) এ বিষয়ে অসংখ্য অগণিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য ও লিখিত বিবরণ সংকলন করেন। সমসাময়িক অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ নববী (৬৩১-৬৭৬ হি) এবং অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও আলিম এ বিষয়ে লিখেন। গ্রন্থকার তাঁদের বর্ণনার সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করেছেন।

কেউ তা লক্ষ্য করে নি। এরা বলেন, ৩ তারিখ মঙ্গলবার দিনগত বুধবারের রাত থেকেই এই আগুনের আবির্ভাব। বুধবার থেকে তা অত্যন্ত ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ করে। অগ্নির প্রকম্পন ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বারংবার ভূকম্পন হয়। লোকজন ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে আল্লাহ্র কাছে কাঁদাকাটি করতে থাকে। অগ্নির আন্দোলন অব্যাহত থাকে। মদীনাবাসিগণ নিশ্চিত হন যে, তাদের ধ্বংস সন্নিকটে। শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরে আকাশে গভীর ধূয়া ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা উপরে উঠতে উঠতে এমন তীব্রতা ধারণ করে যে, মানুষের দৃষ্টি আবৃত করে ফেলে। মদীনার উপকণ্ঠে তানঈমের প্রান্তরে নিম্নভূমিতে আগুন থেমে থাকে। আগুনের মধ্যে একটি বড় শহরের ছবি দেখা যায়। শহরের চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড়বড় কেল্লার মত তাতে গ্যালারী, টাওয়ার ও মিনার রয়েছে। কিন্তু মানুষ সেই আগুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে কোন পাহাড় পড়লে তা গুড়িয়ে ও গলিয়ে দিচ্ছে। আর এ সব কিছুর ভিতর থেকে একটি লাল ও একটি সবুজ নদী বেরিয়ে আসছে, যেখান থেকে মেঘের গর্জনের মত গর্জন শোনা যায়। তার সম্মুখস্থ পাথর ও পাহাড় তা গ্রাস করে নিচ্ছিল। মদীনাবাসীরা এভাবে অগ্নি দর্শন করতে থাকেন, তবে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করেন নি বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বরকতে মদীনায় ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। (মক্কা থেকে এবং সিরিয়ার বুসরা থেকেও এই অগ্নি দৃষ্ট হয়।[২৮৭] প্রায় তিনমাস প্রজ্জ্বলিত থাকার পরে রজব মাসের ২৭ তারিখে, মে'রাজের রাত্রিতে আগুন নিভে যায়।

এই শতকের প্রসিদ্ধ মিসরীয় আলিম শায়খ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আহমদ কাসতাল্লানী (৬১৪-৬৮৬ হি/ ১২১৮-১২৮৭ খৃ) এই আগুনের বর্ণনায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার নাম 'জুমালুল ইজায ফিল ই'জায বি-নারিল হিজায', অর্থাৎ 'হিজাযের অগ্নির অলৌকিকত্বের বিষয়ে কিছু কথা'।

এই ভবিষ্যদ্বাণীও গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলির অন্যতম; কারণ এই অগ্নি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৬৫০ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ঘটনাটি প্রকাশিত হওয়ার ৪০০ বছর পূর্বে ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারীর সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলনের যুগ থেকেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলিমগণ গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি ইমাম বুখারীর জীবদ্দশাতেই প্রায় ৯০ হাজার মানুষ সরাসরি তাঁর নিকট থেকে গ্রন্থটি শিক্ষালাভ করেন। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যতার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা বা এ ব্যাপারে গোয়ার্তুমি করার কোন সুযোগ নেই।

(৩১) ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে মাসীহ দাজ্জালের বিষয়ে তাবিঈ আবূ কাতাদার সূত্রে তাবিঈ ইউসাইর ইবনু জাবির থেকে নিম্নের হাদীসটি সংকলন

২৮৭. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৭৯।

করেছেন। তাবিঈ ইউসাইর ইবনু জাবির বলেন, কূফায় প্রচণ্ড লাল বালুঝড় প্রবাহিত হয়। তখন একজন সাধারণ মানুষ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদের (মৃত্যু ৩২ হি) নিকট আগমন করে বলে, হে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ! কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কি এসে গেল ? তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন, না, কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে, উত্তরাধিকার বণ্টন হবে না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে কেউ খুশি হবে না। এরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

অতঃপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে শামের (বৃহত্তর সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডান) দিকে ইশারা করে বলেন : 'শত্রুগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে জমায়েত হবে এবং মুসলিমগণও তাদের জন্য জমায়েত হবে।' আমি বললাম : আপনি কি রোমানদের বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় কঠিন যুদ্ধ হবে এবং যুদ্ধে কঠিন পরাজয় আসবে। তখন মুসলিমগণ একদল সৈন্য প্রেরণ করবে যারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয় অথবা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং জয়লাভ না করে ফিরবে না। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকবে। অবশেষে রাত এসে তাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। তখন বিজয় নিশ্চিত না করেই রোমান সৈন্যরা এবং মুসলিম সৈন্যরা পরস্পরের শিবিরে ফিরে যাবে এবং উক্ত মরণপণ সৈন্যরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে।

এরপর মুসলিমগণ আবারো মরণপণ আরেকদল সৈন্য প্রেরণ করবে, যারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয় অর্জন না করে তারা ফিরবে না। সারাদিন যুদ্ধের পর রাতের আগমনে অমীমাংসিত যুদ্ধ বন্ধ রেখে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মরণপণ সৈন্যরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিনেও মুসলিমগণ অনুরূপভাবে একদল মরণপণ সৈন্য প্রেরণ করবে যারা বিজয় ছাড়া ফিরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হলেও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মরণপণ সৈন্যগণ শেষ হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিনে মুসলিম শিবিরের অবশিষ্ট সৈন্যগণ শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ্ যুদ্ধের চাকা রোমানদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবেন। তারা কঠিন পরাজয় বরণ করবে এবং দলে দলে নিহত হতে থাকবে। এমনভাবে তারা পরাজয়বরণ করবে যা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এমনকি পাখি তাদের পাশ দিয়ে উড়ে যখন তাদেরকে অতিক্রম করে চলে যাবে তখন তারা মৃত্যুবরণ করবে, লুটিয়ে পড়বে।

বিজয়ী মুসলিম বাহিনীরও অপূরণীয় ক্ষতি হবে। শতপুত্রের পিতা জীবিতদের মধ্যে গণনা করে মাত্র একজন পুত্রকে জীবিত দেখতে পাবে। তখন কোন্ উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে ? আর যুদ্ধলব্ধ কোন্ সম্পদই বা আনন্দ প্রদান করবে ?

বিজয়ী মুসলিমগণ যখন এমন অবস্থায় থাকবে তখন হঠাৎ তারা এর চেয়েও বড় বিপদের সংবাদ পাবে। তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে, তাদের পরিবার-পরিজনের

মধ্যে দাজ্জাল আগমন করেছে। তখন তারা তাদের সবকিছু ফেলে সেদিকে ছুটে যাবে। .....

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

সুপ্রিয় পাঠক! প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের অভ্যাস যে, তারা সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিষয়ে অস্পষ্ট ও ঘুরানো-প্যাঁচানো আপত্তি উত্থাপন করে সেগুলির সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। এজন্য আমি এখানে বাইবেল থেকে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করছি। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণ এ সকল সংবাদ বলেছেন। এগুলি থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিরুদ্ধে তাদের এ সকল ঘোরানো-প্যাঁচানো বিভ্রান্তি কিছুই নয়।

এখানে ইস্রায়েলীয় নবীদের বক্তব্য সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা জেনেছি যে, বাইবেলের পুস্তকগুলির কোন কথাই নিশ্চিতরূপে এ সকল নবী বা ভাববাদী থেকে বর্ণিত হয় নি। এগুলির কোন সনদ বা সূত্র নেই। এগুলির অবস্থা একক বর্ণনায় বর্ণিত যয়ীফ হাদীসের মত। এগুলিতে যে ভুল পাওয়া যায়, তা ভাববাদিগণের ভুল নয়, বরং তা প্রচলিত বাইবেলের ভুল। এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি করা বৈধ।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী : আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী।[২৮৮]

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী : যিশাইয়র পুস্তকের ৭ অধ্যায়ে ৮. আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী।[২৮৯]

---

২৮৮. সম্ভবত গ্রন্থকার মানুষের আয়ু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বুঝাচ্ছেন। আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে মানুষদের আয়ু সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বছর হইবে", অর্থাৎ মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু ১২০ বছর হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। নোহ ১৩৫০ বছর জীবিত ছিলেন। শেম ৬০০ বছর জীবিত ছিলেন। অর্ফক্ষদ ৩৩৮ বছর আয়ু লাভ করেন। এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বছর আয়ু পাওয়ার ঘটনাও কম ঘটে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৪ নং ভুলের আলোচনা দেখুন।

২৮৯. রাজা দায়ূদের পুত্র রাজা শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাঈল রাজ্য বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম। উত্তর রাজ্য শামেরা বা ইস্রাঈলকে 'ইফ্রয়িম' বলা হতো। এই রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে এই আয়াতে বলা হয়েছে : "আর পয়ষট্টি বৎসর গত হইলে ইফ্রয়িম বিনষ্ট হইবে, আর জাতি থাকিবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যিহূদা রাজ আহসের সময়। বাইবেলের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারেই আহস ষোল বছর রাজত্ব করেন। এরপর তার পুত্র হিষ্কিয় রাজা হন। হিষ্কিয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বছর অশূর-রাজের হাতে ইফ্রয়িম বা উত্তর প্যালেস্টাইনের ইহূদীদের শমরীয় রাজ্যের পতন ঘটে (২ রাজাবলী ১৮/৯-১০; ২ বংশাবলি ২৮/১, ২৭,২৯/১)। এভাবে দেখা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর ২১ বছরের মধ্যে ইফ্রয়িম বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২২ নং ভুলের আলোচনা দেখুন।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী : যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।২৯০

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী : যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।২৯১

পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী : দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯২

---

২৯০. সম্ভবত গ্রন্থকার ব্যবিলনে ইহুদীদের ৭০ বছর দাসত্ব করার ভবিষ্যদ্বাণী বুঝাতে চেয়েছেন। যিরমিয়র পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ : "১০ বস্তুত সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের সম্বন্ধে সত্তর বছর সম্পূর্ণ হইলে (After seventy years be accomplished at Babylon) আমি তোমাদের তত্ত্বাবধান করিব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করিব, তোমাদিগকে পুনর্বার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা তথায় ৬৩ বছর অবস্থান করেছিলেন, ৭০ বছর নয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৬, ২৭ ও ২৮ নং ভুল দেখুন।

২৯১. সম্ভবত গ্রন্থকার বাবিল-রাজ কর্তৃক সোর ধ্বংস বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছেন। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে ১-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর একাদশ বছরে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ... প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিক হইতে অশ্ব, রথ ও অশ্বারোহিগণের এবং জনসমাজের ও অনেক সৈন্যের সহিত রাজাধিরাজ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে আনাইয়া সোরে (Tyrus) উপস্থিত করিব। সে জনপদে অবস্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ করিবে, তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথিবে, তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন করিবে। আর সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র স্থাপন করিবে ও আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। .... সে আপন অশ্বগণের খুরে তোমার সমস্ত পথ দলিত করিবে, খড়্গ দ্বারা তোমার প্রজাদিগকে বধ করিবে ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। উহারা তোমার সম্পত্তি লুট করিবে, তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তোমার মনোরমা গৃহ সকল ধ্বংস করিবে এবং তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধূলি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। .... আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব : তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে ; তুমি আর নির্মিত হইবে না ....।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সোর (Tyrus)-কে চিরতরে বিধ্বংস করা তো দূরের কথা, নেবূকাদনেযার সোর অধিকারই করতে পারেন নি। নেবূকাদনেযার ১৩ বছর যাবৎ সোর অবরোধ করে রাখেন। তিনি তা অধিকার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু দখল করতে অক্ষম হন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৯ নং ভুল দেখুন।

২৯২. দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে দানিয়েল-এর স্বপ্নের বিবরণে বলা হয়েছে : "১৩ পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তিকে কথা কহিতে শুনিলাম এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নিত্য নৈবেদ্যের অপহরণ, ও সেই ধ্বংসজনক অধর্ম, দলিত হইবার জন্য ধর্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ সম্বন্ধীয় দর্শন কত লোকের জন্য ? ১৪ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত (Unto two thousand and three hundred days); পরে ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। ২৩০০ দিন পরে ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হয় নি। বিস্তারিত দেখুন, ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে ৩০ নং ভুলের আলোচনা।

Contents

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী : দানিয়েলের পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৩

সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী : দানিয়েলের পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৪

অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী : ২ শমূয়েলের ৭ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৫

নবম ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪০ আয়াতে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৬

---

২৯৩. দানিয়েল-এর ৯ম অধ্যায়ে রয়েছে : "তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে- অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য, পাপ শেষ করিবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, অনন্তকাল স্থায়ী ধার্মিকতা আনয়ন করিবার জন্য, দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত (খতম) করিবার জন্য (seal up vision and prophecy), এবং মহাপবিত্রকে অভিষেক করিবার জন্য (and to anoint the Most Holy)।"
এই ভবিষ্যৎ বাণীটিও বাস্তবায়িত হয়নি। (খৃস্টপূর্ব ৫৩৬ সালে সাইরাস কর্তৃক) ইহুদীদের ব্যবিলন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির বা যিরূশালেমের পুনঃস্থাপনের নির্দেশ প্রাপ্তির ৭০ সপ্তাহ শেষে দুই খৃস্টের এক খৃস্টও আবির্ভূত হন নি। খৃস্টানদের খৃস্টের আবির্ভাব ঘটেছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় ২৮,০০০ সপ্তাহ পরে, কিন্তু দর্শন ও ভাববাণী তাঁর দ্বারা শেষ হয়নি। আর ইহুদীদের খৃস্ট তো এখন পর্যন্ত আবির্ভূত হন নি। বিস্তারিত দেখুন, ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩২ নং ভুল।

২৯৪. দানিয়েল-এর ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১১ আর যে সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত ও ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুই শত নব্বই দিন হইবে। ১২ ধন্য সেই, যে ধৈর্য ধরিয়া সেই এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এই সময়সীমার শেষে খৃস্টানদের খৃস্টেরও আগমন ঘটেনি এবং ইহুদীদের খৃস্টেরও আগমন ঘটেনি। বিস্তারিত দেখুন, প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩১ নং ভুল।

২৯৫. এই অধ্যায়ের ১২-১৬ আয়াতে দায়ূদের বিষয়ে নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে : "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইতে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব এবং তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য-সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা হইতে দূরে যাইবে না। আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।" আমরা জানি যে, দায়ূদের বংশের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়নি। মাত্র কয়েক শত বছর রাজত্ব করার পর গত প্রায় ২০০০ বছর পূর্বেই তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুনরায় ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দায়ূদ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে ৩৪ নং ভুল দেখুন।

২৯৬. মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে (অলৌকিক নির্দশন দেখতে চায়), কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া হইবে না। ৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র (theree days and three nights) বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র (three days and three nights) পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।" এখানে যীশু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তিন দিবস ও তিন রাত্র পৃথিবীর গর্ভে অবস্থান করার পরে পুনরুত্থিত হবেন। কিন্তু বাস্তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা

দশম ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ আয়াতে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৭

একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।২৯৮

প্রমাণিত হয়েছে। যোহনের সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শুক্রবার দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে (বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা) যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়। নয় ঘটিকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 'পরে সন্ধ্যা হইলে' অরিমাথিয়ায় যোষেফ গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে যীশুর দেহ প্রার্থনা করেন, মার্কের সুসমাচারে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, শুক্রবার দিবাগত রাত্রে যীশুকে কবরস্থ করা হয়। এরপর রবিবার প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এই দেহটি কবর থেকে অদৃশ্য হয়। যোহনের সুসমাচারে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর দেহ কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর গর্ভে তিন দিন ও তিন রাত্র (three days and three nights) থাকে নি; বরং এক দিন ও দুই রাত্রি তা পৃথিবীর গর্ভে ছিল। বিস্তারিত দেখুন, ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৬০-৬২ নং ভুল।

২৯৭. মথির সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৭ কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের (angels) সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। ২৮ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলেই মৃত্যুর আস্বাদ পেয়েছে, প্রাচীন অস্থি ও মাটিতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুর পরে ২০০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ঈশ্বরের পুত্রকে ফিরিশতাগণের সাথে আপন পিতার প্রতাপে আপনার রাজ্যে এসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিতে দেখে নি। উপর্যুক্ত পরিচ্ছেদের ৬৩ নং ভুল দেখুন।

২৯৮. মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে যিরূশালেমের বিনাশ, যীশুর পুনরাগমন এবং কিয়ামত বা যুগান্তর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যিরূশালেমের ধ্বংসের পরপরই তাঁর পুনরাগমন ঘটবে। তিনি বলেন : "২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই (Immediately after the tribulation of those days) সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশমণ্ডলে পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। ৩০ আর তখন মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে। ৩১ আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে (ফিরিশতাগণকে) প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।... ৩৪ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের (this generation) লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যীশুর শিষ্যগণের জীবদ্দশাতেই ধর্মধাম ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তার পরপরই উপর্যুক্ত কোন ঘটনা ঘটেনি বা যীশুর পুনরাগমন ঘটে নি। সেই প্রজন্মের মানুষেরা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু যীশুর বাক্য বাস্তবায়িত হয় নি। এভাবে বস্তুত যীশুর বাক্য বাস্তবায়িত না হয়ে লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হয় নি। বিস্তারিত দেখুন, ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৭৬-৭৮ নং ভুল।

দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী।[২৯৯]

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। যদি কোন খৃস্টান পাদরি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আপত্তি তুলতে চান, তবে তাকে প্রথমে তাঁর নিজের ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং এরপর আমরা তার আপত্তির বিষয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় প্রকারের অলৌকিক নির্দশনাবলি : অলৌকিক কর্মসমূহ

মুহাম্মাদ ﷺ থেকে অনেক অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। আমি এখানে মাত্র ৪০টি এরূপ অলৌকিক কর্ম উল্লেখ করব।

অলৌকিক কর্ম-১ (ইসরা ও মি'রাজ : অলৌকিকভাবে রাত্রিভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন)

মহান আল্লাহ্ কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন : "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কা মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[৩০০]

এই আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ্ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। উপরন্তু এই আয়াতটিও তা প্রমাণ করে। কারণ 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?"[৩০১]

---

২৯৯. এই অধ্যায়ে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শিষ্যদের ইস্রায়েলের গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ শেষ করার আগেই তিনি তাদের নিকট ফিরে আসবেন। মথির ১০ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে ভূত ছাড়ানোর ও রোগ ভাল করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানোর সময় তাদেরকে নির্দেশ দেন, "কোন গ্রামের লোকেরা যখন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন অন্য গ্রামে পলাইয়া যাইও। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হইবার আগেই মনুষ্যপুত্র আসিবেন" (বাংলা ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদ)। এই ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। যীশুর প্রেরিতগণ ইস্রায়েলের সকল গ্রামে যাওয়া শেষ করেছেন, সকলেই মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তাদের মৃত্যুর পরে প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্র তাঁর রাজত্বে আসেন নি। দেখুন, ১ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৬৪ নং ভুল।

৩০০. সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।

৩০১. সূরা আলাক, ৯-১০ আয়াত।

অন্যত্র সূরা জিন্ন-এর মধ্যে তিনি বলেন : "আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।"[৩০২] নিঃসন্দেহে উপরের দুই স্থানেই 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখনেও 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোন কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমণ বা স্বর্গারোহণ কোন অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

জ্ঞান, বিবেক বা মানবীয় বুদ্ধির দৃষ্টিতে এবং ধর্মগ্রন্থাবলির নির্দেশনার আলোকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়।

জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে তা অসম্ভব নয় এজন্য যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সকল যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য কাজ করতে সক্ষম। অতি দ্রুতগতিতে কোন প্রাণী বা জড় পদার্থকে স্থানান্তর করা জ্ঞান-বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (সা)-কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্থানান্তর করা একটি যৌক্তিক ও সম্ভব বিষয় যা আল্লাহ্ করতে পারেন।[৩০৩] শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বিষয়টি অসম্ভব নয়, তবে অস্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়মের বাইরে। সকল অলৌকিক কর্মই অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বলেই তা অলৌকিক চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়।

ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকেও তা অসম্ভব নয়। ইহুদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জন্য সশরীরে বা জড় দেহসহ ঊর্ধ্বলোকে বা স্বর্গে গমন সম্ভব।

---

৩০২. সূরা জিন্ন, ১৯ আয়াত।

৩০৩. গ্রন্থকারের যুগে আলোর গতি, সময় ও স্থান সম্পর্কে আধুনিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁকে শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে হয়েছে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার মি'রাজের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

(১) পাদরি উইলিয়াম স্মিথ 'তরীকুল আউলিয়া' (ঈশ্বরপ্রেমিকদের পথ) গ্রন্থে Enoch ভাববাদী (ইদরিস আ)-এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যীশুখৃস্টের ৩,৩৮২ বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর বিষয়ে আলোচনাকালে এই পাদরি বলেন : "ঈশ্বর জীবিত অবস্থায় তাঁকে স্বর্গে তুলে নেন, যেন তিনি মৃত্যু না দেখেন। এজন্য লিখিত হয়েছে যে, 'তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।' এভাবে হনোক কোনরূপ রোগব্যাধি, অসুস্থতা, কষ্ট বা মৃত্যু ভোগ না করেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। তিনি সশরীরে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করেন।"

এখানে 'লিখিত হয়েছে' বলতে তিনি আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৩০৪]

(২) ২ রাজাবলির ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে (Elijah) ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলীশায় (Elisha) গিল্‌গল হইতে যাত্রা করিলেন। ..১১ পরে এইরূপ ঘটিল; তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন।"

বাইবেল-ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন : "নিঃসন্দেহে এলিয় জীবিত অবস্থায় স্বর্গে উত্থিত হয়েছেন।"

(৩) মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত নিম্নরূপ : "তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্ধ্বে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।"

(৪) ২ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে সাধু পৌল তাঁর নিজের ঊর্ধ্বারোহণ সম্পর্কে বলেছেন : "২ আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এক ব্যক্তিকে জানি, চৌদ্দ বছর হইল সশরীরে কি না, জানি না; অশরীরে কি না, জানি না; ঈশ্বর জানেন এমন ব্যক্তি তৃতীয় স্বর্গ (third heaven: তৃতীয় আসমান[৩০৫]) পর্যন্ত নীত হইয়াছিল। ৩ আর এমন ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানি সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন– সে পরমদেশে (paradise) নীত হইয়া অকথনীয় কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলা মনুষ্যের বিধেয় নয়।"

---

৩০৪. হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

৩০৫. এখানে লক্ষণীয়, হিব্রু ও আরবী 'سماء' -কে আমরা বাংলায় 'আকাশ' বা 'আসমান' বলে থাকি। আর স্বর্গ বলতে আমরা 'জান্নাত'বা 'ফেরদাউস' বুঝি। বাইবেলের পরিভাষায় কিছু ব্যতিক্রম আছে। বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের 'سماء' অর্থাৎ 'আকাশ' বা 'আসমান'-কে 'heaven' বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে একে স্বর্গ বলা হয়েছে। আর জান্নাতকে ফিরদাউস (paradise) বলা হয়েছে এবং বাংলায় 'পরমদেশ' বলা হয়েছে।

এভাবে পৌল তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত এবং পরমদেশে (paradise) উর্ধ্বারোহণের দাবি করলেন এবং মানুষের বলা বিধেয় নয় এমন সব অকথনীয় কথা শ্রবণেরও দাবি করলেন।

(৫) প্রকাশিত বাক্যের ৪র্থ অধ্যায়ে যোহন বলেছেন : "১ ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে (a door was opened in heaven), এবং প্রথম যে রব শুনিয়াছিলাম, যেন তূরীর রব আমার সহিত কথা কহিতেছিল, সেই রব শুনিলাম, কেহ বলিতেছেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে, সেই সকল আমি তোমাকে দেখাই। ২ আমি তখনই আত্মবিষ্ট হইলাম, আর দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন।"

এ সকল বিষয় সবই খৃস্টানগণের নিকট স্বীকৃত সত্য। কাজেই জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মি'রাজ অস্বীকার করার কোন সুযোগ পাদরিগণের নেই।

তবে তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁদেরই বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি এখানে উত্থাপিত হতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) তত্ত্ব অনুসারে 'আকাশ' বা আসমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাহলে তাদের বিশ্বাস হনোক, এলিয় এবং যীশুর আকাশে আরোহণ কিভাবে সত্য হতে পারে? কিভাবেই বা যীশু ঈশ্বরের ডান দিকে উপবেশন করলেন?

খৃস্টানদের মহাপুরুষ সাধু পৌল তৃতীয় আসমান পর্যন্ত এবং এরপর ফেরদৌস পর্যন্ত উত্থিত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে ৫ম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে আমরা পোপগণের নরক ও প্রায়শ্চিত্ত স্থান (purgatory) সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তবে তাদের ফেরদাউস সম্পর্কে জানতে পারিনি। তাদের এই ফিরদাউস কি উপকথার রাক্ষসের মত কাল্পনিক তৃতীয় আসমানেই অবস্থিত? অথবা তার উর্ধ্বে অবস্থিত?

এমনও হতে পারে যে, ফেরদাউস বা পরমদেশ বলতে তারা জাহান্নাম বা নরককেই বুঝান। বাইবেলের নতুন নিয়মের বা সুসমাচারের বক্তব্য ও খৃস্টানগণের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক পুস্তকাদির বক্তব্য সমন্বয় করলে তাই বুঝা যায়। কারণ যীশুর সাথে যে দুই দুষ্কর্মকারীকে (malefactors) ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ যীশু তাদের একজনকে বলেছিলেন : "আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে (Today shalt thou be with me in paradise)।"৩০৬

---

৩০৬. লূক ২৩/৪৩।

খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের তৃতীয় বিশ্বাসে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, যীশু মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেছিলেন। উভয় বিষয়কে সমন্বিত করলে আমরা বুঝতে পারি যে, খৃস্টীয় বিশ্বাসে নরককেই ফিরদাউস (paradise) বা পরমদেশ বলা হয়েছে।

জাওয়াদ বিন সাবাত তাঁর 'আল-বারাহীন আস-সাবাতিয়া' পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বের ১৬শ প্রমাণে বলেন : "অনুবাদকদের উপস্থিতিতে পাদরি কিয়ারোস আমাকে প্রশ্ন করেন : মুসলিমগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর মি'রাজ সম্পর্কে কি বিশ্বাস পোষণ করে ? আমি বললাম, তারা বিশ্বাস করে যে, মি'রাজ হয়েছিল মক্কা থেকে যিরূশালেম পর্যন্ত এবং তথা থেকে ঊর্ধ্বাকাশে। তিনি বলেন, জড় দেহের পক্ষে তো আকাশে উঠা অসম্ভব। আমি বললাম, আমি জনৈক মুসলিমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বলেন, যীশুর পক্ষে যেমন সশরীরে আসমানে ঊর্ধ্বগমন সম্ভব হয়েছিল সেভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন, আপনি কেন বললেন না যে, আকাশের জন্য খোলা বা বন্ধ হওয়া সম্ভব নয় ? আমি বললাম, আমি সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে, যীশুর ক্ষেত্রে যেমন তা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছিল। পাদরি বলেন, আপনি কেন বললেন না যে, যীশু তো ঈশ্বর। কাজেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা করতে পারেন ? আমি বললাম, আমি সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেন যে, যীশুর ঈশ্বরত্ব বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা; কারণ ঈশ্বরের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে না। প্রহৃত হওয়া, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, কবরস্থ হওয়া ইত্যাদি বিষয় কখনোই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না।"

আমার একজন প্রিয়জন আমাকে বলেছেন যে, ভারতের বেনারস শহরে এক পাদরি ছিলেন। তিনি সাধারণ মুর্খ গ্রাম্য মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন মজলিসে বলতেন, আপনারা কিভাবে মি'রাজকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, অথচ তা একেবারে অসম্ভব বিষয়। তখন একজন ভারতীয় অগ্নিউপাসক (Magian, adherent of Mazdaism) তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বলেন, কুমারী মহিলার স্বামী ছাড়া গর্ভবতী হওয়ার চেয়ে মি'রাজের ঘটনা বেশি অসম্ভব নয়। যদি কোন বিষয় অসম্ভব হলেই মিথ্যা বলে গণ্য হয় তবে কুমারী মেরির গর্ভধারণের ঘটনাও মিথ্যা! তাহলে আপনারা এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন কিভাবে ? এ কথায় উক্ত পাদরি মহাশয় নির্বাক হয়ে যান।

অলৌকিক কর্ম–২ (চন্দ্র খণ্ডিত করা)

মহান আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন : "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।"[৩০৭]

৩০৭. সূরা কামার, ১-২ আয়াত।

এখানে মহান আল্লাহ্ অতীত কালের ক্রিয়ার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে : কাজেই তা সংঘটিত হয়েছিল বলে স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। এখানে অতীত কালের ক্রিয়াকে 'ভবিষ্যৎ কালের' ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা বা 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে' বলে মনে করা অবান্তর ও ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যা। চারটি কারণে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় :

প্রথম কারণ : সাহাবী হুযায়ফা (রা) বর্ণিত কিরাআত বা পাঠে এই আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিয়ামত নিকটবর্তী এবং ইতোমধ্যেই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে :" এক্ষেত্রে মূলনীতি যে, উভয় পাঠের অর্থ একই প্রকার হবে।

দ্বিতীয় কারণ : উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, কাফিরগণ কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে। এথেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঘটনাটি ঘটেছিল এবং তারা যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কোন ঘটনা ঘটার আগেই তাকে যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন আসে না।

তৃতীয় কারণ : প্রসিদ্ধ মুফাসসির বা কুরআন ব্যাখ্যাকারগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এখানে 'বিদীর্ণ হয়েছিল' বলতে অতীত কালই বুঝতে হবে। 'বিদীর্ণ হয়েছিল' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে' বলে অতীত কালের ক্রিয়ার অর্থ ভবিষ্যত কালে নিয়ে যাওয়ার মতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চতুর্থ কারণ : সর্বোপরি বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্র বাস্তবিকই বিদীর্ণ ও খণ্ডিত হয়েছিল। এজন্য 'শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থের লেখক[৩০৮] বলেন, "চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি 'মুতাওয়াতির' বা অতিপ্রসিদ্ধ ভাবে বর্ণিত। ইবনু মাসউদ ও আরো অনেক সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন।"[৩০৯]

আল্লামা তাজ উদ্দীন আবূ নাসর আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু ইমাম আলী ইবনু আবদুল কাফী ইব্ন তামাম আল-আনসারী আস-সুবকী (৭৭১ হি/১৩৭০ খৃ) তাঁর প্রণীত 'শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব' নামক উসূলুল ফিকহের গ্রন্থে বলেন : "আমার নিকট সঠিক মত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির। কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে এই অর্থের হাদীসগুলি সংকলিত হয়েছে।"

৩০৮. সাইয়েদ শরীফ আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী (৮১৬ হি)।

৩০৯. বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতইম (রা) ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে উল্লিখিত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই অলৌকিক চিহ্ন পাদরিগণ অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিভ্রান্তি নিম্নরূপ : "গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রাদির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হওয়া বা জোড়া লাগার কোন অবকাশ নেই। এছাড়া যদি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি সত্যই ঘটতো, তবে পৃথিবীর কারো কাছেই তা অজ্ঞাত থাকত না এবং বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করতেন।"

এই বিভ্রান্তির অপনোদনে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাদরিগণের এই মহাযুক্তি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটি ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত দুর্বল এবং জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির আলোকেও অত্যন্ত দুর্বল।

ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে নিম্নোক্ত ৭টি বিষয় এই মহাযুক্তিটিকে অচল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করে :

প্রথম বিষয় : বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নোহের জলপ্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী যা এক বছরকাল স্থায়ী ছিল। এই মহাপ্লাবনে ভূচর, খেচর, সকল মানুষ, পশু, পাখি ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়, শুধু নোহের জাহাজে অবস্থানকারিগণই জীবিত থাকে।[৩১০] মানুষদের মধ্য থেকে এই প্লাবনের পরে কেবল ৮জন মানুষই[৩১১] জীবিত থাকে। আদিপুস্তকের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতরের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে রয়েছে : "যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্বিত করিতেছিল, তখন তাহারা অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।"

পিতরের দ্বিতীয় পত্রের ২য় অধ্যায়ের ৫ আয়াত নিম্নরূপ : "আর তিনি পুরাতন জগতের প্রতি মমতা করেন নাই, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনিলেন, তখন আর সাত জনের সহিত ধার্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন।"

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ইহূদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এই মহা জলপ্লাবনের পরে মাত্র ৪, ২১২ সৌর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ৪,২১২ বছর পূর্বে এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।

অথচ এই ঘটনার কোন বিবরণ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে ও গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ নেই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ মহাপ্লাবনের ঘটনা ও তারিখের

---

৩১০. এইরূপে ভূমণ্ডল-নিবাসী সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হইল, পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাঁহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচিলেন। আদিপুস্তক ৭/২৩।

৩১১. নোহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ।

বিষয়টি কঠিনভাবে অস্বীকার করেন। তাদের পণ্ডিতগণ সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেন। তারা বলেন, পূর্ববর্তী সময়ের কথা যদি আমরা বাদও দিই, তবে অবতার কৃষ্ণের যুগ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি। ভারতীয় পণ্ডিতদের পুস্তকাদির হিসাব অনুসারে বর্তমান সময়ের (১৮৬৪ খৃস্টাব্দের) ৪,৯৬০ বছর পূর্বে কৃষ্ণের আগমন। তারা বলেন, আমরা যদি এই সময়কালের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, এইরূপ সর্বভূমণ্ডলব্যাপী মহাপ্লাবন এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ কৃষ্ণের যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অনেক শহর এখনো বিদ্যমান। তাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কৃষ্ণের যুগের এত ঐতিহাসিক তথ্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তা যেন গতকালের ঘটনা।

ইবনু খালদূন তাঁর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন : "জেনে রাখ, পারসীয় ও ভারতীয়গণ মহাপ্লাবনের কথা জানেন না। পারস্যের কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই প্লাবন শুধু ব্যাবিলনে সংঘটিত হয়েছিল।"

প্রসিদ্ধ মিসরীয় ঐতিহাসিক আল্লামা তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু আলী ইবনু আবদুল কাদির ইবনু মুহাম্মাদ মাকরিযী ৮৪৫ হি/ ১৪৪১ খৃ) 'কিতাবুল মাওয়াইয ওয়াল-ই'তিবার বি-যিকরিল খুতাতি ওয়াল-আছার' নামক ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন : "পারস্যের অধিবাসিগণ এবং অন্যান্য দেশের সকল অগ্নিউপাসক (Magian, adherent of Mazdaism), (দক্ষিণ ইরাকের) কালদীয়গণ (Chaldeans), ব্যবিলনীয়গণ, ভারতীয়, চীনাগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় জনগোষ্ঠী মহাপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন। পারস্যের কিছু মানুষ তা স্বীকার করেন। তবে তারা বলেন, এই প্লাবন সিরিয়া ও পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া কোথাও হয়নি। এই প্লাবন সর্বাত্মক বা সর্বব্যাপী ছিল না। এতে কিছু মানুষ ডুবে মারা যায়। এই প্লাবন সিরিয়ার হুলওয়ান এলাকা অতিক্রম করে নি। পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে এই প্লাবন আসে নি।"

পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই মহাজলপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে উপহাস করেন। নাস্তিক জন ক্লার্ক লীডসে ১৮৩৯ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় পুস্তিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন: "দর্শন-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুসারে মহাপ্লাবনের এ সকল কাহিনী অসত্য। আমি শুধু অবাক হই, এই প্লাবনে পানির মাছগুলি কি মৃত্যুবরণ করেছিল ?

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের অন্তরের চিন্তার সমস্ত কল্পনাই নিরন্তর কেবল মন্দ (every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually)। তাহলে ঈশ্বর কেন এই ৮ জন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন। তিনি কেন সবাইকে ধ্বংস করে নতুন করে মানুষ সৃষ্টি করলেন না ? কেন ঈশ্বর তাঁর পুরাতন সৃষ্টিকে অবশিষ্ট রাখলেন, যার

ফলে নিরন্তর মন্দ চিন্তা ও কল্পনা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল ? কারণ খারাপ বৃক্ষ কখনো ভাল ফল দিতে পারে না। এজন্যই মথি তাঁর সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলেছেন : "লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে ?"

নোহ মদ্যপ, পাশবিক ও অত্যাচারী ছিলেন (নাঊযু বিল্লাহ্!)। আদি পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২১ ও ২৫ আয়াত থেকে তা জানা যায়। তাহলে কিভাবে আশা করা যায় যে, তাঁর বংশধর সৎ হবে ? নোহের বংশধর যে সৎ নয় তা ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে পৌলের বক্তব্য থেকে জানা যায়।[৩১২] এছাড়া তীত ৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াত[৩১৩], ১ পিতরের ৪ অধ্যায়ের ৩ আয়াত[৩১৪] এবং গীত সংহিতার ৫১ গীতের ৫ আয়াত[৩১৫] থেকেও তা জানা যায়।"

এরপর জন ক্লার্ক ৯৩ পৃষ্ঠায় অত্যন্ত অভদ্রভাবে উপহাস করেছেন এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে। তাঁর অশোভনীয় কথা উদ্ধৃত করতে আমি ইচ্ছুক নই।

দ্বিতীয় বিষয় : যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে –(১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদ অনুসারে[৩১৬]) "১২ তৎকালে যে দিন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে সমর্পণ করেন, সেই দিন যিহোশূয় (Joshua) সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন; আর তিনি (যিহোশূয়) ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন, সূর্য! তুমি স্থগিত হও গিবিয়োনে, আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে। ১৩ তখন সূর্য স্থগিত হইল, ও চন্দ্র স্থির থাকিল, যাবৎ সেই জাতি শত্রুদের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই ? আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্ত গমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস অপেক্ষা করিল (So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day)"।

১৮৪৬ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত 'তাহকীকুল হক' নামক পুস্তকের ৩য় অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "যিহোশূয়ের প্রার্থনার কারণে সূর্যের অস্তগমন ২৪ ঘন্টা থেমে থাকে।"

---

৩১২. সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবত ক্রোধের সন্তান ছিলাম।

৩১৩. কেননা পূর্বে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম।

৩১৪. কেননা পরজাতীয়দের বাসনা সাধন করিয়া, লম্পটতা, সুখাভিলাষ, মদ্যপান, রঙ্গরস পানার্থক সভা ও ঘৃণার্হ পতিমাপূজারূপ পথে চলিয়া যে কাল অতীত হইয়াছে..।

৩১৫. দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

৩১৬. বাংলা অনুবাদ বাংলা বাইবেল থেকে।

এই ঘটনাটি খুবই বড় ঘটনা। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের জন্মের ১৪৫০ বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। যদি তা সত্যিই ঘটে থাকত, তবে বিশ্বের সকলের জন্যই তা প্রকাশ পেত। এ কথা তো স্পষ্ট যে, গভীর মেঘ থাকলেও এই ঘটনা কারো অজ্ঞাত থাকে না। আবার দূরত্বের কারণেও তা না জানার কোন সুযোগ নেই। এ সময়ে যে সকল দেশে রাত ছিল সে সকল দেশের মানুষেরাও বিষয়টি নিশ্চিত জানতেন; কারণ কোথাও যদি ২৪ ঘণ্টা রাত দীর্ঘায়িত হয় তবে তা তাদের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং তারা সকলেই তা জানবে। অথচ এত বড় ঘটনাটি ভারতের হিন্দুদের কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নি। চীন ও পারস্যের মানুষেরাই তা জানতে পারে নি। আমি ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতদেরকে এই বিষয়টি অস্বীকার করতে শুনেছি। তারা বলেন যে, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ও বাতুল। পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই ঘটনা অস্বীকার করেন এবং এ নিয়ে উপহাস করেন। তারা এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনার বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেন।

প্রথম আপত্তি : যিহোশূয় বলেছেন, 'সূর্য, তুমি স্থগিত হও', এরপর বাইবেলে বলা হয়েছে, 'তখন সূর্য স্থগিত হইল'। এই বক্তব্য দুটি প্রমাণ করে যে, সূর্য আবর্তনশীল ও পৃথিবী স্থির। কারণ তা না হলে বলা হতো 'পৃথিবী, তুমি স্থগিত হও.. পৃথিবী স্থগিত হইল..। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) তত্ত্ব অনুসারে বাইবেলের এ সকল বক্তব্য ভুল। ইউরোপের সকল পণ্ডিতই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন এবং এ বিষয়ক প্রাচীন তত্ত্বাবলি ভুল বলে বিশ্বাস করেন। সম্ভবত যিহোশূয় এ সব জানতেন না, অথবা পুরো কাহিনীটিই বানোয়াট।

দ্বিতীয় আপত্তি : বাইবেলে বলা হয়েছে : "আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় ছিল ঠিক দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্ন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা অবাস্তব বলে বুঝা যায় :

প্রথমত, সূর্যকে স্থগিত করার আগেই এ সব শত্রুর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলীয়গণ যুদ্ধ করে 'মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈৎহোরোণের আরোহণ পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিলেন, এবং অসেকা ও মক্কেদা পর্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। আর ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়নকালে যখন তাহারা বৈৎহোরোণের অবরোহণ-পথে ছিল, তখন সদাপ্রভু অসেকা পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপর মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাপাতে মরিল।[৩১৭] বাইবেলের এই অধ্যায়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সকল ঘটনা সব দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। কাজেই এরপর যিহোশূয়ের আর অস্থির হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বিজয়ী ইস্রায়েল-সন্তানগণ ছিল সংখ্যায় অনেক। পক্ষান্তরে পরাজিত অবশিষ্ট শত্রুদের

---

৩১৭. যিহোশূয় ১০/৮-১১।

সংখ্যা অতি সামান্য। কারণ তাদের প্রায় সকলেই ইস্রায়েলীয়দের হাতে বা শিলাপাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এই সামান্য সংখ্যক শত্রুকে নিধন করতে দিবসের অর্ধেকই অবশিষ্ট রয়েছে। কাজেই সূর্যাস্তের পূর্বেই এদেরকে শেষ করে দেওয়া ইস্রায়েলীয়দের জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার ছিল।

দ্বিতীয়ত, এ সময় দ্বিপ্রহর। এ সময়ে তারা কিভাবে চন্দ্র দেখতে পেলো ? সর্বোপরি এ অবস্থায় দিবসের আলো রক্ষার জন্য চন্দ্রকে স্থগিত করা যুক্তির দৃষ্টিতে অর্থহীন কর্ম।

তৃতীয়ত, এ সময় দ্বিপ্রহর ছিল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দিবসের বাকি সময়ের বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ও দ্বিধা ছিল না। আর তাদের কাছে ঘড়ি ছিল না। তাহলে তারা কিভাবে জানলেন যে, সূর্য ঠিক দ্বিপ্রহরের স্থানেই অবস্থান করছিল, এই দীর্ঘ সময়ে পশ্চিম দিকে একটুও হেলে যায় নি কি ?

তৃতীয় আপত্তি : জন ক্লার্ক বলেন : ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যতদিন পৃথিবী থাকবে দিবারাত্রির আবর্তন কখনো থামবে না। আদিপুস্তকের ৮ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে : "যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উত্তাপ, এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না (While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease)।" যদি এই দীর্ঘ সময় সূর্য অস্ত না যায়, তবে তো এই দীর্ঘ সময় রাত্রি থেমে থাকল!

তৃতীয় বিষয় : যিশাইয় ভাববাদীর অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে সূর্যের পিছিয়ে আসা সম্পর্কে যিশাইয়র পুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "পরে সূর্য যত ধাপ নামিয়া গিয়াছিল, তাহার দশ ধাপ ফিরিয়া গেল।"

এ ঘটনাও অত্যন্ত বড় ঘটনা। দিবসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কাজেই বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই তা জানার কথা। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশুখৃস্টের জন্মের ৭১৩ সৌর বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘটনাও পারস্য, চীন ও ভারতের কোন ইতিহাসে লেখা হয় নি।

এছাড়া বাইবেলের এই বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে, সূর্য আবর্তনশীল ও পৃথিবী স্থির। এ বিষয়টিও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যতিল। তবে এ বিষয় বাদ দিলেও প্রশ্ন থাকে, সূর্যের দশ ধাপ ফিরে যাওয়া কিভাবে ঘটেছিল ? হয় দিবস দশ ধাপ পিছিয়ে গিয়েছিল, অথবা সূর্য আকাশে দশ ধাপ ফেরত গিয়েছিল, অথবা পৃথিবী তার আবর্তনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দশ ধাপ পিছিয়ে গিয়েছিল। এই তিনটি বিষয়ই দর্শন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবাস্তব।

উপরের তিনটি ঘটনা ইহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকটেই স্বীকৃত। পরবর্তী ঘটনাবলী কেবল খৃস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

চতুর্থ বিষয় : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) উপর হইতে নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল (many bodies of the saints which slept arose), ৫৩ এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন (And came out of the graves after his ressurrection, and went into the holy city, and appeared unto many)" ।[৩১৮]

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক জেনেছেন যে, নিঃসন্দেহে এটি একটি বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী। ইহূদী, রোমান ও অন্যান্য অখৃস্টান জাতির কোন ইতিহাসে এ ঘটনার অস্তিত্ব নেই। মার্ক ও লূক উভয়েই মৃত্যুর সময়ে যীশুর উচ্চরবে চিৎকারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই 'শৈল বিদীর্ণ হওয়া, কবর সকল খুলিয়া যাওয়া, অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকদের দেহ উত্থাপিত হওয়া এবং তাদের যিরূশালেমে প্রবেশ করার' কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ যীশুর চিৎকারের চেয়ে এ সকল বিষয় অধিক উল্লেখযোগ্য। শৈল বিদীর্ণ হওয়া এমন বিষয়, যা ঘটনা ঘটার পরেও দেখা যায় (তা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে কিছুই লিখলেন না)।

অবাক বিষয় যে, এ সকল মৃত সাধু কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে কি করলেন তা কিছুই মথি লিখলেন না। তারা কাদেরকে দেখা দিয়েছিলেন ? তাদের তো উচিত ছিল ইহূদীগণ এবং পীলাতের সাথে দেখা করা যাতে তারা যীশুকে বিশ্বাস করেন। অনুরূপভাবে যীশুর জন্যও তো যৌক্তিক দায়িত্ব ছিল যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পরে তিনিও এদের সাথে সাক্ষাত করবেন যেন তাঁর বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হয় এবং তাঁর শিষ্যরা রাত্রিবেলায় তাঁর মৃতদেহ চুরি করেছে বলে অভিযোগ করার কোন সুযোগ ইহূদীদের থাকত না।[৩১৯]

---

৩১৮. এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পরে তিন দিবস তারা কবরের নিকটেই বসে ছিলেন। যীশুর পুনরুত্থানের পরে তারা দল বেঁধে যিরূশালেমে প্রবেশ করে মানুষদেরকে দেখা দেন। আর যীশু গোপনে শুধু তাঁর শিষ্যদেরকে সাক্ষাত দেন।

৩১৯. খৃস্টানগণের দাবি অনুসারে পারলৌকিক মুক্তির জন্য কোন কর্ম, সততা বা ধর্মপালন জরুরী নয়, বরং একটিমাত্র বিশ্বাস জরুরী যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মানুষের পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর যীশুর আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল এই উৎসর্গ। মূলত যীশু কোন আদর্শ বা কর্ম শিক্ষা দিতে আসেন নি, বরং নিজেকে উৎসর্গ করে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর এক্ষেত্রে পুনরুত্থানের পরে যিরূশালেমের সকলকে, বিশেষত পীলাত ও ইহূদীগণের সাথে সাক্ষাত করলে তাঁর উৎসর্গের বিষয়টি তারা নিশ্চিতরূপে জানতেন এবং কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বের সকলেই তা জানতে পারতেন। মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হতো।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল সাধু বা পবিত্র মানুষ যিরূশালেমের মানুষদেরকে দেখা দেওয়ার পরে কি করলেন তা মথি লিখেন নি। তারা কি পুনরায় তাদের কবরে ফিরে গিয়েছিলেন ? না কি তারা জীবিতই রয়ে গিয়েছিলেন ?

কোন কোন রসিক ব্যক্তি বলেন, সম্ভবত মথি একাই এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায়!

এখানে উল্লেখ্য যে, লূকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মন্দিরের তিরস্করিণী --চিরে গিয়েছিল যীশুর মৃত্যুর পূর্বে। পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বিবরণ এর বিপরীত।

পঞ্চম বিষয় : মথি, মার্ক ও লূক যীশুর ক্রুশারোহণের বিবরণে লিখেছেন : "বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। সূর্যের আলো রহিল না।"৩২০

এ ঘটনাটি সত্যিই ঘটে থাকলে তা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই জানতে পারত। কারণ, বাইবেলে দাবি করা হয়েছে যে, ঘটনাটি দিবসে ঘটেছিল এবং দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। অথচ ভারত, চীন, পারস্য ইত্যাদি দেশের ইতিহাসে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।৩২১

ষষ্ঠ ঘটনা : মথি তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মুখে ইহূদীদের রাজার, অর্থাৎ যীশুর জন্মের সংবাদ পেয়ে হেরোদ রাজা বৈৎলেহম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে দুই বছর বা তার কম বয়সের যত বালক ছিল সবাইকে হত্যা করেন। এরূপ একটি নির্মম পৈশাচিক গণহত্যার কথা অন্তত রোমান রাজ্যের সকলেরই জানার কথা। অথচ কোন ইতিহাসে এ ঘটনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি মথি ছাড়া অন্য কোন সুসমাচার লেখকও এই ঘটনার কথা লিখেন নি।

সপ্তম বিষয় : মথি ও লূকের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে এবং মার্কের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের নিকট যীশুর বাপ্তাইজিত হওয়ার বিবরণে নিম্নের কাহিনীটি রয়েছে : "১০ আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপর নামিয়া আসিতেছেন। ১১ আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।" এ মার্কের ভাষা (অন্যদের ভাষাও প্রায় একই)।৩২২

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশ দুইভাগ হয়ে গেল! কাজেই বিষয়টি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়।

৩২০. মথি ২৭/৪৫; মার্ক ১৫/৩৩; লূক ২৩/৪৪।

৩২১. যীশুর সমকালীন রোমান ও ইহূদী ইতিহাসেও এ ঘটনার সামান্যতম কোন উল্লেখ নেই।

৩২২. মার্ক ১/১০-১১; মথি ৩/১৬-১৭; লূক ৩/২১-২২।

অনুরূপভাবে কপোতের নেমে আসা প্রত্যক্ষ করা এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে আগত লেখকগণ ছাড়া বিশ্বের আর কেউই এ সকল বিষয়ে কিছুই লিখেন নি।

এই ঘটনা সম্পর্কে উপহাস করে জন ক্লার্ক বলেন : "মথি আমাদেরকে অত্যন্ত বড় সংবাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। যখন আকাশের দরজা খুলে গেল, তখন কি আকাশের বড় দরজাগুলো খুলেছিল ? না মাঝারি দরজাগুলো ? না ছোট দরজাগুলো? আর এই দরজাগুলো সূর্যের এদিকে ছিল না ওদিকে ? মথির এই ভুলের কারণে আমাদের পাদরিগণ দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়াতে থাকেন।"

এরপর তিনি বলেন : "মথি আমাদের এই কপোতের সংবাদও দিলেন না। কপোতটিকে কি কেউ ধরে খাঁচায় ভরেছিল ? নাকি সেটিকে তারা আবার আকাশে ফিরে যেতে দেখেছিলেন ? যদি ফিরে যেতে দেখেন, তবে বুঝতে হবে যে, আকাশের দরজাগুলো এই দীর্ঘ সময় উন্মুক্তই ছিল। সেক্ষেত্রে জানা গেল যে, তারা আকাশের অভ্যন্তরভাগ ভাল করেই দেখে নিয়েছিল। কারণ পিতরের তথায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত তথায় কোন দারোয়ান ছিল বলে জানা যায় না। সম্ভবত এই কপোতটি ছিল একটি জিন।"

উপরের ৭টি বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ করার বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তি ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনার আলোকে ভিত্তিহীন ও বাতিল। এছাড়া নিম্নের ৮টি বিষয় প্রমাণ করবে যে, জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতেও তাঁদের আপত্তি ভিত্তিহীন ও বাতিল :

প্রথম বিষয় : চন্দ্র খণ্ডিত করার ঘটনাটি ঘটেছিল রাত্রিতে। আর রাত সাধারণভাবে ঘুম, বিশ্রাম ও ঘরে থাকার সময়। এ সময়ে মানুষ ঘরের বাইরে বা রাস্তাঘাটে চলাচল করে কম। আর যদি আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয় বা শীতকাল হয় তবে সব মানুষ জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আরাম করে। এমতাবস্থায় প্রায় কেউই আকাশের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না। শুধু যে ব্যক্তি আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখে বা কোন কিছুর অপেক্ষায় থাকে সেই আকাশের অবস্থা জানতে পারে। এজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে, রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, অথচ অধিকাংশ মানুষই সে বিষয়ে কিছুই জানে না। সকালে কেউ তাকে সংবাদ দিলে সে তা জানতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয় : চন্দ্র খণ্ডিত করার ঘটনাটি সামান্য সময়ের জন্য ঘটেছিল। দু-তিন ঘণ্টা বা দীর্ঘ সময়ের ঘটনা হলে মানুষ নিজে তা প্রত্যক্ষ করার পরে অন্যকে ডেকে তা দেখাতে পারে বা ঘুমন্ত মানুষকে তা দেখার জন্য ঘুম থেকে উঠিয়ে আনতে পারে। এ ঘটনাটি কখনোই সেরূপ ছিল না।

তৃতীয় বিষয় : বিশ্বের কেউই এ ঘটনাটি ঘটবে বলে অপেক্ষায় ছিল না। পূর্ব থেকে যে ঘটনার অপেক্ষায় থাকা হয় সে ঘটনা অনেকেই দেখতে বা দেখাতে পারে। যেমন রামাদানের চাঁদ, দুই ঈদের চাঁদ দেখা বা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ অবলোকন করা। সাধারণত আগে থেকেই আগ্রহী সকলে জানেন যে, অমুক সময়ে চাঁদ দেখা যেতে পারে বা অমুক সময়ে গ্রহণ হবে। এজন্য অনেকেই তা দেখতে পারে। দিবসেও সকল মানুষ সব সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখে না, রাতে তো দূরের কথা। এ কারণে যারা এই অলৌকিক চিহ্ন দাবি করেছিল তারা তা দেখেছিল; কারণ তারা তার অপেক্ষায় ছিল। এছাড়া এ সময়ে যাদের দৃষ্টি কাকতালীয়ভাবে আকাশের দিকে গিয়েছিল তারাও তা দেখেছিলো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদরে দাবি অনুসারে যখন রাসূলুল্লাহ (স) চন্দ্র খণ্ডিত করে দেখালেন, তখন তারা বলল, মুহাম্মাদ (সা) তোমাদেরকে যাদু করেছে। আবু জাহল বলে, এ যাদু মাত্র। তোমরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় খবর নিয়ে দেখ, তারা চন্দ্রকে খণ্ডিত দেখেছে কি না ? এরূপ অনুসন্ধানের সময় মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার কোন কোন মানুষ বলে যে, তারা চাঁদকে খণ্ডিত অবস্থায় দেখেছিল। আরবের পথিকগণ অধিকাংশ সময় দিনে বিশ্রাম করত এবং রাতে পথ চলত। এজন্য এরূপ পথিকদের কেউ কেউ তা অবলোকন করে। এজন্য তারা বলে 'এ তো চিরাচরিত যাদু।'

একাদশ হিজরী শতকের (সপ্তদশ খৃষ্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম ফিরিশতা (৯৫৯-১০৩২ হি/১৫৫২-১৬২৩ খৃ) তাঁর রচিত 'তারিখ ফিরিশতা' নাম ইতিহাস-গ্রন্থের ১১শ প্রবন্ধে লিখেছেন : ভারতের মালাবারের কেউ কেউ তা দেখতে পায়। এ দেশের শাসক ছিলেন অগ্নি-উপাসক। এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৮ম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক হাফিয ইউসুফ ইবনু আবদুর রাহমান মিযযী (৬৫৪-৭৪২ হি/১২৫৬-১৩৪১ খৃ) তাঁর শিক্ষক তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনু আবদুল হালীম ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮ হি/১২৬৩-১৩২৮ খৃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন পরিব্রাজক তাঁকে বলেছেন, তিনি ভারতে একটি প্রাচীন স্থাপনা দেখেছেন, যার উপরে লেখা রয়েছে, যে রাত্রে চন্দ্র খণ্ডিত হয়েছিল সে রাতে স্থাপিত।

চতুর্থ বিষয় : অনেক সময় অনেক স্থানে আকাশের ঘন মেঘ বা পাহাড়ের কারণে চাঁদ দেখা যায় না। অনেক সময় এরূপ হয় যে, একই দেশের এক এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে বা আকাশে ঘন মেঘ রয়েছে, ফলে দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূর্য দেখা যায় না এবং সবুজ রঙে যে আবরণকে সাধারণ মানুষ আকাশ বলে মনে করে তাও

দেখা যায় না এবং রাতেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাঁদ বা সবুজ 'আকাশ' দৃশ্যগোচর হয় না, কিন্তু সে জোড়ারই অন্য এলাকায় বৃষ্টি বা মেঘের কোন চিহ্নও দেখা যায় না, অথচ দুই এলাকার মধ্যে দূরত্ব হয়ত খুবই কম। ইউরোপ ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা বৃষ্টি ও তুষারপাতের মৌসুমে চন্দ্র তো দূরের কথা, অনেক দিন যাবৎ সূর্যও দেখতে পান না।

পঞ্চম বিষয় : চাঁদ পৃথিবীর সকল দেশে একই সময়ে উঠে বা একইভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এক দেশের আগে আরেক দেশে চাঁদ উদিত হয় এবং এক দেশ থেকে যে সময়ে দেখা যায় অন্য দেশে তখন দেখা যায় না। এজন্যই চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এক দেশে তা দৃষ্ট হলেও অন্য দেশে তা দেখা যায় না। কখনো বা কোথাও আংশিক চন্দ্র গ্রহণ দেখা যায়, কোথাও পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোথাও কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ মানুষ ছাড়া কেউ এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারে না। অনেক সময় আমরা শুনতে পাই যে, জ্যোতির্বিদগণ রাত্রিবেলায় মহাকাশের বিশাল আলোকপিণ্ড, বিশাল নতুন নক্ষত্রের প্রকাশ ইত্যাদি অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে সে বিষয়ে আলোচনা করেন, অথচ অন্যান্য মানুষ সে বিষয়ে কিছুই জানে না।

ষষ্ঠ বিষয় : চন্দ্র বিদীর্ণ করার মত কয়েক মুহূর্তের অলৌকিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোন এলাকার কোন মানুষ হঠাৎ করে দেখতে পেলেও এরূপ দর্শকদের সংখ্যা সাধারণত খুব কম হয় (কারণ কেউ দেখে অন্যদেরকে ডেকে এনে দেখানোর মত সময় থাকে না)। এরূপ অল্প সংখ্যক মানুষের কথা সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন না। ঝড়, প্লাবন, কঠিন তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ ইত্যাদি যে সকল ঘটনা ঘটার পরেও তার প্রভাব থেকে যায় এবং পরিবেশ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় সে সকল বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ যেভাবে সাধারণ মানুষদের বর্ণনা গ্রহণ করেন, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে তারা সেভাবে সাধারণ মানুষদের বক্তব্যকে গ্রহণ করেন না। এজন্য এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা অন্যান্য দেশের কিছু মানুষ দেখে অন্যদেরকে বলেছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেন নি, বরং এ সকল বর্ণনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করেছেন অথবা মনে করেছেন যে, চন্দ্রগ্রহণ জাতীয় কিছু হয়ত ঘটেছিল।

সপ্তম বিষয় : ঐতিহাসিকগণ, বিশেষত পূর্ব যুগের ঐতিহাসিকগণ, অধিকাংশ সময় ভূপৃষ্ঠের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতেন, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির ঘটনা সাধারণত তাঁরা ইতিহাসে উল্লেখ করতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশগুলো অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের অনেক পরে এ সকল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

অষ্টম বিষয় : যখন কোন মানুষ কোন অস্বাভাবিক কর্ম বা প্রাকৃতিক অবস্থাকে নিজের অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে দাবি করেন, তখন যিনি উক্ত ব্যক্তির দাবি সত্য বলে মানেন না, তিনি সাধারণত উক্ত ঘটনা গোপন করতে চেষ্টা করেন। সাধারণত তিনি তা লিখতে বা উল্লেখ করতে রাজি হন না। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায় এবং প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৪ ও ৫ অধ্যায় পাঠ করলে তা অনুধাবন করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা এবং যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে চন্দ্র খণ্ডিত করার ঘটনায় আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই।

'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা ড. ফান্ডার ১৮৪৩ সালে মির্জাপুর থেকে প্রকাশিত সংস্করণে লিখেন : "তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হবে কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ আরবী 'আস-সা'আ' (সময়, মুহূর্ত) শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় সুনির্দিষ্ট দিনের সুনির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ কিয়ামতের সময়। এই অর্থেই এই শব্দটি এই সূরার শেষের আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যই কাযী বায়যাবী ও অন্যান্য মুফাস্সির এই আয়াতে 'আস-সা'আ' অর্থ কিয়ামত বলেছেন এবং তাঁরা বলেছেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের চিহ্নসমূহের মধ্যে এটিও একটি চিহ্ন যে, ভবিষ্যতে চন্দ্র খণ্ডিত হবে।"

এখানে ফান্ডার সাহেব দুটি বিষয় দাবি করেছেন :

প্রথম বিষয় : তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এখানে 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ হবে 'চন্দ্র বিদীর্ণ হবে'।

দ্বিতীয় বিষয় : কাযী বায়যাবী ও অন্যান্য মুফাস্সির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

ফানডার সাহেবের দুটি দাবিই বাতিল ও মিথ্যা। কারণ প্রথমত, এখানে অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। এই সুস্পষ্ট অতীত কালের ক্রিয়াকে ভবিষ্যতের অর্থে গ্রহণ করার অর্থ স্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করে রূপক অর্থ গ্রহণ করা। আর কোন কথা আভিধানিক ও স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হলে কখনোই তার রূপক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়; বরং তা স্বাভাবিক অর্থেই গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। একটু আগে পাঠক তা জেনেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি বায়যাবীর নামে একটি জঘন্য মিথ্যাচার ও বানোয়াট অপবাদ মাত্র। তিনি কখনোই 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ 'বিদীর্ণ হবে' বলে ব্যাখ্যা করেন নি; বরং তিনি চন্দ্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)কর্তৃক বিদীর্ণ হয়েছে বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে তাঁর নিকট গৃহীত সঠিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পরে তিনি বলেছেন যে, কোন কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে 'বিদীর্ণ হয়েছে' কথাটির অর্থ 'বিদীর্ণ হবে'। এরপর তিনি এই মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এভাবে আমরা দেখেছি

Contents

যে, বায়যাবী যে মতটি বাতিল করেছেন, ফানডার সাহেব সেই মতটিকে বায়যাবীর নামে চালিয়েছেন।

১৮৪৩ সালে ফান্ডার সাহেব তাঁর বইটি প্রকাশ করলে সেই বছরেই (১৮৪৩ খৃ/১২৫৯ হি) শায়খ মুহাম্মাদ আল-হাসান (মৃত্যু ১২৮৭ হি/১৮৭০ খৃ) 'মীযানুল হক' পুস্তকটির মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদে 'আল-ইসতিফসার' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি ফানডার সাহেবের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, 'পাদরি মহাশয় হয় অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত অথবা তিনি জেনে শুনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরূপ মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছেন।'

পাদরি ফান্ডার সাহেব এই প্রতিবাদে সচেতন হয়ে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেন। ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত ফারসী সংস্করণ এবং ১৮৫০ সালে মুদ্রিত উর্দু সংস্করণে তিনি লিখেছেন : 'আস-সা'আ' শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে একবচনে কুরআনে সর্বদা কিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' বাক্যটি 'এবং' সংযোজক অব্যয় (Conjunction) দ্বারা 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে' বাক্যটির সাথে সংযোজিত হয়েছে। প্রথম ক্রিয়াটি (নিকটবর্তী হয়েছে) ভবিষ্যতের অর্থ 'ভবিষ্যতে আগমন করবে' বলা হয়েছে। অদ্রূপভাবে দ্বিতীয় ক্রিয়াটিও ভবিষ্যতের অর্থে 'বিদীর্ণ হবে' অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে তখন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে।[১] কোন কোন তাফসীরকারক এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন যামাখশারী ও বায়যাবী। তাঁরা যদিও বিশ্বাস করেছেন যে, এই আয়াতটি মুহাম্মাদ (সা)-এর মুজিযা বা অলৌকিক চিহ্ন, কিন্তু তাঁরা এ কথাও স্পষ্টত বলেছেন এবং তাঁরা কোন কোন মানুষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ, কিয়ামতের দিন চন্দ্র খণ্ডিত হবে। হুযায়ফার

---

১. এখানে ফান্ডার সাহেব অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন। 'আস-সা'আ' অর্থ যে কিয়ামত এ কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজের অনেক পাণ্ডিত্য যাহির করেছেন। অথচ যে কোন আরবী পাঠক বা আরবী জানা মানুষই বুঝেন যে, 'আস-সা'আ' অর্থ কিয়ামত। এরপর তিনি দাবি করেছেন যে, কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার কারণে 'বিদীর্ণ হয়েছে' অর্থ হবে 'বিদীর্ণ হবে'। তাঁর এই দাবিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। এখানে দুটি ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি ক্রিয়াই অতীত কালের : 'নিকটবর্তী হয়েছে' এবং 'বিদীর্ণ হয়েছে'। দুটি ক্রিয়াই অতীতের অর্থ প্রকাশ করছে। প্রথম ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যতের অর্থে গ্রহণ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এখানে বলা হয় নি যে, 'কিয়ামত আগমন করেছে', তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে, এর অর্থ 'কিয়ামত আগমন করবে' বরং এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে'। কিয়ামত তো আসলেই নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামতের বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এর অর্থ 'কিয়ামত নিকটবর্তী হবে' মনে করা পাগলামী বৈ আর কিছু নয়। আর প্রথম ক্রিয়াটি যেহেতু সুস্পষ্টভাবে অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত, সেহেতু দ্বিতীয় ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যতের বলে মনে করার কোন অবকাশ নেই।

কিরাআতে রয়েছে : "এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে যে, ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। বায়যাবী বলেন, কথিত আছে যে, এর অর্থ, কিয়ামতের দিন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে।"

এভাবে ফানডার সাহেব তাঁর পূর্ববর্তী ভুলের বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজের বক্তব্য সংশোধন করেছেন। তবে তিনি এখানে যেভাবে কাশ্শাফের বক্তব্যের সংক্ষেপ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হই। কারণ তিনি কিছু কথা বাদ দিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন কথাগুলো বাদ দেওয়াতে তাঁর দাবি প্রমাণ সহজ হবে। এরপর তিনি হুযায়ফার কিরাআত সম্পর্কীয় কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, হুযায়ফার কিরাআতে রয়েছে : "এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"..। এ কথাগুলো দ্বারা তাঁর বক্তব্য অপ্রমাণিত ও খণ্ডিত হয়েছে। কারণ এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্র বিদীর্ণকরণ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, হুযায়ফার কিরাআতের বিষয়টি ফানডার সাহেব তাঁর দাবির প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন নি, তবে যামাখশারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করতে যেয়ে অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, তাহলে তিনি যামাখশারীর কিছু কথা বাদ দিলেন কেন ? তাফসীরে কাশ্শাফে যামাখশারীর বক্তব্য নিম্নরূপ : "কোন কোন মানুষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ কিয়ামতের দিন চন্দ্র খণ্ডিত হবে। পরবর্তী আয়াত এই ব্যাখ্যা বাতিল করে দেয়। কারণ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন : "তারা কোন নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।" এ ব্যাখ্যা বাতিল করতে এই আয়াতই যথেষ্ট। হুযায়ফার কিরাআতে রয়েছে : "এবং ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে যে, ইতোমধ্যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। যেমন আপনি বলেন, আমীর এ মুখি হয়েছেন, ইতোমধ্যে তাঁর আগমনের সংবাদ নিয়ে বার্তাবাহক এসে গিয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মাদায়েনে অবস্থানকালে একদিন হুযায়ফা (রা) বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, "জেনে রাখ! কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। তোমাদের নবীর যুগেই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" যামাখশারীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

ফানডার সাহেব বলেছেন : "আস-সা'আ' শব্দটি সুনির্দিষ্ট একবচনে ...", আরো বলেছেন , 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' বাক্যটি 'এবং' সংযোজক অব্যয় (Conjunction) দ্বারা ...'। এ সকল কথা দ্বারা তিনি কিছুই প্রমাণ করতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি বুঝেছেন যে, 'সা'আ' অর্থ কিয়ামত আর চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামতের চিহ্ন, কাজেই তা অবশ্যই কিয়ামতের সাথেই কিয়ামতের মধ্যেই সংঘটিত হতে হবে। তাঁর এই

চিন্তা ভুল। ভালভাবে চিন্তা ও অনুধাবন না করার ফলে তিনি এই বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। সূরা মুহাম্মাদে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে ? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো ইতোমধ্যে এসেই পড়েছে।"[২]

এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, "কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো ইতোমধ্যে এসেই পড়েছে"। অতীত কালের ক্রিয়ার পূর্বে قد শব্দ ব্যবহার উক্ত ক্রিয়াটি নিকট অতীতে সংঘটিত হয়েছে বলে নিশ্চয়তা দেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের চিহ্ন ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য মুফাস্সিরগণ এভাবেই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। বায়যাবী বলেন : "কারণ ইতোমধ্যেই কিয়ামতের লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন, চন্দ্র বিদীর্ণ বা খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।" ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি/১২১০ খৃ) 'আত-তাফসীরুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন ; "লক্ষণসসমূহ অর্থ চিহ্নসমূহ। মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এ সকল লক্ষণের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর নুবুওয়াত প্রকাশিত হওয়া।" তাফসীরুল জালালাইনে বলা হয়েছে : "লক্ষণসমূহ অর্থাৎ চিহ্নসমূহ; এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া এবং ধুম্র।" তাফসীরকার হুসায়নীও বায়যাবীর অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

ফানডার সাহেব বলেছেন, "প্রথম ক্রিয়াটি (নিকটবর্তী হয়েছে) ভবিষ্যতের অর্থে 'ভবিষ্যতে আগমন করবে' বলা হয়েছে।" তাঁর এই কথাটি ভুল। এই ক্রিয়াটি অতীতের অর্থই প্রকাশ করছে। এর অর্থ 'ভবিষ্যতে কিয়ামত আগমন করবে' বলা ভুল। কোন কোন মানুষ এ বিষয়ে যা বলেছে তাফসীরকারগণ তা বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ফানডার সাহেব এরপর বলেন : "যদি আমরা স্বীকার করি যে, চন্দ্র বাস্তবিকই খণ্ডিত বা বিদীর্ণ হয়েছিল, তবুও তা মুহাম্মাদ (সা)-এর অলৌকিক চিহ্ন বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ এ আয়াতে বা অন্য কোন আয়াতে বলা হয় নি যে, তা মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক খণ্ডিত বা বিদীর্ণ হয়েছিল।"

তাঁর এ কথার উত্তরে আমি বলব যে, এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতই প্রমাণ করে যে, তা মুহাম্মাদ (সা)-এর অলৌকিক চিহ্ন ছিল। এছাড়া হাদীসসমূহও তা প্রমাণ করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক-বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বিচারে এ সকল সহীহ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রচলিত বিকৃত, অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ একক

২. সূরা মুহাম্মাদ, ১৮ আয়াত।

বর্ণনায় বর্ণিত সুসমাচারগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। এ সকল সুসমাচারের লেখকগণ থেকে কে তা শিক্ষা করেছে তা জানা যায় না, তাঁদের থেকে কে বা কারা তা শিক্ষা ও অনুলিপি করেছে তাও জানা যায় না। এভাবে প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ এই পুস্তকগুলোর কোন সূত্র জানা যায় না। পাঠক প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তা জেনেছেন (পক্ষান্তরে প্রতিটি হাদীস সুস্পষ্ট সূত্রসহ বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কে কে তা শুনেছেন এবং বলেছেন, তাঁদের থেকে কারা শিখেছেন, তাঁদের থেকে কারা বর্ণনা করেছেন তা সবই চুলচেরা বিশ্লেষণসহ সংকলিত রয়েছে)।

মাননীয় পাদরি মহাশয় অতঃপর বলেন, "প্রথম আয়াতের সাথে দ্বিতীয় আয়াতের সম্পর্ক এই যে, শেষ যুগে যখন অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের লক্ষণগুলো দেখবে তখন তারা তা বিশ্বাস করবে না এবং পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের রীতি অনুসারে বলবে, এগুলো নোংরা যাদু ছাড়া কিছুই নয়।"

পাদরি মহোদয়ের এই কথা দু' কারণে ভুল :

প্রথমত, কোন অস্বীকারকারী অকারণে কিছু অস্বীকার করে না এবং কোন অবিশ্বাসী কোন অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা দেখলেই তাকে যাদু বলে অভিহিত করে না, বরং যদি কেউ দাবি করে যে, এই অস্বাভাবিক কর্মটি আমি করেছি বা তা আমার অলৌকিক চিহ্ন, তাহলেই শুধু কেউ তাকে 'যাদু' বলে অভিহিত করতে পারে। শেষ যুগে যখন প্রাকৃতিকভাবে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে এবং কেউ দাবি করবে না যে, এই লক্ষণটি আমি প্রকাশ করেছি তখন কিভাবে এবং কেনই বা অস্বীকারকারিগণ তা অস্বীকার করবে ? আর কিভাবে বা কেনই বা তারা বলবে যে, এগুলো নোংরা যাদু ছাড়া কিছুই নয় ?

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে চন্দ্র খণ্ডিত ও বিদীর্ণ হবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিনের আগে তো চাঁদ বিদীর্ণ হবে না। আর মহাপ্রলয় শুরু হলে তো সকলের সামনেই সব প্রকাশিত হয়ে যাবে। তখন অবিশ্বাসীরা কেউ বলবে না যে, "এ তো চিরাচরিত যাদু।" তবে যদি কেউ মি. ফানডারের মত একগুঁয়ে অহংকারী বুদ্ধিমান পণ্ডিত হন তবে ভিন্ন কথা। তিনি বা তাঁর মত কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এ সময়ে কবর থেকে উঠে প্রথমেই মনে মনে কল্পনা করবেন বা মুখেও হয়ত বলবেন যে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু'। তাঁদের মনের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যেরূপ একগুঁয়ে বিরোধিতা বিদ্যমান তাতে হয়ত তাঁরা এরূপই করবেন।

মি. ফানডার এরপর বলেন : "মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক চন্দ্র খণ্ডিত করার ঘটনা যদি সত্যিই ঘটতো তবে যে সকল বিরোধী তাঁর নিকট অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শনের দাবি করতো তাদেরকে তিনি বলতেন, আমি তো অমুক দিনে চাঁদ খণ্ডিত করেছি, কাজেই তোমরা অবিশ্বাস করো না।"

এ কথার জবাব পাঠক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ্।

অন্য একজন খৃস্টান পাদরি 'বিজহাতুল ঈমান' (বিশ্বাসের দিক) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি চন্দ্র খণ্ডিত করার মুজিযা অস্বীকার করে বলেন : "কয়েকজন তাফসীরকারক, যেমন যামাখশারী ও বায়যাবী, এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিয়ামতের দিনে চাঁদ বিদীর্ণ হবে। যদি এ ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকত তবে সারা বিশ্বে তা প্রসিদ্ধি লাভ করত। শুধু এক এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভের কোন অর্থ হয় না।"

পাঠক পূর্বের আলোচনা থেকে জেনেছেন যে, পাদরি মহাশয়ের দুটি কথাই সন্দেহাতীতভাবে বাতিল। তবে এই পাদরি যুক্তি ও পুস্তকের সূত্র প্রদানে 'মীযানুল হকের' প্রণেতা ফানডার সাহেবের চেয়েও অধিক পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তিনি 'কাশ্শাফের' নামও স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে পড়েছিলেন : 'কাযী বায়যাবী ও অন্যান্য মুফাস্সির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।' এ থেকে তিনি ধারণা করেন যে, নিশ্চয় অন্যান্য মুফাস্সির বলতে তাফসীরে কাশশাফ বুঝানো হয়েছে; কারণ অন্যান্য তাফসীরের চেয়ে তাফসীরে কাশ্শাফের সাথে তাফসীরে বায়যাবীর সম্পর্ক একটু বেশি। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি 'কাশ্শাফ' নামটিও যোগ করে দিয়েছেন যেন 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফানডারের চেয়েও তাঁর পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রকাশ পায়।

তাফসীরে কাশ্শাফের প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই বলেছেন : "চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান অলৌকিক চিহ্নসমূহের এবং আলোকোজ্জ্বল মুজিযাগুলোর অন্যতম।"

ভারতীয় পণ্ডিত নেয়ামত আলীর একটি পুস্তিকার প্রতিবাদে তৃতীয় একজন পাদরি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পাদরি চন্দ্র বিদীর্ণ করার মুজিযা অস্বীকার করে লিখেছেন : "এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না যে, এই মুজিযাটি মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল। তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না।"

এই তৃতীয় পাদরি তাঁর পাণ্ডিত্য পূর্বোক্ত দুই পাদরি থেকেই গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি পাণ্ডিত্যে পূর্বোক্ত দুইজনকেই অতিক্রম করেছেন এবং বলেছেন, "তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না।" তিনি দেখেছেন যে, প্রথম পাদরি মি. ফানডার 'বায়যাবী'র কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় পাদরি 'বায়যাবী ও কাশ্শাফ'-এর কথা বলেছেন। সম্ভবত তিনি মনে করেছেন যে, উভয়েই সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বাকি সকল তাফসীরগ্রন্থকে এই দুই তাফসীরের মতই ধরে নিয়েছেন এবং এই মনে করা ও ধরে নেওয়ার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন,

'তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকেও তা প্রমাণিত হয় না' যেন এভাবে উপর্যুক্ত দুই পাদরির চেয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রমাণিত হয়। তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেন এ কথা ভেবে বিমুগ্ধ হন যে, তিনি সকল তফসীরগ্রন্থ পাঠ করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই তিন পাদরির প্রত্যেকেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তীকে অতিক্রম করেছেন এবং কিছু নতুন সংযোজন করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়টি প্রথম শতাব্দী থেকেই খৃস্টানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। প্রেরিতগণের পত্রগুলো পাঠ করলেই তা বুঝা যায়। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এরূপ মিথ্যাচার খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় নেককাজ বলে গণ্য হতে থাকে।

ঐতিহাসিক মোশিম (Mosheim)[৩] ১৮৩২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর পণ্ডিতগণের বর্ণনায় বলেন : "প্লেটো ও পিথাগোরাসের (Pythagoras) অনুসারীদের মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হলো : 'সত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয় উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।' খৃস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাঁদের থেকে প্রথমে মিসরের ইহূদীরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এরপর এই ঘৃণিত মহামারী খৃস্টানগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। মহান ধর্মগুরুদের নামে জালিয়াতি করে প্রচারিত বিপুল সংখ্যক পুস্তক থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলেন : "এ কথা সুপ্রমাণিত-সুনিশ্চিত যে, প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। অসত্য ও মিথ্যা 'সুসমাচারের' আধিক্যই লূককে তাঁর সুসমাচার লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্তরেরও বেশি এইরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।"

যেখানে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ যীশুখৃস্ট ও তাঁর প্রেরিতদের নামে ৭০টিরও বেশি মিথ্যা সুসমাচার চালিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে এই তিন পাদরি যদি সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআনের তাফসীরের নামে কিছু মিথ্যা কথা চালিয়ে দেন তাহলে অবাক হওয়ার কি আছে ?

৩. গ্রন্থকার সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জার্মান প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক Mosheim, Johann Lorenz von-কে বুঝাচ্ছেন। জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি ৮৫ টি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর একটি Institutiones Historiae Ecclesiasticae Anitquae et Recentioris (Instituted of Ecclesiastical History).

এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ পুস্তিকাটি পাদরিগণ ভারতে বহুল প্রচার করতেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পুস্তিকাটি বিতরণ করতেন। কিন্তু যখন কয়েকজন মুসলিম আলিম পুস্তিকাটির জবাব লিখে ছাপালেন এবং তাঁদের জবাবগুলো মুসলিমদের মধ্যে প্রচার লাভ করল, তখন পাদরিগণ পুস্তিকাটি পরিত্যাগ করেন। পুস্তিকাটির জবাবে নিম্নের তিনটি পুস্তিকা ছাপা হয় :

প্রথম: 'আত-তুহফাতুল মাসীহিয়্যাহ্', সাইয়েদ উদ্দীন হাশিমী রচিত।

দ্বিতীয়: 'তা'য়ীদুল মুসলিমীন', লাখনৌ-এর শীআ নেতার জনৈক আত্মীয় রচিত।

তৃতীয়: 'খুলাসাতু সায়ফিল মুসলিমীন', হায়দার আলী কোরেশী রচিত।

অলৌকিক কর্ম-৩ : এক মুষ্টি মাটি দ্বারা শত্রুবাহিনী পরাজিত করা

বায়যাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, 'আকানকাল' নামক টিলার পথ ধরে কুরাইশ বাহিনী আগমন করছে, তখন তিনি বললেন, 'এই তো কুরাইশ বাহিনী। তারা তাদের অহংকার এবং গৌরব নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং তারা আপনার রাসূলের সত্যতা অস্বীকার করছে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।' তখন জিবরীল আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন, আপনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারবেন। এরপর যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরের সম্মুখীন হলো তখন তিনি এক মুষ্টি কাঁকর নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর মুখে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন : 'মুখগুলো কদাকার হোক।' তখন মুশরিকদের প্রত্যেক সৈন্যের চোখই কাঁকর-বালিতে আক্রান্ত হয়। তারা হতবিহ্বল ও হতবল হয়ে পড়ে এবং পালাতে শুরু করে। তখন মুসলিমগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে থাকেন। এরপর যখন যুদ্ধ শেষে ফেরার পরে তাদের কেউ বলেন, আমি হত্যা করেছি এবং আমি বন্দি করেছি।"

"এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন : "এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।"[৪] অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন কাঁকরগুলো তাদের চক্ষুতে পৌছানোর জন্য নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি শুধু নিক্ষেপ করার বাহ্যিক কর্মটুকু করেছিলেন মাত্র, কিন্তু আপনি সেগুলো প্রত্যেক শত্রুর চক্ষুতে পৌছান নি, বরং আল্লাহ্ই মূল নিক্ষেপণ কাজটি সম্পন্ন করেন। কারণ তিনিই নিক্ষেপের উদ্দেশ্য পূরণ করেন এবং প্রত্যেক শত্রুসৈন্যের চোখে কাঁকর পৌছে দেন। ফলে তারা পরাজিত হয় এবং আপনারা তাদের বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন।"

৪. সূরা আনফাল, ১৭ আয়াত।

ফখরুদ্দীন রাযী (র) বলেন, "সঠিক বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনাটি বদরের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। কুরআনে এস্থলে বদরের যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেই এ কথা বলা হয়েছে। যদি দাবি করা হয় যে, এ ঘটনা অন্য কোন সময়ে ঘটেছিল, তবে দাবি করতে হবে যে, কুরআনে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বোপরি, কোন্ ঘটনায় তা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর নির্ভর করার চেয়ে অর্থের ব্যাপকতার উপর বেশি নির্ভর করতে হবে।"

পাদরি মি. ফানডার এই মুজিযাও অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য ও বক্তব্যের অসারতা আলোচনা করেছি। কাজেই পুনর্বার তা আলোচনা করব না।

অলৌকিক কর্ম-৪ : আঙুলের মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র আঙুলগুলোর মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। এই মুজিযা বা অলৌকিক কর্ম মোশির জন্য পাথরের মধ্য থেকে পানি নির্গত হওয়ার চেয়েও মহত্তর। কারণ পাথর থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া মূলত একটি প্রাকৃতিক কর্ম যা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেহ ও মাংসের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা নির্গত হওয়া কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে কখনো ঘটে নি।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, "আসরের সালাতের সময় ঘনিয়ে আসল। লোকজন অনুসন্ধান করেও ওযূর জন্য কোন পানি যোগাড় করতে পারলেন না। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নিকট একটি পাত্রে অল্প কিছু ওযূর পানি আনয়ন করা হলো। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত সেই পাত্রের মধ্যে রাখেন এবং সকল মানুষকে নির্দেশ দেন সেখান থেকে ওযূ করার। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আঙ্গুলিগুলোর মধ্য দিয়ে ঝর্ণার মত পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিত মানুষেরা সেই পানি দিয়ে ওযূ করল। এমনকি সর্বশেষ মানুষটিও তা দিয়ে ওযূ করে নিলেন।"

এই মুজিযাটি সংঘটিত হয়েছিল মদীনার বাজারের নিকট যাওরা নামক স্থানে।

অলৌকিক কর্ম-৫ : আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া

জাবির (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার দিনে মানুষজন পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নিকট একটি ছোট্ট পাত্রে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি সেই পানি দিয়ে ওযূ করলেন। তখন লোকজন তাঁর নিকট এসে বলেন, আপনার এই পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট আর কোন পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত পাত্রটির মধ্যে রাখেন। এতে তাঁর আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মত পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে লাগল। তখন উপস্থিত সকলেই সেই পানি পান করলেন এবং তা দিয়ে ওযূ করলেন। উপস্থিত মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৪০০।

অলৌকিক কর্ম-৬ : আঙুলের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জাবির, তুমি ওযূর জন্য ঘোষণা দাও। তিনি বলেন, শিবিরে কারো কাছে কোন পানি ছিল না। অনুসন্ধান করে একটি চামড়ার পাত্রের তলানিতে এক ফোঁটা পানি পাওয়া গেল। এক ফোঁটা পানিসহ সেই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি পাত্রের উপর হাত রাখলেন এবং কিছু কথা বললেন যা আমি বুঝতে পারলাম না। এরপর তিনি বললেন, কাফেলার বড় পাত্রটি নিয়ে এস। তখন পাত্রটি এনে তাঁর সামনে রাখা হলো। তিনি তাঁর হাত পাত্রটির মধ্যে রাখলেন এবং আঙুলগুলো ফাঁক করলেন। জাবির তাঁর নির্দেশে এক ফোঁটা পানি তাঁর হাতের উপর ঢাললেন। তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ্। জাবির বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর আঙুলের মধ্য দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হয়ে আসছে। পাত্রটি পানিতে ভরে গেল এবং পানি পাত্রের বাইরে প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল মানুষকে নির্দেশ দিলেন পানি পান করতে। তখন সকলেই তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, শিবিরে আর কারোরই কোন পানির প্রয়োজন নেই তখন তিনি পাত্রটির মধ্য থেকে তাঁর হাত উঠিয়ে নিলেন। পাত্রটি তখনও পরিপূর্ণ ছিল।

এই মুজিযাটি বুওয়াত যুদ্ধের সময় ঘটেছিল।

অলৌকিক কর্ম-৭ : মৃত স্রোতস্বিনীতে পানির সঞ্চার

তাবূক যুদ্ধের বিবরণে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, পানির জন্য তাঁরা তাবূকের একটি স্রোতস্বিনী বা মরুভূমির ছোট্ট ঝর্ণার -- নিকট গমন করেন। ঝর্ণাটি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং এর তলায় পায়ের গোড়ালি পরিমাণ সামান্য পানির প্রবাহ ছিল। তখন তাঁরা হাত দিয়ে অল্প অল্প করে কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই পানি দিয়ে তাঁর হাত ও মুখ ধৌত করে আবার তা উক্ত ঝর্ণার মধ্যে ফেরত দেন। তখন ঝর্ণাটি পানিতে ভরে যায়। শিবিরের সকল মানুষ সেই পানি পান করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায়, পানির গতি এমন বৃদ্ধি পেল যে, পানির মধ্য থেকে মেঘ গর্জনের ন্যায় গর্জন শোনা গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মু'আয! তোমার আয়ু দীর্ঘ হলে হয়ত তুমি দেখতে পেতে যে, এই স্থানের সব কিছু গাছপালা ও ফল-ফসলের সবুজে ভরে গিয়েছে।[৫]

---

৫. এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাবুকের এ সকল অঞ্চল ভবিষ্যতে সবুজে ভরে যাবে। দেড় হাজার বছর পরে বর্তমানে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের আগে আরবদের দেশ ফল-ফসল ও নদী-ঝর্ণায় ভরে যাবে। বর্তমানে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। ক্রমান্বয়ে আরবদেশ কৃষিক্ষেত ও ফল-ফসলের বাগানে ভরে যাচ্ছে।

অলৌকিক কর্ম-৮ : দু' পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা

ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীগণ পানি সঙ্কটে নিপতিত হন ও পিপাসায় কষ্ট পেতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দু'জন সাহাবীকে বলেন, তোমরা অমুক স্থানে গমন কর। সেখানে দেখবে যে, একজন মহিলার সাথে একটি উট আছে এবং তার উপর দুটি পানির মশক (চামড়ার পাত্র) রয়েছে। তোমরা তাকে অনুরোধ করে এখানে নিয়ে আসবে। তাঁরা দুজন তথায় গমন করে বর্ণনানুসারে মহিলাকে দেখতে পান। তাঁরা তাকে অনেক অনুরোধ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার মশকদ্বয় থেকে কিছু পানি একটি পাত্রে ঢালেন। এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে সেই পানিতে কিছু দু'আ পাঠ করেন। এরপর পানিটুকু পুনরায় মশকে ঢেলে দেন। এরপর মশক থেকে পানি ঢালার মুখ খুলে মানুষদেরকে নির্দেশ দেন যার কাছে যত মশক বা পাত্র আছে সবাই যেন তা ভরে নেয়। মানুষেরা উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে তাদের সকল মশক ও পাত্র ভরে নিলেন। এমনকি একটি পাত্রও খালি থাকল না। ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা) বলেন, মানুষেরা যখন তাদের মশক ও পাত্রগুলো উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে ভরছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, উক্ত মশকদ্বয় যেন ক্রমেই পানিতে ভরে উঠছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নির্দেশে উক্ত মহিলার জন্য উপহার হিসেবে খাদ্য সংগ্রহ করা হলো। এমনকি সংগৃহীত খাদ্যে তার কাপড় ভরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তুমি এখন যেতে পার। আমরা তোমার মশকদ্বয় থেকে এক ফোঁটা পানিও গ্রহণ করি নি, কিন্তু আল্লাহ্ই আমাদেরকে পানি দান করেছেন।"

অলৌকিক কর্ম-৯ : অলৌকিক বৃষ্টিপাত

উমার (রা) বলেন, তাবূকের যুদ্ধে যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে তাঁরা পানিসঙ্কটে নিপতিত হন। দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ তাঁরা পানির কোন সন্ধান না পাওয়াতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কেউ কেউ তার নিজের উট জবাই করে তার পেটের নাড়ি ও গোবর চিপে তা পান করছিলেন। এই কঠিন বিপদের কথা জানিয়ে আবূ বক্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করেন প্রার্থনা করার জন্য। তখন তিনি তাঁর দু'হাত তুলে প্রার্থন করেন। তাঁর হস্তদ্বয় নামানোর পূর্বেই আকাশ মেঘে ভরে গেল। এরপর বৃষ্টি হলো এবং মানুষেরা নিজেদের পাত্রগুলোতে পানি ভরে নিল। এই বৃষ্টি মুসলিম সৈন্যদের শিবির অতিক্রম করে নি।

অলৌকিক কর্ম-১০ : খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে খাদ্য প্রার্থনা করে। তিনি তাকে প্রায় অর্ধ ওয়াসাক (প্রায় দেড় মণ) যব প্রদান করেন।

লোকটি যব নিয়ে বাড়িতে রাখে এবং নিজের পরিবার ও আত্মীয়-মেহমানসহ তা ভক্ষণ করতে থাকে। অনেক দিন যাবৎ এভাবে চলার পরে লোকটি হঠাৎ একদিন অবশিষ্ট যব ওজন করে। সে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দেয় যে, এতদিন খাওয়ার পরেও তার যব আগের মতই রয়েছে। তিনি তখন বলেন, তুমি যদি তা ওজন না করতে তবে আজীবনই তা থেকে তোমরা আহার করতে পারতে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তা থেকে যেত।

অলৌকিক কর্ম-১১ : কয়েকটি রুটি ৮০ ব্যক্তিকে খাওয়ানো

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে ক্ষুধার্ত দেখে তিনি তার বাড়ি থেকে কয়েকটি যবের রুটি বগলের মধ্যে করে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খাওয়ার জন্য প্রদান করেন। তিনি সে রুটিগুলো দিয়ে উপস্থিত ৮০ জন সাহাবীকে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করান।

অলৌকিক কর্ম-১২ : এক সা' যব দিয়ে এক হাজার মানুষ খাওয়ানো

জাবির (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি ছাগল ছানা এবং এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) যব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১,০০০ মানুষকে খাওয়ান। জাবির বলেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তারা সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে তা রেখে চলে গেলেন, অথচ আমাদের হাঁড়ি চুলার উপরেই ছিল এবং রুটি বানানোর জন্য মাখানো আটা তখনো শেষ হয়নি, বরং রুটি বানানোর কাজ চলছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আটা এবং হাঁড়িতে মুখের লালা দিয়েছিলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করেছিলেন।

অলৌকিক কর্ম-১৩ : দুজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্যে ১৮০ জনকে খাওয়ানো

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, (হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ সা ও আবু বক্রের মদীনায় আগমনের পরে) তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বক্র (রা)-কে দাওয়াত দেন এবং তাঁদের দু'জনের পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন, আপনি আনসারদের নেতৃস্থানীয় (অধ্যক্ষগণ) ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে ডেকে আনুন। তিনি নির্দেশ মত ত্রিশজন আনসার নেতাকে ডেকে আনেন। তাঁরা তৃপ্তির সাথে খাদ্য গ্রহণ করে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে যান। অতঃপর তিনি বলেন, এবার ৬০ জনকে ডাকুন। তিনি ৬০ জনকে ডেকে আনেন এবং তাঁরা অনুরূপভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, এবার ৭০ জনকে ডাকুন। তাঁরাও এভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং বাকি খাবার রেখে চলে যান। যারা খাদ্য ভক্ষণ করে চলে যান তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে--

হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে বেরিয়ে যান। আবূ আইয়ূব আনসারী বলেন, এভাবে আমার সেই খাদ্য ১৮০ ব্যক্তি ভক্ষণ করেন।

অলৌকিক কর্ম-১৪ : এক বাটি গোশ্‌ত বহুসংখ্যক মানুষকে খাওয়ানো

সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক বাটি (bowl) গোশ্‌ত আনয়ন করা হয়। সাহাবীগণ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলে দলে তা থেকে ভক্ষণ করেন। এক দল উঠে গেলে অন্য দল আহার করতে বসেন।

অলৌকিক কর্ম-১৫ : ১ সা' খাদ্য ১৩০ জনকে খাওয়ানো

আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমরা ১৩০ ব্যক্তি ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারো কাছে কি কোন খাবার আছে? তখন এক ব্যক্তি প্রায় এক সা' (প্রায় আড়াই কিলোগ্রাম) যবের আটা নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি মেষ ক্রয় করে তা রান্নার জন্য প্রস্তুত করেন। আটা দিয়ে রুটি বানানো হয় এবং মেষটিকে সেঁকা (রোস্ট করা) হয়। আল্লাহ্‌র কসম, একশত ত্রিশ জনের প্রত্যেককেই সেঁকা গোশ্‌ত থেকে অংশ প্রদান করা হয়। এরপর অবশিষ্ট খাদ্য দুটি বড় খাঞ্চায় রাখা হয়। আমরা সকলেই সেই খাদ্য ভক্ষণ করি। এরপরও খাঞ্চা দুটিতে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। আমি তা উটের পিঠে করে নিয়ে যাই।

অলৌকিক কর্ম-১৬ খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা), আবূ হুরায়রা (রা) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এক যুদ্ধের সফরে তাঁরা খাদ্যের সঙ্কটে নিপতিত হন। সকলের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দেন যার কাছে যা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট আছে তা তার নিকট জমা করতে। তখন সবাই একমুষ্টি বা তার চেয়ে সামান্য বেশি খাবার এনে জমা করেন। কেউ কেউ এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমাণ খেজুর জমা দিলেন, যা ছিলো সর্বোচ্চ পরিমাণ। তখন সকল খাদ্য একটি চামড়ার পাটির উপরে রাখা হলো। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, আমি দেখলাম যে, একটি ছাগী মাটিতে শয়ন করলে যে স্থান দখল করে জমাকৃত সকল খাদ্য আনুমানিক সেই পরিমাণ স্থান দখল করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে সেই খাদ্য থেকে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পুরো শিবিরে একটি পাত্রও আর অপূর্ণ থাকল না। এরপরও সেখানে খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে গেল।

অলৌকিক কর্ম-১৭ ওলীমার খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, যয়নাব বিনতু জাহ্‌শ (রা)-এর সাথে বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক মানুষের নাম বলে তাঁদেরকে দাওয়াত করতে তাঁকে

নির্দেশ দেন। এত মানুষকে তিনি দাওয়াত দেন যে, আমন্ত্রিত মেহমানগণ আগমন করলে তাঁর বাড়ি ও বিশ্রামস্থল ভরে যায়। তখন তিনি তাদের সামনে একটি মগ এগিয়ে দেন, যে মগের মধ্যে পনির মিশ্রিত এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) পরিমাণ খেজুরের ছাতু ছিল। তিনি মগটি অভ্যাগতদের সামনে রেখে তার মধ্যে নিজের তিনটি আঙুল ডুবিয়ে দেন। এরপর আমন্ত্রিত মেহমানগণ সেই ছাতু ভক্ষণ করে প্রস্থান করেন। সকলের খাওয়ার পরেও মগের মধ্যে প্রায় আগের মতই ছাতু অবশিষ্ট থাকে।

অলৌকিক কর্ম-১৮ খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) একটি হাঁড়িতে তাঁদের দু'জনের দুপুরের খাদ্য রান্না করেন। এরপর আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে তাঁকে তাঁদের সাথে আহার করার জন্য দাওয়াত দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমাকে নির্দেশ দেন, তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি করে থালায় খাবার বাড়তে। এরপর তাঁর জন্য, তারপর আলী (রা)-এর জন্য এবং সবশেষে ফাতিমা (রা)-এর নিজের জন্য খাবার বাড়তে বলেন। এরপর ফাতিমা হাঁড়িটি উঠান। তখনও হাঁড়িটি খাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। ফাতিমা (রা) বলেন, আমরা আল্লাহ্র মর্যিমত অনেক দিন সেই খাবার ভক্ষণ করি।

অলৌকিক কর্ম-১৯ ফসলে অলৌকিক বৃদ্ধি

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় অনেক ঋণ রেখে যান। তাঁদের যে পরিমাণ ফল ও ফসল উৎপন্ন হয় কয়েক বছর ধরে তা প্রদান করলেও তাতে তাঁদের ঋণ শোধ হয় না। তিনি মূল সম্পত্তিই পাওনাদারদের দিতে চান, কিন্তু পাওনাদারগণ তাতে রাজি হন না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করালে তিনি তাকে খেজুর বাগানে খেজুর কর্তনের নির্দেশ দেন। এরপর কয়েকটি খেজুর গাছের নিচে সেগুলি জমা করেন। তিনি তথায় গমন করেন এবং দু'আ করেন। তখন জাবির সেই খেজুর দিয়ে পাওনাদারদের সকল পাওনা পরিশোধ করার পরেও প্রতি বছর তারা যে পরিমাণ খেজুর কর্তন করতেন সেই পরিমাণ খেজুরই অবশিষ্ট থাকে।

অলৌকিক কর্ম-২০ : খাদ্যে অলৌকিক বৃদ্ধি

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার (এক যুদ্ধের সফরে) মানুষেরা খাদ্যসঙ্কটে নিপতিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, কিছুই কি নেই ? আমি বললাম, পাত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণ খেজুর আছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এস। তখন তিনি পাত্রের খেজুরগুলির মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে একমুষ্টি খেজুর বের করলেন। তিনি মুষ্টি খুলে বরকতের জন্য প্রার্থনা করলেন। এরপর

বললেন, দশ জনকে ডাক। দশ জন পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে চলে যাওয়ার পরে তিনি আবার দশ জনকে ডাকতে বললেন। এভাবে তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে খাওয়ালেন। সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, তুমি যে খেজুর এনেছিলে তা ফেরত নিয়ে যাও। তুমি এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে খাবে, কিন্তু কখনো পাত্র থেকে খেজুরগুলি ঢালবে না। তখন আমি খেজুরগুলি নিয়ে দেখলাম, আমি যে পরিমাণ খেজুর এনেছিলাম তার চেয়ে বেশি খেজুর সেখানে রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়, আবূ বক্র (রা)-এর যুগে ও উমার (রা)-এর যুগে আমি এই পাত্র থেকে খেজুর নিয়ে নিজে খেয়েছি এবং অন্যদের খাইয়েছি। উসমান (রা)-এর শাহাদতের সময় এগুলি আমার ঘর থেকে লুট হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর প্রার্থনায় ও তাঁর কারণে অলৌকিকভাবে খাদ্য ও পানীয় বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা প্রায় ২০ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবী থেকে কয়েকজন তাবিঈ তা বর্ণনা করেছেন। এরপর তৃতীয় প্রজন্মে অগণিত মানুষ তা বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা ঘটেছে বড় বড় যুদ্ধাভিযানে ও অনেক মানুষের সামনে। এ সকল বিষয়ে কেউ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে সাহস পান না। কারণ মিথ্যা বললে এ সকল অভিযানে বা ঘটনায় উপস্থিত অন্য কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারেন বলে ভয় থাকে।

এ সকল ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শূন্য থেকে বা অনস্তিত্ব থেকে খাদ্য বা পানীয়র অস্তিত্ব প্রদান করেন নি, বরং অতি সামান্য হলেও কিছু খাদ্য বা সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে তা বৃদ্ধি করেছেন। কারণ এটিই স্রষ্টার সাথে বিনয়ের রীতি যেন সকলেই বুঝতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ই, তিনিই খাদ্য বা পানিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্ তা বৃদ্ধি করেছেন। আর এই বৃদ্ধিকরণও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৃষ্টি।

মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী বা ভাববাদিগণও এভাবেই খাদ্য বা পানীয়কে অল্প থেকে অধিক করেছেন। এভাবেই এলিয়র মুজিযা বা অলৌকিক কর্মে আমরা দেখেছি যে, তিনি বিধবা মহিলার ময়দা ও তৈল অল্প থেকে বৃদ্ধি করেছিলেন। ১ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।[৬]

অনুরূপভাবে ইলীশায় ভাববাদীর মুজিযায় বা অলৌকিক চিহ্নে 'আশু পক্ক শস্যের রুটি, যবের কুড়িখানা রুটি ও ছালায় ভরা শস্যের তাজা শীষ' বৃদ্ধি লাভ করে এবং

---

৬. ১ রাজাবলি ১৭/৮-১৬।

১০০ লোকে তা ভোজন করার পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। ২ রাজাবলি ৪ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।[৭]

অনুরূপভাবে যীশুর মুজিযা বা অলৌকিক চিহ্নে 'পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ'-এ বরকত প্রদান করা হয় এবং অনুমান ৫ হাজার মানুষ তা ভক্ষণ করে। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮]

অলৌকিক কর্ম-২১ বৃক্ষের কথা বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া

ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এক বেদুঈন চলতি পথে আমাদের কাছে আসে : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে বেদুঈন! তুমি কোথায় চলেছ ? সে উত্তর দেয় : আমার পরিবারের কাছে যাচ্ছি। তখন তিনি বলেন, তুমি কি কোন কল্যাণ লাভ করতে চাও ? সে বলে, কি সেই কল্যাণ ? তিনি বলেন, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। বেদুঈন বলে, তুমি যা বলছ তার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে ? তিনি বলেন, মরুভূমির ঐ সবুজ গাছটি আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। গাছটি ছিল নিম্নভূমির অপর প্রান্তে। তখন গাছটি মাটির মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে বেদুঈন লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটি তিনবার গাছটিকে প্রশ্ন করে এবং তিনবারই গাছটি সাক্ষ্য প্রদান করে। এরপর গাছটি তার পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

অলৌকিক কর্ম-২২ বৃক্ষের আনুগত্য

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বের হন। আমি পানির একটি পাত্র নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গমন করি। তিনি ময়দানে আড়াল করার মত কিছুই দেখতে পেলেন না। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, নিম্নভূমির প্রান্তে দুটি গাছ রয়েছে। তিনি একটি গাছের নিকট যেয়ে গাছটির একটি ডাল ধরে টান দিয়ে বললেন, আল্লাহ্র অনুমতিতে আমার অনুগত হও। তখন গাছটি নাকে রশি পরানো উটের ন্যায় তাঁর পিছে পিছে চলে এল। তখন তিনি অন্য বৃক্ষটির কাছে যেয়ে তাকেও অনুরূপভাবে বললেন, আল্লাহ্র অনুমতিতে আমার অনুগত হও। অতঃপর তিনি বৃক্ষ দুটি কাছাকাছি হওয়ার পরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্র অনুমতিতে তোমরা উভয়ে একত্রিত হয়ে আমাকে আড়াল কর। তখন গাছ দুটি একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের আড়ালে বসলেন। আমি দৌড়ে সেখান থেকে সরে এলাম। আমি দূরে বসে নিজের

---

৭. ২ রাজাবলি ৪/৪২-৪৪।

৮. মথি ১৪/১৪-২১।

মনে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং গাছ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অলৌকিক কর্ম-২৩ খেজুর গাছ থেকে কাঁদির আগমন

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন বেদুঈনকে বলেন, তুমি বলত, আমি যদি ঐ খেজুর গাছ থেকে তার কাঁদিটিকে ডেকে নিয়ে আসি তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুরের কাঁদিটিকে ডাক দিলেন। কাঁদিটি লাফাতে লাফাতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, ফিরে যাও। তখন কাঁদিটি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

অলৌকিক কর্ম-২৪ খেজুরের গুড়ির ক্রন্দন

জাবির (রা) বলেন, খেজুর গাছের গুড়ি কেটে খুটি বানিয়ে তার উপর মসজিদে নববীর ছাউনি দেওয়া ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুতবা দিতেন তখন এরূপ একটি গুড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বর বানানো হলো এবং তিনি মিম্বরে উঠে খুতবা দিতে শুরু করলেন, তখন আমরা শুনলাম যে, নবজাতক বাচ্চা হারানো উটের মত গুড়িটি কাঁদছে। আনাস (রা)-এর বর্ণনায় : এমনকি তার ক্রন্দনের আওয়াজে মসজিদ কম্পিত হচ্ছিল। সাহল (রা)-এর বর্ণনায় : এ দৃশ্য দেখে সমবেত মানুষেরা কাঁদতে লাগলেন। মাতলিব (রা)-এর বর্ণনায়, এমনকি গুড়িটি ফেটে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুড়িটির কাছে এসে তার উপরে নিজের হাত রাখেন। এতে গুড়িটি শান্ত হয়ে যায়।

খেজুরের গুড়ির ক্রন্দনের এই সংবাদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সংবাদ। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগেই তা প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থের দিক থেকে তা মুতাওয়াতির বা অতি প্রসিদ্ধ হাদীস, যে হাদীস থেকে নিশ্চিত জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস জন্মে। প্রায় ২০ জন সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন উবাই ইবনু কা'ব (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা), সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়িদী (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা), বুরায়দা (রা), উম্মু সালামা (রা) এবং মুত্তালিব ইবনু ওয়াদা'আ (রা)। এ সকল সাহাবী সকলেই এই অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসের শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও সব হাদীসের অর্থ এক। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অর্থটি নিঃসন্দেহে মুতাওয়াতির।

অলৌকিক কর্ম-২৫ ইঙ্গিতে প্রতিমাসমূহের পতন

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, কা'বা ঘরের চতুর্পার্শে ৩৬০টি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সকল পাথরের মূর্তির পাগুলি সীসা দিয়ে পাথুরে মেঝের সাথে আটকানো

ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর হাতের খেজুরের ডালটি দিয়ে এ সকল প্রতিমা স্পর্শ না করে শুধু সেগুলির দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"৯ তিনি যখনই কোন প্রতিমার মুখের দিকে ইশারা করলেন তখনই প্রতিমাটি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর যখনই তিনি কোন প্রতিমার পিঠের দিকে ইশারা করলেন, তখনই প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এভাবে সকল প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

অলৌকিক কর্ম-২৬ মৃত কন্যার পুনরুজ্জীবন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। লোকটি বলে, আপনি আমার মৃত কন্যাকে জীবিত করে না দেখালে আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তার কবরটি আমাকে দেখাও। তখন লোকটি তাঁকে কবরটি দেখিয়ে দেয়। তিনি কবরস্থ মেয়েটিকে তার নাম ধরে ডাক দেন। মেয়েটি কবরের অভ্যন্তর থেকে বলে, লাব্বায়কা, আমি উপস্থিত। তিনি বলেন, তুমি কি পৃথিবীতে ফিরে আসতে ভালবাস ? মেয়েটি বলে, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি তা চাই না। আমার পিতামাতার চেয়ে আল্লাহকে আমি অধিক স্নেহময় পেয়েছি এবং পৃথিবীর চেয়ে আখিরাত উত্তম বলে জানতে পেরেছি।

অলৌকিক কর্ম-২৭ মৃত মেষকে জীবন দান

জাবির (রা) একটি মেষ জবাই করে রান্না করেন এবং একটি খাঞ্চায় রুটির ছারীদ তৈরি করেন। এই খাদ্য তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করেন। উপস্থিত মানুষেরা তা ভক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বলেন, তোমরা গোশ্ত খাও, তবে হাড় ভেঙ্গ না। খাওয়ার পরে তিনি হাড়গুলি জমা করে তাতে হাত বুলান এবং কিছু কথা বলেন। তখনই দেখা গেল যে, ভক্ষিত মেষটি সেখানে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।

অলৌকিক কর্ম-২৮ ক্ষত চক্ষু সুস্থ করা

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, (উহুদের যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লৌহ বিহীন তীর এগিয়ে দিয়ে বলছিলেন, তুমি তীর ছুড়তে থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও অনেক তীর ছুড়েছিলেন, এমনকি তাঁর ধনুকটি ভেঙে যায়। এ দিনে কাতাদা ইবনু নু'মান নামক সাহাবীর চোখে আঘাত লেগে চোখটি বেরিয়ে তার কপোলের উপর এসে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চোখটিকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। চোখটি সুস্থ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর দু চোখের মধ্যে এটিই অধিক সুস্থ ও ভাল ছিল।

---

৯. সূরা বানী ইসরাঈল (ইসরা), ৮১ আয়াত।

অলৌকিক কর্ম-২৯ অন্ধকে দৃষ্টি দান

উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে, আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি যেয়ে ওযূ কর এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় কর। অতঃপর বল, 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমি আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের দ্বারা। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার দ্বারা আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করছি যেন তিনি আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত করেন। হে আল্লাহ্! আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।' উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন এবং সে সুস্থ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ফিরে আসল।

অলৌকিক কর্ম-৩০ মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর আরোগ্য

মুলায়িবুল আসিন্নার পুত্র বলেন, তিনি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু মাটি নিয়ে তাতে থুতু নিক্ষেপ করে তা উক্ত দূতকে প্রদান করেন। দূত অবাক হয়ে মাটিটুকু গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, তার সাথে উপহাস করা হয়েছে। সে যখন মাটি নিয়ে মুলায়িবের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তাকে মাটিটুকু খাওয়ানো হলে আল্লাহ্ তাকে সুস্থ করে দেন।

অলৌকিক কর্ম-৩১ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান

হাবীব ইবনু ফুদাইক বলেন, তাঁর পিতার চক্ষু সাদা হয়ে যায় এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার চোখে ফুঁক দেন। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। আমি দেখেছি যে, ৮০ বছর বয়সেও তিনি সূচের মধ্যে সূতা ঢুকাতেন।

অলৌকিক কর্ম-৩২ চোখের অসুস্থতা নিরাময়

খায়বার যুদ্ধের সময় আলী (রা) চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-এর চোখে থুতু দেন। আলী আরোগ্য লাভ করেন।

অলৌকিক কর্ম-৩৩ উরুর ক্ষত নিরাময়

সালামা ইবনুল আকওয়া খায়বারের যুদ্ধে তাঁর উরুতে আঘাত পান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহত স্থানে থুতু দেন এবং সালামা তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যান।

অলৌকিক কর্ম-৩৪ বাকশক্তিহীনকে কথা বলানো

খাছ'আম গোত্রের একজন মহিলার পুত্র নির্বোধ ও বাকশক্তিহীন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু পানি নিয়ে পানির মধ্যে কুলি করেন এবং নিজের হস্তদ্বয় ধৌত করেন। এরপর তিনি পানিটুকু উক্ত বালককে প্রদান করে তাকে তা পান করাতে এবং তা দিয়ে দেহ মুছে দিতে নির্দেশ দেন। এতে বালকটি সুস্থ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষদের চেয়েও অধিক বুদ্ধির অধিকারী হয়।

অলৌকিক কর্ম-৩৫ পাগলকে সুস্থ করা

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এক মহিলা তার এক পাগল পুত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। তিনি ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দেন। এতে ছেলেটি বমি করে এবং তার পেট থেকে কাল কুকুর ছানার মত কিছু বের হয়। এরপর ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায়।

অলৌকিক কর্ম-৩৬ অগ্নিক্ষত নিরাময়

কিশোর মুহাম্মাদ ইবনু হাতিবের বাহুর উপর একটি গরম হাঁড়ি উল্টে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে হাত বুলিয়ে দেন, তার জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেখানে থুতু দেন। এতে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যায়।

অলৌকিক কর্ম-৩৭ হাতের অসুস্থতা নিরাময়

শুরাহবীল আল-জু'ফীর (রা) হাতের তালুতে একটি আব (tumour) ছিল, যে কারণে তিনি ঘোড়ার লাগাম, তরবারী ইত্যাদি ধরতে পারতেন না। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে তাঁর সহানুভূতি কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার টিউমারটি ডলতে থাকেন। এভাবে টিউমারটি মিলিয়ে যায় এবং এর কোন চিহ্নই তাঁর হাতে আর থাকে না।

অলৌকিক কর্ম-৩৮ সন্তান-সম্পদে বরকতের প্রার্থনা

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমার মা (উম্মু সুলাইম) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার খাদেম আনাসের জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান বেশি করে দাও এবং তাকে যা কিছু প্রদান কর সব কিছুতে বরকত প্রদান কর।' আনাস বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার সম্পদ অনেক। আর আমার নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানগণের সংখ্যা প্রায় একশত।

অলৌকিক কর্ম-৩৯ পারস্য সাম্রাজ্যের পতন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পারস্য সম্রাট কিসরার (Khosrau) নিকট পত্র লিখেন। পারস্য সম্রাট অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে পত্রটি ছিঁড়ে

ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সে যেমন আমার পত্র ছিড়ে ফেলেছে, আল্লাহ্ তার সাম্রাজ্য ছিড়ে বিনষ্ট করবেন। ফলে অচিরেই পারস্য সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে। পৃথিবীর কোথাও পারস্য সাম্রাজ্যের বা পারসিক আধিপত্যের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

অলৌকিক কর্ম-৪০ পোশাকের বরকত

আসমা বিনতু আবূ বক্‌র (রা) তাঁর নিজের ঘর থেকে একটি শালের জুব্বা বের করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই জুব্বাটি পরিধান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা এটি সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে জুব্বাটি ধুয়ে সেই পানি তাকে প্রদান করি। এতে সে সুস্থ হয়ে যায়।

এ সকল মুজিযা বা অলৌকিক চিহ্ন প্রত্যেকটি পৃথকভাবে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে তা মুতাওয়াতির, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকেই বহুসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। যেমন আলী (রা)-এর বীরত্ব বা হাতিম তাঈর দানশীলতা বিষয়ক বর্ণনাদি।

মার্ক ও লূক তাঁদের সুসমাচারে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলির চেয়ে একক সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। মার্ক ও লূক লোকমুখে শোনা কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা পুস্তক তাঁদের নিকট থেকে কেউ গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করেছেন কিনা, করলে কতটুকু করেছেন, নাকি অন্য কেউ তাঁদের নামে লিখে চালিয়েছে ইত্যাদি কোন তথ্যই সংরক্ষিত নেই। পক্ষান্তরে একক বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসগুলির সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা সংরক্ষিত রয়েছে বরং চারটি সুসমাচারের লেখক সকলেই যে ঘটনাবলি লিখেছেন সেগুলিও একক সূত্রে বর্ণিত। এগুলির মূল্যও আমাদের নিকট 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সা)-এর চরিত্র ও আচরণ

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করে তা তাঁর মহান চরিত্র ও অতুলনীয় সদাচরণ। তাঁর মধ্যে সকল মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল। জ্ঞান, কর্ম, বংশমর্যাদা, দেশের মর্যাদা, দৈহিক গুণাবলি ও মানসিক গুণাবলির চরম উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা তিনি লাভ করেন। তাঁর গুণাবলি বিচার করলে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সকল গুণের এরূপ সমন্বয় একজন নবী বা ভাববাদী ভিন্ন কারো মধ্যে হতে পারে না। কারণ, এ সকল গুণের কোন একটি দিক হয়ত অন্য মানুষদের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সকল গুণের এরূপ সমন্বয় নবীগণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে সম্ভব নয়। এজন্য এরূপ সকল পূর্ণতার গুণের সমন্বয় তাঁর নবুওয়তের অন্যতম প্রমাণ। মুহাম্মাদ (সা)-এর চরম

বিরোধীরাও তাঁর মধ্যে এ সকল গুণের অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল বলে স্বীকার করেছেন।

খৃস্টান যাজক স্পানহিস্মিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কঠিনতম বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অনেক আপত্তিকর কথা তাঁর বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু এ সকল মানবীয় ও চারিত্রিক গুণাবলির অধিকাংশ যে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত জর্জ সেল (George Sale)[১০] প্রণীত কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় স্পানহিস্মিসের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, "তিনি সৌন্দর্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর রীতিপদ্ধতি ছিল সন্তোষজনক ও আকর্ষণীয়। দরিদ্রদের প্রতি দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকলের সাথেই তিনি অমায়িক ও সুন্দর আচরণ করতেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি আল্লাহ্র নামকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। নিরপরাধ মানুষদেরকে মিথ্যা অপবাদদানকারী, ব্যভিচারী, হত্যাকারী, অকারণ কৌতুহলের কারণে অন্য মানুষের অধিকার নষ্টকারী, লোভী ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। তাঁর অধিকাংশ ওয়ায-উপদেশই ছিল ধৈর্য, দানশীলতা, দয়াপ্রদর্শন, মানব-কল্যাণ, পরোপকার, পিতামাতা ও বয়স্কদের মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন বিষয়ক। ইবাদত-বন্দেগির বিষয়ে তাঁর সাধনা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের।"

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সা)-এর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করে তা তাঁর ধর্মব্যবস্থা বা শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা, জাগতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্র, বিচার ও প্রশাসন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকল দিকে ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা রয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, এগুলো অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যিনি এগুলো নিয়ে আগমন করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী বা ভাববাদী। পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর শরীয়ত বা কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিগণের আপত্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। একান্তই বিদ্বেষ, অযৌক্তিক পক্ষপাত এবং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার কারণেই তাঁরা এ সকল কথা বলে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা

অন্য যে বিষয়টি মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করে, তা তাঁর প্রকাশ ও বিজয়ের অবস্থা। তিনি এমন এক সমাজে নবুওয়ত দাবি করেন, যে সমাজের

১০. ইংরেজ পাদরী ও প্রাচ্যবিদ। ১৭৩৬ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত কুরআনের অনুবাদটি প্রথম ১৭৩৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মানুষদের কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ছিল না। তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে, আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে আলোকময় গ্রন্থ ও মহান প্রজ্ঞা নিয়ে আগমন করেছি। আমি সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাস ও সভতার আলোকে আলোকিত করব। তিনি ছিলেন সামাজিক শক্তিতে দুর্বল এবং তঁর সাহায্যকারিগণ ও অনুসারিগণ ছিলেন নগণ্য ও দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জগতে সকল মানুষের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হন। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি সকলের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। তাদের মতামত ভ্রান্ত, তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও তাদের ধর্ম বাতিল বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি তাদের রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর ধর্ম সকল ধর্মের উপর প্রকাশ ও বিজয় লাভ করে। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে সকল দেশে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

তাঁর শত্রুগণ ছিল সংখ্যায়, অস্ত্রে, শক্তিতে ও সামর্থ্যে অনেক বেশি। তাঁর ধর্ম ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ধর্মের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা, গোঁড়ামি, অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনা ছিল সীমাহীন ও অপ্রতিরোধ্য। তা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারে নি। আল্লাহ্র সাহায্য ও আসমানী সহযোগিতা ছাড়া কি তা সম্ভব ছিল ?

ইহূদীদের ব্যবস্থা-গুরু গমলীয়েলকে (Gamaliel) খুব সুন্দর কথা বলেছেন : "হে ইস্রায়েল-লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদবিষয়ে সাবধান হও। ৩৬ কেননা ইতিপূর্বে থুদা (Theudas) উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়াছিল, এবং কমবেশ চারি শত জন তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল; সে হত হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহই রহিল না। ৩৭ সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা (Judas of Galilee) উঠিয়া কতকগুলো লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া লইয়াছিল; সেও বিনষ্ট হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল, সকলে ছড়াইয়া পড়িল। ৩৮ এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে ক্ষান্ত হও, তাহাদিগকে থাকিতে দেও; কেননা এই মন্ত্রণা কিংবা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে; ৩৯ কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়। কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ (if this counsel or this work be of me, it will come to nought: But if it be of God, Ye cannot overthorw it; lest happy ye be found even to fight against God)."

গীতসংহিতার প্রথম গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টের পথ বিনষ্ট হইবে (For thd LORD knoweth the way of the righteous; but the way of the ungodly shall perish)।"

গীতসংহিতার ৫ গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে, সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন (Thou shalt destroy them that speak leasing:the LORD will abhor the bloody and deceitful man)।"

গীতসংহিতার ৩৪ গীতের ১৬ আয়াতে রয়েছে : "সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল; তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করিবেন।"

গীতসংহিতার ৩৭ গীতে রয়েছে : "১৭ কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু ধার্মিকদিগকে (the righteous) ধরিয়া রাখেন। ... ২০ কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে, সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণশোভার সমান হইবে; তাহারা অন্তর্হিত, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।"

মুহাম্মাদ (সা) যদি ধার্মিক (righteous) না হতেন তবে সদাপ্রভু তাঁর পথ বিনষ্ট করতেন, লাঞ্ছিত করতেন এবং ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করতেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছুই করেন নি। এতে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (সা) ধার্মিক। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করে ঈশ্বরের সাথেই যুদ্ধ করছেন। তবে সময় নিকটবর্তী এবং অচিরেই তারা জানতে পারবেন। "অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।"[১১]

তারা কখনোই ইসলামকে মুছে ফেলতে পারবেন না। আল্লাহ্ই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : "তারা আল্লাহ্র আলো (Allah's Light) ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।"[১২]

ইসলাম ধর্মই আল্লাহ্র আলো। আর আল্লাহ্ তাঁর এই আলো দীন ইসলামকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিপূর্ণতা দিবেনই, যদিও ইহূদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিক অবিশ্বাসিগণ তা অপসন্দ করে। একজন কবি বড় সুন্দর কথা বলেছেন :

যে আমাকে সর্বদা হিংসা করে তাকে বল : তুমি কি জান কার সাথে তুমি অভদ্রতায় লিপ্ত হয়েছ ?

তুমি তো মূলত আল্লাহ্র সাথেই অভদ্রতা করছ : মনে হচ্ছে তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে তুমি রাজি নও।

---

১১. সূরা শু'আরা, ২২৭ আয়াত।

১২. সূরা সাফ্ফ, ৮ আয়াত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

পঞ্চম যে দিকটি প্রমাণিত করে যে, মুহাম্মাদ (সা) সত্যিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বা ভাববাদী ছিলেন তা তাঁর আগমনের সময় ও মানবতার প্রয়োজন বিবেচনা করা। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হলেন, যখন বিশ্বের মানব জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন এবং তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করবেন। আরবগণ ছিল পৌত্তলিকতা ও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। পারস্যবাসীরা ছিল দুই ঈশ্বর-বাদের ও মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। তুর্কী-মঙ্গোল জাতি ছিল জনপদ ধ্বংস ও মানবসভ্যতার বিনাশে লিপ্ত। ভারতের মানুষ ছিল গরু, গাছপালা ও পাথর-মূর্তির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত। ইহূদী জাতি ছিল ধর্মের বিকৃতি, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণারোপ, সত্যের অস্বীকার ও মিথ্যার প্রচারে লিপ্ত। খৃস্টান জাতি ছিল ত্রিত্ববাদ, ক্রুশ-পূজা এবং সাধু ও সাধ্বীদের মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের অনুসারিগণ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবে ছিল। সত্যকে ভুলে তারা অসত্য ও অসম্ভবকে নিয়ে মেতে ছিল।

মহান মহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ কি এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে পরিত্যাগ করবেন? বিশ্ববাসীর প্রতি করুণার প্রতীক কাউকে তিনি পাঠাবেন না? তা তো হতে পারে না!

আর মানবতার এই কঠিন সময়ে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া আর কেউই আবির্ভূত হন নি। তিনিই এই মহান ধর্ম ও ব্যবস্থা দিয়ে যান এবং এই সুমহান সৌধ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল বিভ্রান্ত আচার-রীতি এবং বাতিল ধর্মবিশ্বাস অপসারিত করেন। একত্ববাদের সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতার জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। বহু-ঈশ্বরবাদিতা, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণাবলি আরোপ ইত্যাদি-রূপ সকল বিভ্রান্তির অন্ধকার অপসারিত হয়। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং তিনি লাভ করুন পরিপূর্ণ মর্যাদা।

এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেন : "হে গ্রন্থানুগামি-ইহূদী-খৃস্টানগণ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে, যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নি'; এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী এসেছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[১৩]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি/১২১০ খৃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন : "রাসূল প্রেরণে বিরতির পর মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রেরণ করার উপকারিতা এই

১৩. সূরা মায়িদা, ১৯ আয়াত।

যে, সময়ের আবর্তনে ও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের বিশ্বাস ও বিধিবিধানের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সত্য মিথ্যার সাথে এবং হক বাতিলের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগের জন্য মানুষদের একটি বাস্তব ওজর-অজুহাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মানুষ বলতে পারত, হে আমাদের মা'বূদ! আমরা জানি যে, আপনার ইবাদত করা অত্যাবশ্যক। তবে আমরা বুঝতে পারছি না যে, কিভাবে আপনার ইবাদত করব ?! এই সময়ে এই অজুহাত অপসারিত করার জন্য আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রেরণ করেন।"

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী

পূর্ববর্তী ভাববাদী বা নবীগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেগুলো তাঁর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে পাদরিগণ বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদেরকে কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেন। এজন্য আমি মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আলোচনার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে আটটি বিষয় আলোচনা করব, যেগুলো এ বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করবে।

প্রথম বিষয় : বাইবেলীয় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী বনাম মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়, যিরমিয়, দানিয়েল, যিহিষ্কেল, যীশু প্রমুখ ইস্রায়েলীয় ভাববাদী আগামী দিনের অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা নবূখদ্‌নিৎসর (নেবুকাদনেযার, Nebuchadnezzar) , কোরস (সাইরাস : Cyrus), আলেকজান্ডার এবং তার উত্তরাধিকারিগণ, ইদোম, মিসর, নীনভা, বাবিল প্রভৃতি দেশ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কাজেই তাঁরা মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না এরূপ চিন্তা করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন তাঁর প্রকাশের সময়ে 'একটি সরিষা-দানার তুল্য', 'অতি ক্ষুদ্র বীজ', কিন্তু পরে তিনি এমন বৃক্ষ হয়ে উঠলেন যে, 'আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাঁহার শাখায় বাস করিল।'[১৪] তিনি প্রতাপশালী পরাক্রান্ত ক্ষমতাধর অধিপতি ও সম্রাটদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের মূল আবাসস্থল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও যিরূশালেমে তাঁর ধর্ম পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তা প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছে। সকল ধর্মের উপরে তা প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগের পর যুগ তা প্রতিষ্ঠিত থাকল। এ পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাবের পরে ১,২৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত

১৪. মথি ১৩/৩১-৩২ শ্লোকে যীশুর বাক্য থেকে গৃহীত।

থাকবে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হাজার হাজার ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ আলিম, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, মহান আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও অলৌকিক চিহ্নের অধিকারী ওলী-আউলিয়া ও মহান শাসক-প্রশাসক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ সকল ঘটনা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে অনেক বড় ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইদোম, নীনভা ও অন্যান্য দেশের ঘটনার চেয়ে পরিমাণে ও গুরুত্বে এগুলো কোন অংশেই কম নয়। এজন্য সুস্থ জ্ঞান এ কথা স্বীকার করতে পারে না যে, এ সকল ভাববাদী ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন, অথচ সেগুলোর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এত বড় বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলবেন না।

দ্বিতীয় বিষয় : ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি ও অস্পষ্টতা

ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত ইঙ্গিতময় হয়, পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না। পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সাধারণত সেই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন না। সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয় না যে, অমুক সালে, অমুক দেশে, অমুক গোত্রে, অমুক আকৃতি ও প্রকৃতির অমুক নামে একজন ভাববাদী আগমন করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থাকে। তবে বিশেষভাবে জ্ঞানী ও ধর্মপুস্তক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞ মানুষেরা পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত ও সূত্রাদির মাধ্যমে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী এত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয় যে, সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ মানুষেরাও তা বুঝতে পারেন না। পরবর্তী ভাববাদী আবির্ভূত হয়ে, নিজে যখন দাবি করেন যে, আমিই সেই ভাববাদী যাঁর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদী অমুক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁর এই দাবি বিভিন্ন অলৌকিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তখনই কেবল তারা বুঝতে পারেন যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একেই বুঝানো হয়েছিল। এরূপ ভাববাদীর আবির্ভাব, দাবি পেশ ও দাবি প্রমাণের আগে তারা কিছুই বুঝতে পারেন না। এজন্য এ সকল ধর্মজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষদেরকে তিরস্কারও করা হয়।

এ কারণেই যীশু ইহুদী পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদেরকে তিরস্কার করেছেন। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন, "হা ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক্ তোমাদিগকে! কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া লইয়াছ; আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকেও বাধা দিলে।" লূকলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।১৫

শুধু তাই নয়, খৃস্টানগণের বর্ণনা ও বিশ্বাস অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তী ভাববাদিগণের বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময়

১৫. লূক ১১/৫২।

ভাবাবাদিগণও বুঝতে পারেন না, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ তো দূরের কথা। যে ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেন বা যাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে স্বয়ং সেই ভাববাদীও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন না বা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যিনি আগমন করেছেন তাঁকে চিনতে পারেন না।

যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে : "১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন ইহূদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে ? ২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীস্ট (the Christ/the Messiah/the annointed) নই। ২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় (Elias) ? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী (that prophet) ? তিনি উত্তর করিলেন, না। ২২ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে ? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? ২৩ তিনি কহিলেন, আমি প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। ২৪ তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল (And they which were sent were of the Pharisees)। ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীস্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন ?"

খৃস্টান পাদরি ও ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বলেছেন যে, এখানে ২১ ও ২৫ আয়াতে 'সেই ভাববাদী' বলতে সেই প্রতিশ্রুত ও আকাঙ্খিত ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে, যার বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায় মোশি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[১৬]

যাজক ও লেবীয়গণ ইহূদীদের ধর্মগুরু এবং তাঁদের ধর্মপুস্তকাদির বিষয়ে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তারা জানতে পেরেছেন যে, যোহন একজন ভাববাদী। কিন্তু তিনি কি খৃস্ট না এলিয় না মোশির ভবিষ্যদ্বাণীর সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এই তিন ভাববাদীর বিষয়ে ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলোতে এঁদের কোন বিস্তারিত বিবরণ, লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ণনা করা হয় নি। যার ফলে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধর্মযজ্ঞদের নিকটেই তাঁদের বিষয় অস্পষ্ট ও ঘোলাটে ছিল, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। আর এ কারণেই তারা তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি খৃস্ট ? যোহন যখন তার খৃস্ট হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেন তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি কি এলিয় ? যখন যোহন তাঁর এলিয় হওয়ার বিষয়টিও

---

১৬. দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৫-২২।

অস্বীকার করলেন তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী? যদি এই তিন জনের লক্ষণ ও চিহ্নগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বলা থাকত তবে এই সন্দেহের কোন অবকাশই থাকত না।

শুধু তাই নয়, এ থেকে আমরা আরো জানতে পারছি যে, যোহন নিজেই জানতে পারেন নি যে, তিনি এলিয়। এজন্য তিনি তাঁর এলিয় হওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছেন : "আমি নই।: অথচ যীশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যোহনই এলিয়। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ে যোহন বিষয়ে যীশু বলেছেন : "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি (this is Elias, which was for to come)।"[১৭]

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "১০ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক ? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; ১২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে। ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন।"

এই বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেল যে, ইহূদী অধ্যাপক ও যাজকগণ চিনতে পারে নি যে, যোহনই এলিয় এবং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তাই তারা করেছেন। অনুরূপভাবে যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণও চিনতে পারেন নি যে, তিনি এলিয়, অথচ খৃষ্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে প্রেরিতগণ মোশির চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভাববাদী ছিলেন। প্রেরিতগণ যোহনের নিকট বাপ্তাইজিত হয়েছেন এবং অনেকবার তাঁকে দেখেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে এলিয় বলে চিনতে পারেন নি। অথচ তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের ঈশ্বর ও খৃষ্টের আগমনের পূর্বে এলিয়ের আগমন আবশ্যক।

যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশুর বিষয়ে যোহন বাপ্তাইজক বলেন, "আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না (I knew him not), কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন; তিনিই আমাকে বলিলেন,যাঁহার উপরে পবিত্র আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। ৩৪ আর আমি দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।"

পাদরিগণের ব্যাখ্যা অনুসারে 'আমি তাঁহাকে চিনিতাম না' অর্থ আমি ভালভাবে চিনতে পারি নি যে, ইনিই প্রতিশ্রুত খৃস্ট।

---

১৭. মথি ১১/১৪।

এ থেকে জানা গেল যে, যীশুর উপর কপোতের ন্যায় পবিত্র আত্মা অবতরণ করার পূর্ব পর্যন্ত ত্রিশ বছর যাবৎ যোহন বাপ্তাইজকও নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন নি যে, যীশুই প্রতিশ্রুত খৃস্ট। সম্ভবত কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করা খৃস্টের বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্নরূপে পরিচিত ছিল না। তা না হলে যোহন বাপ্তাইজকের এ কথা কিভাবে ঠিক হতে পারে?

তবে এ বিষয়টি বাদ দিলেও এখানে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, যোহন খৃস্টকে চিনতে পারেন নি। যীশু খৃস্টের সাক্ষ্য অনুযায়ী যোহন ছিলেন ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] আর খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ছিলেন যোহনের ঈশ্বর ও প্রভু। খৃস্টের আগমনের পূর্বে তাঁর আগমন ছিল অপরিহার্য। আর তাঁর এলিয় হওয়ার বিষয়টিও ছিল সুনিশ্চিত। এত কিছু সত্ত্বেও ইস্রায়েলীয় কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী যোহন বাপ্তাইজক তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত নিজেকেই চিনতে পারলেন না। এই দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর প্রভু ও ঈশ্বরকেও চিনতে পারলেন না। অনুরূপভাবে মোশি এবং সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে মর্যাদাবান ভাববাদিগণ প্রেরিতগণও যোহন বাপ্তাইজকের জীবদ্দশায় তাঁকে চিনতে পারলেন না। তাহলে পূর্ববর্তী ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে পরবর্তী ভাববাদীকে চেনার ব্যাপারে বা এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মগুরু, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই বুঝা যায়।

যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ৫১ আয়াতে তা বলা হয়েছে।[১৯] এই ভাববাদী যীশুকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তাঁকে অপমান করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] যদি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে বিদ্যমান খৃস্টের আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হতো, তবে 'নিজ ঈশ্বরকে ঈশ্বর-নিন্দুক হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী এই ভাববাদী' কায়াফা কখনোই এভাবে নিজের ঈশ্বরকে ঈশ্বর-নিন্দুক বলে ফতওয়া দিতেন না এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দিতেন না।

---

১৮. মথি ১১/১১ : "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।"

১৯. যোহন ১১/৪৯-৫১, ১৮/১৪।

২০. মথি ২৬/৫৭-৮৬।

মথি ও লূক তাঁদের সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মার্ক ও যোহন তাঁদের সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। যোহন নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর বিষয়েই বলা হয়েছে। এই ভষ্যিদ্বাণীটি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ৩য় আয়াতে নিম্নরূপ : "এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে যোহন বাপ্তাইজকের বিশেষ কোন চিহ্ন বা লক্ষণ উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর কোন বিশেষ চিহ্ন, বৈশিষ্ট্য, তাঁর আবির্ভাবের সময়, স্থান ইত্যাদি কিছুই বলা হয় নি। এ বিষয়টি যে যোহনের সাথে সম্পৃক্ত তা বুঝার কোন উপায় নেই। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যে যোহনের বিষয়ে বলা হয়েছে যোহন নিজে এবং সুসমাচার লেখকগণ দাবি না করলে খৃস্টান পণ্ডিতগণও তা নিশ্চিতরূপ জানতে পারতেন না, সাধারণ খৃস্টানগণ তো দূরের কথা। কারণ যিশাইয় ভাববাদীর পরে যত ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর আগমন ঘটেছে তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রান্তরে রব করা'-র বিষয়টি প্রযোজ্য বরং তা যীশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি নিজেও যোহনের মত রব করতেন : "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল (Repent: for the Kingdom of heaven is at hand)।"[২১]

সুসমাচার লেখকগণ পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের যে সকল বক্তব্যকে যীশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অবস্থা পাঠক ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন। আমরা দাবি করি না যে, মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোর প্রত্যেক বাণীই এরূপ দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট যে তার অর্থ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমরা সত্যকে মিথ্যার দ্বারা মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।"[২২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি) বলেন : "বাহ্যত বুঝা যায় যে, 'মিথ্যার দ্বারা' কথাটির মধ্যে যে আরবী 'বা' (ب) অব্যয়টি (preposition) রয়েছে তা এখানে 'দ্বারা' বা 'সাহায্যে' অর্থ প্রকাশ করছে। যেমন আরবীতে বলা হয়: كتبت بالقلم আমি কলম দ্বারা লিখেছি, অর্থাৎ আমি কলমের সাহায্যে লিখনি কর্মটি সম্পাদন করেছি। তাহলে এই আয়াতের অর্থ, শ্রোতাদের সামনে বিভিন্ন প্রকারের অস্পষ্ট আপত্তি, ঘোরালো কূটতর্ক ইত্যাদির সাহায্যে তোমরা সত্যকে

---

২১. মথি ৪/১৭

২২. সূরা বাকারা, ৪২ আয়াত।

অস্পষ্ট, ঘোলাটে বা মিথ্যা-মিশ্রিত করে ফেল না। কারণ, তোরাহ ও ইনজীলে বা ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মপুস্তকসমূহে মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন বিষয়ক সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইঙ্গিতময় ও অস্পষ্ট। এগুলোর সঠিক অর্থ বুঝার জন্য চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ এগুলোর বিষয়ে কূটতর্ক করতেন এবং আগ্রহী ব্যক্তি যেন এগুলোর সঠিক অর্থ না বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ঘোরালো ব্যাখ্যা, আপত্তি ও বিভ্রান্তি দিয়ে সত্যের সামনে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতেন।"

একাদশ হিজরী শতকের (সপ্তদশ খৃস্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আবদুল হাকীম সিয়ালকোটী (১০৬৭ হি/১৬৫৬ খৃ) তাফসীরে বায়যাবীর টীকায় লিখেছেন : "এ বিষয়টি বুঝার জন্য বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এ কথা বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক নবীই মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত এবং অস্পষ্ট কিছু পূর্বাভায প্রদান করেছেন। এ সকল ইঙ্গিত ও পূর্বাভাষের অর্থ শুধু গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন। আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও রীতি এরূপই। আলিমগণ বলেছেন, সকল আসমানী কিতাবেই কোন না কোনভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কিত সংবাদ, পূর্বাভাষ বা ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কিন্তু এগুলো ইঙ্গিতময়। যদি এগুলো সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হতো তবে তাদের আলিম-পণ্ডিতগণ এগুলো গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন না। এরপর ভাষান্তরের ফলে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পায়। হিব্রু থেকে সিরীয় ভাষায়, সিরীয় থেকে আরবী ভাষায়, এভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের সাথে সাথে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তোরাহ ও ইনজীলের বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে যেগুলোর অর্থ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সেগুলো মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের প্রতি ইঙ্গিত করছে। গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের নিকট সুস্পষ্ট যে, এগুলো মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পূর্বাভাস। তবে সাধারণ পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের নিকট তা অস্পষ্ট।"

তৃতীয় বিষয় : সেই ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ইস্রায়েলীয় জাতি

খৃস্টান পাদরিগণ বিভ্রান্তিমূলকভাবে দাবি করেন থাকেন যে, ইহূদীগণ বা ইস্রায়েলীয় জাতি খৃস্ট ও এলিয় ছাড়া অন্য কোন ভাববাদীর বা 'আখেরী যমানার নবীর' আগমনের আশা করত না। তাঁদের এই দাবি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা; বরং বাইবেলই প্রমাণ করে যে, তারা খৃস্ট ও এলিয় ছাড়াও অন্য একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। উপর্যুক্ত দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখছেন যে, যীশুর সমসাময়িক ইহূদী পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ যোহন বাপ্তাইজককে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি খৃস্ট ? যখন তিনি তা অস্বীকার করলেন তখন তারা প্রশ্ন করেন, তবে আপনি কি এলিয় ? যখন তিনি তাও অস্বীকার করেন তখন তারা প্রশ্ন করেন,

তবে আপনি কি সেই ভাববাদী ? অর্থাৎ মোশি যে ভাববাদীর আগমনের সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন আপনি কি সেই ভাববাদী ? এ থেকে জানা যায় যে, খৃষ্ট ও এলিয়ের ন্যায় আরো একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষা তারা করত। আর এই ভাববাদীর বিষয়টি তাদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁর কোন নাম-পরিচয় বলার প্রয়োজন হতো না, 'সেই ভাববাদী' বললেই সকলেই বুঝতে পারত।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে পর্বের প্রধান দিনে যীশুর উপদেশ প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : "৪০ সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী। ৪১ আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট।"

এ কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, খৃষ্ট এবং সেই ভাববাদী দু'জন দুই ব্যক্তি হবেন। এজন্যই তারা একজনের বিপরীতে অন্যের কথা বলেছেন।

চতুর্থ বিষয় : যীশুখৃস্টে ভাববাণী শেষ হয় নি

পাদরি মহোদয়গণ দাবি করেন যে, যীশুখৃস্টই শেষ ভাববাদী ছিলেন, কাজেই তাঁর পরে আর কোন ভাববাদী বা নবী আগমন করবেন না বা কোন ভাববাদীর প্রয়োজন নেই। তাঁদের এই দাবিটিও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মিথ্যা। কারণ উপরের আলোচনা থেকে পাঠক দেখলেন যে, ইস্রায়েলীয় জাতি খৃষ্ট ও এলিয় ছাড়াও একজন ভাববাদীর অপেক্ষায় ছিল। আর এ কথা কোনভাবে প্রমাণিত হয় নি যে, 'সেই ভাববাদী' খৃস্টের আগে আগমন করেছেন। কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি খৃস্টের পরেই আগমন করবেন।

এ ছাড়া খৃস্টানগণ নিজেরাই খৃস্টের পরেও অন্য মানুষের নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব স্বীকার করেন। তারা খৃস্টের ১২ জন প্রেরিতকে ভাববাদী বলে বিশ্বাস করেন। এছাড়া পৌলকেও তারা ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ভাববাণী প্রাপ্ত ভাববাদী বলে বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, তারা পরবর্তী অন্য অনেক মানুষের ভাববাদিত্ব স্বীকার করেন।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৭ সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী (prophets) যিরূশালেম হইতে আন্তিয়খিয়াতে (Antioch) আসিলেন। ২৮ তাঁহাদের মধ্যে আগাব (Agabus) নামে এক ব্যক্তি উঠিয়া আত্মার আবেশে জানাইলেন যে, সমুদয় পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে; তাহা ক্লৌদিয়ের (Claudius Caesar)"[২৩] অধিকার সময়ে ঘটিল।

---

২৩. রোমান সম্রাট (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)। শাসনকাল : ৪১-৫৪ খৃষ্টাব্দ।

তাহলে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের বাইরেও 'কয়েক জন ভাববাদীর' কথা তারা স্বীকার করলেন। এ সকল ভাববাদীর একজনের নাম আগাব, যিনি মহাদুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রদান করলেন।

এই পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১০ সেই স্থানে আমরা অনেক দিন অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়া (Judaea)[২৪] হইতে আগাব নামে একজন ভাববাদী উপস্থিত হইলেন। ১১ আর তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন লইয়া তাঁহার নিজের হাত-পা বাঁধিয়া কহিলেন, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছে, যে ব্যক্তির এই কটিবন্ধন, তাঁহাকে যিহূদীরা যিরূশালেমে এইরূপে বাঁধিবে, এবং পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে।"

এখানেও সুস্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগাব একজন ভাববাদী ছিলেন।

যীশু বিভিন্ন সময়ে ভণ্ড ভাববাদিগণ থেকে সতর্ক করেছেন। অনেক সময় পাদরিগণ ভণ্ড ভাববাদিগণ বিষয়ক এ সকল বক্তব্য যীশুখৃষ্টের পরে আর কোন ভাববাদী আগমন করবেন না— এই দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে যীশুর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে : "ভাক্ত ভাববাদিগণ (false prophets) হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকট আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া (ravening wolves)।" এ কথা দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চান যে, যীশুর পরে আর কোন ভাববাদী আগমন করবেন না।

বস্তুত এই আয়াত দিয়ে যীশুকে সর্বশেষ ভাববাদী বলে দাবি করা বা যীশুর পরে আর কোন সত্য ভাববাদী আবির্ভূত হবেন না বলে দাবি করা সত্যই অদ্ভুৎ বিষয়! কারণ যীশু এখানে ভাক্ত ভাববাদী বা ভণ্ড নবী থেকে সাবধান করেছেন, সত্য ভাববাদী থেকে নয়।[২৫] এজন্য তিনি 'ভাক্ত' কথাটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, যদি তিনি বলতেন, 'আমার পরে যত ভাববাদী আগমন করবেন সকলের থেকে সাবধান থাকবে' তবে সে কথা বাহ্যত তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু যীশু এরূপ কোন কথা বললেও, পাদরিগণ সে কথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হতেন; কারণ যীশুর পরে অনেক ভাববাদীর ভাববাদিত্ব তারা বিশ্বাস করেন বলে আমরা দেখেছি।

---

২৪. যিরূশালেম-সহ ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশকে 'যিহূদিয়া' বলা হতো। অনেক সময় সমগ্র ফিলিস্তিনকেও যিহূদিয়া বলা হয়েছে।

২৫. বরং উপর্যুক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলোতে যীশু স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁর পরে অনেক ভাববাদী আগমন করবেন, কেউ ভাক্ত এবং কেউ সঠিক, যারা স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং কেউ ভাক্ত। ফলের মাধ্যমেই সত্য ভাববাদী থেকে ভণ্ডকে পৃথক করা যাবে।

যীশুখৃস্টের ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রথম শতাব্দীতে অনেক ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব হয়, নতুন নিয়মের পত্রাবলি থেকে আমরা তা জানতে পারি। করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১২ কিন্তু যাহা করিতেছি, তাহা আরও করিব; যাহারা সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুযোগ যেন খণ্ডন করিতে পারি; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদের সমান হইয়া পড়ে। ১৩ কেননা এইরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে।"

এভাবে খৃস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌল উচ্চরবে ঘোষণা করছেন যে, ভাক্ত প্রেরিত ও প্রতারকগণ তার যুগেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা খৃস্টের প্রেরিতত্বের বেশ ধারণ করেছিল।

বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন : "এ সকল ব্যক্তি দাবি করতেন যে, তারা খৃস্টের প্রেরিত। প্রকৃতপক্ষে তারা খৃস্টের প্রেরিত ছিলেন না। তারা ধর্ম প্রচার করতেন এবং এজন্য কষ্ট করতেন। কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিছু জাগতিক অর্জন।"

যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে : "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে (spirit) বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী (false prophets) জগতে বাহির হইয়াছে।"[২৬]

উপরের দুটি বক্তব্য প্রমাণ করে যে, ভাক্ত ভাববাদিগণ প্রেরিতদের যুগেই আগমন করে।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ কিন্তু শিমোন (Simon) নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে পূর্বাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া (corcery) করিত ও শমরীয় জাতিকে (the people of Samaria) চমৎকৃত করিত, আপনাকে এক জন মহাপুরুষ (great one) বলিত, ১০ তাহার কথায় ছোট বড় সকলে অবধান করিত, বলিত, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যাহা মহতী নামে বিখ্যাত (This man is the great power of God)" ।

এই পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "আর তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফঃ (Paphos) নগরে উপস্থিত হইলে এক জন যিহূদী মায়াবী ও ভাক্ত ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম বর্-যীশু (a certain corcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus)"।[২৭]

---

২৬. ১ যোহন ৪/১।
২৭. প্রেরিত ১৩/৬।

এছাড়া অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, যারা নিজেদেরকে খৃষ্ট বলে দাবি করবে। এ বিষয়ে যীশু বলেছেন : "দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। ৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট আর অনেক লোককে ভুলাইবে।" মথির সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে এ কথা রয়েছে।[২৮]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু মূলত এ সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত খৃষ্ট থেকে সাবধান করেছেন। তিনি সত্য ভাববাদী থেকে সতর্ক করেন নি। আর এজন্যই তিনি উপর্যুক্ত বক্তব্যে ভাক্ত ভাববাদিগণ থেকে সাবধান করার পরে বলেছেন : "(ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া।) তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে (Ye shall know them by their fruits) । লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিংবা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে ?"

মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন সত্য ভাববাদী। তাঁর ফলই তা প্রমাণ করে। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলো থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। বিরোধিগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও বিভ্রান্তি প্রচার করে, সেগুলো অগ্রহণযোগ্য। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জানতে পারবেন।

এছাড়া বিরোধীদের অপবাদ নেই কার বিরুদ্ধে। সকলেই জানেন যে, ইহূদীগণ মরিয়মের পুত্র যীশুকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের শুরু থেকে তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁর চেয়ে খারাপ আর কোন মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি। অনুরূপভাবে পাদরিগণের স্বদেশীয় ইউরোপীয় হাজার হাজার পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক যীশুর নিন্দা করেন। তারা প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। পরে তারা খৃষ্টধর্মকে ঘৃণা করে তা পরিত্যাগ করেন। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেন এবং তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে নিয়ে উপহাস করেন। তাদের মতামতের পক্ষে তারা অনেক বইপুস্তক রচনা করেছেন। এ সকল বইপুস্তক বিশ্বের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইউরোপে প্রতিদিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। যীশুর বিরুদ্ধে ইহূদীদের নিন্দা এবং ইউরোপীয় নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা যেমন খৃষ্টান পাদরিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদরি ও পণ্ডিতগণের অপবাদ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চম বিষয় : যীশু-বিষয়ক পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইহূদীদের ব্যাখ্যা

খৃষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি থেকে যীশুর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন। ইহূদীদের ব্যাখ্যা অনুসারে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর একটিও যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য তারা যীশুকে

---

২৮. মথি ২৪/৪-৫।

অবিশ্বাস করেন এবং যীশুর খৃস্টত্বের দাবি কঠিনভাবে অস্বীকার করেন। খৃস্টান পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়মের এ সকল আয়াতের ক্ষেত্রে ইহূদী পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের ব্যাখ্যা মোটেও গ্রহণ করেন না; বরং তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে এগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যাতে বুঝা যায় যে, এগুলো যীশুর বিষয়েই বলা হয়েছে।

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফান্ডার তাঁর পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত ফারসী সংস্করণের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "খৃস্টধর্মের প্রাচীন ধর্মগুরুগণ শুধু এতটুক দাবি করেছেন যে, যীশুখৃস্টের বিষয়ে ইঙ্গিত করে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোতে যে সকল আয়াত রয়েছে ইহূদীগণ সেগুলোর ভুল ও অন্যায় ব্যাখ্যা করে এবং তারা এগুলোর বাস্তবতা বিবর্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের এই দাবি যথাযথ ও সঠিক ছিল।"

এখানে পাদরি মহাশয় প্রাচীন ধর্মগুরুদের দাবিকে শুধু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে তাকে যথাযথ ও সঠিক বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে অসত্য। কারণ প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরুগণ যেমন দাবি করেছেন যে, ইহূদীগণ এ সকল আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে, তেমনি তারা দাবি করেছেন যে, ইহূদীরা এ সকল আয়াতের শব্দ ও বাক্যও বিকৃত করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

তবে আমি এ বিষয়টি বাদ দিচ্ছি। আমি শুধু বলতে চাই যে, ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর যীশু বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহূদীদের মত যেমন খৃস্টানদের নিকট অগ্রহণযোগ্য, অশুদ্ধ ও অন্যায়, তেমনি নতুন ও পুরাতন নিয়মের মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য, অশুদ্ধ ও অন্যায়। পাঠক অচিরেই দেখবেন যে, পুরাতন নিয়মের যে সকল বক্তব্য 'যীশু বিষয়ক' বলে খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যীশুর সাথে সেগুলোর সম্পৃক্ততা তত স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে নতুন ও পুরাতন নিয়মের যে সকল বক্তব্য 'মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক' বলে আমরা পেশ করব মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে সেগুলোর সম্পৃক্ততা অধিকতর স্পষ্ট। কাজেই তাদের ভিত্তিহীন ব্যাখ্যাগুলোকে অবজ্ঞা করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

পুরাতন নিয়মের কিছু বক্তব্যকে খৃস্টানগণ যীশুর বিষয়ে কথিত বলে দাবি করেন। ইহূদীগণ দাবি করেন যে, এগুলো যীশু বা খৃস্টানদের খৃস্টের বিষয়ে কথিত নয়, বরং ইহূদীগণ যে প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁর বিষয়ে কথিত, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বিষয়ে কথিত। খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, এগুলো যীশুখৃস্টের বিষয়েই কথিত। তারা ইহূদীদের বিরোধিতার তোয়াক্কা করেন না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে কথিত পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্যের বিষয়ে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, এগুলো যীশুর বিষয়ে কথিত।

আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এগুলো মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে কথিত। খৃস্টানদের বিরোধিতার আমরা তোয়াক্কা করি না। আর পাঠক অচিরেই দেখবেন যে, এ সকল বক্তব্যের অর্থ মুহাম্মাদ (সা)-এর অবস্থার সাথে যেভাবে মানানসই হয় বা মিলে যায়, যীশুর অবস্থার সাথে সেভাবে খাপ খায় না। কাজেই এগুলোর ব্যাখ্যায় তাদের দাবির চেয়ে আমাদের দাবি অগ্রগণ্য।

ষষ্ঠ বিষয় : নতুন নিয়মে উদ্ধৃত যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, নতুন নিয়মের লেখকগণ ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত। এ সকল লেখক তাঁদের লেখার মধ্যে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী বা বক্তব্য উদ্ধৃত করে দাবি করেছেন যে, সেগুলো যীশুর বিষয়ে কথিত। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁদের উদ্ধৃতিও ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর। আমি এখানে এ জাতীয় কিছু উদ্ধৃতি নমুনা হিসেবে উল্লেখ করব যেন পাঠক এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর বিষয়ে আমি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব সেগুলোর তুলনা করতে পারেন। যীশুর অবস্থার সাথে তাঁর বিষয়ে নতুন নিয়মে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কতটুকু মিলে এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে আমাদের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাঁর অবস্থার সাথে কতটুকু মিলে তা পাঠক তুলনা করতে পারবেন।

যদি কোন পাদরি অযৌক্তিক গোঁড়ামির পথ অনুসরণ করেন এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে আমি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করব সেগুলো মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে নয় বলে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে চান, তবে যীশুর বিষয়ে নতুন নিয়মের লেখকগণ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো যীশুর বিষয়ে কতটুকু প্রযোজ্য তা তাকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে। এতে ন্যায়পরায়ণ পাঠকের কাছে উভয় পক্ষের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং কোন পক্ষের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বেশি জোরালো বা বেশি দুর্বল তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু সেই পাদরি মহাশয় যদি নতুন নিয়মে উদ্ধৃত যীশু-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণের দায়িত্ব এড়িয়ে যেয়ে শুধু আমাদের উদ্ধৃত মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে চেষ্টা করেন তবে তা তার অক্ষমতা, অযৌক্তিক গোঁড়ামি ও উগ্রতাই প্রমাণ করবে। পাঠক ইতোপূর্বে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিষয়ের আলোচনা থেকে জেনেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখি ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। এজন্য বিরুদ্ধমতাবলম্বী এগুলোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।

আমি এখানে শুধু নতুন নিয়মের লেখকগণ উদ্ধৃত যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কিছু নমুনা আলোচনা করব। আমরা দেখব যে, এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু

সন্দেহাতীতভাবে ভুল এবং কিছু বিকৃত। আর কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যীশুর অবস্থার সাথে মোটেও মেলে না। একান্তই দূরবর্তী ব্যাখ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক দাবি ছাড়া কোনভাবেই তাকে যীশুর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। যখন প্রমাণিত হবে যে, নতুন নিয়মের মধ্যে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা এরূপ, তখন আমরা বুঝতে পারব যে, ঐশ্বরিক প্রেরণাবিহীন অন্যান্য খৃস্টান ধর্মগুরু যীশুর বিষয়ে অন্যান্য যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন সেগুলোর অবস্থাও এর চেয়ে ভাল নয়। কাজেই সেগুলো উল্লেখ করে অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে : "এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, "দেখ, সেই কুমারী[২৯] গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, 'আমাদের সহিত ঈশ্বর'।"[৩০]

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ভুলভ্রান্তির আলোচনায় ৫০ নং ভুল হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছি। পাঠক সেখানে দেখেছেন যে, এই কথাটি ভুল, কোনভাবেই বক্তব্যটি যীশুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, যীশুকে গর্ভধারণের সময় মরিয়ম যে কুমারী ছিলেন তা ইহূদীগণ এবং খৃস্টধর্মের বিরোধী নাস্তিক পণ্ডিতগণ মানেন না। কাজেই তাঁদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর বিষয়ে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বাইবেলের বিবরণ অনুসারেই মরিয়ম যীশুর জন্মের আগে থেকেই সূত্রধর যোষেফের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন। যীশুর সমসাময়িক ইহূদীগণ তাঁর বিষয়ে বলত যে, তিনি সূত্রধর যোষেফের পুত্র। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৫৫ আয়াতে এবং যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪৫ আয়াতে ও ৬ অধ্যায়ের ৪২ আয়াতে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইহূদীরা এ কথাই বলে বরং তারা এর চেয়ে অনেক জঘন্য ও নোংরা কথা তাঁর বিষয়ে বলে। যীশুর অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের কথা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয় নি।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ; মথি তাঁর সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের বৈথলেহমে যীশুর জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মথি বলেন : "৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে, কেননা ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ৬ আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে

২৯. এখানে ইংরেজী বাইবেলে (KJV) virgin বা কুমারী বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে কুমারীর পরিবর্তে 'কন্যা' লিখা হয়েছে। যিশাইয় ৭/১৪ তেও একইভাবে ইংরেজিতে virgin ও বাংলায় 'কন্যা' লেখা হয়েছে।

৩০. মথি ১/২২-২৩।

কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন।"

এখানে মথি মীখা ভাববাদীর পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ২য় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু মীখার পুস্তকের মূল বক্তব্যের সাথে উদ্ধৃত বক্তব্যের মিল নেই।৩১ নিঃসন্দেহে দুটি বক্তব্যের একটি বিকৃত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, খৃস্টান গবেষকগণ দাবি করেছেন যে, মীখার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই দাবি প্রমাণবিহীন। শুধু নতুন নিয়মের বাক্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা মীখার বক্তব্যকে বিকৃত বলে দাবি করেন। কাজেই ভিন্ন মতাবলম্বীর কাছে এই দাবি মূল্যহীন।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি ("যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম)।"৩২

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি ("তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে, হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন; রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্ত্বনা পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই" ।)৩৩

পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায় ২৩ আয়াতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী ("এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।")৩৪

---

৩১. মীখার বক্তব্য : আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা।

৩২. এখানে ভাববাদী বলতে হোশেয় ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে। মথি এখানে হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১ম আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই আয়াতটিকে যীশুর জন্য প্রয়োগ করা ভুল। যীশুর সাথে এই আয়াতের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫১নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

৩৩. এই কথাটিও ভুল এবং সুসমাচার লেখক একে বিকৃত করেছেন। কারণ এই কথাটি যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত। যে কোন পাঠক যদি যিরমিয়ের এই আয়াতটির পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করেন তাহলে জানতে পারবেন যে, এই আয়াতটি হেরোদের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়নি, বরং যিরমিয় ভাববাদীর সময়ে সংঘটিত নেবুকাদনেজারের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫৩ নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

৩৪. মথির এই কথাটি অসত্য। কোন ভাববাদীর কোন পুস্তকেই এ কথা নেই। খৃস্টান পণ্ডিতগণ এখানে বিভিন্ন বাতুল ও বাজে ওজর-আপত্তি পেশ করে থাকেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির বর্ণনায় ৫৪ নং ভুলটির আলোচনা দেখুন।

উপর্যুক্ত তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ভুল। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৯ আয়াত ("তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'আর তাহার সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল; তাহা তাঁহার মূল্য, যাঁহার মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল, ইস্রায়েল সন্তানদের কতক লোক যাঁহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছিল")। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২৯শ প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, এই উদ্ধৃতিটি ভুল (এই বাক্যটি বা এ অর্থে কোন বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের কোথাও নেই। এমনকি এই শব্দে ও এই অর্থে কোন কথা পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকেই নেই)। সখরীয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতের অর্থ মথির উদ্ধৃত এই কথার সাথে আংশিক মিলে। কিন্তু মথির উদ্ধৃত বক্তব্য ও সখরীয়র বক্তব্যের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সখরীয়র পুস্তকের বক্তব্যের সাথে মথির লিখিত ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা কর্তৃক খৃস্টকে ধরিয়ে দেওয়ার মূল্য গ্রহণের কাহিনীর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। কারণ এখানে সখরীয় ভাববাদী তাঁর দুটি পাঁচনীর (staff) বা লাঠির নাম এবং সেগুলো দিয়ে মেষপাল চরানোর ঘটনা বর্ণনা করার পরে বলেন : "১২ তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তোমাদের ভাল বোধ হয়, তবে আমার বেতন দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। ১৩ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহা কুম্ভকারের নিকটে ফেলিয়া দেও, বিলক্ষণ মূল্য, উহাদের বিচারে আমি এইরূপ মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে (to the potter in the house of the LORD) ফেলিয়া দিলাম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, সখরীয় ভাববাদীর বক্তব্য কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং একটি অতীত অবস্থার বর্ণনা মাত্র। এছাড়া এখানে বৈধ কর্মের বিনিময়ে সখরীয় ভাববাদীর মত ধার্মিক কর্তৃক মূল্য গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, অবৈধ কাজের বিনিময়ে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার মত অবিশ্বাসীর মূল্য গ্রহণের কথা বলা হয় নি।

সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী : মথিলিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৪ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, ১৫ "সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দনের পরপারে, পরজাতিগণের গালীল, ১৬ যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।"

এখানে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ১ ও ২ আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ : "১ কিন্তু যে [দেশ] পূর্বে যাতনাগ্রস্ত ছিল, তাহার

তিমির আর থাকিবে না; তিনি পূর্বকালে সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছাস্পদ করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী সেই পথ, যর্দনের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালীলকে, গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ২ যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে; যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে।"

দুটি বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয়ের একটি বিকৃত। সে কথা বাদ দিলেও, যিশাইয়র এই বক্তব্যে কোন ব্যক্তির আগমনের কোনরূপ পূর্বাভাষ নেই বরং যিশাইয়র বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে, তিনি সবূলূন ও নপ্তালি দেশের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অতীতকালে তাদের অবস্থা খারাপ ছিল এবং এরপর তা উন্নত হয়। এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলো অতীতকালের হওয়াতে তা স্পষ্টতই বুঝা যায়। যেমন : তুচ্ছাস্পদ করিয়াছিলেন, গৌরবান্বিত করিয়াছেন, মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে, আলোক উদিত হইয়াছে।

যদি আমরা মনে করি যে, এগুলো অতীতের সংবাদ নয়, বরং রূপক অর্থে ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, তবে 'মহা-আলোক দেখতে পাওয়া' এবং 'আলোক উদিত হওয়া'-র অর্থ সে দেশে অনেক ধার্মিক মানুষ গমন করবেন এবং সত্যিকার ধার্মিকতা তথায় বিকশিত হবে। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যীশুকে বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করার কোনরূপ ভিত্তি নেই। কারণ এ সব দেশে অনেক ধার্মিক মানুষ গমন করেছেন। বিশেষত, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথিগণ এবং তাঁর উম্মতের অগণিত ওলী-আউলিয়া তথায় গমন করেছেন। তাঁদের কারণে এ সকল দেশ থেকে অবিশ্বাস ও ত্রিত্ববাদের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং একত্ববাদ ও খৃস্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের মহা-আলোক প্রকাশিত হয়।

সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে যীশুখৃস্ট বিষয়ক যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো থেকে উপরের ৯টি উদাহরণ উল্লেখ করলাম। দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে অন্যান্য উদাহরণ উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। 'ইযালাতুল আওহাম' নামক পুস্তকে আমি আরো অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোর দুর্বলতা ও যীশুর অবস্থার সাথে সেগুলোর অসাঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করেছি।

সপ্তম বিষয় : বাইবেলে উল্লিখিত নামসমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, সংযোজন ও পরিবর্তন

অতীতে ও বর্তমানে সকল যুগে ইহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের অতি পরিচিত একটি অভ্যাস যে, তাঁরা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে অধিকাংশ সময়ে নামগুলোর অনুবাদ করেন এবং নামের পরিবর্তে নামের অর্থ উল্লেখ করেন। এ বিষয়টি বড় অন্যায় ও বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ সকল পুস্তকের যে বাণীকে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী বলে

বিশ্বাস করেন সেগুলোর সাথে কখনো কখনো নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা সংযোগ করেন, অথচ মূল ঐশ্বরিক বাক্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন না। এই দুটি বিষয় তাঁদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও অতি পরিচিত অভ্যস্ত কর্ম। যদি কেউ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠ ও তুলনা করেন তবে এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখতে পাবেন। আমি এখানে অল্প কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রথম : আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতের ১৬২৫ সালে, ১৮৩১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে লেখা হয়েছে : "এই কারণ সেই কূপের নাম বের-লিহায়-আন-নাযিরুনী হইল।"

এখানে অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটিকেই আরবীতে অনুবাদ করেছেন।[৩৫]

দ্বিতীয় : আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি ১৮১১ প্রকাশিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম 'মাকান ইয়ারহামুল্লাহু যায়িরাহু' রাখিলেন।"

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ : "সেই স্থানের নাম 'আর-রাব্বু ইউরা' রাখিলেন।"

এভাবে উভয় অনুবাদেই অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটি আরবীতে অনুবাদ করে লিখেছেন। প্রথম অনুবাদে 'মাকান ইয়ারহামুল্লাহু যায়িরাহু' ও দ্বিতীয় অনুবাদে 'আর-রাব্বু ইউরা' বলা হয়েছে।[৩৬]

তৃতীয় : আদিপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ২০ আয়াতটি ১৬২৫ সালে এবং ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "আর যাকোব আপন পলায়নের কোন সংবাদ নিজ শ্বশুরকে দিলেন না।"

আর ১৮২৫ সালে মুদ্রিত উর্দু অনুবাদে 'নিজ শ্বশুর' স্থলে 'লাবন' লেখা হয়েছে।[৩৭] এভাবে আরবী অনুবাদকগণ নামের পরিবর্তে নামের মর্ম হিসেবে 'শ্বশুর' লিখেছেন।

---

৩৫. ইংরেজিতে Beerlahairoi বাংলা বাইবেল : "বের-লহয়-রোয়ী [জীবন্ত দর্শক; যিনি আমায় দেখিতেছেন, তাঁহার কূপ] সম্ভবত 'বেরলহয়রোয়ী' কূপটির হিব্রু নাম। উপর্যুক্ত আরবী সংস্করণগুলোতে অনুবাদকগণ মূল নামটিই অনুবাদ করেছেন, মূল নামটি উল্লেখ করে এরপর তা ব্যাখ্যা করেন নি।

৩৬. ইংরেজি বাইবেলে : Jehovahjireh, বাংলায় : যিহোবা-যিরি [সদাপ্রভু যোগাইবেন] সম্ভবত এটিই মূল হিব্রু নাম। তাঁদের উচিত ছিল মূল হিব্রু নামটি উল্লেখ করার পরে তার আরবী অর্থ বর্ণনা করা, কিন্তু তাঁরা তা করেন নি।

৩৭. ইংরেজি Authorised Version ? King James Version-এ Laban the Syrian লেখা হয়েছে। Revised standard Version-এ রয়েছে : Laban the Aramean। বাংলা বাইবেলে অরামীয় লাবন। এখানেও মূল নাম অনুবাদের অভ্যাস স্পষ্ট।

চতুর্থ : আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াতটি ১৬২৫ সালে ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার জন্য সব তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই অপেক্ষা করিবে।"

এখানে 'যাহার জন্য সব' কথাটি 'শীলো' (Shiloh) শব্দের অনুবাদ। এখানে মূল নামটিই অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদ গ্রীক অনুবাদ অনুসারে।

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ : "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না; যে পর্যন্ত যাঁহার অধিকার আছে তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

এই অনুবাদে 'শীলো' নামের অনুবাদ করা হয়েছে : "যাহার অধিকার আছে।" এই অনুবাদ সিরীয় অনুবাদ অনুসারে। প্রসিদ্ধ খৃস্টান গবেষক পণ্ডিত লেক্লার্ক এই নামটির অনুবাদ করেছেন : "শেষফল যাহার।" ১৮২৫ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদে 'শায়লা' লেখা হয়েছে। ল্যাটিন বাইবেল ভালগেট (Vulgate)-এ এর অনুবাদ করা হয়েছে : "যিনি প্রেরিত হইবেন।" এভাবে বাইবেলের অনুবাদকগণ এই (শীলো) শব্দটির অনুবাদে যার নিকট যা ভাল মনে হয়েছে তা লিখেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে শব্দটি একটি নাম হিসেবে গণ্য, যাঁর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

পঞ্চম : যাত্রাপুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "(১৩ পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নাম কি ? তবে তাহাদিগকে কি বলিব ?) ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, য়াহ্ইয়াহ আশার য়াহ্ইয়াহ (Yahweh-Asher-Yahweh)।

কিন্তু ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, 'অনাদি অনন্ত' (আমি যে আছি সেই আছি/I AM THAT I AM)।"

এখানে 'য়াহ্ইয়াহ আশার য়াহ্ইয়াহ (Yahweh-Asher-Yahweh)' ঈশ্বরের নাম, অথচ দ্বিতীয় অনুবাদে নামটিকেই অনুবাদ করা হয়েছে : "অনাদি অনন্ত' বা 'আমি যে আছি সেই আছি।'

ষষ্ঠ : যাত্রাপুস্তকের ৮ অধ্যায়ের ১১ আয়াত ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "(ভেকগুলো) কেবল নদীতেই থাকিবে (they shall remain in the river only)।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "(ভেকগুলি) কেবল নীলেই থাকিবে।"

সপ্তম : যাত্রাপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত ১৬২৫ খৃ. ও ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "পরে মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'সদাপ্রভু আমাকে সম্মান করিলেন' রাখিলেন।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "পরে মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'ঈশ্বর আমার পতাকা' রাখিলেন।" উর্দু অনুবাদ এই অনুবাদের অনুরূপ।[৩৮]

এখানে 'ঈশ্বর, সদাপ্রভু, সম্মান, পতাকা ইত্যাদি শব্দের মধ্যে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, অনুবাদকগণ মূল হিব্রু নামটিরই অনুবাদ করেছেন।

অষ্টম : যাত্রাপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে ১৬২৫ ও ১৮৪৪ সালের অনুবাদে রয়েছে : "উত্তম গন্ধরস (Storax) ।" কিন্তু ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে রয়েছে : "নির্মল মেশ্‌ক (musk)।" গন্ধরস (Storax) ও মেশ্‌ক (musk) এক নয়। এতে বুঝা যায় যে, মূল হিব্রু নামটির অনুবাদ করেছেন অনুবাদকগণ। যার নিকট যে অর্থ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করেছেন।

নবম : দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ৫ আয়াত ১৬২৫ ও ১৮৪৪ সালে আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "সদাপ্রভুর দাস মোশি (Moses the servant of the LORD) ...সেই স্থানে...মরিলেন।" কিন্তু ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "আল্লাহ্‌র রাসূল মোশি...সেই স্থানে ...মরিলেন।"

এভাবে তারা 'আল্লাহ্‌র রাসূল' স্থলে 'প্রভুর দাস' লিখেছেন। কাজেই তারা যদি মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে 'আল্লাহ্‌র রাসূল' স্থলে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

দশম : যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতের ১৮৪৪ খৃস্টাব্দের আরবী অনুবাদে রয়েছে : "এই কথা কি 'পুণ্যবানদের গ্রন্থ' (Book of uprights) লিখিত হয় নাই ?"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "এই কথা কি 'সুপথপ্রাপ্তের গ্রন্থে' (Book of straight) লিখিত হয় নাই ?" ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত ফার্সী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "এই কথা কি যাশেরের গ্রন্থে (Book of

---

৩৮. ইংরেজি অনুবাদে এ স্থানের নাম Jehovahnissi বলা হয়েছে। বাংলায় : যিহেবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার পতাকা] বলা হয়েছে। সম্ভবত, 'যিহোবানিষি' স্থানটির নাম। কিন্তু আরবী অনুবাদকগণ মূল নামটির অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়, 'যিহোবা' শব্দটিকে অনুবাদ না করে, তার বদলে 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদ করেছেন।

Jasher) লিখিত হয় নাই ?" ১৮২৫ সালে মুদ্রিত উর্দু অনুবাদে 'যাশা' লেখা হয়েছে।

সম্ভবত যাসার অথবা যাশের অথবা যাশা গ্রন্থটির রচয়িতার নাম। আর আরবী অনুবাদের অনুবাদকগণ তাঁদের মতামত অনুসারে এই নামটির অনুবাদ করেছেন পুণ্যবান বা সুপথপ্রাপ্ত।

একাদশ : যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ের অনুবাদে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত ফারসী সংস্করণে[৩৯] বলা হয়েছে : "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি বৃহৎ ফলক লও, এবং প্রচলিত অক্ষরে তাহাতে লিখ, 'মহের-শালল-হাশ-বসের (Maher-shalal-hash-baz) উদ্দেশে। .... ৩ ..... উহার নাম 'মহের-শালল-হাশ-বস' রাখ।"

১৮২৫ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদও ফারসী অনুবাদের অনুরূপ।

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি বৃহৎ ফলক লও, এবং মানুষের অক্ষরে তাহাতে লিখ, লুট কর ব্যবহার করে, অপহরণ কর ত্বরা করে। ...৩...উহার নাম রাখ, 'লুট কর দ্রুত ও অপহরণ কর তাড়াতাড়ি।'

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানি ভাল ফলক বৃহৎ লৌহ লও, এবং কঠিন মানুষের অক্ষরে তাহাতে লিখ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুট করা হোক, কারণ তা উপস্থিত। ...৩... উহার নাম রাখ, 'লুট কর দ্রুত ও অপহরণ কর তাহলে পাবে।'

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই পুত্রের নাম ছিল 'মহের-শালল-হাশ-বসের (Mahershalalhashbaz) । কিন্তু আরবী অনুবাদের অনুবাদকগণ এই নামটিকে নিজেদের ইচ্ছামত অনুবাদ করে লিখেছেন। তাদের অনুবাদগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে অনুবাদক কিছু কথা নিজের থেকে বৃদ্ধি করেছেন। কাজেই তাঁরা যদি মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে তাঁর কোন নাম এভাবে অনুবাদ করেন অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন বিয়োজন করেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। এরূপ কর্ম তাঁদের অত্যন্ত সুপরিচিত অভ্যাস।

দ্বাদশ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত ১৮১১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।"

৩৯. এখানে বাংলা বাইবেল থেকে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যাহার আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।"

এখানে এই অনুবাদক 'এলিয়' শব্দটির পরিবর্তে ইঙ্গিতবাচক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। কাজেই এরূপ অনুবাদকগণ যদি মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন নাম পরিবর্তন করেন তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ত্রয়োদশ : যোহনলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ আয়াতের ১৮১১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে রয়েছে : "যীশু যখন জানিলেন।" কিন্তু ১৮১৬ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "প্রভু যখন জানিলেন।"

এখানে শেষের দুই সংস্করণের অনুবাদকগণ যীশুর নাম 'যীশু' শব্দের পরিবর্তে তাঁর ভক্তিমূলক উপাধি 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কাজেই এভাবে যদি তাঁরা মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর নাম পরিবর্তন করে তাঁদের অভ্যাস ও গোঁড়ামির কারণে তদস্থলে কোন অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেন তবে তাতে অবাক হওয়া যাবে না।

উপরের উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, বাইবেলের অনুবাদকগণ নামের অনুবাদ করেন এবং এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করবে যে, তাঁরা অনুবাদের মধ্যে ব্যাখ্যা সংযোজন করেন :

(১) মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, 'এলী এলী লামা শবক্তানী,' অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"[৪০]

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"

এখানে মথির সুসমাচারে 'অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?' এবং মার্কের সুসমাচারে অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?' কথাগুলি ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মুখনিসৃত নয়, বরং সুসমাচার লেখক তা নিজের পক্ষ থেকে সংযোগ করেছেন।

---

৪০. মথি ২৭/৪৬।

(২) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে রয়েছে : "এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই দুইজনকে বোনেরগশ, অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র, এই উপনাম দিলেন।"

এখানে অর্থাৎ 'মেঘধ্বনির পুত্র' কথাটুকু যীশুর বক্তব্য নয়। অর্থাৎ যীশু তাদেরকে 'বোনেরগশ অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র' উপনাম প্রদান করেন নি বরং তিনি তাঁদেরকে 'বোনেরগশ' উপনাম প্রদান করেছেন। বাকি কথাটুকু অতিরিক্ত সংযোজিত।

(৩) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৪১ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।"

এখানেও ব্যাখ্যাটুকু সংযোজিত, যীশুর বাক্য নয়।

(৪) মার্কলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে ৩৪ আয়াত ১৮১৬ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ : "আর তিনি স্বর্গের দিকে উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফাত্তা' অর্থাৎ খুলিয়া যাউক।"

১৮১১ সালের আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "আর তিনি স্বর্গের দিকে উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফাথা' আর তা হলো, খুলিয়া যাউক।"

১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "আর তিনি স্বর্গের দিকে উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইথফাতিহ' আর তা হলো, খুলিয়া যাউক।"

১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "আর তিনি স্বর্গের দিকে উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, 'ইফ্ফথা' আর তা হলো, খুলিয়া যাউক।"

এখানে হিব্রু ভাষায় যীশু ঠিক কি বলেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি 'ইফ্ফাত্তা,' না ইফ্ফাথা, না ইথফাতিহ, না ইফ্ফথা বলেছিলেন তা আমরা জানি না। কারণ একেক সংস্করণে একেক শব্দ প্রদান করা হয়েছে। আর অনুবাদগুলির বৈপরীত্যের কারণ, যে সকল মূল পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে অনুবাদ করা হয়েছে, সেগুলির বৈপরীত্য ও বিশুদ্ধতার ঘাটতি। তবে সর্বাবস্থায় আমরা জানছি যে, অর্থাৎ 'খুলিয়া যাউক,' 'আর তা হলো, খুলিয়া যাউক' ইত্যাদি কথা যীশুর বক্তব্য নয়, বরং তা অতিরিক্ত সংযোজন।

১ থেকে ৪ পর্যন্ত উপরের চারটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, যীশু হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। হিব্রু ভাষাই ছিল তাঁর জাতির ভাষা এবং মাতৃভাষা। এ থেকে প্রমাণিত হয়

যে, তিনি গ্রীক ভাষায় কথা বলতেন না। যুক্তি ও বিবেকও তা সমর্থন করে। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন হিব্রু এবং মাতাও ছিলেন হিব্রু। হিব্রু ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। আমরা জানি যে, সুসমাচারগুলি গ্রীক ভাষায় রচিত। এ সকল সুসমাচারে যীশুর বক্তব্যের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি যে, সুসমাচারগুলি একক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এগুলির বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা নিশ্চিত নয়। এর সাথে অনুবাদের বিষয়টি সংযুক্ত হয়ে এগুলির গ্রহণযোগ্যতা দুর্বল করে দেয়।[৪১]

(৫) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "তাঁহারা কহিলেন, রব্বি-অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু।"

এখানে 'অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু' কথাটুকু অতিরিক্ত সংযোজিত, তাদের বক্তব্যের অংশ নয়।

(৬) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪১ আয়াতের ১৮১১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে : "আমরা মাসিয়্যার দেখা পাইয়াছি, ইহার অর্থ মাসীহ্।"[৪২]

---

৪১. অনুবাদক যত আন্তরিক, সৎ ও ভাষাবিদই হোন না কেন, মূল বক্তব্য আর অনুবাদ কখনোই এক হতে পারে না। শ্রোতার বুঝের ভুল বা অনুবাদকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা বাদ দিলেও মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও বাক্য একাধিক অর্থ ও ভাব প্রকাশ করতে পারে। অনুবাদক শুধু একটি অর্থ সঠিক মনে করে অনুবাদ করেন। মূল বক্তব্য হুবহু সংরক্ষিত হলে তা থেকে শ্রোতা বা সংকলক যা বুঝেছেন, পাঠক বা পরবর্তী গবেষক অন্য অর্থ বুঝতে পারেন। আর এজন্যই মুসলিম উম্মাহ কুরআনের ক্ষেত্রে মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ প্রকাশ করা অবৈধ মনে করেন। মূল আরবী পাঠের পাশাপাশি অনুবাদ থাকলে যে কোন আগ্রহী পাঠক যে কোন আয়াতের অর্থ মূলের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন বা ভিন্ন অর্থ ও নির্দেশনা বুঝতে পারেন। কুরআনের অনেক আয়াতের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুফাসসিরগণ নির্দিষ্ট অর্থ করেন। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদগণ বা আরবীতে অভিজ্ঞ খৃস্টান পাদরিগণ এ সকল আয়াতের ভিন্ন অর্থ দাবি করে থাকেন। মূল পাঠ সংরক্ষিত থাকার ফলেই তা সম্ভব হয়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, যীশুর বক্তব্য শিষ্যরা ভাল বুঝতে পারতেন না। এছাড়া অধিকাংশ শিষ্য উচ্চশিক্ষিত ও ভাষাবিদ ছিলেন না। যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতো যে, মথি, মার্ক, লূক ও যোহন এ সুসমাচারগুলি লিখেছিলেন এবং তাঁদের লেখা সুসমাচারগুলি হুবহু ও নির্ভুলভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তবুও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে, গ্রীক সুসমাচারগুলিতে যীশুর বক্তব্যের যে অনুবাদ লেখা হয়েছে তাতে যীশুর শিক্ষা পুরোপুরি প্রকাশিত হয় নি। এর পাশাপাশি যখন আমরা দেখি যে, সুসমাচারগুলি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয় নি এবং এগুলির কোন প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, তখন আমরা এগুলির নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলি।

৪২. ইংরেজি পাঠ : We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. বাংলায় : "আমরা মসীহের দেখা পাইয়াছি–অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]।"

১৮১৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ফারসী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "আমরা মসীহের দেখা পাইয়াছি–অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীস্ট।" ১৮১৪ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদও এরূপ।

উপরের আরবী অনুবাদদ্বয় থেকে জানা যায় যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'মাসিয়্যা' এবং 'মাসীহ' শব্দটি তার অনুবাদ। আর ফারসী ও উর্দু অনুবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'মাসীহ' এবং 'খৃস্ট' শব্দটি তার অনুবাদ। কিন্তু ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, আন্দ্রিয় যে শব্দটি বলেছিলেন তা ছিল 'খৃস্ট' এবং অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় মাসীহ। এভাবে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি না যে, আন্দ্রিয় কি বলেছিলেন? তিনি কি মাসিয়্যা বলেছিলেন, না মাসীহ বলেছিলেন, না খৃস্ট বলেছিলেন। এ শব্দগুলির অর্থ যদিও এক, কিন্তু আন্দ্রিয় তো তিনটি শব্দ বলেন নি, তিনি নিঃসন্দেহে এই তিনটির মধ্য থেকে একটি শব্দই বলেছিলেন। যদি কোন শব্দ লিখে এরপর তার ব্যাখ্যা লিখতে হয়, তবে অবশ্যই প্রথমে মূল শব্দ লিখে এরপর তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হয়। এ বিষয় বাদ দিলেও আমরা নিশ্চিত বুঝতে প্যারি এখানে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আন্দ্রিয়ের বক্তব্যের অংশ নয়,বরং তা অতিরিক্ত সংযোজন।

(৭) যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৪১ আয়াতে ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ অনুসারে যীশু তাঁর শিষ্য পিতরের বিষয়ে বলেন : "তোমাকে পিতর বলা যাইবে, অনুবাদ করিলে যাহার অর্থ পাথর।"

১৮১৬ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "তোমাকে 'সাফা' বলা যাইবেই, যাহার অর্থ 'পিতর।'

১৮১৬ সালে মুদ্রিত ফার্সী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "তোমাকে কৈফা বলা যাইবে, অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পাথর।"[৪৩]

তাঁদের এই গবেষণা ও সংশোধনের উপর আল্লাহ্ পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করুন! এত বেশি গবেষণা ও সংশোধন যে, কোন্‌টি যীশুর মূল বক্তব্য ও কোন্‌টি তাঁর ব্যাখ্যা তা জানার কোন উপায় নেই। তবে সে কথা বাদ দিয়ে আমরা অন্তত এতটুকু নিশ্চিত যে, ব্যাখ্যা যীশুর বক্তব্যের অংশ নয়, বরং তা অতিরিক্ত সংযোজন।

তাঁদের ঈশ্বর নাম ও উপাধি অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং তাঁর প্রেরিত ও স্থলাভিষিক্ত 'পিতরের' নাম ও উপাধির অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি তাঁদের এই অবস্থা হয়, তবে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, তাঁরা তাঁদের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান মুহাম্মাদ, আহমাদ বা মুহাম্মাদ (সা)-এর অন্য কোন নাম বা উপাধি যথাযথভাবে রেখে দেবেন?

---

৪৩. thou shalt be called Vephas, which is by interpretation, A stone. তোমাকে কৈফা বলা যাইবে–অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]।

(৮) যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ২ আয়াতে উল্লিখিত পুকুরের বিষয়ে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে লেখা হয়েছে : "ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম 'বৈত সাইদা'.."। ১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "ইব্রীয় ভাষা থেকে বলা হয় 'বৈতহাসদা'..."। ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম 'বৈতহাসাদা' অর্থাৎ করুণার বাড়ি।"

এখানেও বৈতসাইদা, বৈতহাসদা ও বৈতহাসাদার মধ্যে পার্থক্য ঐশ্বরিক পুস্তকগুলির সংশোধন ও পরিমার্জনে তাঁদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফল। তবে এ বিষয়টি বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, সর্বশেষ অনুবাদক তাঁদের অনুবাদের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বৃদ্ধি করেছেন (অর্থাৎ করুণার বাড়ি)। যে কথাকে তিনি ঈশ্বরের কথা বলে বিশ্বাস করেন, সেই ঈশ্বরের বাণীর অনুবাদের মধ্যে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করেছেন। এরূপ অনুবাদকগণ মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে যদি অনুরূপ কিছু সংযোজন করেন তবে তা খুবই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে।

(৯) প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৯ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতে রয়েছে : "আর যাফোতে এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার নাম টাবিথা, অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ হরিণী।"

(১০) প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১৩ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে ১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে : "কিন্তু আলীমাস, সেই মায়াবী, কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ (Elymas the sorcerer for so is his name by interpretation)), সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।"

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে লেখা হয়েছে : "কিন্তু আলীম, সেই মায়াবী, কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ, সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।"

কোন কোন উর্দু অনুবাদে বলা হয়েছে "আলমাস" আর কোন কোন অনুবাদে "আলমা" বলা হয়েছে।

এখানে তার নাম আলীমাস, আলীম, আলমাস বা আলমা যাই হোক, নামের অনুবাদ সংযোজিত।

(১১) করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের শেষে ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে রয়েছে : "কোন ব্যক্তি যদি আমাদের প্রভু খৃস্টকে ভাল না বাসে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আতি।"

১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "কোন ব্যক্তি যদি আমাদের প্রভু যীশুখৃষ্টকে ভাল না বাসে, তবে সে বঞ্চিত হউক, মারাণ আতা।"

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "কোন ব্যক্তি যদি প্রভু যীশুখৃষ্টকে ভাল না বাসে, তবে সে হউক আনাথীমা মারাণ আথা।"

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এখানে রয়েছে : "কোন ব্যক্তি যদি প্রভু যীশুখৃষ্টকে ভাল না বাসে, তবে সে বিচ্ছিন্ন হউক; মারাণ আথা, অর্থাৎ প্রভু এসেছেন।"

মূল পাঠের বিশুদ্ধতা যাই হোক না কেন, সর্বশেষ অনুবাদক এখানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু ব্যাখ্যা (অর্থাৎ প্রভু এসেছেন) সংযোজন করেছেন।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে, কিভাবে বাইবেলের অনুবাদকগণ নিজেদের পক্ষ থেকে ইচ্ছামত বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাইবেলের পাঠের মধ্যে সংযোজন করেন। এভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান নামসমূহের অনুবাদ করা, নামের পরিবর্তে অর্থের ভিত্তিতে অন্য শব্দ ব্যবহার করা এবং তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংযোজন করা অতীত-বর্তমান সকল যুগের বাইবেল লেখক ও অনুবাদকগণের চিরাচতি স্বভাবজাত রীতি। কাজেই তাঁদের পক্ষে মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, তাঁরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে তাঁর কোন নাম অনুবাদ করে নামের পরিবর্তে অর্থ লিখবেন বা এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ লিখবেন বা ব্যাখ্যা হিসেবে বা ব্যাখ্যা ছাড়াই কোন কথা সংযোগ করবেন। আর এরূপ পরিবর্তনের ফলে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং বাহ্যত এগুলির সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর সম্পৃক্ততা অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছে।

নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ে প্রযোজ্য হতে পারে এমন সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে এভাবে পরিবর্তন করার বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল খুবই বেশি। তাঁদের অভ্যন্তরীণ দল উপদলে মতামতের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার যে আগ্রহ তাঁদের ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল মুসলিমদের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার। আর পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছেন যে, তাঁদের অভ্যন্তরীণ দল-উপদলের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত বা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁরা কখনোই কোন দুর্বলতা বা অবসাদ প্রদর্শন করেন নি। পাঠক দেখেছেন যে, এ বিষয়ে হর্ন বলেছেন : এ কথা সুনিশ্চিত যে, মূলধারার অনেক গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলিকে সমর্থন করতেন ও বিশুদ্ধ পাঠের চেয়ে বিকৃত পাঠকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। কারণ এগুলি দিয়ে কোন সঠিক বিষয়কে সমর্থন করা হতো অথবা সে বিষয়ক কোন আপত্তিকে খণ্ডন করা হতো।

যেমন, লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৪৩ আয়াতটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেওয়া হয়।[৪৪] কারণ কোন কোন ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী খৃস্টান মনে করতেন যে, 'স্বর্গের দূত এসে প্রভু যীশুকে সবল করবে' এই কথাটি যীশু খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে সাংঘর্ষিক।

মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে 'তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়[৪৫] এবং ২৫ আয়াত থেকে 'ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন (her firstborn son)' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়।[৪৬] এইরূপ বিকৃতির উদ্দেশ্য হলো, যেন মরিয়মের চিরস্থায়ী কুমারিত্বের কোন সন্দেহ না আসে।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের ১৫ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লিখিত 'সেই বারো জনকে' কথাটি পরিবর্তন করে 'এগার জন' লেখা হয়। এই বিকৃতির উদ্দেশ্য ছিল যেন পৌল মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত না হয়। কারণ ১২ শিষ্যের একজন বিশ্বাসঘাতক ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscar'i-ot) ইতোপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ আয়াতের কিছু শব্দ ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তী যুগেও কোন কোন ধর্মগুরু এই কথাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ফেলে দেওয়াকে সমর্থন করেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এই কথাগুলি আরিয়ান সম্প্রদায় (Arians)[৪৭]-এর মত সমর্থন করে।[৪৮]

---

৪৪. লূকের ২২ অধ্যায়ের ৩৯-৪৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুহস্তে সমর্পিত হওয়ার পূর্বরাতে যীশু শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে নিজের শিষ্যদেরকে প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং নিজে মর্মভেদী দুঃখে কাতর হয়ে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তিনি এত বেশি ব্যথিত ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর 'ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোটার মত মাটিতে পড়ছিল।' এ সময়ে একজন স্বর্গদূত বা ফিরিশতা এসে তাঁকে শক্তি যোগান। ৪২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল করিলেন।"

৪৫. মথি ১/১৮ : "তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা থেকে।"

৪৬. মথি ১/২৫ : "আর যে পর্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না..."।

৪৭. ৩য়-৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়ুসের (Arius) অনুসারিগণ, যারা যীশু খৃস্টকে ঈশ্বরের সত্তার অংশ নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট 'পুত্র' বলে বিশ্বাস করতেন। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খৃস্টান বলে পরিচিত।

৪৮. পুনরুত্থান বা কেয়ামত সম্পর্কে এই আয়াতে যীশু বলেন : "কিন্তু সেই দিনে বা সেই দণ্ডের কথা কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, খৃস্টের সত্ত্বা ঈশ্বরের সত্ত্বা থেকে পৃথক, এজন্য ঈশ্বর যা জানেন তা খৃস্ট জানেন না। খৃস্ট স্বর্গস্থ দূতগণের মতই পৃথক সৃষ্টিমাত্র, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ নন। আরিয়ান সম্প্রদায় এই মতই পোষণ করতেন।

লূকলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতের মধ্যে কিছু কথা বৃদ্ধি করা হয়। সিরীয় অনুবাদ, ফারসী অনুবাদ, ইথিওপীয় অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক অনুবাদে এই শব্দগুলি বাড়ানো হয়। অনেক ধর্মগুরুর উদ্ধৃতিতেও এই সংযোজনটুকু বিদ্যমান। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল ইউটিকিয়ান (Eutychian) সম্প্রদায়ের[৪৯] বিরোধিতা করা, কারণ তাঁরা যীশুর মধ্যে দুইটি সত্ত্বা বিদ্যমান বলে মানতেন না।[৫০]

পণ্ডিত হর্নের বক্তব্য এখানেই শেষ।

এ যদি হয় ধার্মিক, সৎ ও বিশ্বস্ত খৃস্টানগণের কর্ম, তাহলে অধার্মিক খৃস্টানগণের বিষয়ে পাঠকের ধারণা কী হতে পারে ? বস্তুত পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থ বিকৃতি সাধন করা ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সকল খৃস্টানের অতি পরিচিত অভ্যাস।

---

৪৯. ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর খৃস্টান সাধু ইউটিশাস (Eutyches 375-454)-এর অনুসারিগণ। এরা 'একসত্তাবাদী' (Monophysites)। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের মধ্যে একটিমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর মধ্যে কোন মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। বিস্তারিত দেখুন Encyclopaedia Britannica, articles: Eutychian; Eutyches; Monophysite.

৫০. প্রচলিত বাইবেলেও যীশু নিজেকে সরাসরি ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। কোথাও তিনি বলেন নি যে, আমি ঈশ্বরের সত্তার অংশ। তবে তিনি বলেছেন : "যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে" (মথি ১০/৪০)। এইরূপ কিছু কথায় তিনি তাঁকে মানলেই ঈশ্বরকে মানা হবে বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল কথার ভিত্তিতে পৌল-পন্থী খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্ট ঈশ্বরের সত্তার অংশ এবং তিনিই ঈশ্বর (God Incarnate)। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রচলিত বাইবেলেই খৃস্ট বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভাল বলবে না, আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বরই ভাল, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর... ইত্যাদি। তিনি অসময়ে ডুমুর গাছে ফল খুঁজেছেন, কিন্তু জানতে পারেন নি যে, গাছে ফল নেই। তিনি শত্রুদের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন ...। ইত্যাদি অগণিত বিষয় প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং একজন মানুষ ছিলেন। এ সকল সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাশ কাটানোর জন্য ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ 'দ্বৈত-প্রকৃতির' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁরা বলেন, যীশুর মধ্যে দুইটি পৃথক সত্ত্বা ও প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল : মানবীয় ও ঐশ্বরিক। এর ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছে অনেক মতভেদ ও গোঁজামিল। কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, তাঁর একটি মাত্র সত্ত্বাই ছিল, তা হলো ঐশ্বরিক সত্ত্বা। লূকের এই আয়াতের মধ্যে দুইটি শব্দ বৃদ্ধি করে তাঁর মানবীয় সত্ত্বা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। লূকের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" এই আয়াতের মধ্যে 'তোমার থেকে' শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে (KJV) শব্দ দুইটি রয়েছে : that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God।

ইমাম (মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ) কুরতুবী (১২৭৩ খৃ) ও মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী অন্যান্য লেখক খৃস্টধর্ম বিষয়ক তাঁদের পুস্তকাদিতে বাইবেল থেকে যে সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সাথে বর্তমান যুগে প্রচলিত অনুবাদগুলির অনেক স্থানে মিল পাওয়া যায় না। বাহ্যত এর কারণ এইরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি। এ সকল মুসলিম আলিম তাঁদের যুগে প্রচলিত আরবী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। পরবর্তী যুগে অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। অনুবাদের পার্থক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। তবে পরিবর্তনের বিষয়টিই সংশোধনের কারণ। কারণ আমরা দেখছি যে, খৃস্টান ধর্মগুরুগণের লেখনি ও অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের এই অভ্যাস এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের সমসাময়িক একটি উদাহরণ দেখুন। পাদরি মি. ফান্ডার রচিত 'মীযানুল হক' গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ রয়েছে। (১৮৩৩ খৃস্টাব্দে) বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মূহানী (১৭৮৭-১৮৭০ খৃ) 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করেন। (১৮৪৩ খৃস্টাব্দে) 'আল-ইসতিফসার' প্রকাশিত হওয়ার পরে মি. ফান্ডার নিজের বইটি সংশোধন করেন। সংশোধনের পর (১৮৪৯ সালে) তিনি পুস্তকটি নতুন করে প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি 'হাল্লুল ইশকাল' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের প্রতিবাদে।

মীযানুল হক গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য খণ্ডন করে আমি 'মুআদ্দিলু ইওয়িজাযিল মীযান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। এই পুস্তকে আমি মীযানুল হক গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যগুলিও উল্লেখ করি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে[৫১] আমার এই পুস্তকটি ভারতে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। আমার প্রিয় বন্ধু (শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মূহানী) মি. ফানডারের 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডন করে 'আল-ইসতিবশার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি (১৮৪৯ খৃস্টাব্দে) প্রকাশিত হয় এবং ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই পুস্তকটি প্রকাশের সময়ে এবং পরবর্তীকালে যখন পুস্তকটি ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তখন মীযানুল হকের প্রণেতা ড. ফানডার ভারতেই ছিলেন। এই পুস্তকটি প্রকাশের পরেও তিনি ভারতে অবস্থান করেন, কিন্তু এর প্রতিবাদে বা এর বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি কিছুই লিখেন নি।

---

৫১. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কারণে।

কোন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, মি. ফানডার তাঁর 'মীযানুল হক' গ্রন্থটি তৃতীয়বারে মত সংশোধন ও পরিমার্জন করে তুর্কী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই সংস্করণে তিনি যে সকল স্থানে প্রয়োজন মনে করেছেন সে সকল স্থানে পরিবর্তন ও সংশোধন করেছেন। যেমন প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে এবং অন্যান্য স্থানে পরিবর্তন করেছেন।

এখন যদি কোন গবেষক পাঠক 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু মীযানুল হক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তাঁর হস্তগত না হয়, বরং পুস্তকটির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্ককরণ তার হাতে থাকে এবং তিনি 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থে মীযানুল হক গ্রন্থের যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চান, তবে কিছু কিছু স্থানে তিনি অমিল দেখবেন।

অনুরূপভাবে যদি কেউ আমার লেখা 'মুআদ্দিল ইওয়িজাযিল মীযান' পুস্তকটি পাঠ করেন, কিন্তু মীযানুল হক প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ তার হস্তগত না হয়, বরং তৃতীয় তুর্কী সংস্করণটি তার হাতে থাকে, এবং মুআদ্দিল গ্রন্থে মীযানুল হক গ্রন্থের যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চান, তবে তিনি কোন কোন স্থানে গরমিল দেখবেন। তিনি যদি মীযানুল হকের লেখকের এই পরিবর্তন, পরিমার্জনের বিষয়ে অবগত না থাকেন তবে হয়ত চিন্তা করবেন, এ সকল স্থানে উদ্ধৃতি প্রদানকারী উদ্ধৃতি প্রদানে ভুল করেছেন। অর্থাৎ আল-ইসতিফসার বা মু'আদ্দিল গ্রন্থের লেখক মীযানুল হক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদানে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেন নি বলে পাঠকের কাছে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার উল্টো। প্রতিবাদ প্রকাশের পরে মি. ফানডার তাঁর নিজের পুস্তকে কোনরূপ স্বীকৃতি বা ইঙ্গিত ব্যতিরেকেই পরিবর্তন সাধন করেন। ফলে এই অমিল দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদকারী ও উদ্ধৃতি প্রদানকারী বিশ্বস্ততার সাথেই উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সংশোধন, পরিবর্তন বা বিকৃতি খৃস্টান পণ্ডিতগণের চিরাচরিত অভ্যাস ও রীতি।

অষ্টম বিষয় : সাধু পৌলের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য

ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ পৌলকে খৃস্টের দ্বাদশ প্রেরিতের পর্যায়ভুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের নিকট তিনি অগ্রহণযোগ্য। আমরা তাকে বিশ্বাসী বা ধার্মিক বলে বিশ্বাস করি না বরং আমরা তাকে ভণ্ড, দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী প্রতারক বলে মনে করি। চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, যীশুখৃস্টের স্বর্গারোহণের পরে অনেক দুষ্ট অধার্মিক ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত গুরুর আবির্ভাব হয়। পৌল ছিলেন এ

সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত গুরুদের অন্যতম।৫২ তিনিই খৃস্টধর্ম বিকৃত ও বিনষ্ট করেন। তিনি তার অনুসারীদের জন্য সকল প্রকার নিষিদ্ধ ও অশুচি দ্রব্য বৈধ করে দেন। প্রথমে তিনি প্রকাশ্যে খৃস্টের অনুসারীদেরকে কষ্ট দিতেন (মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতেন এবং ঘরে ঘরে প্রবেশ করে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে ধরে এনে কারাগারে সমর্পণ করতেন)৫৩। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, এভাবে প্রকাশ্যে অত্যাচার করে খৃস্টধর্মের বিশেষ ক্ষতি করা যাচ্ছে না। এজন্য তিনি প্রতারণামূলকভাবে খৃস্টধর্মে প্রবেশ করেন। তিনি খৃস্টের আজ্ঞালাভের কথা প্রচার করেন এবং বাহ্যিক বৈরাগ্য ও সাধুতা অবলম্বন করেন। এই বাহ্যিক সাধুতার আড়ালে তিনি খৃস্টের সকল শিক্ষা বিকৃত করে খৃস্টধর্মের বিনাশ সাধন করেন। সাধারণ খৃস্টানগণ তার বাহ্যিক সাধুতায় ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে তার কথা বিশ্বাস করে। এছাড়া তিনি যেহেতু সকল কর্ম ও বিধিবিধান থেকে তাদেরকে বিমুক্ত করে দেন, এজন্য সকলেই খুশিমনে তার কথা মেনে নেয়। যেমন দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকে মন্টানাস (Montanus) নামক এক খৃস্টান সাধু বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ফারাক্লীত (Paraclete)। তাঁর বাহ্যিক বৈরাগ্য ও সাধুতার কারণে অনেক খৃস্টান তাঁর অনুগামী হয়ে যায়।৫৪

---

৫২. যীশু নিজে ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ভাববাদিগণ ভাক্ত বা ভণ্ড ভাববাদীর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যীশু বলেছেন : "কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।" মথি ২৪/২৪। মথির সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে তিনি বলেন : ১৫ ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া। ..২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই ? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই ? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই ? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টতই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।" এ বিষয়ে যীশুর আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে, যেগুলি পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পৌল একজন ভাক্ত ভাববাদী ছিলেন। বিশেষত বাইবেলে ভণ্ডদের দুটি চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে : (১) ভণ্ড ভাববাদী নিহত হবে বা তার অপমৃত্যু হবে এবং (২) তার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে না। এ দুটি চিহ্নই পৌলের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

৫৩. প্রেরিত ৮/১-৩।

৫৪. দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু টার্টুলিয়ান (Tertullian) পর্যন্ত মন্টানাসের অনুসারী হয়ে যান।

অতীত ও বর্তমান সকল যুগেই মুসলিম আলিম ও গবেষকগণ পৌলের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ইমাম (মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ) কুরতুবী তাঁর পুস্তকে কতিপয় পাদরির প্রশ্নের উত্তরে সিয়াম বা উপবাস বিষয়ক আলোচনায় পৌলের বিষয়ে বলেন : "আমাদের বক্তব্য যে, এই লোকটিই (পৌল) আপনাদের ধর্ম বিনষ্ট করেছে। সে আপনারে বুদ্ধি ও বিবেক অন্ধ করে দিয়েছে। এই ব্যক্তিই যীশু খৃস্টের সত্য ধর্মকে বিকৃত করেছে। ফলে খৃস্টের বিশুদ্ধ ধর্ম আপনাদের নিকট পৌঁছায় নি। আপনারা তার কথা শুনেন নি এবং তার কোন চিহ্নও দেখতে পান নি। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই পৌলই আপনাদেরকে কিবলা থেকে সরিয়ে দেয় এবং মোশির ব্যবস্থা ও আসমানী কিতাবের নির্দেশ অনুসারে খৃস্টের ধর্মে যা কিছু অবৈধ ও অশুচি ছিল সবই পৌল আপনাদের জন্য বৈধ করে দেয়। আর এজন্যই আপনাদের মধ্যে পৌলের মতামত ও নির্দেশাবলি বেশি প্রচলিত এবং আপনারা এগুলিই বেশি চর্চা করেন।"

১০ম হিজরী শতকের, ১৬শ খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আবুল বাকা সালিহ ইবনুল হুসায়ন জা'ফারী 'তাখযীলু মান হার্‌রাফাল ইনজীল' (ইনজীল বিকৃতকারীকে লজ্জা প্রদান) নামক পুস্তকের নবম অধ্যায়ে এই পৌল কিভাবে সাধারণ খৃস্টানগণকে প্রবঞ্চিত করেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : "এই পৌল তার সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজির মাধ্যমে খৃস্টানদের থেকে তাদের ধর্ম ছিনিয়ে নেন। কারণ, তিনি দেখতে পান যে, যীশুর নামে যা কিছু বলা হয় তা সবই নির্বিচারে গ্রহণ করার পূর্ণ মানসিকতা খৃস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান। এই অপবিত্র ব্যক্তি তোরাহ-এর সকল ব্যবস্থা ও বিধিবিধান মুছে দেন।"

অন্যান্য মুসলিম আলিম ও গবেষকও অনুরূপ কথা বলেছেন। এজন্য পৌলের বক্তব্য আমাদের নিকট বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। বাইবেলের নতুন নিয়মের মধ্যে পৌলের যে পত্রগুলি রয়েছে সবই অগ্রহণযোগ্য। ঐশ্বরিক প্রেরণা বা যীশু খৃস্টের ধর্মের সাথে এগুলির কোন সম্পর্ক আমরা স্বীকার করি না। একটি সরিষার দানা দিয়েও আমরা তার বক্তব্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক নই। এজন্য আমি এই অনুচ্ছেদে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনার মধ্যে পৌলের কোন বক্তব্য আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করব না। অনুরূপভাবে আমার বক্তব্যের বিপক্ষে তার বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরের ৮টি বিষয় অনুধাবন করার পরে আমরা এখন মূল বিষয়, অর্থাৎ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক সুসমাচার ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আলোচনা করব। বস্তুত বাইবেলের পুস্তকগুলিতে বহুবিধ বিকৃতি সাধিত হওয়ার পরেও বাইবেলের পুস্তকসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক অনেক সুসংবাদ ও

ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদীর বিষয়ে যে সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন তা অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতময় হয়। ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে যীশুর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন, যীশুর ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগযোগ্যতা বা যীশুর সাথে সেগুলির সংশ্লিষ্টতা খুবই অস্পষ্ট ও দুর্বল। এই দুটি বিষয় সামনে রেখে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পর্যালোচনা করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো।

আমি এ অনুচ্ছেদে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুদের নিকট স্বীকৃত (canonical) পুস্তকাদি থেকে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ১৮টি সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৭ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। ১৮ আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। ১৯ আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। ২০ কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।[৫৫] ২১ আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব ? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"

ইহূদীগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদটি যিহোশূয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, কথাটি যীশুর[৫৬] বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয় দাবিই ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ কথাগুলি মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন বিষয়ক সুসংবাদ ছাড়া কিছুই নয়। নিম্নোক্ত দশটি বিষয় তা প্রমাণ করে :

প্রথম বিষয় : তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, যীশুর সমসাময়িক ইহূদীগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীর

৫৫. গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠে বলা হয়েছে : "তাকে নিহত হতে হবে।"

৫৬. একই ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই আবার ঈশ্বরের ভাববাদী।

আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত এই ভাববাদী মসীহ বা খৃস্ট নন, বরং অন্য একজন হবেন। কাজেই এখানে যে ভাববাদীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি কখনোই যিহোশূয় হতে পারেন না বা যীশুও হতে পারেন না।[৫৭]

দ্বিতীয় বিষয় : এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, "তোমার সদৃশ (like unto thee)"। যিহোশূয় ও যীশু কেউই মোশির সদৃশ বা মোশির তুল্য হতে পারেন না।

কারণ প্রথমত, যিহোশূয় ও যীশু উভয়েই ইস্রায়েল সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কেউ মোশির তুল্য বা সদৃশ হতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ১০ আয়াত তা প্রমাণ করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে " "মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই (there arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।"

দ্বিতীয়ত, মোশি ও যিহোশূয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। কারণ মোশি ছিলেন ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও বিধিনিষেধময় নতুন ব্যবস্থাপ্রাপ্ত একজন ভাববাদী। পক্ষান্তরে যিহোশূয় এরূপ কিছুই লাভ করেন নি বরং তিনি মোশির ব্যবস্থার অনুসারী একজন ভাববাদী ছিলেন।

অনুরূপভাবে মোশি ও যীশুর মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। কারণ খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ছিলেন ঈশ্বর ও প্রভু আর মোশি ছিলেন তাঁর দাস মাত্র।

খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু সৃষ্টিজগতের মুক্তির জন্য নিজে শাপগ্রস্ত বা অভিশপ্ত (Cursed) হয়েছেন। গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে পৌল তা স্পষ্টতই লিখেছেন।[৫৮] পক্ষান্তরে মোশি তাঁর জাতির মুক্তির জন্য শাপগ্রস্ত হন নি।

খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেন। ত্রিত্ববাদীদের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক পুস্তকে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মোশি নরকে গমন করেন নি।

খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তাঁর অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য। মোশি তাঁর অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য ক্রুশে আরোহণ করেন নি।

---

৫৭. যীশুকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিশ্রুত ভাববাদী বলে দাবি করলে খৃস্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি 'খৃস্ট' ছিলেন না; কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (খৃস্ট) ও প্রতিশ্রুত ভাববাদী দুই ব্যক্তি হবেন, এক ব্যক্তি নন। আর এখানে যিহোশূয়কে বুঝানো হলে তো আর ইহুদীগণ হাজার হাজার বছর ধরে 'সেই ভাববাদী'-র আগমনের অপেক্ষায় থাকত না।

৫৮. গালাতীয় ৩/১৩।

এছাড়া মোশির ব্যবস্থায় শাস্তি, দণ্ড, গোসলের বিধান, পবিত্রতা ও শুচিতার বিধান, শুচি ও অশুচি খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদির বিধান রয়েছে। প্রচলিত নতুন নিয়ম থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর ব্যবস্থায় এ সব কিছুই নেই।

মোশি তাঁর জাতির মানুষের কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাময় নেতা ছিলেন, সকলেই যাঁর আনুগত্য করত এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ কার্যকর করা হতো। যীশু এরূপ ছিলেন না।

তৃতীয় বিষয় : এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : "উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে (from among their brethren)।" আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ বংশ সকলেই তখন মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতো যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কোন বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, তবে এখানে ঈশ্বর "উহাদের মধ্য হইতে" বলতেন, "উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বলতেন না। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলীদের দ্বাদশ বংশের কোন বংশের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বরং দ্বাদশ বংশের সকলের 'ভ্রাতৃগণের' মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটির প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থ এরূপই। আর এই অর্থে এই শব্দটি বাইবেলের অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সদাপ্রভু ঈশ্বর হাগার (Hagar)-কে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতিতে 'ভ্রাতৃগণ (brethren)' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ অনুসারে বলা হয়েছে : "সে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সকলের সম্মুখে বসতি স্থাপন করিবে।" ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে : "তাঁহার সকল ভ্রাতার উপস্থিতিতে সে বসবাস করিবে (he shall dwell in the presence of all his brethren)।"

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতেও ইসমাঈলের বিষয়ে 'ভ্রাতৃগণ' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "তাঁহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) প্রান্তে তিনি বসবাস করিলেন।"

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে : "তাঁহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) উপস্থিতিতে তিনি বসতি স্থাপন করিলেন।"

এখানে ভ্রাতৃগণ বলতে এষৌ-এর বংশধর, ইসহাকের বংশধর ও অবরাহামের অন্যান্য পুত্রের বংশধরদের বুঝানো হয়েছে।

গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে মোশি কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল কহিতেছে, আমাদের যে সমস্ত কষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।"

দ্বিতীয় বিবরণের ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ... ৪ আর তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর-নিবাসী তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ এষৌ-সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, আর তাহারা তোমাদের হইতে ভীত হইবে... ৮ পরে আমরা ... সেয়ীর-নিবাসী আমাদের ভ্রাতৃগণ এষৌ সন্তানদের সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম।"

এভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণ বলতে এষৌ-সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণ বলতে ইশ্মায়েল সন্তানগণ, এষৌ-সন্তানগণ বা অবরাহাম ও ইসহাকের অন্যান্য সন্তানদের বংশধরকে বুঝানো হয়। এ হলো 'ভ্রাতৃগণ' শব্দের আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থ। এতে সন্দেহ নেই যে, রূপক অর্থে 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে বাইবেলে কোথাও কোথাও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যকার' কাউকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কোন স্থানে কোন শব্দ মূল ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব হলেই শুধু সেখানে তার রূপক অর্থ গ্রহণ করা যায়। এখানে প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা নেই। আর যিহোশূয় ও যীশু প্রকৃত অর্থে ইস্রায়েল-সন্তানদের ভ্রাতা নন, বরং তাদের অন্তর্ভুক্ত; কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থ বিষয় : উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, 'আমি উৎপন্ন করিব (আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে : আগামীতে উৎপন্ন করিব)'। আর এ কথা বলার সময় যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানগণের সাথে মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং মোশির স্থলাভিষিক্ত ভাববাদী তিনি। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে?

পঞ্চম বিষয় : এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : "তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব।" এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, এই ভাববাদীর উপর পৃথক 'আসমানী কিতাব' অবতীর্ণ হবে এবং নিরক্ষর হওয়ার কারণে তিনি তা মুখস্থ রেখে মুখে পাঠ করবেন। এই দুটি বিষয়ের কোনটিই যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ষষ্ঠ বিষয় : এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : "আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।" এই ভাববাদীর বৈশিষ্ট্য বুঝানোর জন্য এ কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এই প্রতিশোধ বিশেষ ধরনের শাস্তি যা সাধারণ ভাববাদিগণের কথা অমান্য করলে প্রযোজ্য নয়। কাজেই এই প্রতিশোধ বলতে শুধু পারলৌকিক জাহান্নামের শাস্তি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শাস্তি হতে পারে না। কারণ যে কোন ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত না করলেই এরূপ প্রতিশোধ বা শাস্তি আল্লাহ্ প্রদান করেন। এভাবে বুঝা যায় যে, এখানে প্রতিশোধ বলতে 'ব্যবস্থা' নির্ধারিত প্রতিশোধ

বুঝানো হয়েছে। এই ভাববাদী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হবেন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাকে শাস্তি প্রদানের। এ বিষয়টির যীশুর ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়; কারণ তাঁর ব্যবস্থায় তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে বা ব্যবস্থা পালন না করলে কোন শাস্তি, দণ্ড বা যুদ্ধের বিধান নেই।

সপ্তম বিষয় : প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৩ অধ্যায়ে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে[৫৯] বলা হয়েছে : "১৯ অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, ২০ যেন এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। ২১ যাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাঁহারা পূরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন। ২২ মোশি ত বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; ২৩ আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"

এই বক্তব্য থেকে, বিশেষত ১৮১৬, ১৮২৮, ১৮৪১ ও ১৮৪২ সালে মুদ্রিত ফার্সী অনুবাদের ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী খৃস্ট নন, বরং অন্য একজন এবং এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আবির্ভাব পর্যন্তই স্বর্গ খৃস্টকে গ্রহণ করবে। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর বিষয়ে বলা হয়েছে। যে কোন খৃস্টান যদি ভিত্তিহীন গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে পিতরের বক্তব্য ভালভাবে চিন্তা করেন তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে, পিতরের এই বক্তব্যই প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের উক্ত দাবি খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

উপরের ৭টি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য এবং তাঁর অবস্থার সাথে পরিপূর্ণরূপে মিলে। কারণ,

প্রথমত, তিনি খৃস্ট নন।

দ্বিতীয়ত, নিম্নের বহু বিষয় তিনি মোশির সদৃশ ও তুল্য :

(১) মোশির মত তিনিও আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল (দাস ও ভাববাদী)।

(২) পিতা ও মাতার সন্তান।

---

৫৯. এখানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকারের দেওয়া আরবী পাঠের অর্থ প্রায় কাছাকাছি।

(৩) বিবাহিত ও সন্তান-সন্ততির পিতা।

(৪) তাঁর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিবিধান রয়েছে।

(৫) তাঁকে জিহাদ বা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৬) তাঁর ব্যবস্থায় প্রার্থনা বা ইবাদতের সময় পবিত্রতা অর্জনের বিধান রয়েছে।

(৭) অপবিত্রতা, মহিলাদের মাসিক বা প্রসবোত্তর অপবিত্রতা থেকে গোসল করার নির্দেশ রয়েছে।

(৮) মল-মূত্র থেকে পোশাক পবিত্র রাখার নির্দেশ রয়েছে।

(৯) মৃত প্রাণী, জবাই না করা প্রাণী ও প্রতিমার জন্য উৎসর্গীত প্রাণী অবৈধ করা হয়েছে।

(১০) তাঁর ব্যবস্থায় দৈহিক ইবাদত ও অনুশীলনের বিধান রয়েছে।

(১১) ব্যভিচারে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।

(১২) অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি ও দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১৩) তিনি এগুলি প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন।

(১৪) সুদ নিষিদ্ধ করেছেন।

(১৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করলে তার আপত্তি করতে আদিষ্ট হয়েছেন।

(১৬) বিশুদ্ধ একত্ববাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১৭) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল (ঈশ্বরের ভাববাদী ও ঈশ্বরের দাস) বলতে। তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বর (নাঊযু বিল্লাহ্!) বলতে নির্দেশ দেন নি।

(১৮) তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

(১৯) মোশির ন্যায় তিনি স্বাভাবিকভাবে কবরস্থ হয়েছেন।

(২০) তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য শাপগ্রস্ত হন নি।

(২১) তিনিও মোশির মত নিজ জাতির মধ্যে সম্মানিত নেতা ছিলেন, যাঁকে সকলেই মান্য করেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করেছেন।

তাঁদের উভয়ের জীবন ও ধর্ম-ব্যবস্থা (শরীয়ত) সম্পর্কে চিন্তা ও তুলনা করলে এরূপ আরো অনেক সাদৃশ্য ও মিল আমরা দেখতে পাই। এজন্যই মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেরূপ রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।"[৬০]

---

৬০. সূরা মুয্যাম্মিল, ১৫ আয়াত।

তৃতীয়ত, তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কারণ তিনি ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন।

চতুর্থত, তাঁর উপরে পৃথক 'আসমানী গ্রন্থ' বা আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি আল্লাহ্র বাণী পাঠ করতেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "সে মনগড়া কথা বলে না। (সে যা বলে) তা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৬১]

পঞ্চমত, তাঁকে জিহাদের বা যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায় কর্ণপাত না করার কারণে কুরাইশ বংশের প্রতাপশালী নেতৃবৃন্দ, পারস্যের সম্রাটবৃন্দ, রোমান সম্রাটবৃন্দ ও অন্যান্যদের থেকে আল্লাহ্ প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ষষ্ঠত, যীশুখৃস্টের পুনরাগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে।

সপ্তমত, তাঁর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গ খৃস্টকে গ্রহণ করেছে। এরপর তিনি আগমন করে সকল বিষয় পুনঃস্থাপন করেছেন। তিনি শিরক বা বহু-ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ ও মূর্তিপূজা অপসারণ করেছেন। বর্তমান যুগে ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে যেন কেউ সন্দিহান না হন। কারণ মহাসত্যবাদী সত্যঘোষিত মুহাম্মাদ (সা) আমাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ না রেখে বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে জানিয়েছেন যে, ইনশাআল্লাহ, এই সময় রাষ্ট্রপ্রধানের[৬২] আবির্ভাবের পূর্বে ইহূদী-খৃস্টানগণের সংখ্যা-শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ইনশা আল্লাহ, এই সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং সত্য প্রকাশিত হবে। এরপর আল্লাহ্র দীনই একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করবে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দীনের সাহায্যকারী ও সেবক বানিয়ে দিন। আমীন।

অষ্টম বিষয় : উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর যে কথা বলেন নি, সে কথা যদি কোন ভাববাদী ঈশ্বরের নামে বলে তবে তাকে নিহত হতে হবে। মুহাম্মাদ (সা) যদি সত্য ভাববাদী না হতেন তবে তিনি অবশ্যই নিহত হতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ এ বিষয়ে বলেছেন : "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।"[৬৩]

---

৬১. সূরা নাজ্‌ম, ৩-৪ আয়াত।

৬২. মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে কিয়ামতের পূর্বে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের এক পর্যায়ে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের আবির্ভাব হবে, যিনি জুলুম অত্যাচার দূরীভূত করে বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এ বিষয়ে কোন কথা কুরআন কারীমে নেই। বুখারী ও মুসলিম সংকলিত কোন হাদীসেও ইমাম মাহদী বিষয়ক কিছু বর্ণিত হয় নি। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

৬৩. সূরা হাক্কা, ৪৪-৪৬ আয়াত।

কিন্তু তিনি নিহত হন নি বা বিনষ্ট হন নি বরং তাঁর বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।"[৬৪] আর আল্লাহ্ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তিনি সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছেন।[৬৫] পক্ষান্তরে খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু নিহত হয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এজন্য যদি কেউ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর বিষয়ে কথিত, তবে তাতে প্রমাণিত হবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ভাববাদী ছিলেন বা ঈশ্বরের নামে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ইহূদীরা তাঁর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে। না'উযু বিল্লাহ্!

নবম বিষয় : উপরের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে মনগড়া কিছু বলেন, তবে তিনি তা কখনো সিদ্ধ হতে দেন না, বরং তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা) অনেক বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন।

দশম বিষয় : ইহূদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, তোরাহ্-এ যে ভাববাদী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ (সা)-ই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। তবে তাদের কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং কেউ অবিশ্বাসের মধ্যেই থেকেছেন। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যীশুই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন নি বরং 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১৮ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।[৬৬]

মুখায়রিক নামক একজন ইহূদী ধর্মগুরু পণ্ডিত মদীনায় বাস করতেন। তিনি অনেক অর্থ-সম্পদ ও খেজুরের বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার

---

৬৪. সূরা মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

৬৫. এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহের অন্যতম। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, যীশু তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থাতেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত না হলে কেউ এরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। আর আমরা দেখছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি।

৬৬. যোহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।

আলোকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বা নবী বলে চিনতে পারেন। কিন্তু নিজ ধর্মের মায়া তাকে আটকে রাখে। তিনি নিজের ধর্মের উপর অটল থাকেন। অবশেষে (৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ, মোতাবেক ৩০/৩/৬২৫ হি) উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। দিনটি ছিল শনিবার। তিনি বলেন, হে ইহূদীগণ! আল্লাহ্র শপথ, তোমরা তো জান যে, এই যুদ্ধে মুহাম্মাদ (সা)-কে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব। তারা বলে, কিন্তু আজ তো শনিবার। তিনি বলেন, কোন বিশ্রাম নেই। অতঃপর তিনি তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁর আত্মীয়দেরকে বলে যান যে, যদি আমি এই যুদ্ধে নিহত হই, তবে আমার সম্পদ মুহাম্মাদ (সা) লাভ করবেন। তিনি এই সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে যেভাবে চান ব্যবহার করবেন। তিনি উহুদের কাছে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মুখায়রিক শ্রেষ্ঠ ইহূদী। তিনি তাঁর সম্পদ গ্রহণ করেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সকল জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ ছিল তার অধিকাংশই ছিল মুখায়রিকের সম্পদ।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহূদীদের মিদরাস (Midsrash) গৃহে[৬৭] গমন করে বলেন, আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। তারা বলে, আবদুল্লাহ ইবনু সোরিয়াই এরূপ ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিয়ে একত্রে বসে বলেন, আপনার ধর্মের কথা চিন্তা করে এবং আপনাদেরকে আল্লাহ্ যে মান্ন ও সালওয়া প্রদান করেছেন এবং প্রান্তরে ছায়া দিয়েছেন সেই নিয়ামতের কথা চিন্তা করে বলুন, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? আবদুল্লাহ্ ইবনু সোরিয়া বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা জানি। আমি যা বুঝেছি আমার সম্প্রদায়ের মানুষেরাও তা বুঝেন। আপনার বর্ণনা ও গুণাবলি তোরাহ-এর মধ্যে ব্যাখ্যাত রয়েছে। কিন্তু এরা আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তাহলে আপনি কেন সত্য প্রকাশ করছেন না ? আবদুল্লাহ্ ইবনু সোরিয়া বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধিতা করতে চাই না। আশা করি এক সময়ে তারা আপনাকে স্বীকার করে নেবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব।"

সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে কুবায় অবস্থান করেন, তখন আমার পিতা (মদীনার প্রসিদ্ধ ইহূদী নেতা) হুয়াই ইবনু আখতাব এবং আমার চাচা আবূ ইয়াসির ইবনু আখতাব অতি-প্রত্যুষে তথায় গমন

৬৭. তোরাহ ও তালমূদ বিষয়ক গবেষণা ও পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত স্থান।

করেন। সূর্যাস্তের পরে তাঁরা ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে প্রবেশ করেন। আমি আনন্দিত চিত্তে তাঁদের কাছে দৌড়ে যাই। তাঁরা এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁদের কেউই আমার দিকে কোন দৃষ্টিপাত করলেন না। আমি শুনলাম যে, আমার চাচা আবূ ইয়াসির আমার পিতাকে বলছেন, ইনিই কি তিনি ? (অর্থাৎ ইনিই কি তোরাহ-এর প্রতিশ্রুত ভাববাদী ?) আমার পিতা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, ইনিই তিনি। আমার চাচা বললেন, আপনি কি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিশ্চিতরূপে চিনতে পেরেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার চাচা বললেন, তাহলে তাঁর বিষয়ে আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন ? আমার পিতা উত্তর দেন : আল্লাহ্‌র শপথ, যতদিন জীবিত থাকব তাঁর বিরোধিতা করে যাব।

উপরের দশটি বিষয় প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনেরই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী।

এখানে কেউ বলতে পারেন যে, 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে শুধু ইসমাঈল সন্তানগণকেই বুঝানো হবে এমন তো নয় বরং ইসমাঈল সন্তানগণ ছাড়াও এষৌ[৬৮]-এর বংশধর এবং অব্রাহামের অন্য স্ত্রী কটূরার পুত্রদের বংশধরগণও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য (কাজেই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী তো এদের মধ্যে থেকেও আসতে পারেন)।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, হ্যাঁ, তারাও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য। তবে তাদের মধ্য থেকে এ সকল বৈশিষ্ট্যসহ কোন ভাববাদী আবির্ভূত হননি। এছাড়া ইশ্মায়েলের বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ যেভাবে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের বংশধরদেরকে মহা মর্যাদা দানের বিষয়ে হাগার (Hagar)[৬৯] এবং অবরাহামকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৭০]

---

৬৮. ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যাকোব বা ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

৬৯. বিবি হাজেরা।

৭০. আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে বলেন : "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব ; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব (I will make him a great nation)।"

এছাড়া ইসহাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেন এবং এরপর এষৌকে যে আশীর্বাদ করেন তা থেকে জানা যায় যে, এষৌ-এর বংশধরদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমন সম্ভব নয়। আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭১]

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এখানে দুটি আপত্তি উত্থাপন করেন। মীযানুল হক পুস্তকের প্রণেতা ড. ফানডার "হাল্লুল ইশকাল কী জাওয়াবিল ইসতিফসার" (ইসতিফসার পুস্তকের উত্তরে সমস্যার সমাধান) নামক পুস্তকে আপত্তি দুটি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আপত্তি : দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে মোশি বলেছেন : "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from the midst of thee, of the brethren) উৎপন্ন করিবেন ....।" এখানে "তোমার মধ্য হইতে" কথাটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন, ইশ্মায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি : স্বয়ং যীশু নিজেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর বিষয়ে কথিত বলে দাবি করেছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৪৬ আয়াতে তিনি বলেন: "কেননা আমার[৭২] বিষয়ে তিনি (মোশি) লিখিয়াছেন (for he wrote of me)।"

উপর্যুক্ত আপত্তিদ্বয়ের বিষয়ে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :

প্রথম আপত্তির উত্তর

ফার্সী ও উর্দু অনুবাদে উপর্যুক্ত আয়াতটি নিম্নরূপ : "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক

৭১. বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরকে প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ! শেষ বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে বলেন, আমাকে প্রান্তর থেকে মৃগ শিকার করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াও, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে। এষৌ প্রান্তরে গমন করলে ছোট ভাই যাকোব বড় ভাইয়ের পোশাক পরে, নিজেকে এষৌ বলে দাবি করে পিতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পিতা বারংবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই এষৌ কিনা। বারংবার নিশ্চয়তা প্রদানের পরে পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তিনি মূলত এষৌকেই আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রকাশ পায় যে, সবই ছিল প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কিন্তু ঈশ্বর এই ধোঁকায় প্রবঞ্চিত হয়ে প্রবঞ্চক যাকোবকেই দুধ, মধু ও সকল কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হন! আর সহজ, সরল, সত্যবাদী ও পিতার নির্দেশ যথাযথ পালনকারী এষৌ-এর ভাগ্যে জোটে সকল অভিশাপ। আর ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হলেন! যাই হোক যাকোবের জন্য ইসহাক আশীর্বাদ করেন : "তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।" আর এষৌকে তিনি আশীর্বাদ করেন, "তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে"। এ থেকে বুঝা যায় যে, এষৌ-এর বংশে কোন মহান ভাববাদী জন্ম নিতে পারেন না।

৭২. বাংলা বাইবেলে 'আমারই' বলা হয়েছে। আরবী ও ইংরেজী পাঠ থেকে তা বুঝা যায় না।

ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।" আর এই বক্তব্য মূলত আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়।[৭৩] কারণ মুহাম্মাদ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতিশ্রুত অবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। মদীনার মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইহূদীগণ বসবাস করতো। খায়বার, বনু কায়নূকা, বনূ নাযীর ও অন্যান্য ইহূদী গোত্র তথায় বসবাস করতো। তাদের অভ্যন্তরে বা তাদের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে তিনি একদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এবং অন্যদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হলেন। এছাড়া ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

সর্বোপরি 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটি ব্যাকরণের পরিভাষায় 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটি আংশিক বা সংশোধনমূলক প্রতিকল্প বাক্যাংশ। আরবী ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে থেকে ইবনুল হাজিব ও তাঁর অনুসারিগণের মতানুসারে একে 'বদল ইশতিমাল' বা 'আংশিক পরিবর্তন' বলে গণ্য করা যায়। আর ইবনু মালিকের মতানুসারে একে 'বদল ইদরাব' বা 'সংশোধনমূলক পরিবর্তন' বলে গণ্য করা যায়। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দ বা বাক্যাংশটি বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভূত বলে গণ্য।

আর প্রথম বাক্যাংশটুকু (তোমার মধ্য হইতে) যে বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভূত তার প্রমাণ এই যে, মোশি পরবর্তী ১৮ আয়াতে যখন এই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বরের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেখানে এই কথাটুকু উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে যীশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্ধৃতির মধ্যে (তোমার মধ্য হইতে) কথাটুকু উল্লেখ করেন নি।[৭৪] ইতোপূর্বে ৭ম বিষয়ে পাঠক পিতরের উদ্ধৃতি পাঠ করেছেন। আবার স্তিফানও (Stephen) এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন।[৭৫] তাঁর উদ্ধৃতিতেও এই কথাটুকু নেই। প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ৭ম

---

৭৩. "তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বক্তব্যটির দুটি অংশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। হয় একটি বাক্যাংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত, অথবা দুটির একটি রূপক। পরবর্তী কালে সংযোজিত হলে প্রথম বাক্যাংশটিই (তোমার মধ্য হইতে) সংযোজিত বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী ১৮ আয়াতে ঈশ্বরের নিজের ভাষায় যে বক্তব্য রয়েছে তাতে এ কথাটুকু নেই। আর যদি দুটি বাক্যাংশই সঠিক বলে গণ্য হবে তবে একটি রূপক বা প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও প্রথম বাক্যাংশটি রূপক বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী আয়াতে এই কথাটুকু নেই এবং ব্যাকরণ ও ভাষার দিক থেকে পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশই মূল বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৭৪. দেখুন প্রেরিত ৩/২২।

৭৫. দেখুন প্রেরিত ৭/৩৭।

অধ্যায়ে তা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ : "ইনি সেই মোশি, যিনি এস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ একজন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন; যাহার কথা তোমরা শ্রবণ করিবে।"[৭৬]

এ সকল স্থানে (তোমার মধ্য হইতে) কথাটুকুর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই কথাটুকু বক্তার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এবং 'তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটুকুই মূল উদ্দেশ্য।

'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের লেখক বলেছেন : 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু পরবর্তীকালে সংযোজিত বিকৃতি মাত্র। তিনটি বিষয় তা প্রমাণ করে[৭৭]:

প্রথমত : এই বক্তব্যের স্থলে ইস্রায়েল সন্তানদের সকল বংশই উপস্থিত ছিল। এমন নয় যে, কোন কোন বংশ উপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য বংশ অনুপস্থিত ছিল। ফলে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটির কোন অর্থই থাকে না, কথাটি অর্থহীন সংযোজনে পরিণত হয়। কিন্তু পরের আয়াতে 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটিই এসেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই কথাটিই মূল এবং 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু পরবর্তীকালে সংযোজন করে মূল পাঠকে বিকৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : মোশি যখন ঈশ্বরের যবানীতে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তখন 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু বলেন নি। আর মোশির কথা তো ঈশ্বরের বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে না।

তৃতীয়ত : প্রেরিতগণ যখন এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তখন 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু উদ্ধৃত করেন নি।

আপনারা হয়ত বলবেন যে, বিকৃতিকারী যখন ভবিষ্যদ্বাণীটি বিকৃত করলেন, তখন পুরো বক্তব্যটিই বিকৃত করলেন না কেন ? এক্ষেত্রে আমি বলব যে, বিচারালয়গুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃত প্রমাণাদি ধরা

---

৭৬. 'যাহার কথা তোমরা শ্রবণ করিবে (him shall ye hear)' এই কথাটুকু ইংরেজি বাইবেলে (AV/KJV), গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠে ও এবং ১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে বিদ্যমান। কিন্তু বাংলা বাইবেলে ও ইংরেজি revised standard version-এ কথাগুলি নেই। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, বাইবেল লেখক ও অনুবাদকগণ ইচ্ছামত কিছু শব্দ ও বাক্য বৃদ্ধি করেন এবং ইচ্ছা হলে তা আবার ফেলে দেন।

৭৭. 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটি যে পরবর্তী কালে অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, শমরীয় তোরাহ-এর এই আয়াতটির মধ্যে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু নেই। শমরীয় আয়াতের পাঠ নিম্নরূপ : "তোমার সকল ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।"

পড়ে এক প্রমাণের সাথে অন্য প্রমাণ বা এক স্থানের সাথে অন্য স্থানের অসঙ্গতি প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে। মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারিগণের কোন কোন বক্তব্য তাদের মিথ্যা প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহ্‌র নিয়ম যে, তিনি প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। ধর্মের বিশ্বস্ততা বিনষ্টকারীর বিকৃতি তিনি ধরিয়ে দেন। এই নিয়ম অনুসারে প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক থেকে এমন কিছু কথা বা কর্ম ঘটে যায় যার মাধ্যমে তার বিকৃতি ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ পেয়ে যায়। তবে কোন ধর্মের সকলেই তো আর প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক নন। এজন্য যে সকল বিশ্বাসঘাতক পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি বিকৃত করতো, তারা ধার্মিক ও সৎমানুষদের দিকে লক্ষ্য রাখতো। এজন্য তারা সবকিছু বিকৃত করে নি।" আল-ইসতিফসার গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

সপ্তম বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংযোজন ও বিয়োজন ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের চিরাচরিত ও সুপরিচিত অভ্যাস। এই অভ্যাসের আলোকে আল-ইসতিফসার গ্রন্থের এই মতটিই জোরালো বলে বুঝা যায়।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর

এ বিষয়ে যীশুর বক্তব্য নিম্নরূপ : "কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমার বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন (For had ye believed Moses, ye would have believed me : for he wrote of me)"। এখানে কোনরূপ উল্লেখ নেই যে, মোশি অমুক স্থানে (বা অমুক কথা) আমার বিষয়ে লিখেছেন বরং এখানে তিনি শুধু বলেছেন যে, মোশি তাঁর বিষয়ে কিছু লিখেছেন। যদি তোরাহ-এর কোন এক স্থানে তাঁর বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে তাই যথেষ্ট। আর আমরা তো এ কথা স্বীকার করি যে, যীশুর বিষয়ে তোরাহ-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় পাঠক তা জানতে পারবেন। কিন্তু আমরা কখনোই স্বীকার করি না যে, যীশুর এই কথাটি দ্বারা তিনি দ্বিতীয় বিবরণের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ উপরের দশটি বিষয় প্রমাণ করে যে, কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তা মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়েই বলা হয়েছে।

এই আপত্তি উত্থাপনকারী ড. ফান্ডার তাঁর 'মীযানুল হক' পুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে দাবি করেছেন যে, আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতটি যীশুর প্রতি ইঙ্গিত করে।[৭৮] আর যীশুর উপর্যুক্ত বক্তব্য, 'তিনি আমার বিষয়ে লিখিয়াছেন'

৭৮. আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশ ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হ্যাঁ, যদি যীশু বলতেন যে, মোশি তাঁর পাঁচ পুস্তকের কোন পুস্তকেই আমার বিষয়ে ছাড়া অন্য কোন ভাববাদীর বিষয়ে কিছুই লিখেন নি বা কোন ইঙ্গিত করেন নি তবে হয়ত কেউ দাবি করতে পারতেন যে, উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও তাঁর বিষয়েই বলা হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ২১ আয়াত নিম্নরূপ : "উহারা অনীশ্বর দ্বারা (with that which is not God) আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল, স্ব স্ব অসার বস্তু (অসার উপাস্য : idols)[৭৯] দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল ; আমিও নজাতি দ্বারা (with those which are not a people) উহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব, মূঢ় জাতি (a foolish nation) দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।"

এখানে মূঢ় (আরবী বাইবেলে : জাহিল) জাতি বলতে আরবদেকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা ছিল মূঢ়তা, মুর্খতা ও বিভ্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাদের নিকট কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাদের ছিল না। তারা মূর্তি বা জড়-পূজা ছাড়া কিছুই জানত না। দাসী হাগারের (হাজেরার) পুত্র ইশ্মাইলের বংশধর হওয়ার কারণে ইহূদীগণ তাদেরকে ঘৃণা করত।

তাহলে এই আয়াতের অর্থ, ইস্রায়েলীয়গণ তাদের স্ব স্ব অসার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে। এজন্য তাদেরই নিকট ঘৃণিত একটি মূর্খ ও মূঢ় জাতির দ্বারা আমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করব।[৮০] তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি ইহূদীগণ কর্তৃক ঘৃণিত এই মূঢ় জাতির মধ্যে মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সত্য পথের নির্দেশনা দান করেন। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা জুমু'আর মধ্যে আল্লাহ্ বলেন : "তিনিই উম্মীদের

---

৭৯. ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন বা অথরাইজড ভার্সনে with their vanities এবং রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সনে with their idols লেখা হয়েছে। আরবী বাইবেলে তাদের 'অসার উপাস্যগণ দ্বারা' লেখা হয়েছে।

৮০. এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইহূদীগণ একত্ববাদ বিনষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। এর বিপরীতে একটি মূঢ় জাতিকে প্রকৃত ও সত্য একত্ববাদ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেন। আর এজন্যই মুসলিমদের প্রতি ইহূদীদের অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টি চিরন্তন। তাত্ত্বিকভাবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, খৃষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি অত্যন্ত বিকৃত, ঘৃণ্য ও ঈশ্বরের অবমাননাকর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী একত্ববাদ, মূর্তিপূজার বিরোধিতা, ইবাদত-বন্দেগি, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি সবই বিশুদ্ধ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহূদী ধর্ম-ব্যবস্থার কাছাকাছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি এতই বেশি ও চিরস্থায়ী যে, এদের ধ্বংস করার জন্য তারা যে কোন অপবিত্র, মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদী জাতির সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

(নিরক্ষরদের) মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে।"[৮১]

এখানে 'মূঢ় জাতি' বলতে কখনোই গ্রীক জাতি হতে পারে না। খৃস্টানদের পবিত্রপুরুষ সাধু পৌলের কথা থেকে এরূপ মনে হতে পারে যে, 'মূঢ় জাতি' বলতে হয়ত গ্রীক জাতিকেই বুঝানো হয়েছে।[৮২] কিন্তু এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন।[৮৩] কারণ যীশুর আগমনের তিন শতাধিক বছর পূর্ব থেকে গ্রীকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

যীশুর আগমনের পূর্বেই এদের মধ্যে সক্রেটিস (Socrarates), হিপোক্রেটিস (Hippocrates), পিথাগোরাস (Pythagoras), প্লেটো (Plato), এরিস্টোটল (Aristotle/Aristoteles), আর্কিমিডিস ((Archimedes), ব্যালিনাস, ইউক্লিড (Euclid/Eukleides), গ্যালেন (Galen/Galenos/Galenus) ও অন্যান্য জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত আবির্ভূত হন, যাঁরা ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিশ্ববরেণ্য ছিলেন। যীশুর যুগে গ্রীক-রোমানগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের শীর্ষে ছিল। এমনকি তারা তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের শিক্ষা, নির্দেশ, কাহিনী, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট (the Septuagint: LXX) বা 'সত্তরের' অনুবাদটি যীশুর আবির্ভাবের ২৮৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের মাধ্যমেই গ্রীকগণ

---

৮১. সূরা জুমু'আ ২ আয়াত।

৮২. পৌল রোমীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করে গ্রীকদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ঈশ্বরের কাছে ইহূদী ও গ্রীকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে মনে হতে পারে যে, তিনি গ্রীকদেরকে এই মূঢ় জাতি বলে বুঝাতে চেয়েছেন। দেখুন প্রেরিত ১/০১২-১৯।

৮৩. যে সকল জাতি দ্বারা ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেছেন তাদের অন্যতম ব্যাবিলনীয় জাতি, গ্রীক-রোমান জাতি ও আরব জাতি। এদের মধ্যে আরবগণই ছিল মূঢ় বা জাহিল হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্যরা শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-দর্শনে ইস্রায়েলীয়গণের সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও অধিক উন্নত ছিল। বাইবেলের এই আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোথাও কোন ইউরোপীয় গবেষক, পণ্ডিত বা পাদরি স্বীকার করবেন না যে, ব্যাবিলনীয়গণ বা গ্রীকগণ মূর্খ জাতি বা তারা আরবগণ বা ইহূদীগণের তুলনায় মূর্খ ছিল। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, অসন্তুষ্টির মূল বিষয়-অসার দেবদেবীর উপাসনা বনাম প্রকৃত একত্ববাদ লাভ। এ দিক থেকে আরবগণ ছাড়া অন্য কোন জাতি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে নি। সর্বোপরি এরূপ চিরন্তন অসন্তুষ্টি আর কোন জাতির প্রতি তাদের নেই। খৃস্টানগণ দীর্ঘদিন তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে বটে, তবে খৃস্টানগণ তো ইস্রায়েলীয়দেরই অন্তর্ভুক্ত, তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন জাতি বা মূঢ় জাতি বলে গণ্য করার কোন উপায় নেই।

বাইবেলে জ্ঞান অর্জন করে। তবে তারা মোশির ধর্ম বা ব্যবস্থার অনুসারী ছিল না। তারা সর্বদা জ্ঞানের চর্চা ও অনুসন্ধান করত। এজন্য খৃষ্টানগণের মহাপুরুষ সাধু পৌল করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ১ম অধ্যায়ে বলেছেন : "২২ কেননা যিহূদীরা চিহ্ন চায়, এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে (the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom) ২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খৃষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরাজিতদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।"

কাজেই মূঢ় জাতি বা মূর্খ জাতির অর্থ কখনোই গ্রীক জাতি হতে পারে না। কাজেই রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে সাধু পৌলের বক্তব্য হয় ব্যাখ্যা করতে হবে অথবা বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। ইতোপূর্বে অষ্টম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, আমাদের নিকট সাধু পৌলের বক্তব্যের কোন মূল্যই নেই।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩ অধ্যায়ের অনুবাদে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেলে[৮৪] বলা হয়েছে : "সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেরীয় হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, অযুত অযুত পবিত্রের সহিত (নিকট হইতে)[৮৫] আসিলেন, তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল (The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints : from his right hand went a fiery law for them)"[৮৬]।

এখানে 'সীনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনের' অর্থ মোশিকে তোরাহ প্রদান করা এবং 'সেরীয় হইতে উদিত হওয়ার' অর্থ যীশুকে সুসমাচার বা ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ 'পারণ পর্বত' মক্কার একটি পর্বত।

আদিপুস্তকের ২১ অধ্যায়ে ইশ্মায়েলের অবস্থা বর্ণনায় বলা হয়েছে : "২০ পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। ২১ সে পারণ প্রান্তরে বসতি করিল (he dwelt in the wilderness

---

৮৪. এখানে বাংলা বাইবেলের অনুবাদ উল্লেখ করেছি এবং ইংরেজি অথোরাইজড ভার্সন-এর ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করেছি।

৮৫. বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি অথোরাইজড ভার্সনের ভাষ্য অনুসারে 'সহিত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮৬. দ্বিতীয় বিরণ ৩৩/২।

of Paran)। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।"

নিঃসন্দেহে ইশ্মায়েলের অবস্থান মক্কায় ছিল (যদ্দারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম)।[৮৭]

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, অগ্নি যখন সীনয়-এ প্রকাশ পেয়েছিল, তখনই সেরীয় ও পারণ পর্বতেও প্রকাশ পেয়েছিল এবং এভাবে এই তিন স্থানে একই সময়ে অগ্নি প্রকাশিত বা প্রসারিত হয়েছিল। কারণ যদি আল্লাহ কোথাও অগ্নি সৃষ্টি করেন, তবে বলা হয় না যে, আল্লাহ তথা হইতে আসিলেন বরং 'আল্লাহর আগমন' বা প্রকাশের অর্থ তথায় ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রকাশ পেয়েছে, অথবা তথায় কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে অথবা অনুরূপ কোন 'ঐশ্বরিক প্রতাপ' প্রকাশিত হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণ স্বীকার করেন যে, সীনয়ে মোশির উপর ওহী বা প্রত্যাদেশ আগমন করেছিল। তাহলে সেরীয় ও পারণেও এরূপ কিছু অবশ্যই হতে হবে।[৮৮]

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

আদি পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে ইশ্মায়েলের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম (শুনিলাম); দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতির জন্য বানাইব (বড় জাতি করিব) (And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation) ।"

৮৭. এ বিষয়ে হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের তিন আয়াতে বলা হয়েছে : "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। [সেলা] আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah, His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)"। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত : praised।

৮৮. এখানে আরো দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ আগমন মোশি বা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথীসহ মক্কার আগমন করেন। দ্বিতীয়ত, অগ্নিময় ব্যবস্থাও বা শরীয়তও তিনি প্রদান করেছেন।

Contents

এখানে আমি তাহাকে একটি বড় জাতির জন্যই বানাইব (আরবী অনুবাদ অনুসারে) বা আমি তাকে একটি বড় জাতি করিব (I will make him a great nation) বলতে মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কারণ ইশ্মায়েলের বংশে তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এই জাতিকে বড় জাতি (great nation) করেছেন। ইশ্মায়েল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইশ্মায়েল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ কুরআনে মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্য অবরাহাম ও ইশ্মায়েলের প্রার্থনা উদ্ধৃত করেছেন। কুরআনের ভাষায় তাঁরা বলেন : "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৮৯]

ইমাম কুরতুবী তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন : "ইহূদীদের ভাষা (হিব্রু ভাষা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাদের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করেছেন এরূপ কতিপয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, ইহূদীদের মধ্যে সংখ্যার একটি হিসাব প্রচলিত। প্রত্যেক বর্ণের একটি সংখ্যা রয়েছে এবং শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির সংখ্যা হিসাব করে তারা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। এই হিসাব অনুসারে তোরাহ-এর এই আয়াতে সংখ্যার ভাষায় দুইবার মুহাম্মাদ (সা)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে :

"প্রথমবার : 'অতিশয়' বা অনেক অনেক (exceedingly)। হিব্রু ভাষায় শব্দটি 'বিমাদমাদ'। হিব্রু ও আরবী বর্ণমালার সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই শব্দটির সংখ্যা ৯২ : বা=২, মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, দ্বিতীয় মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, মোট ৯২। মুহাম্মাদ শব্দের অক্ষরগুলির গণনাফলও ৯২ : মীম=৪০, হা=৮, মীম=৪০, দাল=৪।

"দ্বিতীয়বার : 'বড় জাতি' (great nation)। হিব্রু ভাষায় এখানে বলা হয়েছে : "লুগাই গাদূল"। হিব্রু ভাষায় জীম ও সাদ নেই। এজন্য হিব্রু ভাষায় গাইনই জীমের স্থলাভিষিক্ত। হিব্রু ভাষায় লাম=৩০ ও গাইন-৩, ওয়াও=৬, ইয়া=১০, গাইন=৩, দাল=৪, ওয়াও=৬, লাম=৩০। এখানেও মোট ৯২।"

ইমাম কুরতুবীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এখানেই শেষ।

আবদুস সালাম ছিলেন একজন ইহূদী ধর্মগুরু ও পণ্ডিত। তুর্কি সুলতান বায়েযীদ খানের[৯০] সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আর-রিসালা আল-হাদিয়্যা'

---

৮৯. সূরা বাকারা, ১২৯ আয়াত।

৯০. সুলতান দ্বিতীয় বায়েযীদ (Bayezid II), ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮১ থেকে ১৫১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী শাসক ছিলেন।

(পথনির্দেশক পুস্তিকা) নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি বলেন, "ইহূদী ধর্মগুরুদের অধিকাংশ দলিল-প্রমাণের ভিত্তি বর্ণমালার বর্ণগুলির সংখ্যাতাত্ত্বিক মানের উপর। শলোমন যখন যিরূশালেমের ধর্মধাম নির্মাণ করেন তখন তারা সমবেত হয়ে বলেন, এই ধর্মধাম ৪১০ বছর বিদ্যমান থাকবে। এরপর তা নষ্ট হবে। হিব্রু 'বাযাত' শব্দটির অক্ষরগুলির সংখ্যা থেকে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণী বের করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'বিমাদমাদ' শব্দ থেকে মুহাম্মাদ শব্দের ভবিষ্যদ্বাণী বের করার বিষয়ে ইহূদী পণ্ডিতগণ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, 'বিমাদমাদ' শব্দের মধ্যে যে 'বা' অক্ষরটি বিদ্যমান, এই অক্ষরটি শব্দের মধ্যকার অক্ষর নয়, বরং অতিরিক্ত অব্যয় যা শব্দের প্রথমে সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই শব্দ দ্বারা 'মুহাম্মাদ' শব্দ প্রমাণ করতে হলে আরেকটি 'বা' অক্ষর এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলব, হিব্রু ভাষার সুপরিচিত নিয়ম যে, যদি দুটি 'বা' অক্ষর পাশাপাশি একত্রিত হয় এবং তন্মধ্যে একটি শব্দের মূল অক্ষর এবং অন্যটি অতিরিক্ত অব্যয় হয়, তবে অব্যয়টি বিলুপ্ত করতে হবে এবং শব্দের মধ্যকার 'বা' অবশিষ্ট থাকবে। এই নিয়ম তাদের ভাষায় অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। কাজেই এর জন্য কোন প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই।"

আবদুস সালামের বক্তব্য এখানেই শেষ।

এখানে আমি অতিরিক্ত সংযোজন করতে চাই যে, মুসলিম আলিমগণ বলেছেন, 'মাদমাদ' মুহাম্মাদ (সা)-এর একটি নাম। ৫ম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি/১১৪৯ খৃ) তার 'আশ-শিফা' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী

আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ আয়াতটি ১৯২২ সালে, ১৮৩১ সালে ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ অনুসারে নিম্নরূপ : "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে পরিচালনাকারী (ব্যবস্থা-প্রদানকারী)[৯১] যাইবে না (The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver (ruler's staff[৯২]) from between his feet), যে পর্যন্ত যাঁহার জন্য সব তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই অপেক্ষা করিবে।"

১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ : "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলে মধ্য হইতে রীতি-ব্যবস্থা যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার অধিকার আছে তিনি না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

৯১. উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে 'বিচারদণ্ড' লেখা হয়েছে।

৯২. Revised Standard Version.

এখানে 'যাহার জন্য সব' বা 'যাঁহার অধিকার আছে তিনি' কথাটি 'শীলো' (Shiloh) শব্দের অনুবাদ।[৯৩] এই শব্দের অনুবাদে খৃস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইতোপূর্বে ৭ম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক সে বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন।

আবদুস সালাম তাঁর 'আর-রিসালা আল-হাদিয়্যা বা পথনির্দেশক' পুস্তিকায় এই আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় লিখেছেন : "যিহূদা হইতে শাসক যাইবে না এবং তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে ব্যবস্থাপক (রীতি-প্রদানকারী) যাইবে না, যে পর্যন্ত যাঁহার জন্য তিনি না আইসেন, জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।"

বাইবেলের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মোশি ও যীশুর যুগের পূর্ণতার পরে মুহাম্মাদ (সা) আগমন করবেন। এখানে শাসক বা রাজদণ্ড বলতে মোশিকে বুঝানো হয়েছে; কারণ যাকোবের পরে মোশির যুগ পর্যন্ত তাঁর বংশধরের মধ্যে ব্যবস্থা ও রাজত্ব নিয়ে আর কেউই আগমন করেন নি। আর ব্যবস্থাপক বা রীতি-প্রদানকারী বলতে যীশুকে বুঝানো হয়েছে; কারণ মোশির পরে যীশু পর্যন্ত আর কোন ভাববাদী ব্যবস্থা-সহ আগমন করেন নি। তাঁদের উভয়ের পরে ব্যবস্থা-সহ মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া কেউ আগমন করেন নি।[৯৪] এ থেকে জানা যায় যে, যাকোবের কথার অর্থ, শেষযুগে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা) আগমন করবেন। কারণ শাসক ও ব্যবস্থাপকের পরে আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) ভিন্ন আর কেউ আগমন করেন নি। এছাড়া এখানে বলা হয়েছে : "যাঁহার জন্য তিনি।" বাক্যের সামগ্রিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, এর অর্থ : রাজত্ব বা রাজদণ্ড যাহার জন্য তিনি। এ কথাও প্রমাণ করে যে, এখানে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে।

উপরের আয়াতে এরপর বলা হয়েছে : "জাতিগণ তাঁহারই কাছে সমবেত হইবে।" এ কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এখানে মুহাম্মাদ (সা)-কেই বুঝানো হয়েছে। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো কাছে জাতিগণ সমবেত হয় নি।[৯৫]

---

৯৩. উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে : "যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন"। ইংরেজি অথোরাইজড ভার্সনে : until Shiloh come।

৯৪. মোশির ব্যবস্থায় রাজত্ব ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধিবিধান ছিল। যীশুর ব্যবস্থায় শুধু ধর্মবিশ্বাসের ব্যবস্থা ছিল। মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থায় উভয়েরই সমন্বয় ছিল।

৯৫. মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই আরব-অনারব বিভিন্ন জাতির মানুষ তাঁর নিকট সমবেত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে বিশ্বের প্রায় সকল জাতি তাঁর 'রাজদণ্ড ও ব্যবস্থা'-র ছায়ায় সমবেত হয়েছে। পক্ষান্তরে যীশুর জীবদ্দশায় তিনি অ-ইস্রায়েলীয়দের গ্রহণ করেন নি বরং তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মিশন শুধু ইস্রায়েলীয়দের জন্য, অন্য কোন জাতির জন্য নয়। তাঁর উর্ধ্বারোহণের পরে পৌলের প্রচেষ্টায় অন্য জাতির মানুষেরা 'খৃস্টধর্ম' গ্রহণ করে, কিন্তু পৌলের এই ধর্ম কখনোই যীশুর ব্যবস্থা ছিল না বরং পৌল যীশুর সকল শিক্ষা ও ব্যবস্থা রহিত করে নতুন একটি ধর্ম প্রচার করেন। কাজেই যীশুর রাজদণ্ড ও ব্যবস্থার ছায়ায় জাতিসমূহের সমবেত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

এখানে যাবূর বা গীতসংহিতার উল্লেখ না করার কারণ এর মধ্যে কোন ব্যবস্থা বা শরীয়ত নেই। দায়ূদ ছিলেন মোশির ব্যবস্থার অনুসারী একজন ভাববাদী। আর এখানে যাকোব শরীয়ত বা ব্যবস্থাসহ যে সকল ভাববাদী আগমন করবেন তাঁদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"

আমি এখানে সংযোগ করতে চাই যে, মোশি ইস্রায়েলীয়দেরকে তাঁর ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করতে পারতেন এবং কেউ ব্যবস্থা না মানলে তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। এজন্য মোশিকে 'শাসক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যীশু মূলত তোরাহ-এর ব্যবস্থা পালনের জন্য আহ্বান করতেন, কিন্তু ব্যবস্থা পালনে কাউকে বাধ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কেউ পালন না করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এজন্য তাঁকে 'রীতি-প্রদানকারী' বলা হয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, এই আয়াতে 'রাজদণ্ড ও ব্যবস্থা' বলতে মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীয়ত বুঝানো হয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের কোন কোন পাদরির লেখনি এবং কোন কোন অনুবাদ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে 'রাজদণ্ড' বলতে তারা জাগতিক রাষ্টক্ষমতা বুঝান এবং 'ব্যবস্থাপক' বলতে জাগতিক শাসক বুঝান। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইহূদীগণ যে 'খৃস্ট'-এর আগমনের অপেক্ষা করতো তিনি এবং যীশুখৃস্ট কাউকেই শিলোহ বলে দাবি করার কোন উপায় নেই।

ইহূদীগণ যে খৃস্টের জন্য অপেক্ষা করছেন এখানে তাকে শিলোহ বলে দাবি করা হয়েছে বলে দাবি করা এজন্য সম্ভব নয় যে, যিহূদার বংশধরদের মধ্য থেকে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা ও জাগতিক শাসক অপসারিত হয়েছে দু' হাজার বছরের বেশি আগে নেবুকাদনেযারের সময়ে। এই দীর্ঘ সময় ইহূদীদের খৃস্টের কোন সাড়াশব্দ কেউ শুনতে পায় নি। কাজেই এ কথা স্পষ্ট যে, শিলোহকে ইহূদীদের খৃস্ট বলে মনে করা এবং তার আগমন পর্যন্ত জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা যিহূদার বংশে বিদ্যমান থাকবে বলে দাবি করার কোন উপায় নেই।

অনুরূপভাবে যীশুখৃস্টকে শিলোহ বলে দাবি করা এবং তার আগমন পর্যন্ত যিহূদার বংশে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসক বিদ্যমান থাকার কথা দাবি করাও অসম্ভব। কারণ যীশুর আগমনের ছয়শত বছর পূর্বে নেবুকাদনেযারের সময়ে যিহূদা বংশ থেকে জাগতিক রাষ্ট্রক্ষমতা অপসারিত হয়েছে।

তিনি যিহূদার বংশধরদেরকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করেন। তারা নির্বাসনে ৬৩ বছর অবস্থান করে। কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেন যে, তারা নির্বাসনে ৭০ বছর অবস্থান করেছিলেন। তাদের এই দাবিটি ভুল। পাঠক প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তা জানতে পেরেছেন (এরপর আবার

তারা যিরূশালেমে বসবাস শুরু করলেও রাজত্ব পান নি বরং পারস্য, সিরিয়া, মিসর, গ্রীক বা রোমের অধীনে অবস্থান করেছেন)।

এরপর সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes)-এর শাসনামলে তাদের উপর অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা নেমে আসে। এন্টিয়কে ইহূদীদের মহাযাজক (high priest) উনিয়াসকে অপসারণ করেন। তার পরিবর্তে তার ভাই জেসন (Jason/Joshua)-কে বার্ষিক ৩৬০ তৌল স্বর্ণ খাজনা প্রদানের বিনিময়ে মহাযাজক নিয়োগ করেন। এরপর আবার জেসনকে অপসারণ করে তার ভাই মিনেলসকে (Menelaus) ৬৬০ তৌল স্বর্ণ বার্ষিক খাজনা প্রদানের বিনিময়ে মহাযাজক নিয়োগ করেন। এরপর মিনেলসের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হলে জেসন পুনরায় তার মহাযাজকের পদ ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন এবং যাকেই শত্রু মনে করেন তাকেই হত্যা করেন।

মিনেলসের মৃত্যুর সংবাদ মূলত মিথ্যা ছিল। এমতাবস্থায় জেসনের বিদ্রোহের সংবাদে খৃস্টপূর্ব ১৭০ সালে এন্টিয়ক পুনরায় যিরূশালেম আক্রমন করেন এবং অধিকার করেন। এবার তিনি যিরূশালেমের ৪০ হাজার ইহূদী হত্যা করেন। অনুরূপ সংখ্যক ইহূদীকে তিনি ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করেন।

খৃস্টান পণ্ডিতদের লেখা 'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের ১৮৫২ সাল মুদ্রিত সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে ৪৮১ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনায় বলা হয়েছে : "এ সময়ে যিরূশালেম লুণ্ঠিত হয় এবং ৮০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।"

মন্দির বা ধর্মধামের মধ্যে যা কিছু ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য ছিল সবই এ সময়ে লুণ্ঠিত হয়। এর পরিমাণ ছিল ৮০০ তৌল স্বর্ণ। ধর্মধামকে অবমাননা করার জন্য বেদির উপরে শূকর জবাই করা হয়। এরপর এন্টিয়ক এন্টাকিয়ায় (Antioc) ফিরে যান। (তার দুধভ্রাতা ও বন্ধু) ফিলিপ নামক একজন অত্যন্ত দুষ্ট ও নোংরা প্রকৃতির মানুষকে তিনি যিরূশালেম ও যিহূদা রাজ্যের দায়িত্বভার প্রদান করেন।

মিসরে তার চতুর্থ অভিযানের সময় এন্টিয়ক এপোলোনিয়াসকে ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ যিরূশালেমে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যিরূশালেম ধ্বংস করে তথাকার সকল পুরুষকে হত্যা করতে এবং শিশু ও নারীদেরকে দাস-দাসীরূপে বন্দী করতে। তারা যিরূশালেমে আগমন করে। শনিবার দিবসে যখন শহরের মানুষেরা প্রার্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তাদের অসাবধানতার সুযোগে এন্টিয়কের বাহিনী তাদের উপর আক্রমন করে। তারা সবাইকে হত্যা করে। কেবল দু'চারজন যারা পাহাড়ে পালিয়ে যেতে পারে বা কোন গুহায় লুকিয়ে পড়তে

পারে তারাই শুধু রক্ষা পায়। তারা শহরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং শহরে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মিভূত করে। শহরের প্রাচীরগুলি তারা ভেঙে ফেলে এবং শহরের অভ্যন্তরের বাড়িঘরগুলি ধ্বংস করে। এ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তারা আকরা পাহাড়ের উপরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে। এই দুর্গের মধ্যে সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে। এখান থেকে তারা ধর্মধামের চারিদিকে নজর রাখতে থাকে। কোন মানুষ ধর্মধামের নিকট গমন করলে তারা তাকে হত্যা করে।

এরপর এন্টিয়ক ইহূদীদেরকে (গ্রীক ধর্মব্যবস্থা অনুসারে) মূর্তিপূজার নিয়মকানুন শিক্ষা প্রদানের জন্য এথানিয়াসকে প্রেরণ করেন। এথানিয়াস এই দায়িত্ব নিয়ে যিরূশালেমে আগমন করেন। ধর্মত্যাগী কিছু ইহূদী তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে। তিনি ইহূদীদের দৈনন্দিন পশুবলি বন্ধ করে দেন। ইহূদী ধর্মের সকল প্রকার বিধিবিধান সবই তিনি বন্ধ করে দেন। পুরাতন নিয়মের সকল কপি খুঁজে বের করে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এগুলি খোঁজার ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মন্দির বা ধর্মধামের স্থলে তিনি গ্রীক-রোমান পিতা ঈশ্বর বা বড় দেবতা জুপিটারের (Jupiter, Jovd, Zeus, Olympios) বেদি তৈরি করেন এবং তার মূর্তি স্থাপন করেন। ইহূদীদের বেদির উপরেও জুপিটারের মূর্তি স্থাপন করেন।

যারা এন্টিয়কের আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সকলকেই তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই মহা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে যাজক মাত্তাথিয়াস (Mattathias) তাঁর পাঁচ পুত্র[৯৬]-সহ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। তাঁরা তাদের আবাসস্থলে দান বংশীয়দের মধ্যে পালিয়ে যান।

এভাবে অবিশ্বাসী এন্টিয়ক ও তার সেনাবাহিনী ইস্রায়েলীদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কিন্তু যিহূদার বংশধরেরা তাকে শাস্তিও দিতে পারে না বা তার ক্ষমতাও হরণ করতে পারে না। ইতিহাসের পুস্তকাদিতে এ সকল বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, যীশুর আগমনের অনেক আগেই যিহূদার বংশধরদের মধ্য থেকে জাগতিক ক্ষমতা ও রাজদণ্ড অপসারিত হয়েছে। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে ?

কোন খৃস্টান পাদরি হয়ত বলতে পারেন, এখানে রাজদণ্ড ও বিচারদণ্ড বিদ্যমান থাকার অর্থ জাতির স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকা। আজকাল কোন কোন পাদরি-মিশনারী এ কথা বলেন। সেক্ষেত্রে আমরা বলব যে, এ ব্যাখ্যাও প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সা)-ই শিলোহ, যীশু নন। কারণ, যীশুর পরেও (প্রায় ৭ শতাব্দী) মুহাম্মাদ

---

৯৬. এদের অন্যতম ছিলেন Judas Maccabeus, Janathan Maccabeus, Simon Maccabeus। এন্টিয়কের বাহিনীর বিরুদ্ধে ম্যাকাবীয় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন তারা।

(সা)-এর আগমন পর্যন্ত তারা জায়গা-জমি, কেল্লা ও দুর্গ নিয়ে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-সহ বসবাস করত। কারো অধীনতা বা আনুগত্য তাদের স্বীকার করতে হতো না। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, খায়বার ও অন্যান্য কয়েক স্থানে তাদের এরূপ ছোটখাট 'রাজ্য' বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের পরে তাদের এই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যও বিলুপ্ত হয়। তারা লাঞ্ছনা ও দুর্বলতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। বিশ্বের সর্বত্র তারা অন্যান্য জাতির অধীনতায় বসবাস করতে থাকে।

এভাবে সকল ব্যাখ্যা ও অর্থই নির্দেশ করে যে, মুহাম্মাদ (সা)-ই ছিলেন শিলোহ, ইহূদীদের খৃস্ট বা খৃস্টানদের খৃস্ট নন।[৯৭]

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী

গীতসংহিতার ৪৫ নং গীত নিম্নরূপ : "১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলিয়া উঠিতেছে; আমি রাজার বিষয়ে আপন রচনা বিবৃত করিব; আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনীস্বরূপ। ২ তুমি মনুষ্য-সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত হয়; সেই নিমিত্ত ঈশ্বর চিরকালের জন্য তোমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন (grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever) । ৩ হে বীর, তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন কর, তোমার প্রভা ও প্রতাপ [গ্রহণ কর] (Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty)। ৪ আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়িয়া যাও, সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে, তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়াবহ কার্য শিখাইবে। ৫ তোমার বাণ সকল তীক্ষ্ণ জাতিরা তোমার নীচে পতিত হয়, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয় (Thine arrows are sharp in the heart of the kings enemies; whereby the people fall under thee)। ৬ তোমার ঐশ্বরিক সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী (your divine throne endures for ever and ever);[৯৮] তোমার রাজদণ্ড সাম্যের-ন্যায়ের দণ্ড (Your royal sceptre

---

৯৭. এখানে লক্ষণীয় যে, রাজত্ব (sceptre) ও ব্যবস্থা বা শরীয়ত প্রদানকারী (lawgiver) উভয়েই ভাববাণী বা নবুওয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই আয়াতের অর্থ যিহূদার বংশের শরীয়ত ভিত্তিক রাজত্ব এবং শরীয়ত-প্রদানকারী নবীগণের আগমন শেষ হওয়ার পরে শিলোহের আগমন ঘটবে বা তাঁর আগমনেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। যীশুর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। কারণ যীশুর পরেও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ভাববাদীর আগমন ঘটেছে। রাজত্ব না থাকলেও 'ব্যবস্থাপক' (lawgiver) বা ভাববাদী তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পরে যিহূদার বংশে আর কোন ব্যবস্থাপক বা ভাববাদীর আবির্ভাব হয় নি।

৯৮. ইংরেজি রিভাইজ্ড ভার্সনের পাঠ। টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতটির অনুবাদ আরো দুই প্রকার হতে পারে : Oh God! Your throne is for ever and ever : হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী।

is a sceptre of equity)[৯৯]। ৭ তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে (therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows)। ৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার সকল বস্ত্র সুবাসিত হয়, হস্তিদন্তময় প্রাসাদসমূহ হইতে তারা[১০০] তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে (out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad)। ৯ তোমার মহিলারত্নদের মধ্যে রাজকন্যারা আছেন (daughters of Kings are among your ladies of honour/Kings daughters were among thy honourable women) তোমার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আছেন রাণী, ওফীরীর সুবর্ণে ভূষিতা। ১০ বৎস (O daughter), শ্রবণ কর, দেখ, কর্ণপাত কর; তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল ভুলিয়া যাও। ১ তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য বাসনা করিবেন; কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁহার কাছে প্রণিপাত কর। ১২ সোর-কন্যা (the daughter of Tyre) উপঢৌকন লইয়া আসিবেন, ধনী প্রজারা তোমার কাছে বিনতি করিবেন। ১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সর্বতোভাবে সুশোভিতা; তাঁহার পরিচ্ছদ স্বর্ণসূত্র-খচিত। ১৪ তিনি সূচীশিল্পিত বস্ত্র পরিয়া রাজার নিকটে আনীতা হইবেন, তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিনী সহচরী কুমারীদিগকে তোমার নিকটে লওয়া যাইবে। ১৫ তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইবে, তাহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে। ১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্তে তোমার পুত্রেরা থাকিবে; তুমি তাহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীতে অধ্যক্ষ করিবে। ১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষপরম্পরায় স্মরণ করাইব, এই জন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল তোমার স্তব করিবে।"

ইহূদী ও খৃস্টানগণ একমত যে, এই গীতে দায়ূদ তাঁর পরের যুগে আগত একজন ভাববাদীর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইহূদীগণের মতে এ সকল গুণের অধিকারী এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী এখনো আগমন করেন নি। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, যীশুই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। আর অতীত ও বর্তমান সকল যুগে মুসলিমগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সা)-ই এই ভাববাদী।

এখানে আমার বক্তব্য যে, এই গীতে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর নিম্নোক্ত গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে :

---

৯৯. রিভাইজ্‌ড ভার্সনের পাঠ। কিং জেমস ভার্সনের পাঠ নিম্নরূপ : the sceptre of thy kingdom is a right screptre : তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড।

১০০. বাংলা বাইবেলে এখানে রয়েছে : "তারযুক্ত যন্ত্র সকল।" কিং জেমস ভার্সনে কথাটি নেই। রিভাইজ্‌ড ভার্সনে তা যোগ করা হয়েছে।

(১) তিনি সুন্দর, (২) তিনি মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, (৩) তাঁর ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত (তাঁর কথা মধুর ও করুণামণ্ডিত), (৪) তিনি চিরকালের জন্য আশীর্বাদ-প্রাপ্ত, (৫) তিনি তরবারী বহন করবেন বা তাঁর কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করবেন, (৬) তিনি প্রতাপশালী, (৭) তিনি সত্য, ধার্মিকতা ও নম্রতার পক্ষে, (৮) তাঁর দক্ষিণ হস্ত ভয়াবহ বা আশ্চর্য কাজ করবে, (৯) তাঁর বাণগুলি তীক্ষ্ণ, (১০) রাজকন্যারা তার সেবা করবেন, (১৩) তাঁর নিকট উপহার-উপঢৌকন আসবে, (১৪) ধনী প্রজারা তাঁর কাছে বিনতি করবে, (১৫) তাঁর পিতৃগণের পরিবর্তে তাঁর পুত্রেরা পৃথিবীর অধ্যক্ষ হবেন, (১৬) পুরুষপরম্পরায় তাঁর নাম স্মরণ করা হবে, (১৭) জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল তাঁর স্তব করবে।

এ সকল বিশেষণ মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যে সর্বোত্তমভাবে বিদ্যমান।

প্রথম বিষয় (সৌন্দর্য) সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছুই আমি দেখি নি। মনে হত সূর্য তাঁর কপালে চমকাচ্ছে। আর যখন তিনি হাসতেন তখন চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে যেত।" উম্মু মা'বাদ তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনায় বলেন, "দূর থেকে দেখলে তিনি ছিলেন সুন্দরতম, আর নিকট থেকে দেখলে তিনি ছিলেন মধুরতম ও প্রিয়তম।"

দ্বিতীয় বিষয় (শ্রেষ্ঠত্ব) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রজ্ঞাময় বাণীতে বলেন : "এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি... আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।"[১০১] তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এখানে 'কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন' বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে সকল নবী-রাসূল বা ভাববাদীর উপরে মর্যাদা দান করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী 'তাফসীরে কাবীরে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বিষয়ে মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন আমি আদম-সন্তানদের নেতা, এতে কোন অহঙ্কার নেই।" অর্থাৎ আমি এ কথা অহঙ্কার করে বলছি না, একান্তই আল্লাহ্র করুণা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার জন্য তা বলছি।

তৃতীয় বিষয় (তাঁর কথার মাধুর্য বা ওষ্ঠের অনুগ্রহ) কোন বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর কথার মাধুর্য ও ভাষার আকর্ষণীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছেন। তাঁর কথার বর্ণনায় বর্ণনাকারীরা বলেছেন : "সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন তিনি এবং সঠিক স্থানে সবচেয়ে মধুর ও আকর্ষণীয়ভাবে তিনি সঠিক কথাটি বলতেন।

---

১০১. সূরা বাকারা, ২৫৩ আয়াত।

চতুর্থ বিষয় (চিরস্থায়ী আশীর্বাদ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ (আশীর্বাদ) প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[১০২] হাজার হাজার মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তাঁর জন্য সালাত পাঠ করছে বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে।

পঞ্চম বিষয় (তরবারী বা খড়গ বহন) অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি নিজেই বলেছেন : "আমি আল্লাহর প্রেরিত ভাববাদী খড়গ-সহ।"

ষষ্ঠ বিষয় (শক্তি ও প্রতাপ) সম্পর্কে আমরা জানি যে, তিনি পরিপূর্ণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। রুকানা ইবনু আব্দ্ ইয়াযীদ ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ বীর ও শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ও কুস্তিগীর। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন মক্কার প্রান্তরে তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, রুকানা! আল্লাহকে কি ভয় করবে না? আমি তোমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছি তা কি তুমি গ্রহণ করবে না ? রুকানা বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমি জানতাম যে, তুমি যা বলছ তা সত্যি তবে আমি তোমার অনুসরণ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আচ্ছা, বলতো, আমি যদি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি তবে কি তুমি আমার দীনকে সত্য বলে মানবে ? রুকানা বলেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ (সা) তার সাথে কুস্তিতে লিপ্ত হয়ে তাকে ধরাশায়ী করেন। রুকানা অসহায় হয়ে পড়েন। রুকানা বলেন, হে মুহাম্মাদ! পুনরায় আরেকবার। দ্বিতীয়বারও রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকানাকে পরাজিত করেন। রুকানা বলেন, বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে এর চেয়েও বেশি আশ্চর্য বিষয় দেখাব, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। রুকানা বলেন, তা কি ? তিনি বলেন, আমি তোমার জন্য ঐ গাছটিকে ডেকে আনব। তখন তিনি গাছটিকে ডাক দেন। গাছটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও। অতঃপর রুকানা নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেয়ে বলেন, হে আব্দু মানাফের সন্তানেরা! আমি মুহাম্মাদের চেয়ে বড় জাদুকর আর কাউকে দেখিনি। এরপর রুকানা যা কিছু ঘটেছে তা সবাইকে বলেন।

দৈহিক শক্তির পাশাপাশি মুহাম্মাদ (সা) অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। ইবনু উমার (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে অধিক সাহসী, বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার জন্য অধিক আগ্রহী ও অধিক দানশীল আর কাউকে দেখিনি।" আলী (রা) বলেন, "যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ কঠিন রূপ ধারণ করত,

---

১০২. সূরা আহযাব, ৫৬ আয়াত।

চক্ষুগুলি রক্তবর্ণ হয়ে যেত, তখন আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর পিছনে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সবার সামনে শত্রুদের সবচেয়ে কাছে থাকতেন। বদরের যুদ্ধের দিনে আমি দেখেছি যে, আমরা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আর তিনি সবার অগ্রবর্তী হয়ে শত্রুদের সবচেয়ে কাছে রয়েছেন। সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।"

সপ্তম বিষয় (সততা ও ধার্মিকতা) সম্পর্কে আমরা জানি যে, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। তাঁর জন্মগত সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে মক্কার প্রসিদ্ধ কাফির নেতা নাদ্‌র ইবনুল হারিছ কুরাইশদেরকে বলেছিলেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেই বড় হয়েছে। কিশোর বয়স থেকেই সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষজনক স্বভাব ও আচরণের অধিকারী, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যপরায়ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। এভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে যখন তাঁর মাথার চুল পাকার উপক্রম করল এবং তাঁর নতুন ধর্ম নিয়ে সে আসল, তখন তোমরা বলছ যে, সে জাদুকর। আল্লাহ্‌র শপথ, সে কখনোই জাদুকর নয়।"

বায়যান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কাফির নেতা আবূ সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেন[১০৩], "তিনি যে কথা বলছেন, সে কথা বলার আগে আপনারা কি তাঁকে কখনো মিথ্যা বলার কারণে অভিযুক্ত করেছেন ?" আবূ সুফিয়ান বলেন, "না।"

অষ্টম বিষয় (দক্ষিণ হস্তের আশ্চর্য কাজ) সম্পর্কে আমরা জানি যে, বদরের যুদ্ধের দিন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে তিনি তাঁর ডান হাতে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে যুদ্ধরত কাফির সেনাবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। এতে শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধার চক্ষু আক্রান্ত হয় এবং তারা চক্ষু সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তারা পরাজিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী যুদ্ধরত অনেক শত্রুকে হত্যা করতে এবং অনেককে বন্দি করতে সক্ষম হয়। এরূপ অনেক ঘটনা আমরা দেখি যা তাঁর দক্ষিণ হস্তের ভয়াবহ কর্ম বলে গণ্য।

নবম বিষয় (বাণগুলির তীক্ষ্ণতা) সম্পর্কে আমরা জানি যে, ইশ্মায়েলের বংশধররা প্রাচীনকাল থেকেই বাণ ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তীরন্দাযি বা তীর নিক্ষেপ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয় কর্ম। তিনি বলতেন, "অচিরেই রোমান সাম্রাজ্য তোমাদের অধীনে আসবে। আল্লাহই

---

১০৩. ৭ হিজরী সালে (৬২৮ খৃষ্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন সকল রাজা ও শাসককে পত্র লিখেন। বায়যান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) যখন পত্র পান তখন মক্কার কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হেরাক্লিয়াস তাকে ডেকে নিয়ে পত্র-প্রেরক সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন।

তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন (তিনিই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত করবেন)। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার তীরগুলি নিয়ে খেলা করতে অক্ষম না হয়।" তিনি আরো বলতেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানগণ! তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ তোমাদের পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দায ছিলেন।" তিনি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি বাণ নিক্ষেপ শিক্ষা করার পরে তা ছেড়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

দশম বিষয় (জাতিগণের অধিনতা)-ও সুস্পষ্ট। তাঁর জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন জাতির ও গোত্রের মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে।

একাদশ বিষয় (ধার্মিকতার প্রতি প্রেম ও দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা) অতি প্রসিদ্ধ। মুহাম্মাদ (সা)-এর ঘোর বিরোধী ও শত্রুগণও তাঁর এ বিষয়টি স্বীকার করে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা তা দেখেছি।

দ্বাদশ বিষয় (রাজকন্যাদের সেবা) সম্পর্কে আমরা জানি যে, পার্শ্ববর্তী সম্রাট, শাসক ও আমীরগণের কন্যারা মুসলিমদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন প্রথম প্রজন্ম থেকেই। একটি উদাহরণ, পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়ায্‌দাগির্দের কন্যা শাহরবানু মুহাম্মাদ (সা)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসায়নের গৃহে ছিলেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বিষয়ও (উপহার-উপঢৌকন, ধনী প্রজাদের বিনতি) সুস্পষ্ট। ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশী (the Negus of Ethiopia), ওমান ও বাহরাইনের রাজা মুনযির ইবনু সাবী প্রমুখ 'ধনী প্রজা' তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান শাসক মুকাওকিস (Cyrus) তাঁর জন্য তিনজন দাসী, একজন কাফ্রী দাস, একটি সাদা-কালো রঙের খচ্চর, একটি সাদাকালো রঙের গাধা, একটি ঘোড়া, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

পঞ্চদশ বিষয় (পুত্রদের অধ্যক্ষ হওয়া) ও তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে ইমাম হাসান খিলাফত লাভ করেন। এরপর তাঁর হাজার হাজার বংশধর ইয়ামান, হিজায, মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, পারস্য, ভারত ও অন্যান্য দেশে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের নেতৃত্ব ও অধ্যক্ষত্ব লাভ করেছেন। এখনো পর্যন্ত হেজায, ইয়ামান ও অন্যান্য দেশে তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকে শাসনক্ষমতা বা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করছেন। ইনশা আল্লাহ, ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ থেকে 'মাহদী' আবির্ভূত হবেন। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবেন এবং তাঁর সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর দীন বিজয়ী হবে।

ষষ্টদশ ও সপ্তদশ বিষয় (পুরুষপরম্পরায় তাঁর নাম স্মরণ ও জাতিগণ কর্তৃক চিরকাল তাঁর স্তব) সুস্পষ্ট। যুগের পর যুগ হাজার হাজার মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে

প্রতিদিন পাঁচবার সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছে : "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। অগণিত মুসল্লী প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অগণিত বার তাঁর জন্য সালাত পাঠ করছে । তাঁর দেওয়া কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করছে অগণিত কারী এবং ব্যাখ্যা করছে অগণিত ব্যাখ্যাকার। অগণিত প্রচারক তাঁদের ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে তাঁরই বাণী প্রচার করছেন। জ্ঞানী, গুণী, শাসক, প্রশাসক সকলেই তাঁর দরবারে উপস্থিত হচ্ছেন, দরজার বাইরে থেকে তাঁকে সালাম জানাচ্ছেন, তাঁর রওযা (রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত) বা সালাতের স্থানের মাটি মুখে মাখছেন[১০৪] এবং তাঁর শাফাআত লাভের আশা করছেন।

উপরের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদিও প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ তা দাবি করেন, কিন্তু তাঁদের দাবি বাতিল ও ভিত্তিহীন। মজার ব্যাপার যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৩ অধ্যায়ের অন্য একটি বক্তব্যের বিষয়েও এ সকল পণ্ডিত দাবি করেন যে, তা যীশুর বিষয়েই কথিত। যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্যটি নিম্নরূপ : "তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং এমন আ. .তি নাই যে, তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা (ব্যাধি) পরিচিত হইলেন ; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই। ..... আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত। ... তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল (he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief : and we hid as it were our faces form him; he was despised, and we esteemed him not ..... we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. .... Yet it pleased the LORD to bruise him)".

যিশাইর পুস্তকের এখানে যে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে তা গীতসংহিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত গুণাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর যিশাইয় কথিত এ সকল গুণাবলি যেহেতু যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু যীশুর ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি সুন্দর ছিলেন। এ কথাও সত্য নয় যে, তিনি শক্তিশালী ও প্রতাপশালী ছিলেন, অথবা তিনি খড়্গ পরিধান করেছিলেন, অথবা তাঁর বাণ তীক্ষ্ণ ছিল। এ কথাও সত্য

---

১০৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত বা জান্নাতের একটি বাগান এবং সংক্ষেপে 'রওযা' নামে পরিচিত। এখানে মুসলিমগণ সালাত আদায়ের জন্য সাজদা করেন, বা ভূলুণ্ঠিত হন।

নয় যে, ধনী প্রজারা তাঁর কাছে বিনতি করেছিল, অথবা তারা তাঁর কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছিল বরং তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস অনুসারে তারা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল, লাঞ্ছিত করেছিল, উপহাস করেছিল, বেত্রাঘাত করেছিল এবং সবশেষে ক্রুসবিদ্ধ করেছিল।

এছাড়া যীশুর স্ত্রীও ছিল না, পুত্রও ছিল না। কাজেই এ কথা বলা যাচ্ছে না যে, তাঁর মহিলারত্নদের মধ্যে রাজকন্যারা ছিলেন বা রাজকন্যারা তাঁর সেবা করেছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যাচ্ছে না যে, তাঁর পিতৃগণের পরিবর্তে তাঁর পুত্রেরা পৃথিবীতে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : গীতসংহিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ৮ম (বাংলা অনুবাদে ৭ম) আয়াতটি (তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে) আমি আরবীতে যেভাবে উদ্ধৃত করেছি, আমার নিকট সংরক্ষিত গীতসংহিতার ফার্সী অনুবাদও একইরূপ। খৃস্টানদের মহাপুরুষ পৌলও আয়াতটি এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায়ে এই আয়াতটি- ১৮২১, ১৮৩১, ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনূদিত বাইবেল অনুসারে এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন; "তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে।"[১০৫] ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত ফার্সী অনুবাদে এবং ১৮৩৯, ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদে এভাবেই আয়াতটির অনুবাদ করা হয়েছে। কাজেই কেউ যদি উক্ত আয়াতটি অন্যভাবে অনুবাদ করেন তবে তার অনুবাদ প্রত্যাখ্যাত হবে এবং ভুল বা বিকৃতি বলে গণ্য হবে। তার অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের মহাপুরুষ পৌলের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বাইবেলের সাধারণ মানুষদেরকেও 'ঈশ্বর', 'প্রভু' ইত্যাদি বলা হয়েছে, অসাধারণ মানুষদের তো কথাই নেই। গীতসংহিতার ৮২ গীতের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান (Ye are gods; and all of you are children of the most High)"।

উপরের বিষয় দুটি দ্বারা ড.ফান্ডারের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে। গীতসংহিতার উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এই দাবি প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁর 'মিফতাহুল আসরার'

---

১০৫. ইব্রীয় ১/৯।

নামক গ্রন্থে লিখেছেন : "উল্লিখিত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, "তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ ; এই কারণ, হে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে", আর যীশুখৃষ্ট ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'হে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন' বলা যায় না।

তাঁর এই দাবির বিভ্রান্তি ও অসারতা দু'দিক থেকে প্রমাণিত। প্রথমত, তিনি আয়াতটি যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা ভুল। কারণ তা তাঁদের ধর্মের মহাপুরুষ পৌলের উদ্ধৃতির বিপরীত। দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুবাদ সঠিক হোক্ বা ভুল, সে দিকে না তাকালেও তাঁর পরবর্তী দাবির অসারতা সুস্পষ্ট। কারণ, 'তোমার ঈশ্বর' কথাটি প্রমাণ করে যে, এখানে 'হে ঈশ্বর' বাক্যাংশের 'ঈশ্বর' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ প্রকৃত ঈশ্বরের তো আর ঈশ্বর থাকে না। আর রূপক অর্থে যীশুকে যেমন ঈশ্বর বলা যায়, মুহাম্মাদ (সা)-কেও তেমনি ঈশ্বর বলা যায়।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী

গীতসংহিতার ১৪৯ গীত নিম্নরূপ : "১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও; সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও। ২ ইস্রায়েল্ আপন নির্মাণকর্তাতে আনন্দ করুক, সিয়োন-সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লসিত হউক। ৩ তাহারা নৃত্যযোগে তাঁহার নামের প্রশংসা করুক, তবল ও বীণাযোগে তাঁহার প্রশংসা গান করুক। ৪ কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রতি প্রীত, তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন। ৫ সাধুগণ গৌরবে উল্লসিত হউক; তাহারা আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক। ৬ তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বিধার (দ্বিমুখী) খড়্গ থাকুক; ৭ যেন তাহারা জাতিগণকে প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; ৮ যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহনিগড়ে বদ্ধ করে; ৯ যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই তাঁহার সমস্ত সাধুর মর্যাদা (let the high praises of God be in their mouth, and a two edged sword in their hand; To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; 8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; 9 To execute upon them the judgment written : this honour have all his saints.)"

এই গীতে এমন একজনের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যিনি এবং যার অনুগত সাধুগণ রাজত্ব লাভ করবেন। এখানে তাঁদের গুণাবলি ও মর্যাদার কথা

উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কণ্ঠে থাকবে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং হস্তে থাকবে দুধারি তরবারি। তাঁরা জাতিগণ থেকে প্রতিশোধ নেবে এবং মানুষদেরকে শাস্তি দিবে। **তাঁরা রাজা ও মান্যগণ্য মানুষদেরকে শৃঙ্খলে ও লৌহনিগড়ে বন্দি করবে।**

আমার বক্তব্য এই যে, এখানে মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উপর্যুক্ত গুণাবলি সবই তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। এখানে শলোমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। কারণ ইহূদী খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে শলোমন তাঁর নিজের রাজ্য পিতার রাজ্যের চেয়ে বড় করতে পারেন নি। এছাড়া তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। এখানে উল্লিখিত গুণাবলি থেকে তিনি শত যোজন দূরে। এছাড়া খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে (রাজাগণ ও মান্যগণ্যদেরকে শৃঙ্খলে বা লৌহনিগড়ে বন্ধ করা করা তো দূরের কথা) তিনি নিজেই ধৃত, বন্দি ও নিহত হন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রেরিতদের অধিকাংশই ধৃত এবং শৃঙ্খলে ও লৌহনিগড়ে বদ্ধ হয়েছিলেন, অতঃপর কাফির রাজা ও মান্যগণ্যগণ দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়র পুস্তকের ৪২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৯ দেখ, পূর্বকার বিষয় সকল সিদ্ধ হইল ; আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই। ১০ হে সমুদ্রগামীরা ও সাগরস্থ সকলে, হে উপকূলসমূহ ও তন্নিবাসীরা! তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার প্রশংসা গাও। ১১ প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুন, কেদরের (Kedar) বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক, শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক (প্রশংসা গাও, হে গুহাবাসিগণ), পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক; ১২ তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক, উপকূলসমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক। ১৩ সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন; তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হ্যাঁ, মহানাদ করিবেন; তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন; ১৪ আমি অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, নীরব আছি, ক্ষান্ত রহিয়াছি; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় কোঁকাইয়া উঠিব; আমি এককালে নিশ্বাস টানিয়া ফুৎকার করিব। ১৫ আমি পর্বত ও উপপর্বতগণকে ধ্বংস করিব, তদুপরিস্থ সমস্ত তৃণ শুষ্ক করিব এবং নদনদীকে উপকূল, ও জলাশয় সকল শুষ্ক করিব। ১৬ আমি অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া লইয়া যাইব; যে সকল মার্গ তাহারা জানে

না, সেই সকল মার্গ দিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। ১৭ যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমার উপর নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে।"

নবম আয়াত থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, যিশাইয় ভাববাদী প্রথমে কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। এরপর ভবিষ্যতের নতুন কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। পূর্বের আয়াতগুলিতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন কিছু বিষয়ে পরের– ১০ থেকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই তিনি পরবর্তী ২৩ আয়াতে বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে কে ইহাতে কর্ণপাত করিবে ? কে অবধান করিয়া ভাবীকালের নিমিত্ত তাহা শুনিয়া রাখিবে ?"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে 'নতুন গীত' অর্থ নতুন ধর্মব্যবস্থা এবং ইবাদত-বন্দেগির নতুন পদ্ধতি। আর এই নতুন ব্যবস্থা বলতে মুহাম্মাদ (সা)-এর শরীয়ত বা ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। সমুদ্রগামী, সাগরস্থ, উপকূলবাসী, গ্রামবাসী, নগরবাসী, গুহাবাসী ইত্যাদি সকলকে এই নির্দেশের অধীন করে জানানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থা বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। এখানে 'কেদর' (Kedar)-এর কথা উল্লেখই মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত; কারণ মুহাম্মাদ (সা) এই কেদরেরই বংশধর, যিনি ছিলেন ইসমাঈলের দ্বিতীয় পুত্র।[১০৬]

উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : "পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক।" এ কথা দ্বারা হজ্জের সময় পালিত বিশেষ ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ মহানাদ করেন "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... ।"

"উপকূলসমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক (declare his praise)" বলতে আযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মর্যাদা ঘোষণা করেন।

"সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন" বলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি এবং তাঁর অনুসারিগণ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁরই নির্দেশে জিহাদ করবেন। তাঁদের জিহাদ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিমুক্ত থাকবে। এজন্যই এই ভাববাদী ও তাঁর অনুসারীদের আবির্ভাব ও যাত্রাকে সদাপ্রভুর আবির্ভাব ও যাত্রা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪ আয়াতে জিহাদের বৈধতার কারণ বলা হয়েছে। ১৬ আয়াতে আরবদের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবরা দীন, ধর্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ ও

---

১০৬. আদিপুস্তক ২৫/১৩।

অনবহিত ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত। বর্বর যুগের বিভিন্ন সুসংস্কার ও বিভ্রান্ত রীতিনীতির মধ্যে তারা নিপতিত ছিল। তাদের এই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন : "যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"[১০৭]

"তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই জাতি স্থায়ীভাবে আল্লাহ্র করুণা লাভ করবে। তারা ক্রোধে নিপতিত বা পথভ্রষ্ট হবে না। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে।

"যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমার উপর নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে" বলে আরবদের মধ্যে যারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ না করে এবং অন্যান্য মূর্তিপূজকগণ— যেমন ক্রুশের পূজারিগণ ও সাধু-সন্তদের মূর্তির পূজারিগণ কি প্রকারের লজ্জা, লাঞ্ছনা ও পরাজয় লাভ করবে তা জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আরবের মূর্তিপূজকগণ, বায়যান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস এবং পারস্য সম্রাট মুহাম্মাদ (সা)-এর আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু পরিপূর্ণ লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটে নি। চূড়ান্ত পরিণতিতে আরব উপদ্বীপ থেকে মূর্তিপূজা ও শির্ক চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পারস্যে কিসরার সাম্রাজ্য বিলীন হয়েছে। সিরিয়া থেকে ক্রুশের পূজারিদের রাজত্ব একেবারে তিরোহিত হয়েছে। বোখারা, কাবুল ও অন্যান্য অনেক এলাকা থেকে শির্ক ও মূর্তিপূজা চিরতরে বিলীন হয়েছে। ভারত, সিন্ধু ও অন্যান্য অনেক দেশে তা কমে গিয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রসারিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক নবম ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়র পুস্তকের ৫৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে! তুমি আনন্দগান কর, অয়ি গর্ভব্যথা-রহিতে, তুমি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর, ও হর্ষনাদ কর; কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক (more are the children of the desolate than the children of the married wife). ইহা সদাপ্রভু কহেন। ২ তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর, তোমার শিবিরের যবনিকা বিস্তারিত হউক, ব্যয়শঙ্কা করিও না; তোমার রজ্জু সকল দীর্ঘ কর, তোমার গোঁজ সকল দৃঢ় কর। ৩ কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণা হইবে, তোমার বংশ জাতিগণের অধিকার পাইবে, এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক বসাইবে। ৪ ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবে না; বিষণ্ন হইও না, কেননা তুমি অপ্রতিভ হইবে না;

১০৭. সূরা আলে-ইমরান ১৬৪ আয়াত ও সূরা জুমু'আ, ২ আয়াত।

কারণ তুমি আপন যৌবনের অপমান ভুলিয়া যাইবে, আর তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না। ৫ কেননা তোমার নির্মাতা তোমার পতি, তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু; আর ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার মুক্তিদাতা, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইবেন। ৬ কারণ সদাপ্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিতা স্ত্রীর ন্যায়, কিংবা দূরীকৃতা যৌবনকালীয় ভার্যার ন্যায় ডাকিয়াছেন; ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন। ৭ আমি ক্ষুদ্র নিমেষ কালের জন্য তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু মহাকরুণায় তোমাকে সংগ্রহ করিব। ৮ আমি কোপাবেশে এক নিমেষমাত্র তোমা হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকাল স্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন। ৯ বস্তুতঃ আমার নিকটে ইহা নোহের জলসমূহের সদৃশ; কারণ আমি যেমন শপথ করিয়াছি যে, নোহের জলসমূহ আর ভূতল আপ্লাবিত করিবে না, তেমনি এই শপথ করিলাম যে, তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, তোমাকে আর ভর্ৎসনাও করিব না। ১০ বস্তুতঃ পর্বতগণ সরিয়া যাইবে, উপপর্বতগণ টলিবে; কিন্তু আমার দয়া তোমা হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-নিয়ম টলিবে না; যিনি তোমার প্রতি অনুকম্পা করেন, সেই সদাপ্রভু ইহা কহেন। ১১ অয়ি দুঃখিনি, অয়ি ঝটিকা-দুলিতে ও সান্ত্বনাবিহীনে, দেখ, আমি রসাঞ্জন দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, নীলকান্তমণি দ্বারা তোমার ভিত্তিমূল স্থাপন করিব; ১২ আর পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার আলিসা, ও সূর্যকান্তমণি দ্বারা তোমার পুরদ্বার সকল, ও মনোহর প্রস্তর দ্বারা তোমার সমস্ত পরিসীমা নির্মাণ করিব। ১৩ আর তোমার সন্তানেরা সকলে সদাপ্রভুর কাছে শিক্ষা পাইবে, আর তোমার সন্তানদের পরম শান্তি হইবে। ১৪ তুমি ধার্মিকতায় স্থিরীকৃত হইবে; তুমি উপদ্রব হইতে দূরে থাকিবে, বস্তুতঃ তুমি ভীত হইবে না; এবং ত্রাস হইতে দূরে থাকিবে, বাস্তবিক তাহা তোমার নিকটে আসিবে না। ১৫ দেখ, লোকে যদি দল বাঁধে, তাহা আমা হইতে হয় না; যে কেহ তোমার বিপক্ষে দল বাঁধে, সে তোমা হেতু পতিত হইবে। ১৬ দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়, আর আপন কার্যের জন্য অস্ত্র গঠন করে, আমিই তাহার সৃষ্টি করিয়াছি, বিনাশ করণার্থে নাশকের সৃষ্টিও আমিই করিয়াছি। যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; যে কোন জিহ্বা বিচারে তোমার প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে তুমি দোষী করিবে। সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্মিকতা লাভ হয়, ইহা সদাপ্রভু কহেন।”

আমার বক্তব্য এই যে, এখানে প্রথম আয়াতে ‘বন্ধ্যে’ বলতে পবিত্র মক্কা বুঝানো হয়েছে। কারণ ইসমাঈল (আ)-এর পরে তথায় কোন ভাববাদী (নবী) আগমন করেন নি এবং কোন ওহী বা প্রত্যাদেশও তথায় আগমন করে নি। যিরূশালেমের অবস্থা ছিল

সম্পূর্ণ বিপরীত। তথায় অসংখ্য ভাববাদী আগমন করেছেন এবং ভাববাণীর অবতরণ ঘটেছে।

এ আয়াতে 'অনাথার সন্তানগণ' বা 'পরিত্যক্তার সন্তানগণ' (children of the desolate) বলতে হাগারের সন্তানগণকে বুঝানো হয়েছে; কারণ তাঁকে এমনভাবে বাড়ি থেকে বের করে প্রান্তরে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি পরিত্যক্তা অনাথার মতই ছিলেন। এজন্যই ইশ্মায়েলের বিষয়ে হাগারকে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, সেখানে ইশ্মায়েলকে 'বন্য' বা 'বন্য গর্দভ স্বরূপ মনুষ্য' বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে : "আর সে বন্য গর্দভস্বরূপ মনুষ্য হইবে (And he will be a wild man[১০৮] /He shall be a wild ass as a man[১০৯])।" আদি পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে।[১১০] আর এখানে 'সধবার সন্তানগণ' (the children of the married wife) বলতে সারার সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এভাবে 'সদাপ্রভু' মক্কাকে সম্বোধন করে তাকে নির্দেশ দিলেন, ঈশ্বরের বন্দনা ও আনন্দগান করতে নির্দেশ দিলেন; কারণ হাগারের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই সারার সন্তানদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হয়েছেন। এভাবে মক্কার অধিবাসীদের মর্যাদালাভের মাধ্যমে মক্কা মর্যাদাবান হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এবং হাগারের সন্তানদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ (সা)-কে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশেষ নবী (ভাববাদী) হিসেবে প্রেরণ করার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। "যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয় (the smith that bloweth the coals in the fire)" বলতে তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। তিনিই নাশক যাকে অবিশ্বাসীদের বিনাশ করণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে (the waster to destroy).

এই নবীর মাধ্যমেই মক্কা যে প্রশস্ততা ও বিস্তার লাভ করেছে তা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মধাম লাভ করে নি। মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও কা'বা ঘরের মত দ্বিতীয় কোন ধর্মধাম নেই। বিগত ১২৮০ বছর যাবৎ পবিত্র কা'বাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ কুরবানী পেশ করা হয় এবং যে মর্যাদা লাভ করে যিরূশালেমের ধর্মধাম তা মাত্র দু'বার লাভ করেছে। প্রথমবার শলোমনের সময়ে, যখন তিনি ধর্মধামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন (খৃস্টপূর্ব ৯৬০ সালের দিকে)। দ্বিতীয়বার যিহূদা (Judah) রাজ্যের রাজা যোশিয়র (Joshiah) রাজত্বের (খৃ. পূ. ৬৪০-৬০৯) ১৮শ বছরে (খৃস্টপূর্ব ৬২১ অব্দের দিকে, প্রথম বারের প্রায় সোয়া তিনশত বছর পরে)।

১০৮. KJV (AV)

১০৯. RSV

১১০. আদিপুস্তক ১৬/১২।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মক্কার এই মর্যাদা চিরকাল স্থায়ী থাকবে। এই স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেছেন : "ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবে না; বিষণ্ন হইও না, কেননা তুমি অপ্রতিহত হইবে না।" তিনি আরো বলেছেন, "মহাকরুণায় তোমাকে সংগ্রহ করিব..অনন্তকাল স্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব।" তিনি আরো বলেছেন : "এই শপথ করিলাম যে, তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, তোমাকে আর ভর্ৎসনা করিব না।" তিনি আরো বলেছেন : "কিন্তু আমার দয়া তোমা হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-নিয়ম টলিবে না।" এভাবেই তিনি মক্কার মর্যাদার স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে, হিজরতের ২২ বছরের মধ্যে মক্কার সন্তানেরা (seed of Makkah) পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি ও অধিকার লাভ করেছেন, জাতিসমূহের উত্তরাধিকার তাঁরাই লাভ করেছেন এবং তাঁরা দেশ, শহর ও জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও আবাদ করেছেন। আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সা)-এর যুগ পর্যন্ত অন্য কোন ভাববাদী বা নতুন ধর্মের প্রবর্তক কখনোই এত অল্প সময়ে এরূপ বিজয় লাভ করেছেন বলে শোনা যায় না। এরই ভবিষ্যদ্বাণী করে সদাপ্রভু বললেন, "তোমার বংশ জাতিগণের অধিকার পাইবে, এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক বসাইবে (thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited)।"

আল্লাহ্ উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন, "যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয় তাহা সার্থক হইবে না।" তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যে ব্যক্তিই মক্কা বা কা'বার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাকেই আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেছেন। হস্তী-বাহিনীকে তিনি এভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন। হস্তিবাহিনীর ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ : আরবের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত ইয়ামান ছিল ইথিওপিয়ার প্রভাবাধীন। ইথিওপিয়ার সম্রাট বা নাজাশী (the Negus of Ethiopia) আসহামার নির্দেশে ইয়ামানের শাসক আবরাহা ইবনু সাবাহ আল-আশরাম ইয়ামানের রাজধানী 'সান'আ'-তে একটি গীর্জা তৈরি করে। সে গীর্জাটির নাম রাখে 'আল-কুলাইস।' তার ইচ্ছা ছিল যে, আরবদের হজ্জ হবে এই নতুন 'গীর্জাকে' কেন্দ্র করে। এজন্য সে কা'বাঘর ভেঙ্গে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেন এবং ইথিওপীয় সৈন্যর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয়। তার সাথে কিছু হাতি ছিল। সেগুলি মধ্যে একটি বিশাল শক্তিশালী হাতি ছিল, যার নাম 'মাহমূদ' ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। আবরাহার আগমনের সংবাদে (মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্রপতি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদা) আবদুল মুত্তালিব তার নিকট গমন করে তাকে তিহামা অঞ্চলের উৎপাদিত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আবরাহা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং

তার বাহিনীকে কা'বা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করে। সে তার প্রধান হস্তীকে অগ্রবর্তী করে। হাতিটিকে কাবামুখি করলেই সে বসে পড়ছিল। আর ইয়ামান বা অন্য কোন দিকে মুখ করালে সে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এ সময়ে আল্লাহ্ কিছু পাখি প্রেরণ করেন। প্রতিটি পাখির মুখে একটি ও দুই পায়ে দুটি ছোট কাঁকর ছিল। কাঁকরগুলি ছিল মসুরের দানার চেয়ে বড় এবং মটর দানার চেয়ে ছোট। একেকটি পাথর একেকজন সৈন্যের মাথার উপরে পড়ে তার গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেক পাথরের গায়ে যে ব্যক্তির মাথায় তা পড়ছিল তার নাম লেখা ছিল। এই অবস্থায় আবরাহার সৈন্যরা পালাতে থাকে এবং পথে-প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহা নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পচন ধরে। অবশেষে বুক ফেটে হৃদযন্ত্র বেরিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। আবরাহার উযির আবূ ইয়াকসূম পালিয়ে ইথিওপিয়ায় নাজাশীর নিকট যাত্রা শুরু করে। একটি পাখি তার মাথার উপর চক্কর দিতে থাকে। সে নাজাশীর নিকট পৌছে তাকে ঘটনার বিবরণ প্রদান করে। তার বর্ণনা শেষ হওয়ার পরে তার মাথার উপরে কাঁকর নিপতিত হয় এবং নাজাশীর সামনেই সে মৃত্যুবরণ করে। মহান আল্লাহ্ সূরা ফীল-এ এদের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উপর্যুক্ত প্রতিশ্রুতির কারণেই কানা দাজ্জাল (Anti-Christ) মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে তা বলা হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক দশম ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয়র পুস্তকের ৬৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার অনুসন্ধান করিতে দিয়াছি; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিয়াছি; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই, তাহাকে আমি কহিলাম, 'দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।' ২ আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে। ৩ সেই ইজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা কবরস্থানে বসে, গুপ্তস্থানে রাত্রি যাপন করে (Which remain among the graves, and lodge in the monuments); তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে, ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নি। ৬ দেখ, আমার সম্মুখে ইহা লিখিত আছে; আমি নীরব থাকিব না, প্রতিফল দিব; ইহাদের কোলেই প্রতিফল দিব।"

এখানে 'যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই' এবং 'যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই' বলতে আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না এবং অনুসন্ধানও করত না। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করে, সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব (গ্রন্থ) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"[১১১] পাঠক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন যে, 'যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই' এবং 'যাহারা অনুসন্ধান করে নাই' বলতে গ্রীক জাতিকে বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে 'বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের' যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা ইহূদী ও খৃস্টান উভয় জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চতুর্থ আয়াতে উল্লিখিত বিশেষণগুলি (কবর ও সমাধির প্রতি অতিভক্তি, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা ও ভক্তি করা, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা ইত্যাদি) খৃস্টানদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর পঞ্চম আয়াতে উল্লিখিত বিষয়াদি (আমার নিকট এস না, আমি তোমার চেয়ে পবিত্র..) ইহূদীদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। এ সকল কারণে মহান প্রতিপালক এই দুই বিদ্রোহী জাতিকে পরিত্যাগ করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বেছে নিয়েছেন।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

দানিয়েলের পুস্তকের ২ অধ্যায়ে ব্যাবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) স্বপ্ন ও তাঁর ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। নবূখদ্‌নিৎসর স্বপ্ন দর্শন করে এ বিষয়ে বিদ্বান মানুষদের নিকট ব্যাখ্যা জানতে চান। অবশেষে দানিয়েল ভাববাদী ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভাববাণীর মাধ্যমে স্বপ্নের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় বলেন : "৩১ হে মহারাজ! আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। ৩২ সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষ ও বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়; ৩৩ তাহার জঙ্ঘা লৌহময় এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। ৩৪ আপনি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেইগুলি চূর্ণ করিল। ৩৫ তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সেই সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া

১১১. সূরা আলে-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।

গেল না। আর যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী চূর্ণ করিল। ৩৬ স্বপ্নটি এই; এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে ইহার তাৎপর্য জ্ঞাত করি। ৩৭ হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ! স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন। ৩৮ আর যে কোন স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে, সেই স্থানে তিনি মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহাদের সকলের উপরে আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন; আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক। ৩৯ আপনার পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ৪০ আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; কারণ লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করে ও পাড়িয়া ফেলে, লৌহ যেমন এই সকল চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই রাজ্য সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। ৪১ আপনি দেখিয়াছেন, দুই চরণ ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বুঝায়; কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি কর্দমে মিশ্রিত লৌহ দেখিয়াছেন। ৪২ আর চরণের অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃন্ময় ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে। ৪৩ আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না। ৪৪ আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। ৪৫ কারণ আপনি ত দেখিয়াছেন, পর্বত হইতে একখানি প্রস্তর বিনা হস্তে খনিত হইল এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল; মহান ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন; স্বপ্নটি নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য সত্য।"

এখানে প্রথম রাজ্য রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) রাজ্য (Chaldean dynasty)। দ্বিতীয় রাজ্য মাদীয়দের (Medes/Median Kingdom) রাজ্য। দানিয়েলের পুস্তকের ৫ অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের (Nebuchadnezzar) পুত্র বেল্‌শৎসর (Belshazzar) -এর হত্যার পর মাদীয়গণ তার রাজ্য অধিকার করে।[১১২] কেলদীয়ের রাজ্যের তুলনায় মাদীয়দের রাজ্য দুর্বলতর ছিল। তৃতীয় রাজ্য ছিল আকিয়ামেনিয়ান (Achaemenian) রাজ্য। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ সালে পারস্যের রাজা সাইরাস (Cyrus) ব্যাবিল অধিকার করেন। এই সাইরাসকেই পাদরিগণ 'কায়খসরু' বলে ধারণা করেন। পারসীয় আকিয়ামিনিয়ান

১১২. দানিয়েল ৫/২৮-৩১।

শাসকগণ সমস্ত পৃথিবীর[১১৩] উপরে কর্তৃত্বশীল বলে গণ্য হওয়ার মত প্রবল প্রতাপের অধিকারী ছিলেন। চতুর্থ রাজ্য বলতে গ্রীক সম্রাট ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের রাজ্য বুঝানো হয়েছে। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩৩০ সালের দিকে সাইরাসের রাজ্য অধিকার করেন। এই রাজ্য ক্ষমতা ও প্রতাপে লৌহের মতই ছিল। আলেকজান্ডারের অধিকারের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য কতগুলি আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে সাসানীয়দের আবির্ভাব পর্যন্ত এদের প্রতাপ দুর্বলই থাকে। এদের আবির্ভাবের পরে তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এভাবে পারস্য রাজ্য দুর্বলতা ও প্রতাপের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। প্রসিদ্ধ সাসানী সম্রাট খসরু আনুশেরওয়াঁর (Khosrow An shirvan/ Khosrow/Chosroes I) শাসনামলে (৫৩১-৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্ম হয় এবং আল্লাহ্ তাঁকে প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ রাজত্ব প্রদান করেন। যে পারস্য রাজ্য সম্পর্কে এ স্বপ্ন দেখা হয়েছিল ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল স্থান তাঁর অনুসারীরা অধিকার করেন। এই চিরস্থায়ী রাজ্য, যা কখনো বিনষ্ট হবে না এবং এ রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হবে না। অচিরেই ইমাম মাহদীর সময়ে এই রাজ্যর পরিপূর্ণতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কিছু দুর্বলতা ও অস্থিতিশীলতা দেখা যাবে, যার কিছু আলামত বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সাথে সাথে সে দুর্বলতা দূরীভূত হবে এবং দীন সব আল্লাহ্রই হবে। মুহাম্মাদ (সা)-ই সেই প্রস্তর, যা 'পর্বত হইতে বিনা হস্তে খনিত হইল এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল।'

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

যীশুর প্রেরিত শিষ্য যিহূদা তাঁর পত্রে হনোক (Enoch) ভাববাদীর (ইদরীস আ) একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। হনোক ছিলেন আদমের পরে সপ্তম পুরুষ বা সপ্তম প্রজন্মের মানুষ। খৃস্টান ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে হনোকের স্বর্গারোহণের ৩০১৭ বছর পরে যীশুখৃস্ট জন্মগ্রহণ করেন। আমি এখানে যিহূদা ভাববাদীর এই উদ্ধৃতিটি ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী বাইবেল থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি।

"প্রভু আপন অযুত পবিত্র লোকের (ten thousands of his saints (AV)/holy myriads (RSV) সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন (execute judgment upon all); ১৫ আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং ভক্তিহীন পাপিগণ তাঁহার

১১৩. বস্তুত এই স্বপ্নে ও ব্যাখ্যায় নেবুকাদনেযারের রাজ্যের কথাই বলা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী বলতেও মূলত তার রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল বুঝানো হয়েছে বলেই মনে হয়। অর্থাৎ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, এশিয়া মাইনর ইত্যাদি।

বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যেন ভর্ৎসনা করেন (to convince (AV)/to convict (RSV) ।"

পাঠক চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকা থেকে জেনেছেন যে, গুরু, ভক্তিভাজন ও শিক্ষককে 'প্রভু' বা 'রাব্ব' (Lord) বলা বাইবেলে খুবই ব্যাপক। কাজেই এ বিষয়ে আর নতুন কথা বলার প্রয়োজন নেই। আর বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই পবিত্র লোক (saint) শব্দের ব্যবহার বিশ্বাসী মানুষদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। যেমন,

(১) ইয়োবের (আইউব, আ) পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াত নিম্নরূপ : "তুমি ডাক দেখি, কেহ কি তোমাকে উত্তর দিবে ? পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কাহার স্মরণ লইবে (to which of the saints wilt thou turn)?"

এখানে 'পবিত্রগণ' বলতে ইয়োবের এ কথা বলার সময়ে তাঁর সমাজে বিরাজমান বিশ্বাসী ও ধার্মিকগণকে বুঝানো হয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা অনুসারে এ কথা সুস্পষ্ট। আর ক্যাথলিকগণের বিশ্বাস অনুসারেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের স্থান (purgatory) বা পৃথিবীর নরক (hell on earth) যেখানে ধার্মিক মানুষদের আত্মাকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং পোপের পক্ষ থেকে ক্ষমাপত্র লাভের পরই এই শাস্তি থেকে ধার্মিক মানুষেরা মুক্তি লাভ করবে। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ইয়োবের যুগে এই শাস্তি-স্থান (Purgatory)-এর অস্তিত্ব ছিল না, যীশুর পরেই তা অস্তিত্ব পেয়েছে।

(২) করিন্থীয়দের প্রতি লিখিত পৌলের প্রথম প্রত্রের ১ম অধ্যায়ের ২ আয়াত নিম্নরূপ : "করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীস্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত (sanctified) ও আহূত পবিত্রগণের (saints) সমীপে।"

এখানে 'পবিত্রকৃত ও পবিত্রগণ' বলতে করিন্থে বিদ্যমান বিশ্বাসী খৃস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১২ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে : "পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও (Distributing to the necessity of saints (AV)/Contribute to the needs of the saints (RSV) ।"

(৪) ও (৫) রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২৫ কিন্তু এক্ষণে পবিত্রগণের (saints) পরিচর্যা করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। ২৬ কারণ যিরূশালেমস্থ পবিত্রগণের মধ্যে যাহারা দীনহীন (the poor saints), তাহাদের জন্য মেসিডোনিয়া (Macedonia) ও আখায়া (Achaia) দেশীয়েরা প্রীত হইয়া সহভাগিতা-সূচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে।"

এই দুই আয়াতেও 'পবিত্রগণ' বলতে যিরূশালেমে বিদ্যমান জীবিত বিশ্বাসিগণকে বুঝানো হয়েছে।

(৬) ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১ম অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : "পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস-খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক (saints) ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের... সমীপে।"

এখানেও 'পবিত্রগণ' বলতে ফিলিপীতে বসবাসরত বিশ্বাসিগণকে বুঝানো হয়েছে।

(৭) তিমথীয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৫ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে চার্চের বিধবা সেবিকাদের বিষয়ে বলা হয়েছে : "যদি পবিত্রদিগের পা ধুইয়া থাকে (if she have washed the saints feet)... ।"

দুটি বিষয় নিশ্চিত করে যে, এখানেও 'পবিত্রগণ' বলতে জীবিত বিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে :

প্রথমত, স্বর্গে বিদ্যমান বা স্বর্গীয় পবিত্রগণ তো আত্মা, তাদের দেহ বা পা নেই।

দ্বিতীয়ত, বিধবা সেবিকাদের পক্ষে আকাশে যেয়ে স্বর্গের পবিত্রগণের পা ধুয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক 'প্রভু' ও 'পবিত্র' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার জানলেন। এর আলোকে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, এখানে 'প্রভু' বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে এবং 'পবিত্র লোকগণ' বলতে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের ভবিষ্যত আগমনকে সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বলে বুঝানোর জন্য 'আসিবেন' না বলে 'আসিলেন' বা অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

বস্তুতই মুহাম্মাদ (সা) আসলেন তাঁর অযুত পবিত্রগণকে নিয়ে,[১১৪] এসে তিনি সকল শ্রেণীর অবিশ্বাসীর বিচার করলেন। মুনাফিক ও পাপিগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কঠোর বাক্যসমূহের কারণে। মুশরিক বা অংশীবাদিগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর রাসূলগণের ভাববাদিত্ব গ্রহণ না করার কারণে। ইহূদীদেরকে ভর্ৎসনা করেন যীশু ও মরিয়মের বিষয়ে কঠোর বাক্য এবং তাদের অন্যান্য বাতিল বিশ্বাসের কারণে। আর তিনি খৃস্টানগণকে ভর্ৎসনা করেন আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে অবহেলা করা, যীশুর বিষয়ে তাদের বাড়াবাড়ি, তাদের অনেকের ক্রুশ ও প্রতিমা পূজা এবং অন্যান্য বাতিল ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের কারণে।

---

১১৪. বিশেষ করে, মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি দশ সহস্র সাহাবী নিয়েই আগমন করেছিলেন।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ত্রয়োদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার (Judaea) প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন; ২ তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও' কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল (Repent Ye: for the kingdom of heaven is at hand)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১২ পরে যোহন কারাগারে সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালীলে চলিয়া গেলেন; ...১৭ সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল (Repent: for the kingdom of heaven is at hand)। ... ২৭ পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন (preaching the gospel of the kingdom)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে নিম্নরূপ প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন : "অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, ... তোমার রাজ্য আইসুক (thy kingdom come)।"[১১৫]

যীশু তাঁর দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্যকে ইস্রায়েলীয়দের দেশে দেশে প্রচার করতে প্রেরণ করেন। এ সময়ে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। এ সকল নির্দেশের মধ্যে রয়েছে : "আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল' (The kingdom of heaven is at hand)।" মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে এ কথা রয়েছে।[১১৬]

লূকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পরে তিনি সেই বারো জনকে একত্রে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত ভূতের উপরে, এবং রোগ ভাল করিবার জন্য, শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন ২ আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে (to preach the kingdom of God) এবং আরোগ্য করিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন, ... তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৮ আর তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ করে, তবে যাহা তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে, তাহাই ভোজন করিও। ৯ আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ

---

১১৫. মথি ৬/৯-১০।

১১৬. মথি ১০/৭।

করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল (The kingdom of God is come nigh unto you)।

"১০ কিন্তু তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তবে বাহির হইয়া সেই নগরের পথে পথে গিয়া এই কথা বলিও, ১১ তোমাদের নগরের যে ধুলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাড়িয়া দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল (the kingdom of God is come nigh unto you)।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যোহন বাপ্তাইজক, যীশুখৃষ্ট, তাঁর দ্বাদশ প্রেরিত এবং তাঁর ৭০ জন শিষ্য সকলেই 'ঈশ্বরের রাজ্যের' আগমনবার্তা প্রচার করছিলেন। যোহন বাপ্তাইজক যে শব্দে এই রাজ্যের আগমন বার্তা প্রচার করেছেন, অবিকল সেই শব্দেই যীশু তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, এই রাজ্যের আগমন বা প্রকাশ যোহনের জীবদ্দশায় ঘটেনি। অনুরূপভাবে যীশুর সময়েও এই রাজ্যের আগমন বা প্রকাশ ঘটেনি। প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণের যুগেও তা আগমন করেনি বা প্রকাশিত হয় নি। কারণ তাঁরা সকলেই আগমনের সুসংবাদ প্রচার করছেন, আগত 'রাজ্যের' মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করছেন এবং তাঁর আগমনের আশা প্রকাশ করছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'স্বর্গের রাজ্য' বলতে যীশুখৃষ্ট প্রচারিত ধর্ম বা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত 'মুক্তির পথ' বুঝানো হয় নি। যদি ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গের রাজ্য বলতে যীশুর প্রচারিত ধর্ম বা মুক্তির পথ বুঝানো হতো তবে কখনোই যীশু বা তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যগণ বলতেন না যে, 'ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল।' অনুরূপভাবে সেক্ষেত্রে তিনি কখনোই তাঁর শিষ্যদিগকে 'তোমার রাজ্য আইসুক' বলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে শিখাতেন না। কারণ যীশুর প্রচারের শুরুতেই তো তাঁর প্রচারিত 'মুক্তির পথ' বা নতুন ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে; কাজেই তা সন্নিকটে বলার বা তাঁর আগমনের জন্য প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না।

বস্তুত, উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'স্বর্গ-রাজ্য' বলতে বুঝানো হয়েছে মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থা এবং তাঁর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত 'মুক্তির পথ।' এভাবে তাঁরা সকলেই এই মহান ব্যবস্থা ও চূড়ান্ত মুক্তির পথের আগমন বার্তা প্রচার করে গিয়েছেন। আর 'স্বর্গ রাজ্য' শব্দ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থা ও 'মুক্তির পথ' 'জাগতিক রাজত্ব' আকারে প্রকাশিত হবে, অসহায়ত্ব বা দুর্বলতারূপে নয়। এই রাজ্যের কারণে বিরোধীদের সাথে বিতর্ক ও যুদ্ধ হবে এবং এই রাজ্যের ভিত্তি হবে স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের উপরে। এ সকল বিষয় সবই মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ হয়ত বলতে পারেন, এ সকল উদ্ধৃতিতে 'স্বর্গ-রাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' বলতে খৃস্টের দ্বিতীয় আগমনের পরে সারা বিশ্বে খৃস্টধর্মের প্রসার বুঝানো হয়েছে। এরূপ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্বল এবং এ সকল উদ্ধৃতির বাহ্যিক অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, উপরন্তু স্বয়ং যীশু 'স্বর্গ-রাজ্যের' যে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন তা খৃস্টান পণ্ডিতদের এরূপ ব্যাখ্যা বাতিল বলে প্রমাণ করে।

যেমন, মথির সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে যীশু বলেছেন : "স্বর্গ-রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিলেন।" এরপর তিনি বলেছেন, "স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন ব্যক্তি লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল।" এরপর তিনি বলেছেন : "স্বর্গ-রাজ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল।"[১১৭]

এভাবে যীশু প্রথমে 'স্বর্গ-রাজ্যকে' তুলনা করেছেন একজন বপনকারী ব্যক্তির সাথে, ফসলের বৃদ্ধির সাথে তুলনা করেন নি। এরপর তিনি স্বর্গরাজ্যকে তুলনা করেছেন সরিষা-দানার সাথে, সরিষাদানার বেড়ে উঠার সাথে তুলনা করেন নি। এরপর তিনি স্বর্গরাজ্যকে তুলনা করেছেন 'তাড়ীর' সাথে, সমস্ত ময়দার তাড়ীময় হওয়ার সাথে নয়।

মথিলিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে যীশু যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তাও খৃস্টান পণ্ডিতদের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা বাতিল বলে প্রমাণ করে। যীশু বলেছেন : "এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।"[১১৮]

এ কথাও প্রমাণ করে যে, 'স্বর্গ-রাজ্য' বা ঈশ্বরের রাজ্য' বলতে 'মুক্তির পথ' বুঝানো হয়েছে, 'মুক্তির পথের প্রসারতা বা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া' বুঝানো হয় নি। তা না হলে 'কেড়ে নেওয়ার' কোন অর্থ হয় না। 'মুক্তির পথের প্রসারতা ও ব্যাপকতা' এক জাতির নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে প্রদান করার কি কোন অর্থ হয়?

এভাবে আমরা দেখছি যে, যোহন, যীশু, প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণের বক্তব্যে যে 'স্বর্গ-রাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্যে'র আগমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তা মূলত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত ও ইসলামের আগমন সংবাদ। ইসলামই পৃথিবীতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা স্বর্গ-রাজ্য। এই রাজ্যেরই সুসংবাদ দিয়েছেন দানিয়েল (আ) তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই রাজ্য ও সেই রাজ্য উভয়েরই প্রতিপাদ্য মুহাম্মাদ (সা)। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ।

---

১১৭. মথি ১৩/২৪, ৩১, ৩৩।

১১৮. মথি ২১/৪৩।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক চতুর্দশ ভবিষদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন ব্যক্তি লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩২ সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে।"

তাহলে স্বর্গ-রাজ্য সেই মুক্তি-পথ যা মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তিনি এমন এক জাতির মধ্যে আগমন করেন যে জাতি বিশ্বের সামনে অত্যন্ত অবহেলিত ও ক্ষুদ্র ছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির জ্ঞান থেকে অজ্ঞ ছিল এবং দৈহিক আনন্দ-উপভোগ ও জাগতিক বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত ছিল। বিশেষত ইহূদীরা তাদেরকে খুবই ক্ষুদ্র ভাবত, কারণ তারা ছিল হাগারের সন্তান। আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেন। এজন্য অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় বাহ্যত তাঁর ব্যবস্থা ছিল শুরুতে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা বেড়ে উঠে, সর্বজনীন হয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থার চেয়ে বড় হয়ে যায়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। যাদের কোন ব্যবস্থা বা ধর্ম ছিল না তারাও এই ধর্মের অনুগামী হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক পঞ্চদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। ২ তিনি মজুরদের সহিত দিনে এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ৩ পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে, ৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। ৬ পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ ? ৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। ৮ পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দেও। ৯ তাহাতে যাহারা এগার

ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক এক জন এক এক সিকি পাইল। ১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। ১১ পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ১২ শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন। ১৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহিলেন, হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই ? ১৪ তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। ১৫ আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই ? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে ? ১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে। কারণ অনেককেই ডাকা হইবে, কিন্তু অল্পই নির্বাচিত হইবে (for many be called, but few chosen)।"[১১৯]

আর মুহাম্মাদের উম্মতরাই শেষের এবং তাঁরাই পুরস্কার ও পারিশ্রমিকে প্রথম। তাঁরাই শেষ কিন্তু প্রথম। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমরাই শেষে এসে অগ্রবর্তী।" তিনি আরো বলেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ থাকবে এবং আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।"

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ষষ্ঠদশ ভবিষ্যদ্বাণী

মথির সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৩ আর একটি দৃষ্টান্ত শুন; একজন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষাকুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। ৩৪ আর ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫ তখন কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। ৩৬ আবার তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের প্রতিও তাহারা সেই মত ব্যবহার করিল। ৩৭ অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। ৩৮ কিন্তু কৃষকেরা

---

১১৯. শেষের নিম্নরেখ বাক্যটি গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠ ও ইংরেজি বাইবেলে (AV/KJV) বিদ্যমান। তবে বাংলা বাইবেলে বাক্যটি নেই। অনুরূপভাবে ইংরেজি RSV-এও বাক্যটি নেই।

পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। ৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। ৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন ? ৪১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে। ৪২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুৎ ?' ৪৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে। ৪৪ আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে। ৪৫ তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয় বলিতেছেন।"

এখানে 'গৃহকর্তা' বলতে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। 'দ্রাক্ষাক্ষেত্র' বলতে ধর্মব্যবস্থা বা শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। "তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষাকুণ্ডু খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন" বলতে ব্যবস্থার বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ বুঝানো হয়েছে। 'দুষ্ট কৃষকগণ' বলতে ইহূদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, প্রধান যাজকগণ, ফরীশীগণ যাদের অন্তর্ভুক্ত। 'নিজ দাসগণ' বলতে ভাববাদিগণকে বুঝানো হয়েছে। 'পুত্র' বলতে যীশুকে বুঝানো হয়েছে, আর চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, যীশুকে পুত্র বলা বাইবেলীয় পরিভাষা অনুসারে কোন আপত্তিকর বিষয় নয়। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ইহূদীরা তাঁকে হত্যা করেছে। 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে' বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। 'যে জাতি তাহার ফল দিবে' বলতে মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে। "এই সেই প্রস্তর যার উপরে কেউ পড়লে সে ভগ্ন হবে; কিন্তু এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, তাকে চূরমার করে ফেলবে।"

খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে' বলতে যীশুকে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন কারণে তাদের দাবি বাতিল বলে প্রমাণ হয় :

প্রথমত, দায়ূদ ১১৮ গীতে বলেছেন, "২২ গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ২৩ ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।"

যীশু ইহূদী ছিলেন, যিহূদার বংশধর ছিলেন এবং দায়ূদেরই বংশধর ছিলেন। কাজেই যদি এই পাথর বলতে যীশুকেই বুঝানো হতো তবে সাধারণভাবে ইহূদীদের দৃষ্টিতে তা অদ্ভুত বলে গণ্য হতো না। বিশেষত দায়ূদের দৃষ্টিতে তা কখনোই অদ্ভুত বলে গণ্য হতো না; কেননা খৃস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, দায়ূদ তাঁর গীতসমূহে অত্যন্ত জোরালোভাবে যীশুর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি যীশুর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করতেন। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের বংশধরের বিষয় অন্যরকম। ইস্রায়েলীয়গণ সর্বদা তাদেরকে অত্যন্ত অবহেলা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। কাজেই তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ কোণের প্রধান প্রস্তর হয়ে যায় তবে তা তাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, এই প্রস্তর সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে : "আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।" এ বিষয়টি যীশুর ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন : "আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি।" যোহনের সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে কথাটি রয়েছে।[১২০] পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রযোজ্যতা বুঝতে কোন ব্যাখ্যা লাগে না। দুষ্ট ও পাপীদেরকে বুঝানো এবং ভর্ৎসনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি কেউ তাঁর উপরে পতিত হয়েছে তবে সে ভগ্ন হয়েছে। আর যদি তিনি কারো উপরে পতিত হয়েছেন তবে সে চুরমার হয়েছে।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমার ও ভাববাদিগণের (নবীগণের) দৃষ্টান্ত একটি প্রাসাদের ন্যায় যা সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এক কোণে একটি প্রস্তরের স্থান খালি রাখা হয়েছে। দর্শকগণ উক্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে চক্কর দিয়ে দেখতে থাকেন এবং প্রাসাদের নির্মাণশৈলী তাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু উক্ত প্রস্তরের খালি স্থানটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমিই এই সর্বশেষ প্রস্তর, আমাকে দিয়েই প্রাসাদটির নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং আমার মাধ্যমেই ভাববাদিগণের পরিসমাপ্তি ঘটে।"

অন্যান্য অনেক বিষয় মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করেছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করেছি। এভাবে তাঁর নবুওয়ত প্রমাণিত হওয়ার পরে তাঁর এই বাণীটি বাইবেলের উপর্যুক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, যীশুর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, পুত্র ও প্রস্তর এক নয়, বরং ভিন্ন।

---

১২০. যোহন ১২/৪৭।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক সপ্তদশ ভবিষ্যদ্বাণী

প্রকাশিত বাক্যের ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৬ আর যে জয় করে, ও শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য সকল পালন করে, তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ 'জাতিগণের উপরে কর্তৃত্ব দিব; ২৭ তাহাতে সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে এমনি শাসন করিবে যে, কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চুরমার হইয়া যাইবে' ২৮ আর আমি প্রভাতীয় তারা (the morning star) তাহাকে দিব। ২৯ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন।"

এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, যাকে জাতিগণের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং যিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদেরকে শাসন করেছেন তিনি মুহাম্মাদ (সা) ভিন্ন কেউ নন। এই অর্থেই তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন : "এবং আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেন পরাক্রান্ত বিজয় দ্বারা।"

প্রসিদ্ধ আরবীয় গণক সাতীহ মুহাম্মাদ (সা)-কে 'যষ্টির অধিকারী' বলে অভিহিত করে। বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের রাতে পারস্য সম্রাট কিসরা আনুশেরওঁয়ার (Khosrow An shirvan/Khosrow/Chosroes I) রাজদরবার ফেঁটে যায় এবং তা থেকে ১৪টি ঝুল বারান্দা ভেঙে পড়ে। পারস্যের অগ্নিপূজকদের পূজিত 'চিরন্তন অগ্নি-শিখা' নিভে যায়, যা বিগত হাজার বছরে একবারও নেভে নি। ইরানের সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে যায়। পারসিক প্রধান পুরোহিত স্বপ্নে দেখেন যে, কতকগুলি দুর্দমনীয় উট কতকগুলি আরবীয় ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে দজলা অতিক্রম করে তার দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য-সম্রাট ভয় পান যে, কোন অঘটন ঘটবে। তখন তিনি আবদুল মাসীহ নামে একজন দূত সিরিয়ায় অবস্থানরত গণক সাতীহের নিকট প্রেরণ করেন। আবদুল মাসীহ্ সিরিয়া পৌঁছে দেখে যে, সাতীহ তার মৃত্যু শয্যায়। তখন সে উক্ত বিষয়গুলি সাতীহের নিকট উল্লেখ করে। সাতীহ উত্তরে বলে, 'যখন পাঠ বেড়ে যাবে, যষ্ঠির অধিকারী প্রকাশিত হবেন, সাওয়া হ্রদ পানিশূন্য হবে, পারস্যে অগ্নি নির্বাপিত হবে, তখন আর ব্যাবিলে পারসিকদের স্থান হবে না এবং সিরিয়াতেও সাতীহ নিদ্রা যেতে পারবে না। ভগ্ন ব্যালকনির সংখ্যা অনুসারে তাদের মধ্য থেকে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী ক্ষমতা গ্রহণ করবে। আর যা কিছু আসার তা আসবেই।' এ কথা বলার পরে সাতীহ মৃত্যুবরণ করে। আবদুল মাসীহ ফিরে যেয়ে পারস্য রাজ আনুশেরওঁয়াকে সবকিছু অবগত করায়। পারস্য-রাজ বলেন, ১৪ জন রাজার ক্ষমতাগ্রহণ অনেক সময়ের ব্যাপার। ততদিনে অনেক কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু ৪ বছরের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে ১০ জন রাজা ক্ষমতা গ্রহণ করে। অন্যান্যরা উমার (রা)-এর খিলাফতের সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সর্বশেষ রাজা ইয়াযদাগির্দ (Yazdegerd III) খলীফা উসমানের খিলাফতকালে (৬৫১ খৃ/৩১ হি) নিহত হয়।

প্রভাতীয় তারা (the morning star) বলতে এখানে কুরআন বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সূরা নিসায় বলেন : "এবং তোমাদের প্রতি একটি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"[১২১]

'সাওলাতুদ দাইগাম আরা আদাই ইবনি মারইয়াম' (মরিয়ম পুত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ) গ্রন্থের লেখক উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি উদ্ধৃত করার পরে বলেন, 'আমি বিতর্ক অনুষ্ঠানের সময় পাদরি ওয়েট ও উইলিয়াম উভয়কে বললাম, এই 'লৌহদণ্ড'ধারী শাসক মুহাম্মাদ (সা)। এ কথা শুনে তারা অস্থির হয়ে যান। তারা বলেন, যীশু তো এ নির্দেশ প্রদান করেন থুয়াতীরাস্ত মণ্ডলীকে (church in Thuatira) ; কাজেই এরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব সেখানেই হতে হবে। মুহাম্মাদ (সা) তথায় গমন করেন নি। আমি বললাম, এই মণ্ডলীটি কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ? তারা অভিধান গ্রন্থাদি দেখে বলেন, মণ্ডলীটি ছিল রোমানদের দেশে (এশিয়া মাইনরে) ইসতাম্বুলের নিকটে। তখন আমি বললাম, মুহাম্মাদের সঙ্গীরা (সাহাবীগণ) উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে তথায় গিয়েছেন এবং তা অধিকার করেন। সাহাবীদের পরে অধিকাংশ সময় এ সকল স্থান মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। অবশেষে ওসমানী তুর্কী সুলতানেরা তা অধিকার করেছেন এবং এখন পর্যন্ত তা তাদেরই অধিকারে রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাদের অধিকার চিরস্থায়ী করুন। এতে প্রমাণিত হলো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সুস্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে কথিত হয়েছে।'

গ্রন্থকার বলেন, সম্মানিত ভারতীয় আলিম আব্বাস আলী জাজমাবী ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে একটি বৃহদাকার পুস্তক রচনা করেন। তিনি পুস্তকটির নামকরণ করেন, 'সাওলাতুদ দাইগাম আলা আদাই ইবনি মারইয়াম' (মরিয়ম পুত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিংহের আক্রমন)। এরপর তিনি— আল্লাহ্ তাঁকে রহমত করেন-ভারতের কানপুর শহরে ওয়েট ও উইলিয়াম নামক দুজন পাদরির সাথে প্রকাশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি তাদেরকে পরাজিত ও লা-জওয়াব করে দেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত পুস্তকটির সারসংক্ষেপ পৃথকভাবে সংকলন করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন এবং পুস্তিকাটির নাম দেন 'খুলাসাতু সাওলাতিদ দাইগাম' (সিংহের আক্রমণের সারসংক্ষেপ)। আল্লামা আব্বাস আলী জাজমাবীর বিতর্কটি সংঘটিত হয়েছিল মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতার সাথে আকবর আবাদে (আগ্রায়) আমার বিতর্ক-অনুষ্ঠানের ২২ বছর আগে।[১২২]

---

১২১. সূরা নিসা, ১৭৪ আয়াত।

১২২. আল্লামা রহমাতুল্লাহ কীরানবীর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লামা আব্বাস আলী জাজমাবীর কানপুরের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩২/১৮৩৩ সালের দিকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৃটিশ দখলের সেই কঠিন দিনগুলিতেও ভারতীয় আলিমগণ খৃস্টান মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় মোটেও পিছপা হন নি।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক অষ্টাদশ ভবিষ্যদ্বাণী

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যোহনলিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়গুলিতে বিদ্যমান। আমি ১৮২১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ থেকে তা উদ্ধৃত করব। যোহনের সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। ১৬ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক ফারাক্লীত (another Paraclete)[১২৩] তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; ১৭ তিনি সত্যের আত্মা (the Spirit of truth), জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকেও জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন (he dwelleth with you, and shall be in you)। ... ২৬ কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা (But the Comforter, which is the Holy Ghost-KJV, But the Counselor, the Holy Spirit =RSV) যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। ৩০ (২৯) আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।"

যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৬ যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা (the Spirit of truth), যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন, যখন সেই সহায় (ফারাক্লীত/the Comforter) আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। ২৭ আর তোমরাও সাক্ষী (And ye also shall bear witness), কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।"

১২৩. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠে 'ফারাক্লীত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে 'সহায়' বা 'সাহায্যকারী' লেখা হয়েছে। ইংরেজিতে Comforter বা Counselor লেখা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে গ্রীক ভাষায় কথা বলতেন না, বরং হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় কথা বলেছেন। যীশুর ভাষায় এখানে যীশু কি বলেছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই। কারণ প্রথম কয়েক শতাব্দীর কোন প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত নেই। প্রচলিত গ্রীক অনুবাদে Paracletos শব্দটি ব্যবহৃত। এর অর্থ এডভোকেট, সুপারিশকারী, কারো সাহায্যে আহ্বানকৃত ব্যক্তি, দয়ালু বন্ধু ইত্যাদি। গবেষকগণ মনে করেন যে, প্রচলিত গ্রীক Paracletos শব্দটি অন্য গ্রীক শব্দ Periclytos থেকে গৃহীত, যার অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। Periclytos (প্রশংসিত) শব্দটি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃতির মাধ্যমে Paracletos (এডভোকেট) রূপ ধারণ করে। তবে প্রশংসিত বা এডভোকেট উভয় অর্থেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কেবল মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পবিত্র আত্মাকে এডভোকেট, সহায় বা পরামর্শক বলা ভিত্তিহীন।

যোহনের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লীত/the Comforter/the Counselor) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮ আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী (ভর্ৎসনা বা তিরস্কার) করিবেন (reprove)। ৯ পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না; ১০ ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; ১১ বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এই জগতের আর কোন[১২৪] অধিপতি বিচারিত হইয়াছে। ১২ তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না। ১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth), যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইবেন[১২৫] ও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলিকে মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রমাণ করার আগে আমি দু'টি বিষয় পেশ করতে চাই।

প্রথম বিষয় : ইতোপূর্বে সপ্তম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, অতীত ও বর্তমান সকল যুগের খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের অভ্যাস যে, তাঁরা

---

১২৪. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠে এভাবে 'আর কোন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় টীকায় লেখা হয়েছে 'শয়তান'। বাংলা বাইবেলে এখানে 'এই জগতের অধিপতি' বলা হয়েছে। ইংরেজিতে the prince of this world বলা হয়েছে। অন্যত্র যীশু বলেছেন : "আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই বা আমার উপরে তাহার কোন ক্ষমতা নাই : (the prince of this world cometh, and hath nothing in me=KJV/the ruler of this world is coming, he had no power over me=RSV)...।" যোহন ১৪/৩০-৩১।

১২৫. এখানে কেরির বাংলা বাইবেলে "লইয়া থাকেন" বলা হয়েছে। আরবী ও ইংরেজি বাইবেলে ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কিং জেমস ভারসনে বলা হয়েছে : he shall take of mine, and shall shew it unto you। রিভাইজ্ড স্টান্ডার্ড ভারসনে বলা হয়েছে : she will take what is mine, and declare it to you। আমরা জানি না, কিজন্য ভবিষ্যতের ক্রিয়াকে বাংলায় বর্তমানের অর্থ করা হয়েছে।

অধিকাংশ সময় নামসমূহের অনুবাদ করেন। পাঠক আরো জেনেছেন যে, যীশু খৃস্ট গ্রীক ভাষায় কথা বলেন নি, বরং তিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত আগন্তুককে যীশুখৃস্ট হিব্রু ভাষায় যে নাম দিয়েছিলেন যোহনের সুসমাচারে সেই হিব্রু নামটিকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এরপর আরবী অনুবাদকগণ সেই গ্রীক শব্দের আরবী লিখেছেন 'ফারাক্লীত।'

জনৈক পাদরি রচিত উর্দু ভাষার একটি পুস্তিকা আমার হস্তগত হয়েছে। ১২৬৮ হিজরীতে (১৮৫২ খৃ) পুস্তিকাটি প্রকাশিত। 'ফারাক্লীত' শব্দের বিশ্লেষণের জন্য পুস্তিকাটি রচিত। লেখক পাদরি মহাশয় দাবি করেছেন যে, মুসলিমগণ কিভাবে 'ফারাক্লীত' শব্দের বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে তা তাদেরকে বুঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, 'ফারাক্লীত' শব্দটি মূল গ্রীক শব্দের আরবী রূপ। যদি আমরা বলি যে, মূল গ্রীক শব্দটি ছিল 'প্যারাক্লীটোস' (Paracletos) , তবে এর অর্থ হয় 'মুহাম্মাদ' বা 'আহমদ' শব্দের অর্থের কাছাকাছি। যে সকল মুসলিম আলিম দাবি করেছেন যে, 'ফারাক্লীত' বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা ধারণা করেন যে, শব্দটি পেরিক্লীটোস (Preiclytos) শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আর এর অর্থ মুহাম্মাদ বা আহমদ শব্দের অর্থের কাছাকাছি। এজন্য তাঁরা দাবি করেন যে, যীশু মুহাম্মাদ বা আহমদ (সা)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু সঠিক সত্য এই যে, মূল গ্রীকে প্যারাক্লীটোস (Paracletos) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমার কথা এই যে, দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। এছাড়া গ্রীক বর্ণগুলির একটির সাথে অন্যটির মিল খুব বেশি। অনেক বর্ণই দেখতে প্রায় একই রকম। কাজেই দু একটি পাণ্ডুলিপিতে পেরিক্লীটোস (Periclytos) শব্দটি বিকৃত হয়ে প্যারাক্লীটোস (Paracletos) হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। এরপর ত্রিত্ববাদী খৃস্টান ধর্মগুরুগণ এই বিকৃত শব্দের পাণ্ডুলিপিকেই অন্যান্য পাণ্ডুলিপির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর উপরেই নির্ভর করেছেন। এই পুস্তকের ২য় অধ্যায় যদি কেউ ভাল করে চিন্তা করেন এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের ৭ম বিষয়টি নিরপেক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবেন যে, এরূপ বিকৃতি ও বিকৃতিকে গ্রহণ করা ধার্মিক খৃস্টানদের জন্য খুবই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং তা নেককর্ম বলে গণ্য হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয় বিষয় : মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, তাঁরাই প্রতিশ্রুত 'ফারাক্লীত।' যেমন ২য় খৃস্টীয় শতকের খৃস্টান যাজক মন্টানাস

---

১২৬. তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের ধর্মপ্রচারক মানী (Mani)-ও নিজেকে ফারাক্লীত বলে দাবি করেন।

(Montanus) নিজেকে ফারাক্লীত বলে দাবি করেন।[১২৬] তিনি অত্যন্ত কঠোর নীতিমালা, সততা ও কৃচ্ছতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৭ খৃস্টাব্দের দিকে এশিয়া মাইনরে তিনি ভাববাদিত্ব দাবি করেন। তিনি বলেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ফারাক্লীত, যীশু খৃস্ট যাঁর আগমনের কথা জানিয়েছেন। অনেক মানুষ তাঁর দাবি মেনে নিয়ে তাঁর অনুসারী হয়।[১২৭]

উইলিয়াম ম্যুর তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থের ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত উর্দু সংস্করণের ২য় অংশের ৩য় অধ্যায়ে মন্টানাস ও তাঁর অনুসারীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "কেউ কেউ বলেছেন, সে নিজেকে ফারাক্লীত অর্থাৎ সান্তনাদাতা পবিত্র আত্মা বলে দাবি করে। তিনি কঠোর নীতিমালা, ধার্মিকতা ও কৃচ্ছতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এজন্য মানুষদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন।"

এ থেকে জানা গেল যে, প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীগুলিতে খৃস্টানগণ 'ফারাক্লীতের' আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্যই অনেকে দাবি করতে পেরেছেন যে, তারাই ফারাক্লীত এবং খৃস্টানগণও তাদের দাবি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

'লুব্বুত তাওয়ারীখ' (ইতিহাসের সার) গ্রন্থের (খৃস্টান ধর্মগুরু) লেখক লিখেছেন, "মুহাম্মাদ (সা)-এর সমসাময়িক ইহূদী ও খৃস্টানগণ একজন প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষা করতেন। এ বিষয়টি দ্বারা মুহাম্মাদ (সা) বিশেষভাবে উপকৃত হন। কারণ তিনি দাবি করেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী।"

তাঁর কথা থেকেও জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে ইহূদী-খৃস্টান সকলেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। এই ছিল প্রকৃত বাস্তবতা। ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশী (Negus)-এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পৌঁছায় তখন তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ যে ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করছে তিনিই সেই ভাববাদী।' তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রের উত্তর পাঠান। উত্তরে তিনি লিখেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্যবাদী ও সত্য-প্রমাণিত রাসূল। আমি আপনার আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করলাম। আমি আপনার চাচাতো ভাই (জা'ফার ইবনু আবী তালিব)-এর কাছে শপথ গ্রহণ করলাম এবং তাঁর হাতে হাত রেখে জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করলাম।"

---

১২৭. দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মবেত্তা (theologian) টার্টুলিয়ান (Tertullian) মন্টানাসের মত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ফারাক্লীত বলে স্বীকার করেন। খৃস্টধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানে টার্টুলিয়ানকে সেই যুগের ও সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক বলে গণ্য করা হয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি এখনো খৃস্টধর্মের অন্যতম উৎস বলে গণ্য; টারটুলিয়ানের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় মন্টানাসের ধর্মমত প্রসার লাভ করে এবং প্রায় ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

মিসরের কপ্টিক শাসক মুকাওকিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রের উত্তরে লিখেন : "মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহর প্রতি, কপ্টিকদের শাসক মুকাওকিসের পক্ষ থেকে। আপনার উপর শান্তি হোক। আপনার চিঠি পাঠ করেছি এবং আপনি যা বলেছেন এবং যে জন্য আহ্বান করেছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমি জানতাম যে, একজন ভাববাদীর আগমন বাকি আছে। আমি ধারণা করতাম যে, তিনি সিরিয়ায় (ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম) আগমন করবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি।"

এই দুই সম্রাট পত্র প্রাপ্তির সময়ে (৭ম হিজরীতে) মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর জাগতিক ক্ষমতার কারণে ভয় করতেন না।

প্রসিদ্ধ আরবীয় খৃস্টান গোত্রপতি জারূদ ইবনুল আলা তাঁর গোত্রের (আব্দু কায়স) মানুষেদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, আপনি সত্য-সহ আগমন করেছেন এবং সত্যই উচ্চারণ করেছেন। যিনি আপনাকে সত্যসহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি ইঞ্জিলের (সুসমাচারের) মধ্যে আপনার বর্ণনা পেয়েছি এবং মরিয়ম তনয় আপনার আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কাজেই দীর্ঘ সালাম আপনার জন্য। আর আপনাকে যিনি সম্মানিত করেছেন তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা। দর্শনের পরে আর চিহ্ন লাগে না এবং বিশ্বাসের পরে আর সন্দেহ থাকে না। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল।" এরপর তাঁর গোত্রের মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই জারূদ একজন খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীকার করছেন যে, মরিয়ম তনয়, অর্থাৎ যীশু মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, খৃস্টানগণ একজন নবীর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন, যাঁর আগমন সম্পর্কে স্বয়ং যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

উপরের বিষয়দ্বয়ের আলোকে 'ফারাক্লীত' বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যে মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্যই বলা হয়েছে তা আমরা আলোচনা করব। আমরা জানি যে, যীশু এখানে যে হিব্রু শব্দটি বলেছিলেন তা হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সুসমাচারে ব্যবহৃত শব্দটি মূল হিব্রু শব্দের গ্রীক অনুবাদ মাত্র। তবে আমি মূল হিব্রু শব্দের সন্ধানে যাচ্ছি না বরং গ্রীক অনুবাদে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। যদি এই শব্দটি মূলত পেরিক্লীটোস (Periclytos) হয়ে থাকে তবে তো বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এতে প্রমাণিত হবে যে, যীশু মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে যেয়ে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থও মুহাম্মাদ ও আহমদ (সা) নামের অর্থের কাছাকাছি। আমরা দেখেছি যে, বাহ্যত শব্দটির পেরিক্লীটোস (Periclytos) থেকে পরিবর্তিত হয়ে পারাক্লীটোস (Pareacletos) হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি

এবং খৃস্টান ধর্মগুরুদের সুপরিচিত অভ্যাসের কথা চিন্তা করলে এই সম্ভাবনার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তবে আমি এই যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত সম্ভাবনাটিও বাতিল করে দিচ্ছি। কারণ খৃস্টান পণ্ডিতগণ এই সম্ভাবনা মানতে বাধ্য নন। এজন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে, ফারাক্লীত শব্দটি মূল গ্রীক পরাক্লীটোস শব্দ থেকে গৃহীত; কারণ এতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্য কথিত বলে প্রমাণ করার কোন অসুবিধা হয় না। জনৈক পাদরি মহাশয় তাঁর পুস্তিকায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তদনুসারে ফারাক্লীত শব্দটির অর্থ 'সান্তনাদাতা' (comforter)[১২৮], সাহায্যকারী অথবা উকিল। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেলে ফারাক্লীত অর্থ 'শাফি' (الشافى) 'সুপারিশকারী' (Intercessor) লেখা হয়েছে। এই অর্থগুলি সবই মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি এখানে দুটি বিষয় আলোচনা করব।

প্রথমত, প্রেরিতদের কার্যবিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হলে যীশুর প্রেরিতগণ সকলে এক স্থানে সমবেত হন এবং তখন তাদের উপর আত্মা অবতীর্ণ হয়। আমি প্রমাণ করব যে, 'ফারাক্লীত' বলতে এই আত্মা বুঝানো হয় নি, বরং 'ফারাক্লীত' বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কেই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের সন্দেহ ও আপত্তি আমি উল্লেখ করে সেগুলির উত্তর প্রদান করব।

প্রথম বিষয় : 'প্রেরিতদের নিকট আগমনকারী' আত্মা নয়, বরং মুহাম্মাদ (সা)-ই ফারাক্লীত

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

(১) যীশু প্রথমে বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।" এরপর তিনি 'ফারাক্লীত' সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ফারাক্লীত সম্পর্কে তাদেরকে যা কিছু বলবেন সেগুলি অত্যন্ত জরুরী এবং এ বিষয়ে তাঁর আজ্ঞাগুলি অবশ্য পালনীয়। ফারাক্লীত বলতে যদি প্রেরিতদের উপর অবতরণকারী আত্মাকে বুঝাতেন তাহলে প্রথমেই আজ্ঞাত সকল পালন করার কথা বলে শুরু করতেন না। কারণ এ কথা ধারণা করার কোন কারণ ছিল না যে, যে পবিত্র আত্মা দ্বারা তারা ইতোপূর্বে পূর্ণ হয়েছিলেন সেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর অবতরণ করলে তারা তা অস্বীকার করবেন। শুধু তাই নয়, আত্মার অবতরণ অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ কারো হৃদয়ের উপরে আত্মা অবতরণ করলে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করলে তার উপরে সুস্পষ্টভাবে তার প্রভাব প্রকাশিত হবেই। কাজেই এ কথা চিন্তা করা যায় না যে, কারো উপরে আত্মা অবতরণ করবে অথচ সে নিজেই আত্মার অবতরণের কথা অস্বীকার করবে। আত্মা

১২৮. পরবর্তী আরবী বাইবেলগুলিতে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

তো এমনভাবে অবতরণ করেন না যে, তাকে অস্বীকার করা যেতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে যীশু একজন ভাববাদীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও নবুওয়তের জ্যোতি দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, এই প্রতিশ্রুত ফারাক্লীত যখন আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর অনুসারীদের অনেকেই তাঁকে অস্বীকার করবে। এজন্যই তিনি তাঁর বিষয়ে বলার আগে এ বিষয়ে তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করার বিষয়ে বিশেষভাবে তাকিদ করেন। এরপর তাঁর আগমন সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন।

(২) খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে পিতা ও পবিত্র আত্মা এক ও অভিন্ন। অনুরূপভাবে পুত্রের ঈশ্বরত্বের দিক থেকে পবিত্র আত্মা ও পুত্র মূলত একই সত্ত্বা। কাজেই পবিত্র আত্মাকে পুত্র থেকে পৃথকভাবে 'আরেক ফারাক্লীত' বলা যায় না। পক্ষান্তরে অন্য একজন ভাববাদীকে কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই 'আরেক ফারাক্লীত' বলা যায়।

(৩) সুপারিশ করা বা উকিল হওয়া ভাববাদিত্বের দায়িত্বে সাথে খাপ খায়। পবিত্র-আত্মা তো নিজেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সাথে একীভূত। কাজেই আত্মা কিভাবে সুপারিশ করবে বা উকিল হবে ? কাজেই আত্মাকে 'ফারাক্লীত' বা 'সুপারিশকারী' বলা যায় না। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীকে কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই 'সুপারিশকারী' বলা যায়।

(৪) ফারাক্লীত বিষয়ে যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" নতুন নিয়মের কোন পুস্তক বা পত্র থেকে প্রমাণিত হয় নি যে, যীশু যা কিছু বলেছিলেন তা প্রেরিতগণ ভুলে গিয়েছিলেন এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন তাদের উপর অবতরণকারী এই আত্মা তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

(৫) যীশু বলেছেন, "আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।"

এ কথা সুস্পষ্টত প্রমাণ করে যে, এখানে ফারাক্লীত বলতে আত্মাকে বুঝানো হয় নি। কারণ প্রথম বিষয়ের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, আত্মার অবতরণের সময় শিষ্যগণ তা অবিশ্বাস করবেন বলে ধারণা করার কোন কারণ ছিল না, বরং এরূপ অবিশ্বাসের কোন উপায়ই ছিল না। কাজেই ফারাক্লীত বলতে যীশু যদি আত্মা বুঝাতেন, তাহলে শেষের এই কথাটি বলার কোন প্রয়োজনই থাকত না। একজন ভাববাদী তো দূরের কথা, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ এমন কোন কথা বলেন নি যা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ফারাক্লীত বলতে যদি একজন প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে বুঝানো হয় তবে শেষের এই কথাটি সার্থক ও যথাযথ বলে গণ্য হয়।

উপরন্তু নতুন ভাববাদীকে অবিশ্বাস করার প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে এ কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয়। প্রথমেই প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে গ্রহণ করার যে আজ্ঞা রয়েছে, এ কথার মাধ্যমে শেষে আবার তার তাকিদ দেওয়া হলো।

(৬) যীশু বলেছেন, "তিনিই আমার বিষয়ে (আরবী বাইবেলে : তিনি আমার জন্য) সাক্ষ্য দিবেন (he shall testify of me)"। প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মা কারো সামনে যীশুর জন্য সাক্ষ্য দেন নি। যাদের উপর আত্মা অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই শিষ্যগণের জন্য নতুন কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল না। কারণ আত্মার অবতরণের পূর্ব থেকেই তাঁরা যীশুকে পরিপূর্ণভাবে জানতেন ও চিনতেন। কাজেই তাদের কাছে অন্য কেউ এসে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যীশুকে যারা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছিল তাদের সামনে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া ছিল অতীব প্রয়োজনীয়। অথচ এই আত্মা কোন অবিশ্বাসীর সামনে যেয়ে যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় নি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সা) যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যীশুর বিরুদ্ধে যত ঘৃণ্য অপবাদ দেওয়া হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ঘৃণ্যতম ঈশ্বর বিরোধী (blasphemous) অপবাদ ছিল যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। এই জঘন্য মিথ্যা ঈশ্বরবিরোধিতা (blasphemy) -র অপবাদ থেকে যীশুর পবিত্রতার সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন। তাঁর মাতার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই অপবাদ খণ্ডন করে তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। কুরআনের অনেক স্থানে যীশু ও তাঁর মাতার পবিত্রতার পক্ষে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে।[১২৯] এছাড়া অগণিত হাদীসে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তিনি।

(৭) যীশু বলেছেন : "আর তোমরাও সাক্ষী (And ye also shall bear witness), কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।"

১৮২১, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে, যেগুলি থেকে আমি উপরের উদ্ধৃতিগুলি উল্লেখ করেছি, এখানে (ও/also) শব্দটি নেই। কিন্তু ১৮১৬ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেলে কথাটি রয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮২৫ ও ১৮৬০ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলেও তা রয়েছে। এভাবে বাইবেলের এই তিনটি আরবী সংস্করণে (ও/also) শব্দটি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে প্রকাশিত ফারসী বাইবেলে ও ১৮১৪ সালে মুদ্রিত উর্দু বাইবেলেও শব্দটি বিদ্যমান।[১৩০] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমি প্রথমে যে সংস্করণগুলি থেকে

---

১২৯. উদাহরণ হিসেবে দেখুন : সূরা আলে-ইমরান, ৩৩-৬৩; সূরা নিসা ১৫৫-১৭৩; সূরা মায়েদা, ৭২-৭৫, ১১০-১১৮; সূরা মরিয়ম ১৬-৩৬; সূরা মুমিনূন ৫০ ও সূরা তাহরীম ১২ আয়াত।

১৩০. ইংরেজি কিং জেমস ভারসন (KJV/AV) এবং রিভাইযড স্টাভার্ড ভার্সনেও (RSV) এই (also) শব্দটি বিদ্যমান। বাংলা বাইবেলেও তা রয়েছে। এছাড়া ১৮২৫, ১৮২৬, ১৮৬৫, ১৯৭০, ১৯১৭, ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৮৫ সালে ও পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত সকল আরবী সংস্করণে শব্দটি বিদ্যমান।

যোহনের কথাগুলি উদ্ধৃত করেছি সেই সংস্করণগুলিতে ইচ্ছায় বা ভুলে (ও/also) শব্দটি বাদ পড়েছে।

যীশুর এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যীশুর শিষ্যগণ বা প্রেরিতগণের সাক্ষ্য ও 'ফারাক্লীতের' সাক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন। যদি 'ফারাক্লীত' বলতে পঞ্চাশত্তমীর দিন প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মাকে বুঝানো হয় তবে ফারাক্লীতের সাক্ষ্য ও শিষ্যদের সাক্ষ্যের মধ্যে এই ভিন্নতা আর থাকে না। কারণ এই আত্মাকে কখনো প্রেরিতদের সাক্ষ্যের বাইরে ভিন্নভাবে কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নি বরং প্রেরিতদের সাক্ষ্যই ছিল তার সাক্ষ্য বা তাঁর সাক্ষ্যই ছিল প্রেরিতদের সাক্ষ্য। খৃষ্টানগণ যদিও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র-আত্মা ঈশ্বরের সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ, যা অবতরণ, চলাচল ও অন্যান্য মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও কর্মাবলি থেকে পবিত্র, তবুও আমরা বাইবেলের বর্ণনা থেকে দেখছি যে, এই আত্মা 'আকাশ থেকে প্রচণ্ড বায়ুর মত' অবতরণ করেন, 'অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বার' মত প্রকাশিত হন এবং প্রেরিতদের সকলের উপর বসেন। কাজেই তাঁদের অবস্থা ছিল ভুতগ্রস্ত মানুষের মত। ভুতগ্রস্ত থাকা অবস্থায় ভুতগ্রস্ত মানুষের মুখেই ভুত বা জিন কথা বলে এবং ভুতের কথাই ভুতগ্রস্তের কথা বা ভুতগ্রস্তের মুখের কথাই ভুতের কথা বলে গণ্য হয়। তেমনি আত্মাবিষ্ট প্রেরিতদের মুখের কথাই আত্মার কথা বা আত্মার কথাই আত্মাবিষ্টদের কথা। কাজেই আত্মার সাক্ষ্য ও প্রেরিতদের সাক্ষ্যের ভিন্নতা থাকে না। পক্ষান্তরে 'ফারাক্লীত' বলতে প্রতিশ্রুত ভাববাদীকে বুঝানো হলে বাইবেলের বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ প্রতিশ্রুত ভাববাদীর সাক্ষ্য প্রেরিতগণের সাক্ষ্য থেকে ভিন্ন ও পৃথক।

(৮) যীশু বলেছেন : "আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লীত) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" এভাবে যীশু তাঁর প্রস্থানকে ফারাক্লীতের আগমনের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লীত বলতে কখনোই পবিত্র-আত্মাকে বুঝানো হয় নি। কারণ পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য যীশুর তিরোধান কখনোই পূর্বশর্ত ছিল না। যীশু বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর অবতরণ করেছিলেন।[১৩১] কাজেই তিনি পবিত্র-আত্মা হতে পারেন না বরং ফারাক্লীত বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সাথে প্রেরিতগণ যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে পরিচিত হন নি বা যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি কোনভাবে পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর আগমনের পূর্বশর্ত ছিল যীশুর প্রস্থান। মুহাম্মাদ (সা) এরূপই ছিলেন। তিনি যীশুর গমনের পরেই আগমন করেছেন। যীশুর প্রস্থান ছিল তাঁর আগমনের পূর্বশর্ত।

---

১৩১. যোহন ২০/২২।

কারণ দুটি পৃথক ব্যবস্থাসহ দু'জন ভাববাদী একই সময়ে থাকতে পারেন না। তবে যদি একজন ভাববাদী অন্য ভাববাদীর ব্যবস্থার অধীন ও অনুসারী হন, অথবা দুজনেই তৃতীয় কোন ভাববাদীর ব্যবস্থার অধীন হন তাহলে একই সময়ে ও একই স্থানে দুই বা ততোধিক ভাববাদী বিদ্যমান থাকতে পারেন। মোশি থেকে যীশু পর্যন্ত সময়পর্বে অনুরূপ ঘটেছে।

(৯) যীশু ফারাক্লীতের বিষয়ে বলেছেন : "তিনি ... জগৎকে দোষী (তিরস্কার, ভর্ৎসনা) করিবেন (reprove) ।" এ কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করছে যে, এখানে ফারাক্লীত বলতে মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ তিনিই জগৎকে, বিশেষত ইহূদীদেরকে তিরস্কার করেছেন এবং ভর্ৎসনা করেছেন যীশুকে অবিশ্বাস করার কারণে। একমাত্র অন্ধ ও গায়ের জোরে সত্য অস্বীকারকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, মুহাম্মাদ (সা) এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে ইহূদীদের অপরাধ বর্ণনা করেছেন এবং নিন্দা করেছেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধর মুহাম্মাদ মাহদী দাজ্জাল (antichirst) ও তার অনুসারীদের হত্যার সময়ে যীশুর সাথে থাকবেন। পক্ষান্তরে শিষ্যদের উপর অবতীর্ণ আত্মা কখনোই জগৎকে দোষী করেন নি। এমনকি আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার পরেও প্রেরিতগণও কাউকে তিরস্কার করেন নি বা ভর্ৎসনা করেন নি। কারণ তাঁরা তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করে ধর্ম প্রচার করতেন না, বরং উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন।

উপরে উল্লিখিত (খুলাসাতু সাওলাতিদ দাইগাম) (সিংহের আক্রমণের সার-সংক্ষেপ) পুস্তকের প্রতিবাদে র‍্যাঙ্কিন নামক জনৈক পাদরি উর্দু ভাষায় 'দাফিউল বুহতান' (অপবাদ রোধ) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে পাদরি র‍্যাঙ্কিন লিখেছেন, "ভর্ৎসনা করিবেন বা তিরস্কার করিবেন (reprove) কথাটি সুসমাচারের মধ্যে নেই। সুসমাচারের কোন অনুবাদেও এই শব্দটি নেই। সাওলাতুদ দাইগাম বা সিংহের আক্রমন গ্রন্থের লেখক বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার (reprove) করার কথাটি যোগ করেছেন। এই অতিরিক্ত কথাটুকু থাকলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য; কারণ তিনি অনেককে তিরস্কার করেছেন এবং ভয় দেখিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথাটি এখানে সংযোজন করেছেন। তবে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় করেন তাদের জন্য এরূপ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা শোভা পায় না।"

র‍্যাঙ্কিন সাহেবের এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই বাতিল ও মিথ্যা। এই পাদরি হয় মুর্খ ও বিভ্রান্ত ছিলেন অথবা তিনি জেনেশুনে মিথ্যা বলেছেন ও বিভ্রান্তি প্রচার করেছেন। এতে বুঝা যায় তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন না এবং আল্লাহর শাস্তির

ভয় করতেন না। আরবী বাইবেলের যে সকল সংস্করণ থেকে আমি উপরের যোহনের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছি সেগুলিতে 'ভর্ৎসনা করবেন' (আরবী يوبخ) কথাটি বিদ্যমান। ১৬৭১ সালে রোমে মুদ্রিত আরবী অনুবাদেও কথাটি রয়েছে। ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে এই কথাটির নিম্নরূপ লেখা হয়েছে : "যখন তিনি আসিবেন, তিনি বিশ্বকে নিন্দা করবেন (আরবী يبكت ইংরেজী: censure, blame) পাপের কারণে ...।" ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ এবং ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালে মুদ্রিত ফারসী অনুবাদে এখানে দমন করবেন বা বাধ্য করবেন (আরবী الالزام), ইংরেজী coerce, compel, force) বলা হয়েছে। নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, দমন করা, দোষী করা সব কাছাকাছি অর্থ বহন করে।

তবে র‍্যাঙ্কিন সাহেবের কথার জন্য আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না। কারণ এরূপ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি প্রচার করা প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের অভ্যাস। এজন্যই বাইবেলের ফারসী ও উর্দু অনুবাদকগণ 'ফারাক্লীত' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। কারণ মুসলিমদের মধ্যে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ যে, 'ফারাক্লীত' শব্দটি মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত উর্দু সংস্করণের অনুবাদক তার পূর্ববর্তীদেরকে ছাড়িয়ে এক কাঠি এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি 'আত্মা'-র বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম বা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন যেন সাধারণ মানুষ ধারণা করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যার কথা বলা হয়েছে, তিনি নারী, পুরুষ নন।

(১০) যীশু বলেছেন, তিনি ... জগৎকে দোষী (ভর্ৎসনা, নিন্দা বা তিরস্কার) করিবেন (reprove) পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না...।" এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, যীশুকে যারা অবিশ্বাস করেছে প্রতিশ্রুত এই ফারাক্লীত তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন এবং তাদেরকে তাদের অবিশ্বাসের কারণে ভর্ৎসনা করতে সক্ষম হবেন। পঞ্চাশত্তমীর দিন শিষ্যদের উপর যে আত্মা অবতরণ করেন তিনি মানুষদের সামনে প্রকাশিত হন নি, যীশুকে অবিশ্বাস করার কারণে মানুষদের সামনে প্রকাশিত হয়ে তাদের ভর্ৎসনা করেন নি।

(১১) যীশু বলেছেন : "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না।" এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে শিষ্যগণের উপর অবতীর্ণ আত্মা বুঝানো হয় নি। কারণ যীশু যে বিধানাবলি প্রদান করেছিলেন বা যে কথা বলে গিয়েছিলেন তার অতিরিক্ত কোন কিছুই এই আত্মা প্রদান করেন নি। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, যীশু নিজেই তাঁর প্রেরিতদেরকে 'ত্রিত্ববাদ' শিক্ষা দেন এবং সারা বিশ্বে তা প্রচার করতে নির্দেশ দেন। তাহলে এই আত্মা এসে তাদেরকে অতিরিক্ত কি শিক্ষা দিলেন ? যীশু স্বর্গারোহণের পূর্বে শিখিয়ে যান নি এমন নতুন কি বিধান তিনি প্রদান করলেন ?

হ্যাঁ, এই আত্মার অবতরণের পরে তারা তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধিবিধান বাতিল ও অকার্যকর করে দেন। কেবল যাত্রা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে উল্লিখিত ১০ আজ্ঞার দু-একটি আজ্ঞা তারা বহাল রাখেন। অনুরূপভাবে তারা সকল নিষিদ্ধ বিষয়গুলি বৈধ করে দেন। বিধিবিধান বাতিল করার বিষয়ে একথা বলা চলে না যে, তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না।[১৩২] বিশেষত তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধানের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান শনিবারের সম্মান করার বিধান। এই বিধান লঙ্ঘন করার কারণেই ইহূদীগণ যীশুকে প্রতিশ্রুত খৃস্ট বলে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। যীশু এই বিধান বাতিল করে দেন এবং তাঁর প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণ তা সহ্য করতে সক্ষম হন। কাজেই পুরাতন নিয়মের অন্য সকল বিধান বাতিল করা তাদের জন্য কোনভাবেই 'অসহ্য' ছিল না, বরং তা সহ্য করা তাদের জন্য আরো বেশি সহজ ছিল।

তবে, হ্যাঁ, প্রটেস্ট্যান্ট পাদরিগণ স্বীকার করেন যে, যীশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত যীশুর শিষ্যদের ও প্রেরিতদের বিশ্বাস দুর্বল ছিল এবং তাদের শক্তিও ছিল কম। এজন্য যীশু যদি নতুন নতুন বিধিবিধান সে সময়ে তাদের বলতেন তবে বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে এবং অক্ষমতার কারণে তারা তা সহ্য করতে পারতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লীত বলতে আগত একজন ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে, যাঁর ব্যবস্থায় যীশুর ব্যবস্থার অতিরিক্ত বিধিবিধান থাকবে, যেগুলি সহ্য করা দুর্বল ঈমান মানুষদের জন্য কষ্টকর হবে। আর এই ভাববাদীই হলেন মুহাম্মাদ (সা)।

(১২) যীশু বলেছেন,"কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন।"

এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লীত এমন ব্যক্তি হবেন, যাঁর কথাকে নিজের বানোয়াট কথা মনে করে তাঁকে মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে বা অনুরূপ সুযোগ নিয়ে ইহূদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। এজন্য যীশুকে তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হলো। সমাবেশের দিনে শিষ্যদের উপর অবতীর্ণ আত্মার কথা বা শিক্ষাকে বানোয়াট বা তার নিজের মনগড়া কথা বলে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনাই ছিল না। সর্বোপরি, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র-আত্মাই ঈশ্বর; এজন্য পবিত্র-আত্মার ক্ষেত্রে 'যাহা যাহা শুনেন

---

১৩২. বিধিবিধান তুলে দেওয়া ও অবৈধ বিষয়গুলিকে বৈধ করা মানবীয় প্রবৃত্তির নিকট খুব সহজে গ্রহণযোগ্য বিষয়। কাজেই এরূপ বিষয় সম্পর্কে বলা চলে না যে, তোমরা সেগুলি সহ্য করতে পারবে না।

তাহাই বলিবেন' কথাটি অর্থহীন। কাজেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, যীশু মুহাম্মাদ (সা)-এর কথাই এখানে বলেছেন।১৩৩

তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর কথাকে মনগড়া বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ছিল। আর তিনি ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ ছিলেন না (কাজেই তাকে কিছু বলতে হলে ঈশ্বরের নিকট থেকে শ্রবণ করার দরকার ছিল)। আর তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে 'যাহা যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন'। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "সে মনগড়া কথা বলে না। (সে যা বলে) তা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"১৩৪

(১৩) যীশু বলেছেন, "যাহা আমার, তাহাই তিনি লইবেন (he shall receive of mine=KJV/he will take what is mine=RSV)।" এই কথাটি পবিত্র-আত্মার ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। কার ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র-আত্মাই ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা সৃষ্ট নন, বরং স্রষ্টা। তিনি অনাদি ও সর্ব শক্তিমান। নতুন কোন পূর্ণতা তাঁর ক্ষেত্রে কল্পনাতীত বরং অনাদি থেকেই তিনি সকল পূর্ণতার গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। কাজেই পবিত্র আত্মা যীশু থেকে কিছু গ্রহণ করবেন এরূপ করার কোন অবকাশ নেই বরং এ কথাটিও মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি যীশুর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'যাহা আমার তাহাই তিনি লইবেন' কথা থেকে মনে হতে পারে যে, ফারাক্লীত যীশুর ব্যবস্থার বাইরে যাবেন না বা তাঁর ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ করবেন। এই ভুল ধারণাটি দূর করার জন্য যীশু আবার বলেন : "পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইবেন"

১৩৩. খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে 'পবিত্র আত্মাই' ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের তিন অংশের এক অংশ বা ঈশ্বরের কোন বিশেষ গুণের বহি:প্রকাশ। তাহলে কি কল্পনা করা যায় যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বা পিতা ঈশ্বরের অনুমতি বা সম্মতির বাইরে নিজে বানিয়ে কিছু বলতে পারেন বা বলার সম্ভাবনা তার ক্ষেত্রে থাকে ? অথবা তিনি কি ঈশ্বরের থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যে, কোন কিছু বলতে হলে ঈশ্বরের নিকট থেকে তা শুনে আসতে হয় ? অথবা তিনি কি এরূপ যে, তিনি কিছু কথা নিজের থেকেও বলতে পারেন এবং কিছু কথা ঈশ্বর থেকেও শুনে বলতে পারেন ? যদি তা না হয় তাহলে যীশুর এ কথার অর্থ বা প্রয়োজনীয়তা কি ? এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, উক্ত প্রতিশ্রুত ভাববাদীর বিষয়ে বলা হয়েছে : "তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।" আর এখানে বলা হয়েছে, "কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন"। উভয় কথার অর্থ একই। এতে প্রমাণিত হয় যে, সদাপ্রভু মোশির কাছে যে ভাববাদীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরই আগমন বার্তা শুনিয়েছেন যীশু।

১৩৪. সূরা নাজ্ম, ৩-৪ আয়াত।

(All things that the father hath are mine : therefore said I, that he shall take of mine)"। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যীশু স্পষ্ট করে বুঝালেন যে, 'যাহা আমার তিনি তাহাই লইবেন' অর্থ এই নয় যে, আমি যা বলে যাচ্ছি শুধু তাই তিনি নেবেন; বরং এর অর্থ হলো, যা কিছু ঈশ্বর তাঁকে দেবেন তাই তিনি নেবেন, তবে যেহেতু যা কিছু ঈশ্বরের তাই মূলত আমার, এজন্যই আমি বললাম যে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যা কিছু তিনি গ্রহণ করে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন সবই তোমরা আমারই শিক্ষা হিসেবে গণ্য করবে।[১৩৫]

দ্বিতীয় বিষয় : মুহাম্মদ (সা)-কে ফারাক্লীত বলার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের সমূহ আপত্তি

প্রথম আপত্তি : ফারাক্লীত বিষয়ক বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারাক্লীত পবিত্র-আত্মা বা সত্যের আত্মা (কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা : But the Comforter, which is the Holy Ghost=KJV, But the Counselor, the Holy Spirit=RSV)।[১৩৬] 'পবিত্র আত্মা' ও 'সত্যের আত্মা' বলতে 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' বা 'ঈশ্বরের সত্তার তৃতীয় অংশকে' বুঝানো হয়। কাজেই মুহাম্মাদকে কিভাবে ফারাক্লীত বলা যায় ?

এই আপত্তির জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, মীযানুল হক পুস্তকের রচয়িতা (ড. ফানডার) তাঁর পুস্তকাবলিতে দাবি করেছেন যে, ঈশ্বরের আত্মা', 'পবিত্র আত্মা', 'সত্যের আত্মা', 'সততার আত্মা', 'ঈশ্বরের মুখের আত্মা'. সবই এক অর্থে ব্যবহৃত। তিনি ১৮৫০ সালে মুদ্রিত 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) নামক পুস্তকের ফারসী সংস্করণের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ঈশ্বরের আত্মা' এবং 'পবিত্র আত্মা' নতুন ও পুরাতন নিয়মে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।" এভাবে তিনি দাবি করলেন যে, শব্দদ্বয় সমার্থক।

'হাল্লুল ইশকাল ফী জাওয়াবি কাশফিল আসতার' (পর্দা-উন্মোচনের উত্তরে সমস্যার সমাধান) নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন : "বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনিই জানেন যে, 'পবিত্র আত্মা', 'সত্যের আত্মা', 'ঈশ্বরের মুখের আত্মা' ও অন্যান্য শব্দ সবই 'ঈশ্বরের আত্মা' অর্থে ব্যবহৃত। এজন্য আমি বিষয়টি প্রমাণ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি না।

---

১৩৫. ইতোপূর্বে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সব শিক্ষা জানিয়ে যেতে পারলেন না, বরং ফারাক্লীত এসে বাকি সকল শিক্ষা জানাবেন।

১৩৬. বাইবেলের পাঠ থেকে সুস্পষ্ট যে, which is the Holy Ghost কথাটি যীশুর মূল বক্তব্যের অংশ নয়, বরং তা পরবর্তী কোন লিপিকারের সংযোজিত ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যা বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, যেগুলি সাধারণত ব্রাকেট বা বন্ধনীর মধ্যে থাকে। তবে এখানে বাইবেল লেখক ও প্রকাশকগণ কথাটি বন্ধনীর মধ্যে রাখতে রাজি হন নি।

এভাবে পাঠক জানতে পারলেন যে, তাঁর দাবি অনুসারে এগুলি সবই সমার্থক শব্দ। তাঁর দাবি সঠিক না বেঠিক তা আমরা আলোচনা করব না বরং আমরা তাঁর দাবি অনুসারে ধরে নিচ্ছি যে, এগুলি সবই সমার্থক শব্দ। কিন্তু আমরা মোটেও স্বীকার করি না যে, এ সকল শব্দ বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের সর্বত্র কেবল 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্বের' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে তাঁরই ভাষায় আমরা বলব, "বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনিই জানেন যে, এ সকল শব্দ বাইবেলের অনেক স্থানে 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।"

যিহিষ্কেলের পুস্তকের ৩৭ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন : "আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব (And shall put my spirit in you)।" এখানে 'আমার আত্মা' বলতে 'মানবীয় আত্মা' বা জীবন বুঝানো হয়েছে, 'ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' বুঝানো হয় নি, ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে যিনিই স্বয়ং ঈশ্বর।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে : ১ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের আত্মা) কি না (but try the spirits whether they are of God); কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী (false prophets) জগতে বাহির হইয়াছে। ২ ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের আত্মা) (Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is comein the flesh is of God)। .... ৬ আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি (We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby we know the spirit of truth, and the spirit of error)"।

২ আয়াতে "ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার" কথাটি অন্যান্য সংস্করণে নিম্নরূপ : ১৮২১ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ : "ইহাতে ঈশ্বরের আত্মা জানা যাইবে।" ১৮২৫ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদ : "ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে পৃথক করিতে পারিবে।"

২ আয়াতে 'ঈশ্বরের আত্মা' ও ৬ আয়াতে 'সত্যের আত্মা' বলতে সত্যবাদী ও সত্যপন্থী প্রচারক বা ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে; ঈশ্বরের তৃতীয় অংশকে বুঝানো হয় নি। এজন্যই ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত উর্দু বাইবেলে নিম্নরূপ অনুবাদ করা হয়েছে : ১

আয়াতে 'সকল আত্মা'র স্থলে 'সকল প্রচারক' এবং 'আত্মা সকলকে' স্থলে 'প্রচারক সকলকে' বলা হয়েছে। ৬ আয়াতে 'সত্যের আত্মাকে' স্থলে 'সত্যবাদী প্রচারক' ও 'ভ্রান্তির আত্মাকে' স্থলে 'বিভ্রান্তকারী প্রচারক ' বলা হয়েছে।

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এখানে ঈশ্বরের আত্মা ও সত্যের আত্মা বলতে ঈশ্বরের তৃতীয় অংশকে বুঝানো হয়নি, ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস অনুসারে যে আত্মাই স্বয়ং ঈশ্বর। কাজেই ফারাক্লীতকে 'পবিত্র-আত্মা' বা 'সত্যের আত্মা' বলে ব্যাখ্যা করাতে কোন অসুবিধা নেই; কারণ 'পবিত্র আত্মা' বা সত্যের আত্মা বলতে সত্যবাদী প্রচারক বা সত্যবাদী ভাববাদী বুঝানো হয়েছে, যেভাবে যোহনের পত্রে 'ঈশ্বরের আত্মা' ও 'সত্যের আত্মা' বলতে 'সত্যবাদী প্রচারক' বুঝানো হয়েছে।[১৩৭]

দ্বিতীয় আপত্তি : যীশু তাঁর বক্তব্যে প্রেরিতদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছেন এবং 'তোমাদিগকে' 'তোমাদের' এবং 'তোমরা' শব্দাবালি ব্যবহার করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লীত প্রেরিতদের যুগেই আবির্ভূত হবেন। আর মুহাম্মাদ (সা) তো প্রেরিতদের যুগে আবির্ভূত হন নি (কাজেই তাঁকে ফারাক্লীত বলে দাবি করা যায় না।)।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এই আপত্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও অন্তসারশূন্য। এ দাবির ভিত্তি এই যে, কথা বলার সময় যারা উপস্থিত থাকবেন, তুমি, তোমরা, তোমাদের বা তোমাদিগকে বলতে শুধু তাদেরকেই বুঝতে হবে, অন্য কাউকে বুঝা যাবে না। এ কথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ের ৬৪ আয়াতে মহাযাজক কায়াফা,অধ্যাপকবৃন্দ, প্রাচীনবর্গ ও উপস্থিত মানুষদেরকে সম্বোধন করে যীশু বলেন : "আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে (shall ye (you will=RSV) see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven)।" এখানে 'তোমরা' বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল বা সম্বোধনের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মৃত্যুর পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন অবধি তারা

১৩৭. যোহনের কথা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, "ঈশ্বরের আত্মা' ও 'সত্যের আত্মা' বলতে তিনি 'সত্যবাদী ভাববাদী' বুঝাচ্ছেন। তাঁর কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, অনেক ভাক্ত ভাববাদী বের হয়েছে। কাজেই তোমার সকল ভাববাদীকে বিশ্বাস কর না বরং তাদেরকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবে যে, সে ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের ভাববাদী কি না। ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের সত্য ভাববাদীকে চেনার উপায় হলো, যে সকল ভাববাদী যীশুখৃষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে তারা সকলেই ঈশ্বরের আত্মা বা ঈশ্বরের ভাববাদী ও সত্যের আত্মা বা সত্যের ভাববাদী।

তাঁকে আকাশের মেঘরথে আসতে দেখেন নি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এখানে 'তোমরা' বলতে তাদের সম্প্রদায়ের যে সকল মানুষ যীশুর পুনরাগমনের সময় বিদ্যমান থাকবেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ফারাক্লীত বিষয়ক বাক্যগুলিতেও তোমরা, তোমাদের, তোমাদিগকে ইত্যাদি বলতে ফারাক্লীতের আগমনের সময় তাদের উত্তরসূরীরা যারা বিদ্যমান থাকবেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় আপত্তি : ফারাক্লীতের বিষয়ে যীশু বলেছেন, "জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান (whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him : but ye know him)।" এই কথাটি মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ জগৎ তাঁকে দেখেছে এবং জেনেছে।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, এ আপত্তিটিও অন্তসারশূন্য। এ কথাটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আমাদের চেয়ে তাদের বেশি। কারণ এখানে বলা হয়েছে, 'জগৎ তাঁকে জানে না'। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর আর জগৎ ঈশ্বরকে জানে। জগৎ মুহাম্মাদ (সা)-কে যতটুকু জানে তার চেয়েও বেশি জানে ঈশ্বরকে। এজন্য তারা বলতে বাধ্য যে, এখানে 'জানে না' অর্থ সত্যিকারের পরিপূর্ণ পরিচয় জানে না। আর এই ব্যাখ্যা করার পরে এই কথাটি মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে কোন আপত্তি বা সন্দেহ থাকে না। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এ কথার অর্থ এই যে, জগৎ ফারাক্লীত, অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রকৃতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে জানে না; কিন্তু তোমরা তার পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত আছ। এখানে দেখা বলতে হৃদয়ের দেখা বা জানা বুঝানো হয়েছে। এজন্য যীশু পরের বারে আর দেখার কথা উল্লেখ করেন নি, বরং শুধু জানার কথাই বলেছেন।

এখানে 'দেখে না' বলতে যদি দৃষ্টি দিয়ে দেখা বুঝানো হয় তবে এর ব্যাখ্যা হবে বাইবেলের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ন্যায়। ১৮১৬ ও ১৮২৫ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে মথির সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৩ এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দৃষ্টিপাত করে কিন্তু দেখে না, শ্রবণ করে কিন্তু শুনে না।[১৩৮] এবং বুঝেও না। ১৪ আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে, 'তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোন

---

১৩৮. বাংলা বাইবেলে : দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। ইংরেজী : because they seeing seen not; and hearing they hear not=KJV/seeing they do not see, hearing they do not hear=RSV.

মতে বুঝিবে না; আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না' (seeing ye shall see, and shall not perceive=KJV/ : you shall indeed see but never perceive=RSV)."

এখানে যীশু দৃষ্টিপাত করে না দেখা বলতে যা বুঝিয়েছেন, উপরে ফারাক্লীতের বিষয়েও না দেখা বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার পরে আর মুহাম্মাদ (সা)-কে ফারাক্লীত বলতে কোন আপত্তি থাকে না।

দেখা, জানা ইত্যাদি শব্দের এরূপ ব্যবহার মূলত রূপক ব্যবহার। তবে তা ব্যবহারিকভাবে প্রকৃত ব্যবহারে পরিণত হয়েছে। যীশুর বক্তব্যে এরূপ ব্যবহার অনেক পাওয়া যায়।

মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে রয়েছে : "আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।"

যোহনের সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ২৮ (ও ২৯) আয়াতের যীশু বলেছেন : "যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্যময়; তোমরা তাঁহাকে জান না।"

যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে যীশু বলেন, "ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি।"

যোহনের সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "৭ যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ (and from henceforth ye know him, and have seen him)। ৮ ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না ? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন ?"

যীশুর এ সকল বক্তব্যে 'জানা' অর্থ পরিপূর্ণভাবে বা সত্যিকারভাবে জানা এবং 'দেখা' অর্থ 'জানা'। এরূপ ব্যাখ্যা না করলে যীশুর কথাগুলি সবই ভুল ও অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ ইহূদী সমাজপতি, যাজক, প্রাচীনবর্গ ও প্রেরিতগণ তো যীশুকে জানতেনই, উপরন্তু সাধারণ মানুষেরাও যীশুকে জানত (কাজেই পিতা ছাড়া কেউ পুত্রকে জানে না কথাটির অর্থ থাকে না। আর তারা সকলেই ঈশ্বরকে জানত, কাজেই যীশু ছাড়া কেউ ঈশ্বরকে জানে না, একথা বলা চলে না)। অনুরূপভাবে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরকে পৃথিবীতে দেখা যায় না (কাজেই 'এখন অবধি তোমরা তাঁকে দেখেছ' বা 'যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে' কথা উপর্যুক্তভাবে ব্যাখ্যা না করলে অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়)।

চতুর্থ আপত্তি : ফারাক্লীতের বিষয়ে বলা হয়েছে : তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন (he dwelleth with you, and shall be in you)। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশু যখন এ কথা বলেছিলেন, তখনই ফারাক্লীত প্রেরিতদের সাথে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁদের মধ্যেই ছিলেন। কাজেই মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে এ কথা কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে ?

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে এ কথাটির অনুবাদ নিম্নরূপ : ১৮১৬, ১৮২৮ ও ১৮৪১ সালের ফারসী অনুবাদ এবং ১৮১৪ ও ১৮৩৯ সালের উর্দু অনুবাদও একইরূপ। ১৮৬০ সালের আরবী অনুবাদ : "তোমাদের মধ্যে স্থিত ও তোমাদের মধ্যে থাকবেন।"

এ সকল অনুবাদ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ভবিষ্যতের অবস্থান ও স্থিতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে স্থিত হবেন এবং তোমাদের মধ্যে থাকবেন। এখন শুধু থাকল প্রথম বাক্যটি বর্তমান কালে কেন ? (এ থেকে তো বুঝা যায় যে, ফারাক্লীত যীশুর কথার সময়েই তাদের সাথে অবস্থান করছিলেন)

এ বিষয়ে আমি বলব যে, এই কথাটিকে বর্তমানের অর্থে গ্রহণ করে যীশুর বক্তব্যের সময় ফারাক্লীত প্রেরিতদের সাথে অবস্থান করছিলেন বলে মনে করলে তা যীশুর অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত হবে। ফারাক্লীতের বিষয়ে যীশু বলেছেন : "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক ফারাক্লীত তোমাদিগকে দিবেন।" তিনি আরো বলেছেন : "আর এখন, ঘটিবার পূর্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।" তিনি আরো বলেছেন : "কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লীত) তোমাদের নিকটে আসিবেন না।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম বাক্যের 'বর্তমান কাল' ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটিতে যেমন সুস্পষ্ট ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি প্রথম বাক্যটির অর্থও ভবিষ্যত কাল। এর অর্থ তিনি ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। আর এই অর্থ মুহাম্মাদ (সা) তাদের সাথে অবস্থান করেছেন এবং করছেন।

ভবিষ্যৎ কালে সুনিশ্চিত ক্রিয়ার জন্য বর্তমান বা অতীত কালে ক্রিয়ার ব্যবহার বাইবেলের উভয় নিয়মেই ব্যাপক। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ের শুরুতে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজ বা গগ-ম্যাগগ (Gog and Magog)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে এবং ইস্রায়েলের পর্বতসমূহে এসে তারা ধ্বংস হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এরপর তিনি ৮

আয়াতে বলেন : দেখ, ইহা আসিল এবং সিদ্ধ হইল[১৩৯] (Behold, it is come, and it is done). ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন : "এ সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলিয়াছি।"

এভাবে এখানে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে : আসিল এবং সিদ্ধ হইল। ১৮৩৯ সালে ফারসী অনুবাদেও এখানে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাটি নিশ্চিত ঘটবেই তা বুঝানোর জন্য এভাবে ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীত কালের ক্রিয়া দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। অতীত কালের ক্রিয়া দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলার পরে ২৪৫০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, এখনো গগ-ম্যাগগদের প্রতিশ্রুত আবির্ভাব ঘটে নি।

যোহনের সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে : "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, এবং তা এখন উপস্থিত[১৪০], যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিতেছে[১৪১], এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে (The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God : and they that hear shall live)।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, যীশু বললেন, 'তা এখন উপস্থিত।' তাঁর এ কথা বলার পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এই সময় এখনো উপস্থিত হয় নি। এখন পর্যন্ত এই সময় অজ্ঞাত। কেউই জানে না কখন সে সময় আসবে।

পঞ্চম আপত্তি : প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "আর তিনি (যীশু) তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকারের জন্য অপেক্ষায় থাক, যাহার কথা আমার কাছে শুনিয়াছ (wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me)[১৪২]। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ হইবে, বেশী দিন পরে নয়।

এখানে 'পিতার অঙ্গীকার' বলতে ফারাক্লীত সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের উপরে যে আত্মা অবতরণ করেন তিনি প্রতিশ্রুত ফারাক্লীত।

---

১৩৯. আরবী বাইবেলে উভয় ক্রিয়াই অতীত কালের : আসিল ও সিদ্ধ হইল। বাংলা বাইবেলে : ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধ হইবে। ইংরেজি কিং জেমস ভার্সনে উভয় ক্রিয়াই অতীত কালের। কিন্তু রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সনে উভয় ক্রিয়াকেই ভবিষ্যতের ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪০. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের হুবহু অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে : বরং এখন উপস্থিত।

১৪১. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের হুবহু অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে :শুনিবে।

১৪২. বাংলা বাইবেলে : পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, 'পিতার অঙ্গীকার' বলতে ফারাক্লীতকে বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করা ভিত্তিহীন ও প্রমাণবিহীন দাবি মাত্র বরং দাবিটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল। উপরের ১৩টি বিষয় প্রমাণ করে যে, প্রেরিতদের উপর অবতীর্ণ আত্মাকে ফারাক্লীত বলা সম্ভব নয়। সত্য কথা এই যে, ফারাক্লীত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী এক বিষয় আর শিষ্যদের উপর আরেকবার আত্মার অবতরণের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ উভয় প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করেছেন। প্রথম প্রতিশ্রুতিকে ফারাক্লীতের আগমন বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় বিষয়কে 'পিতার অঙ্গীকার' বলে উল্লেখ করেছেন।

যে বিষয়টি অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে তা হলো, ফারাক্লীত বিষয়ক প্রতিশ্রুতি কেবল যোহন উল্লেখ করেছেন, বাকি তিন সুসমাচার লেখক তা উল্লেখ করেন নি। আর পিতার অঙ্গীকার কেবল লূক উল্লেখ করেছেন, যোহন এই বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। আর সুসমাচার লেখকদের এ কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

অনেক সময় অনেক অতি সাধারণ বিষয় চার সুসমাচার লেখক সকলেই উল্লেখ করেছেন। যেমন যিরূশালেমে গমনের সময় যীশুর গাধার পিঠে আরোহণ করার কথাটি চার সুসমাচার লেখকই উল্লেখ করেছেন।[১৪৩]

আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা একমত হন নি। কেউ তা বর্ণনা করেছেন এবং কেউ করেন নি। যেমন নায়িন নামক নগরে বিধবার পুত্রকে জীবিত করার কথা[১৪৪], যীশু কর্তৃক ৭০ জন শিষ্যকে প্রেরণের কথা[১৪৫] এবং ১০ জন কুষ্ঠরোগীকে শুচি করার[১৪৬] বিষয় লূক ছাড়া কেউ উল্লেখ করেন নি। অন্য তিন সুসমাচার লেখক বিষয়গুলি উল্লেখ করেন নি, অথচ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল যোহন যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, অন্য কেউ করেন নি সেগুলির মধ্যে রয়েছে : গালীলের কান্না নগরে বিবাহের অনুষ্ঠানের ঘটনা, যে ঘটনায় যীশু পানিকে মদে রূপান্তরিত করার অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করেন। এই ছিল তাঁর প্রথম চিহ্ন-কার্য এবং এর মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় এবং শিষ্যরা তাঁকে বিশ্বাস করে।[১৪৭] অনুরূপভাবে যিরূশালেমের বৈথেস্‌দা পুকুরে একজন রোগীকে সুস্থ করার ঘটনাও কেবল যোহন উল্লেখ করেছেন।[১৪৮] এই ঘটনাটিও অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক কার্য ছিল। যে রোগীকে তিনি সুস্থ করেন সে ৩৮ বছর যাবৎ অসুস্থ ছিল।

---

১৪৩. মথি ২১/১-১১; মার্ক ১১/১-১০; লূক ১৯/১৮-৩৬; যোহন ১২/১২-১৬।

১৪৪. লূক ৭/১১-১৭।

১৪৫. লূক ১০/১-১৭।

১৪৬. লূক ১৭/১১-১৯।

১৪৭. যোহন ২/১-১১।

১৪৮. যোহন ৫/১-৯।

ব্যভিচারের জন্য ধৃত স্ত্রীলোকটির কাহিনীও শুধু যোহনই উল্লেখ করেছেন।[১৪৯] জন্মান্ধকে সুস্থ করা ও দৃষ্টিশক্তি দানের ঘটনাও কেবল যোহনই উল্লেখ করেছেন। এটিও যীশুর শ্রেষ্ঠ অলৌকিক চিহ্ন-কার্যসমূহের অন্যতম। যোহনের ৯ অধ্যায়ে তা রয়েছে।[১৫০] মৃত লাসারকে জীবন দানের কাহিনীও একমাত্র যোহনই উল্লেখ করেছেন, অন্য কোন সুসমাচার লেখক তা উল্লেখ করেন নি, অথচ ঘটনাটি যীশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক কার্যসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে মথি ও মার্কও কিছু অলৌকিক কার্য ও অন্যান্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যেগুলি তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখ করেন নি।

মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে গেল। এজন্য আমি এ বিষয়ক আলোচনা এখানেই শেষ করছি। উপরের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সবই আমাদের যুগের খৃস্টানদের নিকট স্বীকৃত পুস্তকাদিতে বিদ্যমান।[১৫১] বাইবেলের অন্যান্য পুস্তক, যেগুলিকে খৃস্টানগণ বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেন না, সেগুলির মধ্যেও মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও

১৪৯. যোহন ৮/২-১১।

১৫০. যোহন ৯/১-৩৮।

১৫১. মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বিদ্যমান। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৩ আরব দেশের উপরে দায়িত্ব The burden upon Arabia (বাংলা বাইবেলে : আরব বিষয়ক ভাববাণী)। হে দদানীয় (Dadanim) পথিক দলসমূহ,তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। ১৪ তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা-দেশবাসীরা (Tema) , তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৫ কেননা তাহারা কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের (Kedar) সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; ১৭ আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।"

একটি ভবিষ্যদ্বাণী যতটুকু স্পষ্ট হতে পারে তার চেয়েও স্পষ্টতর। এখানে স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উন্মুক্ত নিষ্কোষিত তরবারীর সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তাইমা/তিহামার উম্মু মা'বাদের নিকট থেকে পানি, দুগ্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদরের বা আরবের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

যিশাইয়র পুস্তকের ৬০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত। সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল। ...৬ তোমাতে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ, মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ; শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে; তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে। ৭ কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্যা করিবে; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব (All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory)।"

সুসংবাদ বিদ্যমান। আমি সেগুলি থেকে উপরে কোন উদ্ধৃতি প্রদান করিনি। এখানে আলোচনার শেষে আমি এরূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

এখানেও স্পষ্টত মক্কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে মক্কার পবিত্র ঘরের বিশ্বব্যাপী মর্যাদা লাভ ও বিশ্বের সর্বত্র থেকে মানুষের হজ্জে আগমনের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র মক্কার 'আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ' (the house of my glory) পবিত্র কা'বাঘর ছাড়া অন্য কোথাও কেদরের সমস্ত মেষপাল একত্রীকৃত হয় নি, যিরূশালেমের ধর্মধামেও না, খৃষ্টানদের মহাচার্চ ভ্যাটিকান বা অন্য কোথাও নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, একমাত্র কেদরের সমস্ত মেষপালই সম্পূর্ণভাবে খৃষ্টীয় চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে।

হবক্কূকের পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য : "৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশগুল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় (হাম্‌দ) পরিপূর্ণ (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)।"

আমরা দেখেছি যে, পারণ পর্বত ও পারণ প্রান্তর মক্কার প্রান্তরে, যেখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে পারণের পবিত্রতম বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা প্রশংসিত তা বুঝানো হয়েছে।

গীতসংহিতার ৭২ গীতে বলা হয়েছে : "৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন। ৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে। ১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজাগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিরা ও আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। ১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। ১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে; ১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিবে; ও তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করা যাইবে, লোকে তাঁহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিবে, সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে (prayer also shall be made for him continually: and daily shall he be praised)।"

এ কথাগুলিও স্পষ্টত মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি ও তাঁর উম্মতই সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ও পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সামনেই মরুনিবাসীরা নত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে। তিনিই দরিদ্র ও অসহায়দের রক্ষার জন্য সর্বজনীন আইন প্রদান করেন ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল ইসলাম ধর্মেই নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি একমাত্র তিনিই সর্বত্র 'প্রশংসিত' (মুহাম্মাদ)।

যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে : "৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, এক জন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যাহা যাহা দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। ৭ এবং সে দেখিল দুই জন করিয়া অশ্বারোহীসহ একটি রথ, গর্দভের একটি রথ এবং উষ্ট্রের একটি রথ, এবং সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিল : And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed (বাংলা বাইবেলে : "যখন সে দল দেখে, দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহীদিগকে, গর্দভের দল, উষ্ট্রের দল দেখে তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিবে।") ... ৯ আর দেখ, এক দল লোক আসিল; অশ্বারোহীরা দুই দুই জন করিয়া আসিল। আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, 'পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তাহার দেবগণের সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল (Babylom is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground)"। এখানেও বাহ্যত গর্দভের রথ বলতে যীশুকে এবং উটের রথ বলতে মুহাম্মাদ

পাদরি জর্জ সেল (George Sale) তাঁর প্রণীত কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বার্নাবাসের[১৫২] ইঞ্জিল[১৫৩] থেকে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক নিম্নোক্ত

(সা)-কে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পরে তাঁরই সাহাবীদের হাতে বাবিলের পতন ঘটে এবং তথাকার প্রতিমাগুলি ভূমিসাৎ হয়।

হগয় ভাববাদীর পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে : ৭ আর আমি সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তুসকল আসিবে (And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come)।

রেভারেন্ড প্রফেসর ডেভিড বেঞ্জামিন ছিলেন আরমেনিয়ার একজন বিশপ। তিনি খৃষ্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তকের একটি Muhammad in the Bible। এই পুস্তকে তিনি হিব্রু, আরামাইক ও অন্যান্য ভাষার পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এখানে desire বা মনোরঞ্জন শব্দের স্থলে মূলত 'হামদা' বা 'আহমদ' শব্দ রয়েছে। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছেন।

গীতসংহিতার ৯৬ গীতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি কীর্তনীয় (For the LORD is great, and greatly to be praised)।" এই আয়াতের প্রাচীন আরবী অনুবাদে 'মুহাম্মাদ' শব্দটি স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে বলে হিজরী অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইবনু তায়মিয়া (৭২৮ হি/ ১৩২২ খৃ) উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সময়ে ১৪শ খৃস্টীয় শতকে সিরিয়ান ও কালদীয় খৃস্টানদের মধ্যে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তিনি এবং তৎকালীন মুসলিম আলিমগণ সেগুলির উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে বাইবেলের পুস্তকগুলিকে অধ্যায় ও পংক্তিতে ভাগ করার নিয়ম প্রচলিত হয় নি। এজন্য তিনি শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় ও পংক্তির নম্বর উল্লেখ করেন নি। এছাড়া তিনি বাইবেল থেকে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, যেগুলিতে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের একটি আয়াতে বলা হয়েছে : "হে ঈশ্বরের পবিত্র, মুহাম্মাদ, তোমার নাম চিরস্থায়ী।" এই পুস্তকের অন্য আয়াতে রয়েছে : "হে ঈশ্বরের পবিত্রতম, মুহাম্মাদ, আমি তোমার বিষয় জানিয়েছি।" অন্য আয়াতে রয়েছে : "আমার প্রিয় ও আমার পুত্র আহমদ।" অন্য আয়াতে রয়েছে : "আমরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মুহাম্মাদের রব শুনিলাম।" তিনি যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কেদরের সন্তানগণকে একটি পুস্তক দান করবেন এবং তাদেরকে ইহূদীদের উপর প্রাধান্য দান করবেন। বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান যিশাইয় ও যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকদ্বয়ে এই আয়াতগুলি পাওয়া যায় না।

১৫২. বার্নাবাস (Barnabas : Joses/Joseph The Levite) যীশুর একজন শিষ্য ছিলেন। যীশুর তিরোধানের পরে কিছুদিন তিনি পৌলের সাথে প্রচার কার্য করেন। পরবর্তীতে পৌলের সাথে তাঁর মতভেদ হয় এবং তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দেখুন : প্রেরিত ১৩ থেকে ১৫ অধ্যায় এবং প্রেরিত ৪/৩৬-৩৭, ৯/২৭, ১১/১৯-৩০, ১২/২৫, ১ করিন্থীয় ৯/৬। কোন কোন প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় যে, বার্নাবাসের মূল নাম ছিল মাথাই (Matthai) বা মাথিয়াস (Matthias) এবং তিনি যীশুর ১২ শিষ্যের একজন ছিলেন। প্রচলিত ৪ গসপেলে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে তাঁর নাম নেই, তবে দ্বাদশ শিষ্যের নাম বর্ণনায় গসপেলগুলির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

১৫৩. বার্নাবাসের ইঞ্জিল (The Gospel of Barnabas) খৃস্টানদের নিকট অস্বীকৃত (non-canonical) গসপেলগুলির অন্যতম। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিরুদ্ধবাদিগণের উপর

ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছেন : "হে বার্নাবাস, জেনে রাখ যে, পাপ ছোট হলেও ঈশ্বর তার প্রতিফল দান করেন। কারণ ঈশ্বর পাপের প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেহেতু আমার মাতা ও আমার শিষ্যগণ আমাকে জাগতিক কারণে ভালবেসেছে, এ কারণে ঈশ্বর তাদের উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই অন্যায় বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে এই জগতে শাস্তি দান করবেন যেন সেই জগতে তাদেরকে নরকের অগ্নিতে শাস্তিভোগ থেকে মুক্তিদান করেন এবং তাদেরকে তথায় কষ্ট পেতে না হয়। আর আমি নিরপরাধ হলেও কিছু মানুষ আমার বিষয়ে বলেছে যে, তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর এই কথা অপছন্দ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, পুনরুত্থানের দিনে শয়তানগণ যেন আমাকে নিয়ে উপহাস করতে বা হাসাহাসি

নির্মম অত্যাচার খৃস্টীয় চার্চের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে দিন থেকে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেন সে দিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যেখানেই খৃস্টীয় চার্চ সামান্যতম ক্ষমতা পেয়েছে সেখানেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে বা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। সর্বোপরি বিরুদ্ধবাদিদের লেখা বই, পুস্তক বা তাদের মতের পক্ষের সকল লিখনি পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন ও নির্মুল করেছে। এজন্য ৩য়/৪র্থ/৫ম শতকের বা তার পরের যুগের চার্চের বিরোধী খৃস্টানদের লেখা, পাণ্ডুলিপি বা পত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই অন্যান্য 'অস্বীকৃত ইঞ্জিলের' ন্যায় বার্নাবাসের ইঞ্জিলেরও প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। যতটুকু জানা যায়, ৩২৫ সালে নিকীয় মহাসম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত বার্নাবাসের ইঞ্জিল আলেকজান্দ্রীয় চার্চে 'স্বীকৃত ইঞ্জিল' হিসেবে গণ্য ছিল। দ্বিতীয় শতকের খৃস্টান ধর্মগুরু আরিনাউস (Irenaeus) এই গসপেল থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে জানা যায়। নিকীয় মহাসম্মেলনে একে 'বাতিল' ইঞ্জিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং এর পাণ্ডুলিপিগুলি ক্রমান্বয়ে নির্মুল করা হয়। ১৬শ শতকে এর একটি পাণ্ডুলিপি পোপের ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে বের করা হয়। ফ্রাও ম্যারিনো নামে পোপ পঞ্চম সিক্সটাস (Sixtus V : 1585-1590)-এর একজন বন্ধু ছিলেন। একদিন পোপের ব্যক্তিগত পাঠাগারে তিনি 'বার্নাবাসের সুসমাচারের' একটি ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি দেখতে পান। আরিনাউসের লিখনিতে 'বার্নাবাসের সুসমাচারের' উদ্ধৃতি পড়ে তাঁর সুসমাচারটির বিষয়ে কৌতুহল ছিল। এজন্য তিনি পোপের অজান্তে পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপিটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বই সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে। অবশেষে ১৭৩৮ সাল থেকে তা ভিয়েনার লাইব্রেরীতে স্থিতি পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বার্নাবাসের সুসমাচারের আরেকটি 'স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপি' পাওয়া যায়, কিন্তু তা যে কোনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ পাদরি ও প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল এবং অক্সফোর্ডের প্রফেসর ড. মেনকহাউসের মাধ্যমে সুসমাচারটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। ১৯০৭ সালে ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ করা হয়। তবে অদ্ভুতভাবে তা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। শুধু বৃটিশ মিউজিয়াম ও কংগ্রেস লাইব্রেরীতে দুটি কপি থেকে যায়। পরবর্তীকালে এই দুটি কপি থেকে কোন কোন দেশে মুসলিম গবেষকগণ তা পুনর্মুদ্রিত করেছেন। (মরহুম কবি আফজাল চৌধুরী কর্তৃক Gospel of Barnabas -এর বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। –সম্পাদক)

করতে না পারে। এজন্য তিনি করুণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যিহূদার মৃত্যুর মাধ্যমে যেন এই উপহাস ও হাসাহাসি আমি এই জগতে লাভ করি; কারণ সকল মানুষই ধারণা করেছে যে, আমিই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছি। তবে এই উপহাস ও হাসাহাসি ঈশ্বরের ভাববাদী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন সকল বিশ্বাসীকে এই ভুলটি বুঝিয়ে দেবেন; ফলে মানুষের হৃদয় থেকে এই বিভ্রান্তি অপসারিত হবে।"

জর্জ সেলের অনুবাদ এখানেই শেষ।[১৫৪]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। খৃস্টান পণ্ডিতগণ হয়ত আপত্তি করে বলবেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মগুরুগণ তাঁদের সম্মেলনগুলিতে এই ইঞ্জিলটিকে বাতিল বলে বাদ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, তাদের এ সকল মহাসম্মেলনের বাতিল করা ও গ্রহণ করার কোনরূপ মূল্য নেই। ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনেছেন, যে বিষয়ে নতুন কিছু বলার অবকাশ বা প্রয়োজন নেই। এই ইঞ্জিলটি প্রাচীন ইঞ্জিলগুলির অন্যতম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে লিখিত পুস্তকাবলিতে এই ইঞ্জিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জিলটি মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের কয়েক শত বছর পূর্বে রচিত। ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণা ছাড়া কেউ এরূপ একটি বিষয় তা সংঘটিত হওয়ার কয়েক শত বছর পূর্বে এভাবে বলতে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ কথাটি যীশুই বলেছেন।

যদি তারা দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের পরে কোন মুসলিম বার্নাবাসের ইঞ্জিলের মধ্যে এ কথা সংযোজন করেছেন, তবে আমি বলব যে, এ সম্ভাবনা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। কারণ মুসলিমগণ খৃস্টানদের প্রসিদ্ধ ৪ সুসমাচারের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেন নি। কাজেই বার্নাবাসের সুসমাচার বিকৃত করতে যাবেন তারা কেন ?

এছাড়া যদি কোন মুসলিম তার নিকট সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি বিকৃত করেনই তাতে কি খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত সবগুলি পাণ্ডুলিপিই বিকৃত হয়ে যাবে? এটি একেবারেই অবাস্তব কথা। খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, যে সকল ইহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে বিকৃত করেছিলেন। খৃস্টান পণ্ডিতদের দাবি অনুসারেই বলব, ইসলাম গ্রহণকারী এ সকল ধর্মগুরুদের বিকৃতির কারণে ইহূদী-খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত কপিগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলির

---

১৫৪. বার্নাবাসের সুসমাচার (The Gospel of Barnabas) ২২০ অধ্যায়। এছাড়া এই সুসমাচারের আরো কয়েকটি স্থানে যীশু 'মুহাম্মাদ' (সা)-এর নাম উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দেখুন: ১১২, ১৩৬ ও ১৬৩ অধ্যায়।

কোনরূপ বিকৃতি ঘটেনি। তাহলে কোন মুসলিম যদি বার্নাবাসের সুসমাচারের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করেই তবে তাতে খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত কপি বিকৃত হবে কিভাবে ? এভাবে আমরা দেখছি যে, এই সম্ভাবনা অত্যন্ত দুর্বল, অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য।[১৫৫]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১৮৫০ সালে প্রকাশিত জর্জ সেল প্রণীত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বার্নাবাসের এই উদ্ধৃতিটি আমি প্রথমে আমার লেখা 'আল-ই'জায আল-ঈসাবী' (যীশুর অলৌকিকত্ব) নামক (উর্দু) পুস্তকে দিই। আমার এই পুস্তকটি ১২৭১ হিজরী সালে, মোতাবেক ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ভারতের সকল অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খৃস্টান পণ্ডিতদের অনুবাদ ও গ্রন্থাদি প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্তিত হয়। পূর্ববর্তী সংস্করণের সাথে পরবর্তী সংস্করণের বিভিন্ন অমিল থাকে। বিষয়টি আমি ইতোপূর্বে এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। যদি কোন পাঠক দেখেন যে, আমি জর্জ সেলের পুস্তকের যে সংস্করণ থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছি সে সংস্করণ ছাড়া অন্য কোন সংস্করণে, বিশেষত, ১৮৫০ সালের পরবর্তী কোন সংস্করণে বার্নাবাসের এই উদ্ধৃতিটি নেই তবে তিনি যেন আমার উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করেন। কারণ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের সুপরিচিত অভ্যাস যে, তাঁরা তাঁদের সুবিধা অনুসারে তাঁদের প্রকাশিত বই-পুস্তকের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন করেন। তাঁদের কাছে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই তাঁরা যদি জর্জ সেলের পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের সময় এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ফেলে দেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

---

১৫৫. কোন কোন খৃস্টান পণ্ডিত দাবি করেন যে, কোন মুসলিম এই গসপেলটি লিখে 'বার্নাবাসের' নামে চালিয়েছেন। তাঁদের এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। বার্নাবাসের ইঞ্জিলে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইহুদী রীতিনীতি ও যীশুর সমসাময়িক বিষয়াবলির যে সকল বিবরণ রয়েছে তা প্রমাণ করে যে, ইঞ্জিলটির লেখক অত্যন্ত প্রাজ্ঞ পুরাতন নিয়মের গভীর জ্ঞানধারী ইহুদী ছিলেন। এছাড়া এর ভাষাশৈলী, পরিভাষা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, তা প্রথম খৃস্টীয় শতকেই লিখিত। সর্বোপরি কোন মুসলিম পণ্ডিত যদি এই গ্রন্থটির রচনার সাথে জড়িত থাকতেন তবে অবশ্যই তা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্যই করতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি বইটির বিষয়ে মুসলিমদেরকে জানাতেন এবং এর বিষয়বস্তুকে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে কোন মুসলিম আলিম বইটির কথা জানতেনই না। ৭ম/৮ম খৃস্টীয় শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত শতশত মুসলিম পণ্ডিত খৃস্টধর্মের আলোচনা, সমালোচনা ও বাইবেলের আলোকে মুহাম্মাদ (সা) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেউই কখনো 'বার্নাবাসের ইঞ্জিলের' উদ্ধৃতি দেন নি বা এর বিষয়বস্তুও উল্লেখ করেন নি। আল্লামা রহমাতুল্লাহর আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, একমাত্র জর্জ সেলের এই উদ্ধৃতি ছাড়া কোথাও তিনি এই ইঞ্জিলের কথা জানতে পারেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি মূলতই বার্নাবাসের রচিত গসপেল। খৃস্টান চার্চ তা নির্মূল করার ও গুপ্ত রাখার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে হায়দার আলী কোরেশী নামক প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম 'খুলাসাতু সায়ফিল মুসলিমীন' (মুসলিমদের খড়গের সারসংক্ষেপ) নামক একটি উর্দু পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের ৬৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "আরমেনীয় পাদরি ওসকান ১৬৬৬ সালে আরমেনীয় ভাষায় যিশাইয়র পুস্তক অনুবাদ করেন। ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে এন্টনিপোর্টলি প্রেসে তা মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদে যিশাইয়র পুস্তকের ৪২ অধ্যায়ে নিম্নের আয়াতটি রয়েছে : "তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নূতন গীত গাও। তাঁহার প্রতাপের চিহ্ন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে[১৫৬] এবং তাঁহার নাম আহমদ।"[১৫৭] এই অনুবাদটি আরমেনীয় খৃস্টানদের নিকট এখনো বিদ্যমান। কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারেন।"

হায়দার আলী কোরেশীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

গ্রন্থকার বলেন, এই অনুবাদটি আমার হস্তগত হয়নি এবং আমি তা পাঠ করতে পারি নি। কোরেশী সাহেব সম্ভবত তা দেখেছেন এবং পাঠ করেছেন। নিঃসন্দেহে যিশাইয়র এই বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ এই অনুবাদের বিশুদ্ধতা স্বীকার করবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সময় থেকে অগণিত ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) বিষয়ক অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, ছা'লাবা ইবনু সা'ইয়া, আসাদ ইবনু সা'ইয়া, বিনইয়ামীন, মুখায়রীক, কা'ব আল-আহবার ও অন্যান্য অনেক ইহূদী পণ্ডিত। অনুরূপভাবে এঁদের মধ্যে ছিলেন বুহায়রা, নসতূরা হাবাশী, দাগাতির নামক রোমান বিশপ যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে দাহিয়া কালবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ কারণে রোমানরা তাঁকে হত্যা করে, জারূদ, ইথিওপিয়ার নাজাশী, জা'ফর ইবনু আবূ তালিবের সাথে ইথিওপিয়া থেকে আগত পাদরি ও সন্যাসিগণ ও অন্যান্য খৃস্টান পণ্ডিত। অন্য অনেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের সত্যতা ও সর্বজনীনতা স্বীকার করেছেন, কিন্তু জাগতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। যেমন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসরের শাসক মুকাওকিস, ইবনু সূরিয়া, হুয়াই ইবনু আখতাব, আবূ ইয়াসির ইবনু আখতাব ও অন্য অনেকে তাঁর নবুওয়ত ও বিশ্বজনীনতা স্বীকার করলেও হিংসা তাদেরকে দুর্ভাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

---

১৫৬. মুহাম্মাদ (সা)-এর পৃষ্ঠদেশের মাহরে নবুওয়তের কথা বলা হয়েছে।

১৫৭. দেখুন যিশাইয় ৪২/১০-১১। প্রচলিত অনুবাদে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে।

নাজরান থেকে আগত খৃস্টানদের সামনে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করার পরেও যখন তারা সত্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি সত্যকে গ্রহণ না কর তবে আমি যেন তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ধ্বংস প্রার্থনা করি (সকলে একত্রে প্রার্থনা করবেন যে, তাদের মধ্যে যে মিথ্যাচারী তাকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন।), তখন তারা বলেন, হে আবুল কাসিম! বরং আমরা ফিরে যেয়ে সকলে একত্রে বসে পরামর্শ করে দেখি আপনার বিষয়ে কি করা উচিত। তারা ফিরে যেয়ে তাদের নেতা আকিবকে বলেন, এ বিষয়ে আপনার মত কি ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো তাঁর নবুওয়তের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছ। যীশুখৃস্টের বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট সত্য পেশ করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! কোন সম্প্রদায় কোন নবীর সাথে ধ্বংস প্রার্থনায় লিপ্ত হলে তারা ধ্বংস হয়। তোমরা যদি তোমাদের ধর্মের মায়া ছাড়তে না পার তবে এই ব্যক্তির সাথে সন্ধি করে দেশে ফিরে চল।

এই পরামর্শের ভিত্তিতে পরদিন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি হাসান ও হুসায়নের হাত ধরে বেরিয়ে আসেন। ফাতিমা (রা) তাঁর পিছে হাঁটছিলেন। আলী (রা) ছিলেন ফাতিমার (রা) পিছনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান, হুসায়ন, আলী ও ফাতিমা (রা)-কে বলেন, আমি যখন দু'আ করব তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তখন নাজরান প্রতিনিধিদলের সদস্য নাজরানের বিশপ বলেন, হে খৃস্টানগণ! আমি এমন কিছু মুখ দেখতে পাচ্ছি যাঁরা আল্লাহর কাছে কোন পর্বত স্থানান্তরের জন্য প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তা কবূল করবেন। কাজেই তোমরা পারস্পরিক ধ্বংস প্রার্থনায় যোগদান করবে না; কারণ এতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নাজরানের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে কর প্রদান করতে সম্মত হন। তারা কর হিসেবে দুই হাজার জোড়া মূল্যবান লাল পোশাক এবং ত্রিশটি লৌহ বর্ম প্রদান করতে চুক্তিবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তারা যদি 'পারস্পরিক ধ্বংস-প্রার্থনায়' রত হতো তবে তাদেরকে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত করা হতো, তাদের নিম্নভূমিগুলিতে আগুন জ্বলতো এবং আল্লাহ্ নাজরানবাসীদেরকে নির্মূল করতেন, এমনকি বৃক্ষের পাখিরা পর্যন্ত।

এই ঘটনায় দু'ভাবে মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয় :

প্রথমত, তিনি নাজরানবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন যে, তারা তাঁর সাথে পারস্পরিক ধ্বংস প্রার্থনায় যোগ দিলে তাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসবে। তিনি যদি তার নবুওয়তের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হতেন তবে কখনোই তিনি এরূপ ভয় দেখাতেন না। পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়ে এরূপ ভয় দেখানোর অর্থ হলো নিজের মিথ্যাচারিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। কারণ যদি তারা তাঁর সাথে 'ধ্বংস

প্রার্থনায়' অংশগ্রহণ করত এবং তারপরও তাদের উপর শাস্তি না আসতো তবে তাঁর মিথ্যাচার প্রকাশিত হয়ে যেত। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর মত একজন বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করার মত 'ঝুঁকি' নেবেন না। এজন্য যখন আমরা দেখি যে, তিনি নাজরান প্রতিনিধিদের সাথে 'ধ্বংস-প্রার্থনায়' অংশগ্রহণের বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন আমরা নিশ্চিত হই যে, তিনি নিজের নবুওয়তের বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, নাজরানের খৃস্টানগণ ও অন্যান্য অমুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতায় ও তাঁর প্রতিরোধের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করছিলেন। নাজরানবাসিগণ বিপুল পরিমাণের অর্থ কর দিতে রাজি হলেন। অথচ তারা তাঁর সাথে 'পারস্পরিক ধ্বংস প্রার্থনায়' যোগদান করতে রাজি হলেন না। এরূপ একটি প্রার্থনা সভায় যোগদান করলেই তারা জীবন ও সম্পদের ক্ষতি থেকে চিরদিনের মত রক্ষা পেতেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা তাঁর নবুওয়তের সত্যতার বিষয়টি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সাথে এরূপ প্রার্থনায় অংশ নিতে অসম্মত হন।

Contents

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের বিষয়ে বিভ্রান্তি অপনোদন

প্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহ্ আপনাকে উভয় জগতে সুপথে পরিচালিত করুন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভাববাণী বা 'প্রেরণা অর্থাৎ ওহী বা ইলহাম (divine inspiration/revelation) প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদিগণ বা নবী-রাসূলগণ মা'সূম (infalliable) বা অভ্রান্ত ও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে। কেবল এই প্রচারের ক্ষেত্রে ছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাঁরা অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ নন। নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব লাভের পূর্বে বা পরে কখনোই তাঁরা নিষ্পাপ, নির্ভুল বা অভ্রান্ত নন। নবুওয়ত লাভের পরেও তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপে লিপ্ত হতে পারেন, ভুলভ্রান্তি ও অনিচ্ছাকৃত পাপের তো কথাই নেই। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে একজন ভাববাদী দ্বারা বিবাহ-অবৈধ নিকটতম আত্মীয়দের সাথেও ব্যভিচারের মত মহাপাপ সংঘটিত হতে পারে, অনাত্মীয় মহিলাদের তো কোন কথাই নেই। তাদের বিশ্বাস অনুসারে মূর্তিপূজা এবং মূর্তিপূজার জন্য মন্দির ও যজ্ঞবেদি তৈরি করার মত মহাপাপেও ভাববাদীরা লিপ্ত হতে পারেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে অবরাহাম থেকে যোহন বাপ্তাইজক পর্যন্ত সকল ভাববাদীই হয় ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারের ফসল। ভাববাদিগণের বিষয়ে এরূপ ঘৃণ্য বিশ্বাস পোষণ করা থেকে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন!

এই পুস্তকের ভূমিকার ৭ম বিষয়, প্রথম অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ওহী বা ভাববাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদিগণের অভ্রান্ততা ও নিষ্পাপত্বের দাবিও খৃস্টানদের ধর্মীয় মূলনীতি ও বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ভিত্তিহীন ও বাতিল। সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তারা প্রচারের ক্ষেত্রে ভাববাদিগণের অভ্রান্ততা ও নিষ্পাপত্বের এই ভিত্তিহীন দাবি প্রচার করেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও আপত্তি তারা প্রচার করেন তাদের বিশ্বাস অনুসারেই সেগুলি তাঁর নবুওয়ত বা ভাববাদিত্বের কোন ক্ষতি করে না (খৃস্টান পাদরিগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে যে সকল কল্পিত অন্যায়ের কথা বলেন, সেগুলি বাইবেলে বর্ণিত অন্যান্য ভাববাদীর

অগণিত মহাপাপের তুলনায় কিছুই নয়। কাজেই এ সকল কারণে কারো ভাববাদিত্বের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় না)।

ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বা বাইবেলে ভাববাদিগণ বা নবী-রাসূলগণের নামে যত নোংরা পাপের কাহিনী ও মিথ্যা কুফরী কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির আলোচনা আমার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এমনকি খৃস্টানদেরকে বিতর্কে পরাজিত করার জন্যও এ সকল ঘৃণ্য কাহিনী আলোচনা আমি পছন্দ করি না। আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যে, ভাববাদিগণ কখনো এরূপ পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কখনোই তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি দেখলাম যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে অতি সামান্য বিষয় নিয়ে অনেক নোংরা ও ঘৃণ্য কথা বলেছেন এবং তিলকে তাল বানিয়েছেন। বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এরূপ ঘৃণ্য অপপ্রচার চালান। সাধারণ সাদাসিধে কোন মুসলিম হয়ত তাদের এ সকল বাতিল প্রচারণার ফাঁদে পড়ে যেতে পারে। এজন্য খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদিগণের অবস্থা জানানোর জন্য এবং এ বিষয়ে খৃস্টান পাদরিগণকে নির্বাক করার জন্য আমি এখানে বাইবেলে ভাববাদিগণের বিষয়ে যে সকল কথা বলা হয়েছে তা থেকে কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

আমি হাজার মুখে ঘোষণা করছি যে, ভাববাদিগণের বিষয়ে এ সকল নোংরা কথা আমি বিশ্বাস করি না এবং কেউ বিশ্বাস করবেন না। আমি মূলত ইহূদী খৃস্টানদের কুফরী কথাগুলি এখানে উদ্ধৃতি করেছি মাত্র। কারো কুফরী কথা উদ্ধৃত করা কুফরী নয়। মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে খৃস্টান পাদরিগণের অপবাদগুলি ও সেগুলির উত্তর প্রদানের আগে ভূমিকা হিসেবে প্রথমে খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদিগণের পাপকর্মের কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

(১) আদম (আ)-এর কাহিনী খৃস্টানদের নিকট প্রসিদ্ধ। আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে তা লিপিবদ্ধ। তারা স্বীকার করেন যে, আদম ইচ্ছাকৃতভাবে এই 'পাপে' লিপ্ত হয়েছিলেন। তারা আরো দাবি করেন যে, ঈশ্বর যখন তাঁকে এই পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে আদেশ দেন তখন আদম অনুতাপ করতে ও অন্তর পরিবর্তন করতে অসম্মত হন। শেষ জীবন পর্যন্ত আদম তাঁর এই পাপের জন্য অনুতপ্ত হন নি বা তাওবা করেন নি বলে তারা মনে করেন।

পাদরি উইলিয়াম স্মিথ উর্দু ভাষায় লেখা 'তরীকুল আউলিয়া' (ওলীগণের পথ) নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় আদমের বিষয়ে লিখেছেন : "হায় আফসোস! তাঁর তাওবা বা অনুতাপ প্রমাণিত হয় নি! একবারের জন্যও তিনি তাঁর এই পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি।"

(২) আদিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৮ নোহের যে পুত্রের জাহাজ হইতে বাহির হইলেন, তাঁহাদের নাম শেম, হাম ও যেফৎ; আর সেই হাম কনানের পিতা; ... ২০ পরে নোহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। ২১ আর তিনি মদ (wine: দ্রাক্ষারস) পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। ২২ তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। ২৩ তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলেন; পশ্চাৎ দিকে মুখ থাকাতে তাঁহার পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না। ২৪ পরে নোহ মদের (wine: দ্রাক্ষারস) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হইলেন। ২৫ আর তিনি কহিলেন, কনান অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসদের দাস হইবে।"

এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, নোহ মদপান করে মাতাল হয়েছেন এবং উলঙ্গ হয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, পিতার নগ্নতা দেখে অপরাধ করলেন কনানের পিতা হাম, আর শাস্তি হিসেবে-অভিশাপ লাভ করলেন পুত্র কনান! পিতার অপরাধে পুত্রকে শাস্তিদান বে-ইনসাফী ও জুলুম।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে তিনি বলেছেন : "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।"

এরপরেও আমরা ধরে নিলাম যে, বে-ইনসাফী করে পিতার অপরাধে পুত্রকে শাস্তি প্রদান করা হলো, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। আদিপুস্তকের ১০ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, হামের চারটি পুত্র ছিল : কূশ, মিসর, পূট ও কনান।[১৫৮] তাহলে তাদের মধ্য থেকে শাস্তির জন্য কেবল কনানকে বেছে নেওয়ার কারণটিই বা কী ?

(৩) পাদরি উইলিয়াম স্মিথের 'তরীকুল আউলিয়া' গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় অবরাহামের বিষয়ে পাদরি মহোদয় লিখেছেন : "৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহামের কি অবস্থা ছিল তা জানা যায় না। তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যে বড় হন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি পৌত্তলিক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাটান। এ কথা জানা যায় যে, তাঁর পিতামাতা সত্য ঈশ্বরকে চিনতেন না। সম্ভবত অবরাহামও তদ্রূপই মূর্তিপূজা করতেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মূর্তিপূজা করতেন বলেই মনে হয়। এরপর ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হন, বিশ্বের

---

১৫৮. আদিপুস্তক ১০/৬।

মানুষদের মধ্য থেকে তাঁকে নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে বিশেষ বান্দা হিসেবে মনোনীত করেন।"

এ থেকে জানা যায় যে, খৃস্টানদের ধারণায় ৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহাম মূর্তিপূজা করতেন। বস্তুত, খৃস্টানদের মূলনীতি অনুসারে ৭০ বছর পর্যন্ত অবরাহামের মূর্তিপূজা করার বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের সকল মানুষ সে সময়ে পৌত্তলিক ছিল। অবরাহাম তাদের মধ্যেই লালিত-পালিত ও বড় হয়েছেন। তাঁর পিতামাতাও অন্য সকলের মত পৌত্তলিক ছিলেন। এই ৭০ বছর পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর নিকট প্রকাশিত হন নি। আর খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদীর জন্য ভাববাদিত্ব লাভের পরেও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী নয়। আর ভাববাদিত্ব লাভের আগে তো মূর্তিপূজা করলে কোন অসুবিধাই নেই। এ ছিল ভাববাদীর পিতা অবরাহামের নবুওয়ত লাভের আগে ৭০ বছর পর্যন্ত অবস্থা। এখন নবুওয়ত লাভের পরে তাঁর কি অবস্থা ছিল আমি তা উদ্ধৃত করছি।

(৪) আদিপুস্তকের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১১ আর অব্রাম যখন মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন আপন স্ত্রী সরীকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; ১২ এই কারণ মিসরীয়েরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবত রাখিবে। ১৩ বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয়, ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে।"

অবরাহামের এই মিথ্যাচারের কারণ শুধু ভয় নয়, বরং উপরন্তু মঙ্গল লাভের আশা; বরং মঙ্গল লাভের আশাই এই মিথ্যাচারের মূল কারণ বলে বাইবেলের বর্ণনা থেকে বাহ্যত বুঝা যায়। এজন্য অবরাহাম প্রথমেই মঙ্গল লাভের আশাটি ব্যক্ত করে বলেছেন : "যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয়, ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে।" অবরাহাম প্রকৃতই তাঁর স্ত্রীর এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে মঙ্গল বা সম্পদ লাভ করেন। পরবর্তী ১৬ আয়াতে তা স্পষ্টত বলা হয়েছে।[১৫৯] এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মঙ্গল লাভের আশা ছিল বাস্তবসম্মত, আর প্রাণের ভয় ছিল অমূলক ধারণা মাত্র। বিশেষত তিনি তো তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেই প্রস্তুত ছিলেন, আর এজন্য প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন আশংকাই ছিল না। কিন্তু কিভাবে অবরাহাম নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে এবং বিনা বাধায় সম্রাটের হাতে তাকে সমর্পণ করতে রাজি হলেন? কোন মানুষের জ্ঞান ও বিবেক কি অবরাহামের মত মানুষের ক্ষেত্রে এ কথা বিশ্বাস করতে পারে ? অতি সাধারণ যে মানুষটির সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে সেও তো

---

১৫৯. আর তাঁহার অনুরোধে তিনি অব্রামকে আদর করিলেন; তাহাতে অব্রাম মেষ, গরু, গর্দভ, এবং দাস-দাসী, গর্দভী ও উষ্ট্র পাইলেন।

এরূপ কর্ম করতে রাজি হবে না ? তাহলে অবরাহামের মত একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কিভাবে সামান্য লাভের আশায় নিজের স্ত্রীকে বিনা বাধায় সম্রাটের হাতে সমর্পণ করতে রাজি হলেন ?

(৫) আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ আর অব্রাহাম তথা হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশ ও শূরের মধ্যস্থানে থাকিলেন, ও গরারে প্রবাস করিলেন। ২ আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলককে লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। ৩ কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে নারীকে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। ৪ তখনও অবীমেলক তাঁহার কাছে যান নাই; তাই তিনি কহিলেন, হে প্রভু, যে জাতি নির্দোষ, তাহাকেও কি আপনি বধ করিবেন ? ৫ সেই ব্যক্তি কি আমাকে বলে নাই, এ আমার ভগিনী ? এবং সেই স্ত্রীও কি বলে নাই, এ আমার ভ্রাতা ? ...।"

এখানে অবরাহাম ও সারা দ্বিতীয়বার মিথ্যা বললেন। সম্ভবত এখানেও প্রাণের আশঙ্কার পাশাপাশি পূর্বের মতই জাগতিক কিছু সম্পদ লাভের আশাই এই মিথ্যাচারের মূল উদ্দেশ্য। এখানেও তিনি মিথ্যাচারের মাধ্যমে জাগতিক ধন-সম্পদ লাভ করতে সক্ষম হন। পরবর্তী ১৪ আয়াতে তা স্পষ্টত বলা হয়েছে।[১৬০] সর্বোপরি, অবরাহাম যখন বিনা বাধায় স্ত্রীকে রাজার নিকট সমর্পণের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, তখন আবার প্রাণের ভয় কি ? বস্তুত এমতাবস্থায় ভয় অমূলক।

'তরীকুল আউলিয়া' পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় পাদরি স্মিথ মহোদয় লিখেছেন : "অবরাহাম যখন প্রথম বার স্ত্রীকে অস্বীকার করেন তখন সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি আর এরূপ পাপে নিপতিত হবেন না। কিন্তু গাফলতির কারণে তিনি আবারো শয়তানের খপ্পরে পড়লেন।"

(৬) তরীকুল আউলিয়া পুস্তকের ২৯ ও ৯৩ পৃষ্ঠায় পাদরি সাহেব লিখেছেন : "হাগারকে বিবাহ করে অবরাহাম পাপী হয়েছিলেন। তিনি এই বিবাহের দ্বারা পাপী হন নি এ কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ যীশুখৃষ্ট কী বলেছেন তিনি তা ভাল করেই জানতেন। যীশু খৃষ্টের বাণী সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে : "সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, ৫ এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে।"[১৬১]

---

১৬০. তখন অবীমেলক মেষ, গরু ও দাস-দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান করিলেন...।

১৬১. মথি ১৯/৪-৬; মার্ক ১০/৬-৮।

আমার বক্তব্য এই যে, হাগারকে বিবাহ করে যেমন অবরাহাম পাপী হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে সারাকে বিবাহ করেও তিনি পাপ করেছিলেন। সারাকে বিবাহ করে তিনি পাপী হন নি তা বলা সম্ভব নয়। কারণ (সারাহ তাঁর বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন, এবং বৈমাত্রেয় বোনের বিবাহের বিষয়ে) মোশি কী বলেছেন তা তিনি ভাল করেই জানতেন। মোশির কথা তোরাহ-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে : "তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিংবা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা কিংবা অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না।"[১৬২]

তিনি আরো বলেছেন, "আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিংবা মাতৃকন্যাকে, গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাকর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে উচ্ছিন্ন হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।"[১৬৩]

তিনি আরো বলেছেন : "যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিংবা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।"[১৬৪]

এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।[১৬৫]

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের মতানুসারে এরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মতানুসারে অবরাহাম ভাববাদিত্ব লাভের পূর্বে এবং পরে ব্যভিচারী ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!) আর সারার গর্ভে অবরাহামের যত সন্তান জন্মেছিলেন সকলেই ছিলেন জারজ সন্তান। যদি 'রহিতকরণ' মেনে নেওয়া হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, মোশির ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হলেও অবরাহামের ব্যবস্থায় বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করা বৈধ ছিল, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, একাধিক বিবাহও তাঁর ব্যবস্থায় বৈধ ছিল। কাজেই হাগারকে বিবাহ করার কারণে অবরাহামের উপর কোন আপত্তি আসতে পারে না। আমরা এরূপই বিশ্বাস করি। তবে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ যেহেতু 'রহিতকরণ' মানেন না, সেহেতু তাঁদের মূলনীতি অনুসারে

---

১৬২. লেবীয় ১৮/৯।

১৬৩. লেবীয় ২০/১৭।

১৬৪. দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২।

১৬৫. তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, অবরাহামের স্ত্রী সারা আবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন। আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর সে প্রকৃতই আমার ভগিনী (আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে); কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে সে আমার ভার্যা হইল (And yet indeed she is my sister, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife).

তাঁদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, সকল বাইবেলীয় ভাববাদীর পিতা ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী অবরাহাম মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যভিচারী ছিলেন। অথচ তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়তম ও প্রিয়ভাজন। ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন কী এরূপই হন ?

(৭) আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩০ পরে লোট ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন, আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহার মধ্যে বসতি করিলেন। ৩১ পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎ সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগকে বিবাহ করিতে এই দেশে কোন পুরুষ নাই; ৩২ আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। ৩৩ তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। ৩৪ আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যাকে কহিল, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি তাঁহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। ৩৫ এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতে পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। ৩৬ এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। ৩৭ পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদি পিতা। ৩৮ আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন্-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোন-সন্তানদের আদি পিতা।"

'তরীকুল আউলিয়া' পুস্তকের ১২৮ পৃষ্ঠায় পাদরি স্মিথ মহাশয় লোটের এই ঘটনা উল্লেখ করার পরে লিখেছেন : "লোটের এই অবস্থা দেখে ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় নেই! আমরা বেদনা প্রকাশ করছি এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভীতি ও আশঙ্কা বোধ করছি। তবে সবচেয়ে অবাক বিষয় যে, ইনিই কি সেই লোট যিনি সদোমের সকল পাপ ও অন্যায় থেকে পবিত্র থাকলেন ? ঈশ্বরের রাস্তায় তিনি বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন ? সে দেশের সকল অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকলেন? অথচ যখন বেরিয়ে প্রান্তরে চলে গেলেন তখন এভাবে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন ? তাহলে শহরে বা প্রান্তরে বা গুহার মধ্যে কোথাও কি কারো পাপ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব ?"

যেহেতু মাননীয় পাদরিগণই লোটের জন্য ক্রন্দনে রত হয়েছেন, সেহেতু

আমাদের আর এ বিষয়ে লম্বা কথা বলার প্রয়োজন নেই। তাদের ক্রন্দনই যথেষ্ট। তবে আমার বক্তব্য এই যে, এভাবে পিতার সাথে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে সন্তানদ্বয়ের জন্ম হলো, সেই মোয়াব ও বিন-অম্মিকে ঈশ্বর বিনষ্ট করেন নি বা মেরে ফেলেন নি। কিন্তু উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ভাববাদী দায়ূদ যে পুত্রসন্তানটি লাভ করেছিলেন ঈশ্বর তাকে হত্যা করেছিলেন।[১৬৬] সম্ভবত খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে পর-স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অধিক অপরাধ! এজন্যই তাদের ঈশ্বর পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের ফসলকে হত্যা করলেন, অথচ নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচারের ফসল মোয়াব ও বিন-অম্মিকে হত্যা করেন নি। উপরন্তু এরা দু'জন ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য বা ভাল ছিলেন।

মোয়াব যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল ছিলেন তা নিম্নের বিষয় থেকে জানা যায়। মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ূদের দাদা ওবেদ-এর মাতার নাম ছিল রূত।[১৬৭] এই রূত ছিলেন মোয়াবীয়া বা মোয়াবের বংশধর।[১৬৮] এভাবে আমরা দেখছি যে, মোয়াব বংশীয়া নারী রূত ছিলেন দায়ূদ, শলোমন ও যীশুর পিতামহীদের একজন। আর খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে দায়ূদ ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (firstborn) [১৬৯], শলোমনও ঈশ্বরের পুত্র[১৭০] আর যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র[১৭১], বরং তাদের বিশ্বাস অনুসারে তিনিই ঈশ্বর।[১৭২]

আর বিন-অম্মির ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হওয়ার বিষয়টি নিম্নের তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। মথির সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের পুত্র রহবিয়াম যীশুর একজন পূর্বপুরুষ।[১৭৩] আর এই রহবিয়ামের মাতা ছিলেন বিন-অম্মির বংশধর বা অম্মোন বংশীয়। ১ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৪] এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে অম্মোনীয়া হওয়ার কারণে তিনি ঈশ্বরের পুত্রের দাদি, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের দাদি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

---

১৬৬. ২ শমূয়েল ১২/১-২৩।

১৬৭. মথি ১/৫-৬।

১৬৮. দায়ূদের দাদা ওবেদের পিতা বোয়াস মোয়াব বংশীয়া এই রূতকে বিবাহ করেন। বিস্তারিত দেখুন রূতের বিবরণ।

১৬৯. গীতসংহিতা ৮৯/২৭।

১৭০. ২ শমূয়েল ৭/১৪।

১৭১. যোহন ৩/১৬-১৮; ১ যোহন ৪/৯।

১৭২. এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মোয়াব ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হতে হলে জারজ সন্তানের বংশধর হওয়া, বিশেষত কন্যার সাথে পিতার ব্যভিচারজাত জারজ সন্তানের বংশধর হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৭৩. মথি ১/৭-১৭।

১৭৪. ১ রাজাবলি ১৪/২১, ৩১।

দ্বিতীয় বিবরণের ২ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত নিম্নরূপ : "যখন তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোন সন্তানদের দেশের অংশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি।"

তাহলে এই দুই জারজ সন্তান মোয়াব ও বিন-অম্মি বা অম্মোনের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ? প্রথম জারজ সন্তানের সন্তানদের কেউ কেউ ঈশ্বরের পুত্রগণের, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের মহাগৌরবান্বিতা পিতামহী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। অন্য জারজ সন্তানের সন্তানদের কেউ কেউ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের মহাগৌরবান্বিতা পিতামহী হওয়ার মহাগৌরব অর্জন করলেন। তোরাহ স্পষ্টত ঘোষণা করেছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরের পুত্রগণকে ঈশ্বর এ সকল জারজ-বংশীয়ের (অম্মোন-সন্তানদের) দেশ দখল করতে নিষেধ করলেন।

তবে এখানে একটি ছোট্ট সমস্যা থেকে যাচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দুই মহাগৌরবান্বিতা পিতামহীর সূত্রে যীশু মোয়াব ও অম্মোন-বংশীয়। আর বাইবেল প্রমাণ করে যে, মোয়াব ও অম্মোন-বংশীয় কেউ কখনোই সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে বলা হয়েছে : "অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় কেহ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; দশম পুরুষ পর্যন্ত তাহাদের কেহ সদাপ্রভুর সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পাইবে না (An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall be not enter into the congregation of the LORD)."

তাহলে যীশু একজন অম্মোনীয় এবং মোয়াবীয় হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করলেন ? শুধু তাই নয়, তিনি সদাপ্রভুর সমাজের নেতা হলেন ? শুধু তাই নয়, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি স্বয়ং সদাপ্রভুর পুত্রও হলেন ?

খৃস্টান পাদরিগণ হয়ত বলবেন যে, বংশ ধরা হয় পিতার মাধ্যমে, মাতা বা পিতামহীদের মাধ্যমে নয়। আর পিতার দিক থেকে তো যীশু অম্মোনীয় বা মোয়াবীয় ছিলেন না। সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, যদি পিতার দিক থেকেই বংশ নির্ধারণ করা হয়, তবে যীশুর 'খৃস্টত্বের' দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কারণ খৃস্টের জন্য ইস্রায়েলীয় হওয়া, যিহূদার বংশধর হওয়া, দায়ূদের বংশধর হওয়া এবং শলোমনের বংশধর হওয়া জরুরী। আর যীশুর ইস্রায়েলীয়ত্ব, যিহূদীয়ত্ব, দায়ূদ-বংশীয়ত্ব ও শলোমন-বংশীয়ত্ব সবই মাতার সূত্রে, কোনটিই পিতার সূত্রে নয়। আর যদি দাবি করা হয় যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাতার সূত্রে বংশ ধরা হবে এবং প্রথম ক্ষেত্রে তা ধরা হবে না তবে তা ভিত্তিহীন অযৌক্তিক দাবি বলে গণ্য হবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, রূতের বংশধর হিসেবে দায়ূদ ও শলোমনও মোয়াবীয় বংশীয় ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরাও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে আমি এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

আমরা দেখেছি যে, পাদরি মহোদয়গণের দৃষ্টিতে লোটের অবস্থা ছিল ক্রন্দনযোগ্য। আর বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি ঈশ্বরের একজন পবিত্র ভাববাদী ও সাধুপুরুষ ছিলেন। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এই জঘন্য কর্মের কারণে তাঁর সাধুত্বের, মহাপুরুষত্বের বা ভাববাদিত্বের কোনরূপ ক্ষতি হয় নি বা তাঁর পদমর্যাদা দুর্বল হয় নি। অথচ কর্মটি এত জঘন্য ও নোংরা যে, সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত পাড় মাতালও কখনো এরূপ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় না। তারা অধিকাংশ সময় মাতাল হয়ে থাকলেও মাতাল অবস্থাতেই কন্যা ও অনাত্মীয়া মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর যখন কেউ এমন মাতাল হয় যে, কে কন্যা এবং কে অনাত্মীয়া তাও চিনতে পারে না, তখন তার আর যৌন-সঙ্গমের ক্ষমতা থাকে না। মদপানে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভারতের কোন পাড় মাতাল অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর মানুষও কখনো মাতাল অবস্থায় তার মায়ের বা মেয়ের সাথে এরূপ ঘৃণ্য আচরণ করেছে বলে আমরা অদ্যাবধি শুনি নি।

আর যদি সত্যই মাতলামির কারণে মানুষ কন্যার সাথে ব্যভিচারের মত অবস্থায় পৌছায়, তবে ইউরোপীয় খৃস্টানগণের নারীদের জন্য আমাদের ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় নেই। ইউরোপের খৃস্টান নারী ও পুরুষগণ অধিকাংশ সময়েই মাতাল থাকেন। কাজেই তাদের সমাজের ভগ্নি, মাতা ও কন্যাগণ কিভাবে তাদের ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হাত থেকে রক্ষা পাবে ? কোন উপায় নেই! বিশেষত তাদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অবস্থা যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অবাক বিষয় যে, এই পবিত্র সাধুপুরুষ প্রথম রাতে এই ঘৃণ্য পাপে নিপতিত হলেন এবং দ্বিতীয় রাতেও একইভাবে পাপের মধ্যে পতিত হলেন (এক রাতের পাপে সতর্ক হতে পারলেন না)। তবে এই ঘৃণ্য ঘটনাটির একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এখানে বলা যায় যে, লোটের কন্যাদ্বয়ের বংশে যেন ঈশ্বরের পুত্রদের এবং স্বয়ং ঈশ্বরের জন্ম হয় এবং লোট নিজেও যেন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের বংশতালিকায় প্রবেশ করতে পারেন এজন্যই ঈশ্বর এরূপ ব্যভিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি কোন অতি সাধারণ মানুষও এরূপ জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয় তবে দুঃখ ও বেদনায় তিনি এমনভাবে মুহ্যমান হবেন যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। অথচ লোটের ক্ষেত্রে এরূপ কিছুই ঘটল না (বরং এক রাতের পরে আবার দ্বিতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল)। আমি এ সকল অবাস্তব গল্প-কাহিনী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, লোটের বিষয়ে বাইবেলের এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

পিতরের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে : "৭ আর সেই ধার্মিক লোটকে উদ্ধার করিলেন, যিনি ধর্মহীনদের স্বৈরাচারে ক্লিষ্ট হইতেন। ৮ কেননা সেই ধার্মিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে বাস করিতে করিতে,দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের অধর্মকার্য প্রযুক্ত দিন দিন আপন ধর্মশীল প্রাণকে যাতনা দিতেন।" এভাবে তিনি লোটকে ধার্মিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই ধার্মিক ছিলেন এবং ইহূদী-খৃস্টানগণ তাঁর নামে যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে সেগুলি থেকে তিনি পবিত্র ছিলেন।

(৮) আদিপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "৬ পরে ইসহাক গরারে বাস করিলেন। ৭ আর সেই স্থানের লোকেরা তাঁহার স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, উনি আমার ভগিনী; কারণ, এ আমার স্ত্রী, এই কথা বলিতে তিনি ভীত হইলেন, ভাবিলেন, কি জানি এই স্থানের লোকেরা রিবিকার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে; কেননা তিনি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন।"

এভাবে ইসহাকও তাঁর পিতার ন্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বললেন এবং নিজের স্ত্রীকে 'আমার ভগিনী' বললেন। 'তরীকুল আউলিয়া' পুস্তকের লেখক পাদরি স্মিথ মহাশয় তাঁর পুস্তকের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ইসহাকের বিশ্বাসও নষ্ট হলো; কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে বললেন যে, তিনি তাঁর ভগিনী।" এরপর ১৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "আফসোস! আফসোস! কোন একজন আদম সন্তানের মধ্যেও পূর্ণতা পাওয়া যায় না; কেবল অতুলনীয় একজন বাদে।"[১৭৫] "আশ্চর্য যে, শয়তানের যে

---

১৭৫. খৃস্টান পাদরিগণ দাবি করেন যে, যীশুই একমাত্র আদম সন্তান যাঁর মধ্যে পূর্ণতা ছিল ও তিনি পাপমুক্ত ছিলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় : প্রথমত, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু আদম সন্তান নন, বরং তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। কাজেই তাঁকে একমাত্র পূর্ণ মানব বলে দাবি করা তাদের নিজেদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। যীশুর মধ্যে 'দ্বি-সত্ত্বা'-র আবিষ্কার বাইবেলের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক ও সকল যুক্তি ও বিবেকের অগম্য। ঈশ্বরের মধ্যে তো পূর্ণতা থাকবেই। 'ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতা রয়েছে, কাজেই তিনি আদম সন্তানদের চেয়ে ভাল' এরূপ কথার যে কোন অর্থ হয় না তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ইহূদীদের গ্রন্থাদি থেকে যীশুর অনেক অপরাধের কথা জানা যায়। তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তির অনুসারিগণ তাকে ভাল বলবেন এবং প্রতিপক্ষরা তাকে খারাপ বলবেন এটাই স্বাভাবিক। নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয়। আর যীশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্বই প্রমাণিত নয়। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক যীশুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে পৌল ও অন্যান্যদের বানানো একটি কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেছেন। ইতিহাসের আলোকে যীশুকে বিচার করার কোন সুযোগ নেই। ইহূদীদের ধর্মীয় তথ্যাবলিও গ্রহণ করা যায় না। আর বাইবেলে যীশুর জীবনের অতি সামান্য দিকই বলা হয়েছে, তাও ভক্তের চক্ষু দিয়ে। চতুর্থত, সর্বোপরি বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশুর মধ্যে পূর্ণতা ছিল না; বরং তিনি দুর্বলতা ও অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত ছিলেন। তিনি শত্রুভয়ে ভীত ছিলেন, তিনি প্রতিপক্ষকে নোংরাভাবে গালাগালি করতেন, তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের শিষ্যদেরকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতেন; তিনি নিরপরাধ বৃক্ষলতাকে পর্যন্ত অভিশাপ দিয়ে বিনষ্ট করেছেন। তিনি জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণ বিচার করে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতেন। তিনি অ-ইহূদীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করতেন।... কাজেই বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশুকে ত্রুটিমুক্ত বলার উপায় নেই।

জালে অবরাহাম আবদ্ধ হয়েছিলেন ইসহাকও সেই জালেই জড়িয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'ভগিনী' বলে উল্লেখ করলেন। হায় আফসোস! ঈশ্বরের এরূপ প্রিয় ব্যক্তিদের ওয়ায-নসীহতের প্রয়োজন।"

ইসহাকের ঈমানের বিচ্যুতিতে, তাঁর মধ্যে পূর্ণতা না থাকার কারণে, শয়তানের যে জালে অবরাহাম জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই জালে তাঁর জড়িয়ে পড়ার কারণে এবং তাঁর নিজেরই ওয়াজ-নসীহতের প্রয়োজন হওয়ার কারণে পাদরিগণ এভাবে বিলাপ করলেন! তাঁদের এরূপ বিলাপের পরে আমাদের আর কথা বাড়ানোর দরকার নেই।

(৯) আদিপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২৯ একদিন যাকোব ডাল পাক করিয়াছেন, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর হইতে আসিয়া যাকোবকে কহিলেন, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, ৩০ বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা, ঐ রাঙ্গা দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্য তাঁহার নাম ইদোম [রাঙ্গা] খ্যাত হইল। ৩১ তখন যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। ৩২ এষৌ কহিলেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ ? ৩৩ যাকোব কহিলেন, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে তিনি তাঁহার কাছে দিব্য করিলেন। এইরূপে তিনি আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রয় করিলেন। ৩৪ আর যাকোব এষৌকে রুটি ও মসূরের রান্না করা ডাল দিলেন; এবং তিনি ভোজন পান করিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করিলেন।"

এষৌ ছিলেন ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই এষৌ-এর ধার্মিকতার নমুনা দেখুন! যে জ্যেষ্ঠাধিকারের কারণে তিনি ঈশ্বরের ভাববাদিত্ব, সকল বরকত ও কল্যাণ লাভ করতেন, সেই অধিকার তিনি এভাবে সামান্য রুটি আর ডালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলেন। সম্ভবত ভাববাদিত্ব, বরকত, কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর নিকট এই রুটি ও ডালের চেয়ে কম দামি ছিল!

এরপর যাকোবের ভ্রাতৃপ্রেম ও দানশীলতার নমুনা দেখুন! ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত বড় ভাইকে তিনি সামান্য খাদ্যও বিনিময় ছাড়া দিলেন না। ভ্রাতৃপ্রেম ও করুণার কোন বালাই নেই! সবকিছুই ক্রয় ও বিক্রয়!

(১০) আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারবেন যে, যাকোব তিনবার মিথ্যা কথা বলেছেন এবং তাঁর পিতাকে (ইসহাককে) ধোঁকা দিয়েছেন।[১৭৬] যাকোবের প্রবঞ্চনায় ইসহাক যেমন প্রবঞ্চিত হয়েছেন,

---

১৭৬. আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধবয়সে ইসহাক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডেকে বলেন, তুমি প্রান্তর থেকে আমার জন্য মৃগ শিকার করে এনে আমার জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি ভোজন করব, 'যেন মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে।' এষৌ মৃগ শিকারের জন্য প্রান্তরে গমন করলে ইসহাকের স্ত্রী রিবিকা কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে বাড়ির পাল থেকে দুটি ছাগ-বৎস জবাই করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। যাকোব এষৌ-এর কাপড়গুলি পরিধান করেন। এষৌ

তেমনিভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও প্রবঞ্চিত হয়েছেন। কারণ ইসহাক তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে আশীর্বাদ করেন এষৌ-এর জন্য, তিনি যাকোবের জন্য কোন আশীর্বাদ করেন নি। তবে তিনি অন্ধ হওয়ার কারণে আশীর্বাদ করার সময় কে যাকোব এবং কে এষৌ তা বুঝতে পারেন নি। অনুরূপভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও আশীর্বাদ কার্যকর করার সময় কে যাকোব আর কে এষৌ তা চিনতে পারলেন না। বড় অবাক বিষয়! খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এভাবেই প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম, আশীর্বাদ, ধার্মিকতা ও ভাববাদিত্ব লাভ করা যায়।

যাকোবের এই কাহিনী উল্লেখ করতে যেয়ে আমার একটি প্রাসঙ্গিক গল্প মনে পড়ল। ভারতের 'বানোয়া' সম্প্রদায়ের এক ভণ্ড এক গাধাওয়ালার কাছে তার নিজের ঘোড়ার জন্য কিছু খড় চায়। গাধাওয়ালা তাকে খড় দিতে অস্বীকার করে। তখন সেই ভণ্ড বলে, তুমি যদি আমাকে খড় না দাও, তবে আমি তোমার গাধার জন্য বদ-দোয়া করব যেন গাধাটি আজ রাতেই মারা যায়। এ কথা বলে উক্ত ভণ্ড চলে যায়। ঘটনাক্রমে রাত্রিতে তার নিজের ঘোড়াটিই মারা যায়। ঘুম থোক উঠে সকালে সে দেখে যে, তার ঘোড়াটি মরে পড়ে আছে। তখন সে অবাক বিস্ময়ে মাথা নেড়ে বলতে থাকে, কোটি কোটি বছর যাবৎ আমাদের প্রভু ঈশ্বর তার ঈশ্বরত্বের পদে রয়েছেন, এখন পর্যন্ত তিনি গাধা আর ঘোড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না! বদ দোয়া করলাম গাধাওয়ালার গাধার জন্য, আর তিনি আমার নিজের ঘোড়াটিকে মেরে ফেললেন!

এই যদি হয় সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর পিতা যাকোবের ধার্মিকতার হালচাল এবং এই যদি হয় সদাপ্রভু ঈশ্বরের জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থা, তবে একজন অবিশ্বাসী তো দাবি করতেই পারেন যে, সম্ভবত যীশু সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি করেন যে,

---

লোমশ ছিলেন এবং যাকোব লোমশ ছিলেন না, এজন্য রিবিকা যাকোবের হাতে ও গলায় উক্ত জবাইকৃত ছাগবৎসদ্বয়ের চামড়া জড়িয়ে দেন। এরপর যাকোব পিতার নিকট যেয়ে তাকে ডাকেন। তিনি বলেন, "বৎস, তুমি কে ? যাকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ;...তখন ইসহাক আপন পুত্রকে কহিলেন, বৎস কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহা পাইলে ? তিনি কহিলেন, আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে তা উপস্থিত করিলেন (Because the LORD thy God brought it to me.)। ইসহাক যাকোবকে কহিলেন, বৎস, নিকটে আইস; আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি নিশ্চয় আমার পুত্র এষৌ কি না। তখন যাকোব তাঁহার পিতা ইসহাকের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্বর ত যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। বাস্তবিক তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ ভ্রাতা এষৌর হস্তের ন্যায় তাঁহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। ২৪ তিনি কহিলেন, তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র এষৌ ? তিনি কহিলেন, হাঁ।" ইসহাক যাকোবকে এষৌ বলে নিশ্চিত হওয়ার পরে তার দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ করেন এবং তাকে (এষৌকে) আশীর্বাদ করেন।

আপনি যদি আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন তবে আমি আপনার একত্ববাদ ও আপনার প্রভুত্বের কথা প্রচার করব। যীশু কি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন তা সদাপ্রভু ঈশ্বর বুঝতে পারেন নি। ফলে তিনি যীশুকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। ক্ষমতা পাওয়ার পরে যীশু নিজেই ঈশ্বর সেজে যান। তিনি নিজের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করেন এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন! এইরূপ ভিত্তিহীন বিষয়াদি থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি।

পাদরি স্মিথ মহাশয়ের 'তরীকুল আউলিয়া' গ্রন্থের ১৭৯, ১৮০ ও ১৮১ পৃষ্ঠা থেকে (যাকোবের এই ঘটনার বিষয়ে) তাঁর কিছু বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি প্রথমে বলেন, "এ খুবই ভয়ের স্থান! তাঁর মত একজন মানুষ একের পর এক মিথ্যা বললেন! উপরন্তু তাঁর প্রবঞ্চনার মধ্যে ঈশ্বরের নামকে জড়িয়ে নিলেন!"

অতঃপর তিনি বলেন : "যাকোব যে কথা বলেছেন তা ঈশ্বর নিন্দা বা অবিশ্বাসের (Blasphemy) চূড়ান্ত; কারণ তিনি (তাঁর মিথ্যার সাথে ঈশ্বরের নাম সংযুক্ত করে) বলেন, "আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে তা উপস্থিত করিলেন (Because the LORD thy God brought it to me)।[১৭৭]

তৃতীয় স্থানে পাদরি মহাশয় বলেন : "আমরা এ বিষয়ে যাকোবের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের ওযরখাহি বা যুক্তি পেশ করছি না। সকল ধার্মিক মানুষের উচিত এরূপ কর্মকে ঘৃণা করা এবং এরূপ কর্ম থেকে দূরে থাকা।"

চতুর্থত তিনি বলেন : "সকল কথার সারসংক্ষেপ এই যে, তিনি কল্যাণ লাভের জন্য অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, এরূপ কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্য হয়।"

পঞ্চমত তিনি বলেন : "যাকোব যেমন পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর মাতা তাঁর চেয়েও বেশি পাপী ছিলেন; কারণ তিনি এই পাপ-প্রবঞ্চনার পরিকল্পনা ও রূপদান করেছিলেন। তিনিই যাকোবকে এরূপ প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন।"

(১১) আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৫ পরে লাবন[১৭৮] যাকোবকে কহিলেন, তুমি কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম করিবে ? বল দেখি, কি বেতন লইবে ? ১৬ লাবনের দুই কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল। ১৭ লেয়া মৃদুলোচনা, কিন্তু রাহেল রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। ১৮ আর

১৭৭. আদিপুস্তক ২৭/২০ এখানে কেরির বাংলা বাইবেলে অনুবাদে একটু হেরফের করা হয়েছে। ইংরেজি : (Because the LORD thy God brought it to me) অনুবাদে বলা হয়েছে : আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করিলেন।

১৭৮. যাকোবের মামা।

যাকোব রাহেলকে ভালবাসিতেন, এই জন্য তিনি উত্তর করিলেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্য আমি সাত বৎসর আপনার দাস্যকর্ম করিব। ১৯ লাবন কহিলেন, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে; আমার নিকটে থাক। ২০ এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল। ২১ পরে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার স্ত্রী আমাকে দিউন, আমি তাহার কাছে গমন করিব। ২২ তখন লাবন ঐ স্থানের সকল লোককে একত্র করিয়া ভোজ প্রস্তুত করিলেন। ২৩ আর সন্ধ্যাকালে তিনি আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন, আর যাকোব তাঁহার কাছে গমন করিলেন। ২৪ আর লাবন সিল্পা নাম্নী আপন দাসীকে আপন কন্যা লেয়ার দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। ২৫ আর প্রভাত হইলে, দেখ, তিনি লেয়া। তাহাতে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আপনি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন ? আমি কি রাহেলের জন্য আপনার দাস্যকর্ম করি নাই ? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলেন ? ২৬ তখন লাবন কহিলেন, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্তব্য। ২৭ তুমি ইহার সপ্তাহ পূর্ণ কর; পরে আরও সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম স্বীকার করিবে, সেই জন্য আমরা উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করিলেন, তাঁহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলেন; পরে লাবন তাঁহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিলেন। ২৯ আর লাবন বিলহা নাম্নী আপন দাসীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। ৩০ তখন তিনি রাহেলের কাছেও গমন করিলেন, এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভালবাসিলেন; এবং আর সাত বৎসর লাবনের নিকট দাস্যকর্ম করিলেন।"

এখানে তিনটি আপত্তি উত্থাপিত হয় :

প্রথমত, যাকোব তাঁর মামা লাবনের বাড়িতেই থাকতেন ও দাস্যকর্ম করতেন। তিনি তাঁর কন্যাদ্বয়কে সর্বদাই দেখতেন এবং খুব ভাল করেই চিনতেন। তিনি তাদের দেহের আকৃতি, গড়ন, মুখের আকৃতি ও কণ্ঠস্বরের পার্থক্যও ভালভাবেই জানতেন। আর লেয়া ছিলেন মৃদুলোচনা (tender eyed) , কাজেই লেয়াকে রাহেল থেকে পৃথক করে চিনতে কোনরূপ অসুবিধাই ছিল না। কাজেই অত্যন্ত অবাক বিষয় যে, সারা রাত লেয়া যাকোবের বিছানায় থাকলেন, যাকোব তাকে সারা রাত ধরে দেখলেন, কাছে নিয়ে শুয়ে থাকলেন, স্পর্শ করলেন, কিন্তু তাকে চিনতে পারলেন না!

তবে হ্যাঁ, খৃস্টান পাদরিগণ যদি দাবি করেন যে, সারা রাত যাকোবও লোটের ন্যায় পাড় মাতাল ছিলেন। এ কারণে লোট যেমন তাঁর কন্যাদেরকে চিনতে পারেন নি, তেমনি যাকোবও কে লেয়া ও কে রাহেল তা বুঝতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, যাকোব রাহেলকে ভালবাসতেন। এই প্রেমের মাশুল দিতে তিনি ৭ বছর দাস্যকর্ম করলেন। আর প্রেমও এতই গভীর ছিল যে, প্রেমের আকর্ষণে ৭ বছর ৭ দিনের মত মনে হলো তাঁর কাছে। যখন তাঁর মামা লাবন ধোঁকা দিয়ে তাঁর সাথে বড় মেয়ের বিবাহ দিলেন তখন তিনি তাঁর প্রেমিকের জন্য পুনরায় ৭ বছর দাস্যকর্ম করতে রাজি হয়ে গেলেন। আর খৃস্টান পাদরিগণের মতানুসারে এ সকল বিষয় নারীর প্রতি আসক্তি, প্রেম, প্রেমিকাকে পেতে এরূপ দাস্যকর্ম সবই অন্যায় এবং ভাববাদীর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। যাকোব যেভাবে তাঁর পিতাকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর শ্বশুর তাঁকে প্রবঞ্চনা করেন।

তৃতীয়ত, যাকোব একটি স্ত্রী গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন না। খৃস্টান ধর্মগুরুদের মতে একাধিক নারীকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ নয়। আর দু বোনকে একত্রে বিবাহ করা তো কখনোই বৈধ নয়। অথচ যাকোব সেই অবৈধ কাজই করলেন! তরীকুল আউলিয়া গ্রন্থের লেখক পাদরি স্মিথ মহাশয় এ বিষয়ে ওযরখাহি করে তাঁর পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "বাহ্যত যাকোব লাবন কর্তৃক প্রবঞ্চিত না হলে রাহেল ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতেন না। এই ঘটনা দ্বারা একাধিক বিবাহ বৈধ প্রমাণ করা যায় না; কারণ তা ঈশ্বরের নির্দেশে হয় নি এবং যাকোবের সন্তুষ্টিতেও হয় নি।"

পাদরি মহাশয়ের এই যুক্তি ও ওযর খুবই ঠাণ্ডা ও অর্থহীন। এ ওযর দ্বারা যাকোব অবৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। কারণ তিনি তো দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য ছিলেন না বা কেউ তাকে সেজন্য জবরদস্তি করে নি। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক স্ত্রী নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকা।

এই পাদরি মহাশয় অবরাহামকে পাপী ঘোষণা করে যেরূপ বলেছেন, তাঁরই ভাষায় আমি বলতে চাই যে, যীশুখৃষ্ট কী বলেছেন যাকোব তা ভাল করেই জানতেন। যীশু খৃস্টের বাণী সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে : "সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, ... সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে।"[১৭৯] অনুরূপভাবে মোশি কি বলেছেন তা যাকোব জানতেন। মোশি উল্লেখ করেছেন যে, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা সুনিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ ও অবৈধ।[১৮০] তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জেনেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, যাকোবের দুই বিবাহের একটি বিবাহ অবৈধ। আর যে স্ত্রীর বিবাহ অবৈধ ছিল তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানগণ সকলেই জারজ ও অবৈধ সন্তান। এতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক ইস্রায়েলীয় ভাববাদী এরূপ জারজ সন্তান ছিলেন। না'উযু বিল্লাহ!

---

১৭৯. মথি ১৯/৪-৬; মার্ক ১০/৬-৮।

১৮০. লেবীয় ১৮/১৮।

খৃস্টান ধর্মগুরুদের ধার্মিকতার অবস্থা দেখুন! তাঁদের বাতিল ও ভিত্তিহীন ধর্মতত্ত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিভাবে ভাববাদিগণকে পাপী বলে অভিহিত করছেন এবং নানা প্রকারের অন্যায়ের অভিযোগে তাঁদের অভিযুক্ত করছেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। যাকোব দু'বোনকে বিবাহ করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি লেয়া ও রাহেল দু' বোনের পরামর্শে তাঁদের দাসী দু'জন সিল্পা ও বিল্‌হাকেও বিবাহ করেন। আদিপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮১] তরীকুল আউলিয়া পুস্তকের লেখক পাদরি মহাশয়ের ওযরখাহি অনুসারে জানা গেল যে, শ্বশুর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়ে যাকোব দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সিল্পা ও বিল্‌হাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তো এই ওযর চলে না। এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টান ধর্মগুরুদের ধর্মতত্ত্ব অনুসারে এই দুই স্ত্রীর গর্ভজাত যাকোবের সকল সন্তান ব্যভিচার-জাত সন্তান বা জারজ সন্তান ছিলেন।

(১২) আদিপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১৯ তৎকালে লাবন মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিলেন; তখন রাহেল আপন পিতার ঠাকুরগুলিকে হরণ করিলেন। ২০ আর যাকোব আপন পলায়নের কোন সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিলেন। ২১ তিনি আপনার সর্বস্ব লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া গিলিয়দ পর্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিলেন। ২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন যাকোবের ২৩ পলায়নের সংবাদ পাইলেন, এবং আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া সাত দিনের পথ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, ও গিলিয়দ পর্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন। ... ২৬ পরে লাবন যাকোবকে কহিলেন, তুমি কেন এমন কর্ম করিলে ? আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়্গধৃত বন্দিগণের ন্যায় লইয়া আসিলে ? ... ৩০ এখন পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলে বটে; কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে ? ৩১ যাকোব লাবনকে উত্তর করিলেন, ... ৩২ আপনি যাহার নিকটে আপনার দেবতাদিগকে পাইবেন, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে[১৮২] অন্বেষণ করিয়া আমার কাছে আপনার যাহা আছে, তাহা লউন। বাস্তবিক যাকোব জানিতেন না যে, রাহেল সেইগুলি চুরি করিয়াছে। ৩৩ তখন লাবন যাকোবের তাম্বুতে ও লেয়ার তাম্বুতে ও দুই দাসীর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। পরে তিনি লেয়ার তাম্বু হইতে রাহেলের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। ৩৪ কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরগুলিকে লইয়া উষ্ট্রের গদীর ভিতরে রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিলেন; সেই জন্য লাবন তাঁহার তাম্বুর সকল স্থান

---

১৮১. আদিপুস্তক ৩০/১-১৩।

১৮২. গ্রন্থকার উল্লিখিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য এখানে নিম্নরূপ : "আপনি যাহার নিকটে আপনার দেবতাদিগকে পাইবেন সে আমাদের কুটুম্বদিগের সাক্ষাতে হত্যাকৃত হইবে।"

হাতড়াইলেও তাহাদিগকে পাইলেন না। ৩৫ তখন রাহেল পিতাকে কহিলেন, কর্তা, আপনার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি। এইরূপে তিনি অন্বেষণ করিলেও সেই ঠাকুরগুলিকে পাইলেন না।"

এখানে দেখুন! কিভাবে রাহেল তার পিতার ঠাকুরগুলিকে চুরি করলেন এবং কিভাবে মিথ্যা কথা বললেন! বাহ্যত তিনি তার পিতার ঠাকুরগুলিকে চুরি করেছিলেন সেগুলির পূজা করার জন্যই। আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্টত বুঝা যায়। পাঠক একটু পরেই পরবর্তী প্রমাণে উল্লিখিত বাইবেলের বক্তব্য থেকে জানতে পারবেন। এছাড়া রাহেল ছিলেন মূর্তিপূজক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা প্রতিমাপূজক বহু ঈশ্বরবাদী ছিলেন বলে ৩০ ও ৩২ আয়াত থেকে জানা যায়। তাহলে আমরা দেখছি যে, যাকোবের প্রেমিকা ও প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন চোর, মিথ্যাবাদী ও প্রতিমার উপাসক।

(১৩) আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২ তখন যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোকসকলকে কহিলেন, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা (strange gods) আছে তাহাদিগকে দূর কর এবং শুচি হও, ও অন্য বস্ত্র পর। ... ৪ তাহাতে তাহারা আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল শিখিমের নিকটবর্তী এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিলেন।"

এখানে স্পষ্ট যে, যাকোবের পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী লোক সকল এতদিন পর্যন্ত এ সকল ইতর দেবদেবীর মূর্তি পূজা করতেন। যাকোবের পরিবারের জন্য তা খুবই নিন্দনীয় ও কঠিন অন্যায়। এতদিন তিনি তাদেরকে প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করলেন না।

(১৪) আদিপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ আর লেয়ার কন্যা দীণা, যাহাকে তিনি যাকোবের জন্য প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরে গেল। ২ আর হিব্বীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল, তাহাকে ভ্রষ্ট করিল। ৩ আর যাকোবকে কন্যা দীণার প্রতি তাহার প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীকে প্রেম করিল ও তাহাকে মিষ্ট কথা বলিল (যে কথা দীণার হৃদয় স্পর্শ করিল)[১৮৩] ৪ পরে শিখিম তাঁহার পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর। ... ৮ তখন হমোর তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, ... ১৩ কিন্তু ... যাকোবের পুত্রগণ ... শিখিমকে ও

১৮৩. বন্ধনলি মধ্যে উল্লিখিত বাক্যটি গ্রন্থকার আরবী পাঠে রয়েছে, বাংলা বাইবেলে তা নেই।

তাহার পিতা হমোরকে উত্তর দিল; ১৪ তাহারা তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক লোককে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম আমরা করিতে পারি না; করিলে আমাদের দুর্নাম হইবে। ১৫ কেবল এই কর্মটি করিলে আমরা তোমাদের কথায় সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক হও .. ২৪ তখন হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের কথায় তাহার নগরের দ্বার দিয়া যে সকল লোক বাহিরে যাইত তাহারা সম্মত হইল, আর তাহার নগরদ্বার দিয়া যে সকল পুরুষ বাহিরে যাইত, তাহাদের ত্বকছেদ করা হইল। ২৫ পরে তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, যাকোবের এই দুই পুত্র আপন আপন খড়গ গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করতঃ সকল পুরুষকে বধ করিল। ২৬ এবং হমোর ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের বাটী হইতে দীণাকে লইয়া চলিয়া আসিল। ২৭ উহারা তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল, এই জন্য যাকোবের পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে গিয়া নগর লুট করিল। ২৮ তাহারা উহাদের মেষ, গরু ও গর্দভ সকল এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য হরণ করিল; ২৯ আর উহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া উহাদের সমস্ত ধন ও গৃহের সর্বস্ব লুট করিল।"

এখানে দেখুন যাকোবের কন্যা দীণার পবিত্রতার অবস্থা। শিখিমের মিষ্ট কথা তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, তার সাথে যে ব্যভিচার করল তাকেই তিনি ভালবাসলেন।

আর যাকোবের পুত্রগণের জুলুম-অত্যাচারের অবস্থাও দেখুন! তারা দেশের সকল পুরুষকে বধ করল, তাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করল এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করল। এখানে যাকোবের পুত্রগণের জুলুম ও অন্যায় সুস্পষ্ট। আর যাকোবের অন্যায় এই যে, তিনি তাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার আগেই বাধা দিলেন না বা নিষেধ করলেন না। এরপর এরূপ হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হওয়ার পরে তাদেরকে ঈশ্বরের বিধান মোতাবেক শাস্তিও দিলেন না। তিনি অন্যায়ভাবে লুণ্ঠিত মাল-সম্পদ ও বন্দিকৃত শিশু ও নারীদেরকে ফেরতও দিলেন না। যদি মনে করা হয় যে, তিনি তাঁর পুত্রদের সামনে অসহায় ছিলেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে বাধা দিতে পারেন নি এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেরত দিতে পারেন নি, তবে সেক্ষেত্রেও তাঁর কর্তব্য ছিল অন্তত এ সকল জালিমদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, বাইবেলের এই গল্পটিই বাহ্যত ভিত্তিহীন। কারণ শহরের মানুষ যতই অসুস্থ বা পীড়িত হোক, মাত্র দু'জন মানুষ পুরো একটি শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলবে এ কথা কল্পনা করা যায় না।

(১৫) আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "রূবেণ গিয়া তাঁহার পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল তাহা শুনিতে পাইলেন।"[১৮৪]

এখানে যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের অবস্থা দেখুন! নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন! আবার যাকোবের অবস্থাও দেখুন! তিনি তাঁর এই পুত্রকে বা তাঁর এই স্ত্রীকে ব্যভিচারের জন্য কোনরূপ শাস্তি প্রদান করলেন না। বাইবেলের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ সময়ে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা। আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ২৪ আয়াত থেকে এ কথা জানা যায়। তিনি কেবল শেষ জীবনে এই ব্যভিচারী পুত্রের জন্য বদ-দোয়া করেছিলেন। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮৫]

(১৬) আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "৬ পরে যিহূদা তামর নাম্নী একটি কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের সঙ্গে বিবাহ দিল। ৭ কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। ৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ বংশ নিজের হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজায়ার নিকটে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। ১০ তাহার সেই কার্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন। ১১ তখন যিহূদা পুত্রবধূ তামরকে কহিল, যে পর্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না হয়, তাবৎ পর্যন্ত তুমি আপন পিত্রালয়ে গিয়া বিধবাই থাক। ...১৩ তখন কেহ তামরকে বলিল, দেখ, তোমার শ্বশুর আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নায় যাইতেছেন। ১৪ তখন সে বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরণ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিল, ও গায়ে কাপড় দিয়া তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনয়িমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল; ...১৫ পরে যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। ১৬ অতএব সে পুত্রবধুকে চিনিতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার জন্য আমাকে কি দিবে ? ১৭ সে কহিল, পাল হইতে একটি ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও তাবৎ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখিবে ? ১৮ সে কহিল, কি বন্ধক রাখিব ? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্ঠি। তখন সে তাহাকে সেইগুলি দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহা হইতে গর্ভবতী হইল। ১৯ পরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া

১৮৪. আদিপুস্তক ৩৫/২২।

১৮৫. আদিপুস্তক ৪৯/৪।

আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। ... ২৪ প্রায় তিন মাস পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, আরও দেখ, ব্যভিচারহেতু তাহার গর্ভ হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া দেও। ২৫ পরে বাহিরে আনিত হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার গর্ভ হইয়াছে। সে আরও বলিল, এই মোহর, সূত্র ও যষ্ঠি কাহার ? চিনিয়া দেখ। ২৬ তখন যিহূদা সেইগুলি চিনিয়া কহিল, সে আমা হইতেও অধিক ধার্মিকা, কেননা আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই। আর যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না। ২৭ পরে তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইল, আর দেখ, তাহার উদরে যমজ সন্তান। ২৮ তাহার প্রসব কালে একটি বালক হস্ত বাহির করিল; তাহাতে ধাত্রী সেই হস্ত ধরিয়া রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এ প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে দেখ, তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে? অতএব তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। ৩০ পরে হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।"

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

প্রথমত, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'এর' দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মেরে ফেললেন। 'এর'-এর দুষ্টত্বের কোন বিবরণ এখানে দেওয়া হয় নি। এখানে প্রশ্ন হলো, তার দুষ্টত্ব কি তার বড় চাচার দুষ্টত্বের চেয়েও মারাত্মক ছিল ? তার বড় চাচা (রূবেণ) তো তার নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন। তার দুষ্টত্ব কি তার অন্য দুই চাচা শিমিয়োন ও লেবির দুষ্টত্বের চেয়েও অধিক ঘৃণ্য ছিল ? তার এই দুই চাচা তো অন্যায়ভাবে পুরো একটি শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করেন। তার দুষ্টত্ব কি তার পিতা (যিহূদা) ও তার অন্যান্য ভাইয়ের দুষ্টত্বের চেয়েও খারাপ ছিল ? তারা তো উপর্যুক্ত শহরের নিহত মানুষদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করেন! তার দুষ্টত্ব কি তার পিতার দুষ্টত্বের চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল ? তিনি তো 'এর'-এর মৃত্যুর পরে তার বিধবা স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন! এরা সকলেই তো ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা লাভ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন আর 'এর' ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হলেন, যার ফলে তাকে সদাপ্রভু হত্যা করলেন!

দ্বিতীয়ত, এখানে আরো অবাক কাণ্ড যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর ওননকে মেরে ফেললেন; কারণ সে ভূমিতে রেতঃপাত করেছিল। অথচ তাঁর পিতা ও পিতৃব্যগণকে উপরের অপরাধগুলির কারণে হত্যা করলেন না! তাহলে কি ভূমিতে রেতঃপাত করা গণহত্যা, লুণ্ঠন, পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার, পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার ইত্যাদি সকল পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর ?

তৃতীয়ত, যিহূদা তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করার কারণে তার পিতা ইস্রায়েল (যাকোব) তাকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করলেন না। শুধু তাই নয়, এই অধ্যায় বা অন্য কোন অধ্যায় থেকে জানা যায় না যে, যাকোব যিহূদার প্রতি এই ভয়ঙ্কর অপরাধের কারণে কোনরূপ বিরক্ত হয়েছিলেন বা রাগ করেছিলেন। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিহূদার ব্যভিচারের কারণে যাকোব কোনরূপ বিরক্ত হন নি। এ অধ্যায়ে যাকোব রূবেন, শিমিয়োন ও লেবিকে তাদের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডের কারণে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি যিহূদাকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য কোনরূপ নিন্দা করেন নি। তিনি তার অপরাধের বিষয়ে নিরব থেকেছেন এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উপরন্তু তিনি তার জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করেছেন এবং তাকে তার ভাইদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

চতুর্থত, যিহূদা তার পুত্রবধু তামরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে ধার্মিকা ছিল। উপরন্তু তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে তার নিজের চেয়েও বেশি ধার্মিক ছিল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি! সত্যিকারের ধার্মিক পুরুষ এই শ্বশুর। আর সত্যিকারের ধার্মিকা এই পুত্রবধু যে ধার্মিকতায় শ্বশুরকেও হার মানিয়েছে! কারণ সে তার গুপ্তাঙ্গকে স্বামীর পিতা ছাড়া আর কারো কাছে অনাবৃত করে নি এবং শ্বশুর ছাড়া আর কারো সাথে ব্যভিচার করে নি। আর এই এক ব্যভিচারের পুরস্কার হিসেবে সে দুটি পুত্র লাভ করল।

পঞ্চমত, দায়ূদ, শলোমন ও যীশু সকলেই এই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান পেরসের বংশধর। মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, পেরস ও সেরহ উভয়ে ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান। কিন্তু সে কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে হত্যা করেন নি বরং তিনি তাদেরকে জীবিত রেখেছেন, যেমনভাবে তিনি লোটের দুই কন্যার গর্ভে জন্মলাভকারী দুই জারজ পুত্রকে জীবিত রেখেছেন। দায়ূদের সাথে উরিয়ের স্ত্রীর ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছিল যে পুত্র সন্তান তাকে ঈশ্বর ব্যভিচার-জাত হওয়ার কারণে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এদেরকে সেভাবে হত্যা করেন নি। সম্ভবত পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা নিজের পুত্রবধুর সাথে (এবং নিজের কন্যার সাথে) ব্যভিচার করার চেয়ে বেশি কঠিন অপরাধ!

(১৭) যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। ২ তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন

আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। ৩ তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল। ৪ তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন, এবং একটি ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্মাণ করিলেন। তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৫ আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্মাণ করিলেন, এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে। ৬ আর লোকেরা পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল; আর লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"

এই বক্তব্য থেকে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, হারোণ গোবৎস নির্মাণ করেন , উক্ত গোবৎসের পূজার নিমিত্ত তিনি তার সম্মুখে একটি বেদি নির্মাণ করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হবে। এভাবে তিনি নিজে গোবৎস পূজা করেন এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণকে গোবৎস পূজা করতে নির্দেশ দেন। তারা হোমবলি উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলার্থক নৈবদ্য আনে। যে হারোণ এ সকল ঘৃণ্যতম কাজগুলি করলেন বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ও প্রেরিত ছিলেন।

পাদরি স্মিথ মহাশয় ১৮৪২ সালে প্রকাশিত "তাহকীকু দীনিল হক" (সত্য ধর্মের অন্বেষণ) নামক গ্রন্থের প্রথম অংশের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "তাদের (ইস্রায়েল সন্তানগণের) মধ্যে যেমন কোন শাসক বা রাজা ছিল না, তেমনি মোশি, হারোণ ও ৭০ জন সহযোগী ছাড়া তাদের মধ্যে কোন ভাববাদীও ছিল না।"

অতঃপর তিনি লিখেছেন, "মোশি, হারোণ এবং ৭০ জন সহযোগী ছাড়া তাদের মধ্যে কোন ভাববাদী ছিলেন না।"

পাদরি মহাশয়ের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে হারোণ ভাববাদী ছিলেন।

এখানে পাঠকের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পাদরি স্মিথ মহাশয়ের গ্রন্থের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় আমি ১৮৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক থেকে উল্লেখ করেছি। আমি এই পুস্তকের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার খণ্ডন করে 'তাকলীবুল মাতাঈন' (অভিযোগের প্রত্যুত্তর) নামে একটি পুস্তক রচনা করি। এছাড়া 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের রচয়িতা (শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মোহানী, মৃত্যু ১২৮৭ হি/১৮৭০ খৃ) এই পুস্তকের প্রত্যুত্তরে পুস্তক রচনা করেন। আমি শুনেছি যে, পাদরি স্মিথ মহাশয় এ সকল প্রত্যুত্তরের পরে তাঁর গ্রন্থটির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছেন।

তিনি কোন কোন স্থানে কিছু কথা সংযোজন করেছেন, কোথাও কিছু বিয়োজন করেছেন এবং অন্যান্য স্থানে পরিবর্তন করেছেন। মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফান্ডারও মীযানুল হকের ক্ষেত্রে এরূপ করেছিলেন। আমি জানি না, পাদরি স্মিথ মহাশয় তাঁর পুস্তকের পরিবর্তিত বা বিকৃত সংস্করণে উপরে উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় রেখেছেন, না বাদ দিয়েছেন।

সর্বাবস্থায় পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, হারোণ ভাববাদী ছিলেন। এ কথা ঠিক যে, তিনি মোশির ব্যবস্থার অনুসরণ করতেন। তবে এ বিষয়টি তাঁর ভাববাদিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যিহোশূয়, দায়ূদ, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও অন্যান্য সকল ভাববাদী, যারা মোশির পর থেকে যীশু পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন তাঁরা সকলেই মোশির ব্যবস্থার অধীন ছিলেন। কিন্তু এতে তাঁদের ভাববাদিত্ব অপ্রমাণিত হয় না।

যাত্রা পুস্তকের ৪ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর সদপ্রভু হারোণকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে তিনি গিয়া ঈশ্বরের পর্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন, ও তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।"

গণনা পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ তখন সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন .... ৮ আর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন .... ২০ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন ... ।"

এই অধ্যায়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর সরাসরি হারোণের সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে ভাববাণী প্রদান করেছেন।

গণনা পুস্তকের ২, ৪, ১৪, ১৬ ও ১৯ অধ্যায়ে ৬ স্থানে বলা হয়েছে : "আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণের সাথে কথা বলিলেন এবং কহিলেন[১৮৬] (And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying)"।

যাত্রা পুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে : "আর সদাপ্রভু মোশির ও হারোণের সহিত আলাপ করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে, এবং মিসর-রাজ ফরৌণের নিকটে যাহা বক্তব্য, তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।"

বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর হারোণকে এককভাবে এবং পৃথকভাবে ঐশ্বরিক প্রেরণা, ওহী বা ভাববাণী প্রদান করেছেন। এছাড়া মোশির সাথে যৌথভাবেও তাঁর প্রতি ওহী বা ভাববাণী প্রদান করেছেন। তিনি মোশির ন্যায় হারোণকেও তিনি ভাববাদী ও প্রেরিত হিসেবে (নবী ও রাসূল) হিসেবে ফরৌণ এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। যাত্রা পুস্তক ভাল করে

১৮৬. বাংলা বাইবেলে : আর সদপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন।

পাঠ করলে পাঠক জানতে পারবেন যে, ফরৌণের বিরুদ্ধে অলৌকিক চিহ্নসমূহের অধিকাংশই হারোণের হাতে বা হারোণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া মোশি ও হারোণের বোন মরিয়মও ভাববাদিনী ছিলেন বলে যাত্রা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে বলা হয়েছে : "পরে হারোনের ভগিনী মরিয়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন ...।"

গীতসংহিতার ১০৫ গীতের ২৬ আয়াত নিম্নরূপ : "২৬ তিনি পাঠাইলেন আপন দাস মোশিকে ও হারোণকে, যাঁহাকে তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন।"

গীতসংহিতার ১০৬ গীতের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ : "১৬ আরও তাহারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি, ও সদাপ্রভুর পবিত্র লোক হারোণের (Aaron the saint of the LORD) প্রতি ঈর্ষা করিল।"

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফান্ডার ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' (আপত্তির নিরসন) গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, হারোণ ভাববাদী ছিলেন না। বাইবেলের উপর্যুক্ত আয়াতগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এই বক্তব্যটি ভিত্তিহীন, বাতুল ও অসার।

(১৮) যাত্রা পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে রয়েছে : "১১ সেকালে একটি ঘটনা ঘটিল; মোশি বড় হইলে পর একদিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদের ভার বহন দেখিতে লাগিলেন। আর দেখিলেন, একজন মিসরীয় একজন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনকে মারিতেছে। ১২ তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিসরীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন।"

এখানে মোশি বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসার কারণে এই মিসরীয় লোকটিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করলেন।

(১৯) যাত্রা পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাকপটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি; কারণ আমি জড়মুখ জড়জিহ্বা। ১১ সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে নির্মাণ করিয়াছে ? আর বোবা, বধির, চক্ষুষ্মান বা অন্ধকে কে নির্মাণ করে ? আমি সদাপ্রভুই কি করি না ? ১২ এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্তী হইব, ও কি বলিতে হইবে, তোমাকে জানাইব। ১৩ তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় কর, যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, পাঠাও। ১৪ তখন মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল...।"

এখানে আমরা দেখছি যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর অনেক কথা বলে মোশিকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সাহায্যের নিশ্চয়তা দিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোশি ভাববাদিত্বের দায়িত্ব

গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন। এতে তাঁর উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হলো।

(২০) যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে রয়েছে : "পরে মোশি শিবিরের নিকটবর্তী হইলে ঐ গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন। তাহাতে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্বতের তলে আপন-হস্ত হইতে সেই দুইখানা প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।"

এই প্রস্তরফলক দুটি ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের নির্মিত ও ঈশ্বরের নিজের লেখা। এ কথা এই অধ্যায়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮৭] কাজেই এ দুটিকে ভেঙ্গেওফেলা মোশির অন্যায় ও পাপ। এর বিনিময়ে তিনি আর এরূপ ফলক পান নি। কারণ পরবর্তীতে যে দুটি প্রস্তরফলক দেওয়া হয় সে দুটি ছিল মোশির নিজের নির্মিত ও নিজের হাতে লেখা। যাত্রা পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮৮]

(২১) গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে রয়েছে : "পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিলে না (And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel), এইজন্য আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা এই মণ্ডলীকে প্রবেশ করাইবে না।"

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪৮ সেই দিবসে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৪৯ তুমি এই অবারীম পর্বতে, অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্বতে উঠ, এবং আমি অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, সেই কনান দেশ দর্শন কর। ৫০ আর তোমার ভ্রাতা হারোণ যেমন হোর পর্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকট সংগৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্বতে উঠিবে, তোমাকে তথায় মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইতে হইবে; ৫১ কেননা সিন প্রান্তরে কাদেশস্থ মরীবা জলের নিকটে তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে সত্য লংঘন করিয়াছিলে[১৮৯], ফলতঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য কর নাই (Because ye trespassed against me

---

১৮৭. সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্মিত, এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত। যাত্রা পুস্তক ৩২/১৬।

১৮৮. যাত্রা পুস্তক ৩৪/ ১ ও ২৮।

১৮৯. গ্রন্থকার উদ্ধৃত আরবী বাইবেলের পাঠে : "আমার অবাধ্যতা করেছিলে।" ইংরেজি Revised Standard Version-এর ভাষ্য : Because You broke faith with me: তোমরা আমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলে ...।

among the children of Israel...because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel.) । ৫২ তুমি আপনার সম্মুখে দেশ দেখিবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, তথায় প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

এ দুটি স্থানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোশি ও হারোণ এরূপ অপরাধ ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন যে,পবিত্রভূমিতে প্রবেশের সুযোগ থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ঈশ্বর স্পষ্টতই বলেছেন যে, মোশি ও হারোণ অবিশ্বাস করেছিলেন, অবাধ্যতা করেছিলেন, সত্য লঙ্ঘন করেছিলেন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে পবিত্র বলে মান্য করেন নি।

(২২) শিমশোন একজন মহাবলবান ইস্রায়েলীয় বিচারকর্তা ও ভাববাদী ছিলেন। তিনি ঘসাতে একজন বেশ্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তৎপরে তিনি সোরেক উপত্যকার দলীলা নাম্নী একজন মহিলার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি দলীলার নিকট গমনাগমন করতে থাকেন। কাফির পলেষ্টীয়গণ দলীলাকে বলে, "তুমি তাহাকে ফুস্‌লাইয়া দেখ, কিসে তাহার এমন মহাবল হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে জয় করিয়া ক্লেশ দিবার জন্য রাখিতে পারিব; তাহাতে আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা দিব।" দলীলা তাঁকে প্রেমের ফাঁদে বেঁধে এভাবে তাঁর শক্তির উৎস ও তাঁকে পরাজিত করার কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। শিমশোন তিনবার তাকে মিথ্যা বলেন। তখন এই পাপাচারিণী তাঁকে বলে : "তুমি কি প্রকারে বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস ? তোমার মন ত আমাতে নাই ; এই তিন বার তুমি আমাকে উপহাস করিলে ; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলে না।" এভাবে সে প্রতিদিন শিমশোনকে পীড়াপীড়ি করে ব্যস্ত করে তুলে। তখন তিনি প্রকৃত সত্য তাকে বলে দেন। তিনি বলেন, "আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভ হইতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্বল হইয়া অন্য সকল লোকের সমান হইব।"

যখন দলীলা বুঝতে পারল যে, শিমশোন সঠিক তথ্য তাকে প্রদান করেছেন, তখন সে পলেষ্টীয়দের নেতৃবৃন্দকে ডেকে আনে। সে প্রেম করে শিমশোনকে নিজ জানুর উপরে ঘুম পাড়ায়। এরপর এক জনকে ডাকিয়ে তাঁর মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি করায়। এতে তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে যায়। তখন পলেষ্টীয়গণ তাঁকে বন্দি করে, তাঁর দুই চক্ষু উৎপাটন করে এবং তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে নানা প্রকারের অত্যাচার করতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি নিহত হন।

শিমশোনের কাহিনী বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে। আর তিনি যে ভাববাদী ছিলেন তা বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে প্রমাণিত। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৩ অধ্যায়ের৫ ও ২৫ আয়াত, ১৪ অধ্যায়ের ৬ ও ৯ আয়াত, ১৫ অধ্যায়ের ১৪, ১৮ ও ১৯ আয়াত এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের ভাববাদী ছিলেন।

(২৩) ইস্রায়েলের রাজা শৌলের ভয়ে ভীত হয়ে দায়ূদ পলায়ন করেন এবং নোবে যাজক অহীমেলকের নিকট গমন করেন। এই ঘটনার বর্ণনায় ১ শমূয়েলের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পরে দায়ূদ নোবে যাজকের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; আর অহীমেলক কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে কহিলেন, আপনি একা কেন ? আপনার সঙ্গে কেহ নাই কেন ? ২ দায়ূদ অহীমেলক যাজককে কহিলেন, রাজা একটি কর্মের ভার দিয়া আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে যে কার্যে প্রেরণ করিলাম, ও যাহা আদেশ করিলাম, তাহার কিছুই যেন কেহ না জানে ; আর আমি নিজের সঙ্গী যুবকদিগকে অমুক অমুক স্থানে আসিতে বলিয়াছি। ৩ এখন আপনার কাছে কি আছে ? পাঁচখানি রুটি হউক, কিংবা যাহা থাকে, আমার হাতে দিউন। ... ৬ তখন যাজক তাঁহাকে পবিত্র রুটি দিলেন ...। ৮ পরে দায়ূদ অহীমেলককে কহিলেন, এই স্থানে আপনার কাছে কি বর্শা বা খড়্গ নাই? কেননা রাজকার্যের তাড়াতাড়িতে আমি আপন খড়্গ বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নাই।"

এখানে দায়ূদ যা কিছু বলেছেন সবই মিথ্যা। দায়ূদ একের পর এক মিথ্যা কথা বলেছেন যাজক অহীমেলককে। এই মিথ্যার ফলাফল ছিল বড় মর্মান্তিক। এই মিথ্যার কারণে ইস্রায়েলের রক্তপিপাসু রাজা শৌল নোবে নির্বিচারে গণহত্যা করেন। তিনি তথাকার সকল নারী, পুরুষ, শিশু এবং গরু, ছাগল, মেষ, গাধা ইত্যাদি সকল প্রাণী হত্যা করেন। এই ঘটনায় ৮৫ জন যাজক নিহত হন। অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর রক্ষা পান। তিনি পালিয়ে দায়ূদের নিকট গমন করেন। দায়ূদ তার কাছে স্বীকার করেন যে, তিনিই তার পরিবারের সকলের এই হত্যা ও ধ্বংসের কারণ। এ সকল বিষয় ১ শমূয়েলের ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[১৯০]

(২৪) ২ শমূয়েলের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে রাজবর্গের যুদ্ধে গমনের সময়ে দায়ূদ যোয়াবকে, তাহার সহিত আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে পাঠাইলেন ; তাহারা গিয়া অম্মোন-সন্তানদিগকে সংহার করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল ; কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে থাকিলেন। ২ একদা বৈকালে দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে; স্ত্রীলোকটি দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল।

১৯০. ১ শমূয়েল ২২/ ১-২৩।

৩ দায়ূদ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। একজন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয় ? ৪ তখন দায়ূদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন এবং সে তাঁহার নিকটে আসিলে দায়ূদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সেই স্ত্রীলোকটি ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। ৫ পরে সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইল ; আর লোক পাঠাইয়া দায়ূদকে এই সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে। ৬ তখন দায়ূদ যোয়াবের নিকট লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় ঊরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব দায়ূদের নিকটে ঊরিয়কে পাঠাইলেন। ৭ ঊরিয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ তাহাকে যোয়াবের কুশল, লোকদের কুশল ও যুদ্ধের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮ পরে দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, তুমি আপন বাটীতে গিয়া পা ধোও। তখন ঊরিয় রাজবাটী হইতে বাহির হইল, আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভেট গেল। ৯ ঊরিয় আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিল, গৃহে গেল না। ১০ পরে এই কথা দায়ূদকে বলা হইল যে, ঊরিয় গৃহে যায় নাই। দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, তুমি কি পথভ্রমণ করিয়া আইস নাই ? তবে কেন বাটীতে গেলে না ? ১১ ঊরিয় দায়ূদকে কহিল, সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটিরে বাস করিতেছে এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনি করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি ? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম করিব না। ১২ তখন দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে ঊরিয় সেই দিবস ও পরদিবস যিরূশালেমে রহিল। ১৩ আর দায়ূদ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে সে তাঁহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে গেল, গৃহে গেল না। ১৪ প্রাতঃকালে দায়ূদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া ঊরিয়ের হাতে দিয়া পাঠাইলেন। ১৫ পত্র খানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। ১৬ পরে কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা জানাতে যোয়াব নগর অবরোধকালে সেই স্থানে ঊরিয়কে নিযুক্ত করিলেন। ১৭ পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে কয়েক জন লোক, দায়ূদের দাসদের মধ্যে কয়েক জন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা পড়িল। ১৮ পরে যোয়াব লোক পাঠাইয়া যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত দায়ূদকে জানাইলেন। .... ২৬ আর ঊরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী ঊরিয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক করিল। ২৭ পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ লোক

পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাঁহার স্ত্রী হইল, ও তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই কর্ম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল।"

২ শমূয়েলের ১২ অধ্যায়ে দায়ূদের বিষয়ে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান নাথন ভাববাদীর মুখে বর্ণিত হয়েছে। সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান নিম্নরূপ : "৯ তুমি কেন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছ ? তুমি হিত্তীয় ঊরিয়কে খড়্গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, অম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা ঊরিয়কে মারিয়া ফেলিয়াছ। ... ১৪ কিন্তু এই কর্ম দ্বারা আপনি সদাপ্রভুর শত্রুগণকে নিন্দা করিবার বড় সুযোগ দিয়াছেন, এই জন্য আপনার নবজাত পুত্রটি অবশ্য মরিবে।"

এখানে দায়ূদ ৮টি পাপে লিপ্ত হয়েছেন :

প্রথম পাপ : তিনি পর নারীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। আর যীশু বলেছেন : "যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে একথা উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১৯১]

দ্বিতীয় পাপ : দায়ূদ দৃষ্টির পাপেই পরিতৃপ্ত থাকেন নি। তিনি মহিলাকে ডেকে এনে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ব্যভিচার সন্দেহাতীতভাবে মহাপাপ। তোরাহ-এর প্রসিদ্ধ দশ আজ্ঞার মধ্যে সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেন : "ব্যভিচার করিও না।"[১৯২]

তৃতীয় পাপ : দায়ূদ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ প্রকারের ব্যভিচার সকল প্রকারের ব্যভিচারের মধ্যে ঘৃণ্যতম এবং পৃথক পাপ বলে গণ্য। প্রসিদ্ধ দশ আজ্ঞার মধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ পাপ : ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। তিনি এই দায়িত্ব অমান্য করে পাপ করলেন। তিনি নিজেকে বা উক্ত মহিলাকে শাস্তি প্রদান করলেন না। লেবীয় পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১০ আয়াত নিম্নরূপ : "আর যে ব্যক্তি পরের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।"

দ্বিতীয় বিবরণের ২২ অধ্যায়ে ২২ আয়াত নিম্নরূপ : "কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়ন কালে ধরা পড়ে তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"

---

১৯১. মথি ৫/২৮।

১৯২. যাত্রাপুস্তক ২০/১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১৮।

পঞ্চম পাপ : দায়ূদ ঊরিয়কে সেনাবাহিনী থেকে ডেকে পাঠান এবং তাকে স্বগৃহে গমন করতে নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে দায়ূদের মূল উদ্দেশ্য যে, তাঁর অপরাধটি গোপন হয়ে যাক এবং ঊরিয়ের স্ত্রীর গর্ভ উরিয়ের কারণেই হয়েছে বলে প্রচারিত হোক। ঊরিয় তাঁর ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার কারণে গৃহে গমন বা স্ত্রীর সাথে শয়ন থেকে বিরত থাকেন এবং শপথ করেন যে, তিনি গৃহে গমন করবেন না। তখন দায়ূদ দ্বিতীয় দিনের জন্য তাকে তাঁর নিকট অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং অতিরিক্ত মদ পান করিয়ে তাকে মাতাল করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, পাড় মাতাল অবস্থায় ঊরিয় স্বগৃহে যেয়ে স্ত্রীর নিকট শয়ন করবে। কিন্তু এ অবস্থাতেও উরিয় তাঁর নৈতিক চিন্তা ও ধার্মিকতার কারণে তার স্ত্রীর নিকট গমন করেন নি। তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নি, অথচ ধর্মীয় ব্যবস্থায়, সামাজিক শিষ্টাচারে ও জ্ঞান-বিবেকের নির্দেশনা অনুসারে স্ত্রীর নিকট গমন তার জন্য বৈধ ছিল।

সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি! ইহুদী খৃস্টানগণের সাধারণ মানুষদের ধার্মিকতা আর ভাববাদিগণের ধার্মিকতার তুলনা করুন! সাধারণ একজন ধার্মিক মানুষ নিজের বৈধ আনন্দ উপভোগ থেকে বিরত থাকছেন সেনাপতি ও সহযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ধর্মীয় অনুভূতির কারণে। পক্ষান্তরে ইস্রায়েলীয় ভাববাদী ভয়ঙ্করতম পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন এবং এরপর সেই পাপ গোপন করতে বিভিন্ন প্রকারের পাপে লিপ্ত হচ্ছেন নির্বিকার চিত্তে।

ষষ্ঠ পাপ : ঊরিয়কে মাতাল করেও যখন দায়ূদ নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারলেন না, তখন তিনি তাকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কৌশলে অম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা উরিয়কে হত্যা করালেন। যাত্রা পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন : "নির্দোষের কি ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না।"

সপ্তম পাপ : নাথন ভাববাদী কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দায়ূদ তাঁর পাপের জন্য কোনরূপ অনুশোচনা করেন নি বা সতর্ক হন নি।

অষ্টম পাপ : তাঁর এই পাপের বিষয়ে সদাপ্রভুর নির্দেশ ও বিধান তিনি জানতে পারলেন। ঈশ্বর বিধান দিলেন যে, তাঁর এই পাপের ফসল ব্যভিচার জাত পুত্রটি মৃত্যুবরণ করবে। ঈশ্বরের নির্দেশ জানার পরেও তিনি সেই পুত্রের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন, বিনতি করলেন, উপবাস করলেন এবং ভূমিতে পড়ে থাকলেন।[১৯৩]

(২৫) ২ শমূয়েলের ১৩ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ূদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন (নিজের বৈমাত্রেয় ভগ্নি) দায়ূদের কন্যা তামরকে প্রতারণা এবং বলপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপরা তাকে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। উক্ত ধর্ষিতা অসহায়

---

১৯৩. ২ শমূয়েল ১২/১৪-২৩।

ভগ্নি ঘর থেকে বের হতে আপত্তি করলে অম্নোন তার পরিচারককে নির্দেশ দেন তাকে বের করে দেওয়ার। তার নির্দেশে পরিচারক তামরকে বের করে দ্বারে হুড়কো লাগিয়ে দেয়। ধর্ষিতা তামর ক্রন্দন করতে করতে বেরিয়ে যান। দায়ূদ বিষয়টি জানতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি অম্নোনকে ভালবাসতেন, এজন্য তিনি তাকে কিছুই বললেন না। তিনি তামরকেও কিছু বললেন না। এই তামর ছিল দায়ূদের পুত্র অবশালোমের সহোদরা। নিজের সহোদরকে ধর্ষণ করার কারণে অবশালোম অম্নোনকে ঘৃণা করে এবং তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী সময়ে যখনই সে সুযোগ পায় তখনই অম্নোনকে হত্যা করে।

(২৬) (দায়ূদের জীবদ্দশাতেই অবশালোম বিদ্রোহ করে দায়ূদের প্রাসাদ দখল করে এবং সকল মানুষকে দেখিয়ে সে দায়ূদের স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।) ২ শমূয়েলের ২২ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্ত প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল, তাহাতে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করিল।"

এরপর অবশালোম তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। এই যুদ্ধে ইস্রায়েল বংশের ২০,০০০ (বিশ হাজার) মানুষ নিহত হয়। ২ শমূয়েলের ১৮ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৪]

এখানে আমরা দেখছি যে, দায়ূদ পুত্র অবশালোম যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেণের চেয়েও উপরে উঠেছে। তিন দিক থেকে অবশালোম রুবেণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে :

প্রথমত : অবশালোম তার পিতা দায়ূদের সকল উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করেছে ; পক্ষান্তরে রুবেণ তাঁর পিতা যাকোবের একটি মাত্র উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করে।

দ্বিতীয়ত : অবশালোম ইস্রায়েল বংশের সকল মানুষের দৃষ্টির সামনে পিতার পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অথচ রুবেণ গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।

তৃতীয়ত : অবশালোম তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ইস্রায়েল বংশের বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করতে পেরেছে।

অবাধ্য ও পাপী পুত্রের এতসব অপরাধের পরেও দায়ূদ তাকে হত্যা না করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যোয়াব তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অবশালোমকে হত্যা করেন। যখন দায়ূদ হত্যার সংবাদ জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদাকাটা করতে থাকেন।[১৯৫]

এ সকল ঘটনায় আমি অবাক হই না। কোন ভাববাদীর (নবী-রাসূল) বা

১৯৪. ২ শমূয়েল ১৮/১-৭।

১৯৫. ২ শমূয়েল ১৮/১-৩৩।

ভাববাদিগণের সন্তানদের এরূপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া খৃস্টানদের পবিত্র পুস্তকের আলোকে কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। তবে আমি আশ্চর্য হই এ জন্য যে,অবশালোম কর্তৃক সকল মানুষের চোখের সামনে নিজ পিতার পত্নিগণের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের বিধান অনুসারে (!) হয়েছিল। ঈশ্বরই এই ব্যভিচারীকে এরূপ ব্যভিচারের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন! কারণ দায়ূদ যখন উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন তখন ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী নাথনের মুখে দায়ূদকে এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। ২ শমূয়েলের ১২ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বলা হয়েছে : "১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার কুল হইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব ; তাহাতে সে এই সূর্যের সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণের সহিত শয়ন করিবে। ১২ বস্তুতঃ তুমি গোপনে এই কর্ম করিয়াছ, কিন্তু আমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও সূর্যের সাক্ষাতে এই কার্য করিব।"

ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন!

(২৭) ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ শলোমন রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয়া রমণীকে, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে প্রেম করিতেন। ২ যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাইও না এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। ৩ সাতশত রমণী তাঁহার পত্নী ও তিনশত তাঁহার উপপত্নী ছিল; তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। ৪ ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দায়ূদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। ৫ কিন্তু শলোমন সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ দেবতা মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। ৬ এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন; পিতা দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না। ৭ সেই সময়ে শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য উচ্চস্থলী নির্মাণ করিলেন। ৮ তাঁহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন। ৯ অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী

হইয়াছিল, যিনি দুইবার তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, ১০ এবং এই বিষয় তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবগণের অনুগামী না হন; কিন্তু সদাপ্রভু যাহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা তিনি পালন করিলেন না। ১১ অতএব সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার ত এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার আদিষ্ট বিধি সকল পালন কর নাই; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা হইতে রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব।"

এখানে শলোমন পাঁচ প্রকার পাপে লিপ্ত হয়েছেন।

প্রথম পাপ এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও কঠিন পাপ এই যে, তিনি ধর্মত্যাগ করেছেন। শেষ বয়সে যখন মানুষ বেশি বেশি ঈশ্বরের উপাসনার দিকে মনোযোগ প্রদান করবে, সে সময়ে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন। আর মোশির ব্যবস্থায় ধর্মত্যাগীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। ধর্মত্যাগী যদি অলৌকিক চিহ্নধারী ও অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্নকারী ভাববাদীও হন তবুও তাকে এই শাস্তি প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ ও ১৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৬] তোরাহ-এর কোন একটি আয়াত থেকেও জানা যায় না যে, ধর্মত্যাগী তাওবা করলে বা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসলে তার সেই তাওবা বা ফিরে আসা গ্রহণযোগ্য হবে। ধর্মত্যাগীর তাওবা যদি গৃহীত হতো তবে মোশি গোবৎস উপাসকদের হত্যার নির্দেশ দিতেন না। গোবৎস উপাসনার পাপের কারণে মোশি ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন।[১৯৭]

দ্বিতীয় পাপ : তিনি প্রতিমা পূজার জন্য যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে উচ্চস্থলী বা মন্দির ও বেদি নির্মাণ করলেন। এই প্রতিমা-মন্দির ও বেদিগুলি পরবর্তী শতশত বছর তথায় স্থায়ী ছিল। অবশেষে শলোমনের মৃত্যুর ৩৩০ বছরেরও অধিককাল পরে যিহূদা রাজ্যের রাজা যোশিয় বিন আমোন (আমোনের পুত্র যোশিয় রাজা) তাঁর রাজত্বকালে এ সকল মন্দির ও উচ্চস্থলী অশুচি করেন এবং প্রতিমাগুলি ভেঙে ফেলেন। ২ রাজাবলির ২৩ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৮]

তৃতীয় পাপ : যে জাতিগণের নিকটবর্তী হতে সদাপ্রভু ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন তিনি সে সকল জাতির নারীদেরকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "আর তাহাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিবে না ; তুমি তাহার পুত্রকে আপনার কন্যা দিবে না ও আপন পুত্রের জন্য তাহার কন্যা গ্রহণ করিবে না।"[১৯৯]

চতুর্থ পাপ : তিনি এক হাজার স্ত্রী গ্রহণ করেন। ইস্রায়েলীদের মধ্যে যারা শাসন

১৯৬. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১ ও ১৭/২-৭।

১৯৭. ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলির ভাষ্য অনুসারে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। যাত্রা পুস্তক ৩২/২৮।

১৯৮. ২ রাজাবলি ২৩/১-২০।

১৯৯. দ্বিতীয় বিবরণ ৭/৩।

ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য অনেক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিবরণের ১৭ অধ্যায়ে ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর সে (রাজা) অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না, পাছে তাহার হৃদয় বিপথগামী হয়।"

পঞ্চম পাপ : শলোমনের স্ত্রীগণ আপন আপন প্রতিমা ও দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাত ও বলিদান করত। আর যাত্রা পুস্তকের ২২ অধ্যায়ে স্পষ্টত বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি প্রতিমা-দেবতার জন্য বলিদান করিবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।"[২০০] এই নির্দেশের ভিত্তিতে এ সকল স্ত্রীকে হত্যা করা শলোমনের অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। উপরন্তু এ সকল স্ত্রী তাঁকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার সেবা করতে প্ররোচিত করেছিল। এজন্য শলোমনের ঈশ্বর নির্দেশিত অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ছিল যে, তিনি এদেরকে প্রস্তরাঘাতে বধ করবেন। দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ অধ্যায়ে এ বিষয়ে অলঙ্ঘণীয় নির্দেশ দান করা হয়েছে।[২০১]

শলোমন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনোই তাঁর এই দুটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করেন নি।

অবাক বিষয় যে, দায়ূদ ও শলোমন তোরাহ নির্দেশিত এ সকল বিধান তাঁদের নিজেদের উপর এবং পরিবারের সদস্যদের উপর প্রয়োগ করলেন না। ধর্ম নিয়ে তামাশা ও বিকৃতি এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে ? এ সকল শাস্তি ও বিধান কি ঈশ্বর শুধু দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বল মানুষদের উপর প্রয়োগ করার জন্য দিয়েছেন ?

পুরাতন নিয়মের কোন একটি স্থান থেকেও বুঝা যায় না যে, শলোমন তাঁর এই মহাপাপ থেকে তওবা করেছিলেন বা এই মহাপাপ পরিত্যাগ করেছিলেন বরং পুরাতন নিয়মের বিবরণ অনুসারে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, তিনি কখনোই এই মহাপাপ ত্যাগ করেন নি বা স্বধর্মে ফিরে আসেন নি। তিনি যদি তওবা করতেন বা স্বধর্মে ফিরে আসতেন তবে অবশ্যই তিনি এ সকল মন্দির বা উচ্চস্থলী ভেঙে ফেলতেন, এ সকল মন্দিরে যে সকল দেবতা ও প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন সেগুলি বিনষ্ট করতেন এবং এ সকল স্ত্রীকে তিনি প্রস্তরাঘাতে বধ করতেন। তবে, তোরাহ-এর বিধান অনুসারে

---

২০০. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। এখানে বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।"

২০১. "তোমার ভ্রাতা ... কিংবা তোমার বক্ষের স্ত্রী .. যদি গোপনে তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি, ... তবে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হইও না, তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া করিবে না, তাহাকে কৃপা করিবে না, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে না। কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে; তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে তুমিই তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। তুমি তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবে, যেন সে মরিয়া যায়...।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১৬-১১।

মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর তওবার কোন মূল্য নেই। তোরাহ-এর বিধানানুসারে ধর্মত্যাগীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা মি. ফান্ডার ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) নামক পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন যে, আদম ও শলোমন তওবা করেছিলেন। তাঁর এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া কিছুই নয়।

(২৮) এই পুস্তকের ভূমিকায় ৭ম বিষয় থেকে পাঠক জেনেছেন যে, বৈথেলে বসবাসরত একজন ভাববাদী ঈশ্বরের ভাববাণী প্রচারের নামে মিথ্যা বলেন এবং এভাবে ঈশ্বরের নামে মিথ্যা কথা বলে তিনি নিরীহ একজন ঈশ্বরের লোককে প্রতারিত করেন, তাকে ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন এবং তাকে বিনষ্ট করেন।[২০২]

(২৯) ১ শমূয়েলের ১০ অধ্যায়ে ইস্রায়েলের প্রসিদ্ধ রাক্তপিপাসু রাজা শৌল সম্পর্কে বলা হয়েছে : "১০ তাঁহারা সেখানে, সেই পর্বতে, উপস্থিত হইলে, দেখ, এক দল ভাববাদী তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন; এবং ঈশ্বরের আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, ও তাঁহাদের মধ্যে তিনি ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন (a company of prophets met him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them)। ১১ আর যাহারা পূর্বে তাঁহাকে জানিত, তাহারা সকলে যখন দেখিল, দেখ, তিনি ভাববাদীদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিতেছেন, তখন লোকেরা পরস্পর কহিল, কীশের পুত্রের কি হইল ? শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে একজন (Is Saul also among the prophets) ? ১২ তাহাতে তথাকার এক জন উত্তর করিল, ভাল, উহাদের পিতা কে ? এইরূপে, 'শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন ?' এই কথা প্রবাদ হইয়া উঠিল। ১৩ পরে তিনি ভাবোক্তি প্রচার সাঙ্গ করিয়া উচ্চস্থলীতে গেলেন।"

১ শমূয়েলের ১১ অধ্যায়ের ৬ আয়াত নিম্নরূপ : "৬ ঐ কথা শুনিলে পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে সবলে আসিলেন, এবং তাঁহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।"

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শৌল ঈশ্বরের আত্মায় বা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাববাণী করতেন (অর্থাৎ তিনি একজন ভাববাদী বা নবী ছিলেন)।

এই পুস্তকেরই ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "তখন সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল (But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil

---

২০২. বিস্তারিত দেখুন : ১ রাজাবলী ১৩/১১-২৯।

spirti from the LORD troubled him) ।"[২০৩]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, এই ভাববাদী বা নবী তাঁর ভাববাদিত্বের পদ হারিয়ে ফেলেন। ঈশ্বরের আত্মা তাকে পরিত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দুষ্ট আত্মা বা শয়তানের আত্মা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এই পুস্তকেরই ১৯ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৩ তখন শৌল রামাস্থিত নায়োতে গেলেন। আর ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরেও আসিলেন, তাহাতে তিনি রামাস্থিত নায়োতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যাইতে যাইতে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন। ২৪ আর তিনিও আপন বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তিনিও শমূয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, আর সমস্ত দিবারাত্রি বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই জন্য লোকে বলে, শৌলও কি ভাববাদীদের মধ্যে এক জন ?"

এভাবে এই পদচ্যুত ভাববাদী পুনরায় ভাববাদিত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। পবিত্র আত্মা এমন শক্তিতে তার উপর আগমন করলেন যে, তিনি তার সকল পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। আর (পবিত্র আত্মার মহান প্রভাবে ও শক্তিতে) তিনি পুরো একদিন ও একরাত এভাবে উলঙ্গ হয়েই থাকলেন। এই ভাববাদী পবিত্র আত্মা ও শয়তানের আত্মার (ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দুষ্ট আত্মার) মধ্যে এমন অপূর্ব সমন্বয় করেছিলেন যা সত্যই এক অবাক বিষয়! পাঠক যদি এই মহান ভাববাদীর জুলুম, অবাধ্যতা ও অনাচার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তবে শমূয়েল ভাববাদীর এই পুস্তকটি পাঠ করুন।

(৩০) যীশুর বারো জন প্রেরিত ভাববাদীর একজন ছিলেন ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscariot) । তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মা-ময় এবং আত্মায় পরিপূর্ণ এবং তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০৪] এই মহান ভাববাদী পার্থিব্ স্বার্থের জন্য তার পরকালীন মুক্তি বিক্রয় করে দেন। তিনি মাত্র ৩০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০৫] সুসমাচার লেখক যোহন তাঁর সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে[২০৬] সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যীশুর প্রেরিত এই মহান ভাববাদী

---

২০৩. শমূয়েল ১৬/১৪। আরো দেখুন ১৯/৯।

২০৪. যীশু যিহূদা-সহ এই বারোজনকে মৃতকে জীবিত করাসহ সকল প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। "পরে তিনি আপনার বারো জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। ... পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করি, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও..."। মথি ১০/১-৮।

২০৫. মথি ২৬/১৪-১৬; ৪৭-৫০; ২৭/৩-৫।

চোর ছিলেন। তার নিকটে টাকার থলি থাকত আর তার মধ্যে যা রাখা হত সবই তিনি হরণ করতেন। ভাববাদী ও প্রেরিতগণ কি এরূপই চোর হন ? তাঁরা কি এভাবেই পার্থিব স্বার্থের জন্য পারলৌকিক মুক্তি বিক্রয় করে দেন ?

(৩১) খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশুর বারো জন প্রেরিত শিষ্যের মর্যাদা মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে বেশি। যে রাতে ইহূদীরা যীশুকে গ্রেফতার করল সে রাতে এই মহা-মর্যাদাবান প্রেরিতগণ যীশুকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছিলেন।[২০৭] এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে!

খৃস্টান পাদরিগণ হয়ত দাবি করবেন যে, তাঁদের কাপুরুষতা বা ভীরুতার (cowardice) কারণে তাঁরা এরূপ করেছিলেন। আর কাপুরুষতা, ভয় বা দুর্বলতা একটি প্রাকৃতিক ও জন্মগত বিষয়, এজন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না বা অপরাধী বলা যায় না। তাঁদের এই দাবি মেনে নিলেও প্রেরিতগণের অন্য একটি কর্মের জন্য কোন কৈফিয়ত বা ওজর পাওয়া যায় না। কর্মটি ছিল আরো সহজ। সেই রাতে যীশু অত্যন্ত দুঃখার্ত ও ব্যাকুল ছিলেন। তিনি শিষ্যদেরকে বলেন : আমার প্রাণ অত্যন্ত দুঃখার্ত[২০৮], তোমরা এখানে থাক এবং আমার সাথে জেগে থাক। পরে তিনি কিঞ্চিত অগ্রসর হয়ে উবুড় (সাজদা করে) প্রার্থনা করেন (সালাত আদায় করেন)। পরে তিনি শিষ্যদের নিকটে এসে দেখেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি পিতরকে বললেন, এ কি ? এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে তোমাদের শক্তি ছিল না ? জেগে থাক ও প্রার্থনা কর। এরপর তিনি দ্বিতীয় বার গিয়ে আবার প্রার্থনা করলেন। পরে তিনি আবার এসে দেখেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে গিয়ে আবার প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি শিষ্যদের নিকটে এসে বলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[২০৯]

যীশুর প্রতি যদি শিষ্যদের সামান্যতম ভালবাসাও থাকত তবে তারা কখনোই এরূপ করতে পারতেন না। পৃথিবীর সাধারণ পাপী মানুষদের দিতে তাকান। যদি তাদের কোন নেতা বা আপনজন অত্যন্ত দুঃখার্ত ও অস্থির থাকেন, অথবা অসুস্থ থাকেন তবে তারা সে রাতে ঘুমাতে পারেন না। জগতের সবচেয়ে পাপী মানুষটিও এরূপ অবস্থায় ঘুমাতে পারবে না।[২১০]

(৩২) যীশুর বারো প্রেরিত শিষ্যের একজন পিতর। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দাবি

২০৬. যোহন ১২/৪-৬।
২০৭. মথি ২৬/৫৬।
২০৮. আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে: মথি ২৬/৩৮।
২০৯. মথি ২৬/৩৬-৪৬।
২১০. বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একান্তই জাগতিক লোভে শিষ্যগণ যীশুর পিছে ঘুরত। যীশু তাদেরকে রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব ও বহুগুণ ধন-সম্পদ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই লোভেই তারা ঘুরত বলে তাদের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে বুঝা যায়।

অনুসারে যীশুর তিরোধানের পরে তিনিই ছিলেন যীশুর স্থলাভিষিক্ত ও খৃস্টান জাতির কর্ণধার। তিনি ছিলেন প্রেরিতগণের প্রধান। অন্য শিষ্যদের মতই তিনি যীশুকে দুঃখার্ত ও ব্যাকুল দেখেও শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং তাঁকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যান। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্যদের মতই ছিলেন। তবে (প্রেরিতগণের নেতা ও কর্ণধার হিসেবে) এক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত একটি কর্ম করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যখন যীশুকে গ্রেফতারকারীরা তাঁকে নিয়ে মহাযাজক কায়াফার কাছে যায় তখন পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছে মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গমন করেন এবং বাইরে প্রাঙ্গণে বসে থাকেন। তখন একজন দাসী তাঁর নিকটে এসে বলেন, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে যীশুর সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। এরপর অন্য একজন দাসী তাঁকে দেখে সেই স্থানের লোকজনকে বলে, এই ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করেন এবং শপথ করে বলেন যে, যীশুকে তিনি চিনেনই না। কিছুক্ষণ পরে যারা নিকটে দাঁড়িয়েছিল, তারা এসে পিতরকে বলে, সত্যই তুমিও তাদের একজন। তখন পিতর (যীশুকে) অভিশাপ দিতে শুরু করেন এবং শপথ করে বলতে থাকেন যে, তিনি তাঁকে চিনেনই না। তখনই মোরগ ডেকে ওঠে। তাতে পিতরের মনে পড়ে যে, যীশু তাকে বলেছিলেন, "মোরগ ডাকিবার পূর্বেই তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে।"[২১১] মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২১২]

পিতরের বিষয়ে যীশু আরো বলেছিলেন : "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।" মথিলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে এ কথা রয়েছে।[২১৩]

খৃস্টানদের পবিত্র পুরুষ সাধু পৌল গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ২য় অধ্যায়ে লিখেছেন : "১১ কিন্তু পিতর (কৈফা) যখন আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁহার প্রতিরোধ করিলাম, কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন। ১২ ফলতঃ যাকোবের নিকট হইতে কয়েক জনের আসিবার পূর্বে তিনি পরজাতীয়দের সহিত আহার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উহারা আসিলে পর তিনি ছিন্নত্বকদের ভয়ে পিছাইয়া পড়িতে ও আপনাকে পৃথক রাখিতে লাগিলেন। ১৩ আর তাঁহার সহিত অন্য সকল যিহূদীও কপট ব্যবহার করিল; এমন কি, বার্ণবাও তাঁহাদের কাপট্যের টানে আকর্ষিত হইলেন। ১৪ কিন্তু আমি যখন দেখিলাম, তাঁহারা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে চলেন না, তখন আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে (পিতরকে) কহিলাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের মত নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মত

২১১. মথি ২৬/৩৪।

২১২. মথি ২৬/৬৯-৭৫।

২১৩. মথি ১৬/২৩।

আচরণ কর, তবে কেন পরজাতিগণকে যিহূদীদের মত আচরণ করিতে বাধ্য করিতেছ?"

পিতর বা কৈফা কথায় প্রেরিতগণের আগে থাকতেন, কিন্তু অনেক সময় তিনি কী বলতেন তা নিজেই বুঝতেন না। লূকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত 'আছ-ছালাছ আশরাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবী সংকলন গ্রন্থের ২য় পুস্তিকার ৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "কারণ পূর্ববর্তী চার্চ-ফাদারদের একজন (স্বর্ণমুখি যোহন : ৩৪৫-৪০৭ খৃ[২১৪]) বলেছেন, তিনি (পিতর) অহংকার ও বিরোধিতার রোগে জঘন্যভাবে আক্রান্ত ছিলেন।"

এরপর ৬১ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন : "স্বর্ণমুখি যোহন বলেছেন, তার (পিতরের) জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল দুর্বল ও অসংলগ্ন। পিতরের সম্পর্কে সাধু অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খৃ)[২১৫] বলেছেন, তিনি অস্থির-চিত্ত ছিলেন। কারণ কখনো তিনি বিশ্বাস করতেন এবং কখনো সন্দেহ পোষণ করতেন। কখনো স্বীকার করতেন যে, খৃস্ট মরবেন না, আবার কখনো ভয় করতেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। খৃস্ট তার বিষয়ে কখনো বলেছেন : 'ধন্য তুমি', এবং কখনো তাকে বলেছেন : 'দূর হও, শয়তান।"

এই পিতরই খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে মোশি এবং অন্যান্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর থেকে উত্তম ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভাববাদী পিতরের যদি এই অবস্থা হয়, তবে অধিকতর কম মর্যাদাসম্পন্ন বাকি ভাববাদিগণের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!

(৩৩) ইহূদী মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas)[২১৬] একজন ভাববাদী (prophet) ছিলেন বলে সুসমাচার লেখক যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ৫১ আয়াতে এই কায়াফার বিষয়ে ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে

২১৪. "স্বর্ণমুখি যোহন" নামে পরিচিত যোহন ক্রিযসটম ৩৯৮-৪০৪ খৃস্টাব্দে কন্সট্যান্টিনোপলের প্রধান যাজক (Patriarch) ছিলেন।

২১৫. হিপ্পোর সেন্ট অগাস্টিন (Augustine, Saint/ ল্যাটিন : Augustinus) ৩৯৬ থেকে ৪৩০ পর্যন্ত হিপ্পোর বিশপ ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য অনুসারে সেন্ট পলের পরে খৃস্টীয় চার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্বের উপরে তিনি অনেক বইপুস্তক লিখেছেন।

২১৬. কায়াফা ২৭ থেকে ৩৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইহূদীদের মহাযাজক ও প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন। এই পদটি মূলত আমৃত্যু হতো। তবে রোমান শাসকগণ ইহূদীদের মহাযাজক নিয়োগে ও অপসারণে হস্তক্ষেপ করত। যীশুকে বন্দি করা হলে কায়াফার নেতৃত্বে ইহূদী যাজকগণ একবাক্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিচার করেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এজন্য যিরূশালেম ও যিহূদার রাজ্যের রোমান গভর্নর পীলাতের নিকট তাঁকে নিয়ে যান যেন তিনি তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে সম্মত হন। এই মহাযাজক কায়াফাই পরবর্তী কালে যীশু শিষ্য যোহন ও পিতরের বিচার করেছিলেন ও শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

প্রকাশিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে[২১৭] যোহন বলেছেন : "এই কথা যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন (prophesied) যে, জাতির জন্য যীশু মরিবেন।"

'ভাববাণী বলিলেন (prophesied)' কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বরের ভাববাদী (prophet) বা নবী ছিলেন। ঈশ্বরের এই ভাববাদী যীশুকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁকে হত্যা করার রায় প্রদান করেন।[২১৮] কায়াফা যদি এ সকল সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভাববাণী বা ঐশ্বরিক প্রেরণার ভিত্তিতে প্রদান করে থাকেন, তবে যীশুর ক্ষেত্রে তাঁর এ সকল সিদ্ধান্ত ঐশ্বরিক বলে গণ্য হবে এবং যীশু সত্যই মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী ও হত্যার যোগ্য ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে। না'উযু বিল্লাহ্! আর যদি কায়াফার এ সকল কর্ম ও সিদ্ধান্ত শয়তানের প্ররোচনায় ঘটে থাকে তবে এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে।

বাইবেলীয় ভাববাদীদের পাপাচার সম্পর্কে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমার বক্তব্য এই যে, এ সকল পাপ এবং অনুরূপ অন্যান্য পাপের কথা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অথচ এ সকল পাপের কারণে তাঁদের ভাববাদিগণের ভাববাদিত্ব নষ্ট হয় নি বা ভাববাদিত্বের মর্যাদার কোন ঘাটতি হয় নি। তাহলে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে সামান্য খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে তাঁদের লজ্জা করে না ?

সুপ্রিয় পাঠক!

উপরের বিষয়গুলি আপনি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে খৃস্টান পাদরিগণের আপত্তিগুলি উল্লেখ করে সেগুলি খণ্ডন করব।

প্রথম অভিযোগ : জিহাদ বিষয়ক

খৃস্টান পাদরিদের মতে, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে এটিই সবচেয়ে বড় অভিযোগ, আপত্তি ও নিন্দনীয় বিষয়। তাঁরা তাদের পুস্তিকাগুলিতে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা লিখেন। এ সকল কথাবার্তার উৎস অযৌক্তিক গোয়ার্তুমি ছাড়া কিছুই নয়। আমি এই অভিযোগের উত্তর প্রদানের পূর্বে ভূমিকা হিসেবে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করব।

প্রথম বিষয় : অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি

---

২১৭. অনুবাদে বাংলা বাইবেলের ভাষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

২১৮. মথি ২৬/৫৭-৬৮; মার্ক ১৪/৫৩-৬৫; লূক ২২/৫৪-৭১; যোহন ১৮/১২-২৪।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ কুফরী বা অবিশ্বাস ঘৃণা করেন এবং একথা সুনিশ্চিত যে, তিনি পরকালে কাফির বা অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এছাড়া তিনি অবাধ্যতা ও পাপ ঘৃণা করেন। তিনি কখনো কখনো অবিশ্বাসী ও পাপীদেরকে পৃথিবীতেও শাস্তি প্রদান করেন। বিভিন্নভাবে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন।

কখনো তিনি ঢালাওভাবে সবাইকে ডুবিয়ে মেরে অবশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। নোহের সময়ে তিনি এরূপ করেছিলেন। তিনি জলপ্লাবনের মাধ্যমে 'ভূচর যাবতীয় প্রাণী-পক্ষী, গৃহপালিত ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল হত্যা করেন। স্থলচর যত প্রাণীর নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলকে হত্যা করেন। এইরূপে ভূমণ্ডল-নিবাসী সমস্ত প্রাণী–মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষী সকল পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন করেন, কেবল নোহ ও তাঁহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচলেন।'[২১৯]

কখনো তিনি বিশেষভাবে অবিশ্বাসীদেরকে ডুবিয়ে মেরে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মোশির ফরৌণ এবং তার সেনাবাহিনীকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন।[২২০]

কখনো তিনি হঠাৎ করে ধবংস ও হত্যা করেন। যেমন যে রাতে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর ত্যাগ করেছিল সেই রাতের মধ্যভাগে হঠাৎ করে 'সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন।'[২২১]

কখনো তিনি গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে এবং ভূমি উৎপাটন করে অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেন। লোটের সময়ে এরূপ ঘটেছে। সদাপ্রভু তখন সদোমের ও ঘমোরার সমুদয় নগর ও সমস্ত অঞ্চল-নিবাসী সকল মানুষকে গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত কিছু উৎপাটন করে শাস্তি প্রদান করেন।[২২২]

কখনো তিনি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। যেমন (দায়ূদের যুগে) সদাপ্রভু অস্‌দোদীয়দেরকে স্ফোটিক দ্বারা আঘাত করেন এবং সংহার করেন।[২২৩]

কখনো তিনি ফিরিশতা বা দূত প্রেরণ করে অবিশ্বাসী বা কাফিরদেরকে হত্যা ও

২১৯. আদিপুস্তক ৭/১০-২৪।

২২০. যাত্রা পুস্তক ১৪/২১-৩১।

২২১. যাত্রা পুস্ত ১২/২৯-৩৩।

২২২. আদিপুস্তক ১৯/২৩-২৯।

২২৩. ১ শমূয়েল ৫/৬-১২।

ধ্বংস করেন। অশূরীয়দের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করেছিলেন। তিনি একজন দূত (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন, তিনি অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র লোককে বধ করেন। ২ রাজাবলির ১৯ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৪]

কখনো তিনি ভাববাদিগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত জিহাদের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় পাঠক তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন।

অনুরূপভাবে তিনি পাপী ও অবাধ্যদেরকেও শাস্তি প্রদান করেন। কখনো তিনি ভূমিধ্বস ও অগ্নি দ্বারা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন তিনি কোরহ (কারূন), দাথন, অবীরাম ও অন্যান্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তারা যখন মোশির বিরুদ্ধাচরণ করল তখন 'তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল, আর পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া কোরহ, দাথন ও অবিরামকে, তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল। ...আর সদাপ্রভু হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া যাহারা ধূপ নিবেদন করিয়াছিল, সেই দুই শত পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করিল।' গণনা পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[২২৫]

কখনো তিনি এরূপ অবাধ্য ও পাপীদেরকে মহামারী ইত্যাদির মাধ্যমে হঠাৎ ধ্বংস করে শাস্তি প্রদান করেন। কোরহ ও তার সাথীদের ধ্বংসের পরদিন যখন ইস্রায়েলীয়গণ হারোণের সাথে বচসা করে তখন সদাপ্রভু এরূপ হঠাৎ মহামারী-রূপ শাস্তি দিয়ে ইস্রায়েলীদের মধ্য থেকে চৌদ্দ হাজার সাত শত লোক ধ্বংস করেন। যদি এ সময়ে হারোণ মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে না দাঁড়াতেন এবং ইস্রায়েলীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তবে সেদিন সদাপ্রভুর ক্রোধে ইস্রায়েলীয়গণ সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। গণনা পুস্তকের উপরের অধ্যায়েই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[২২৬]

অনুরূপভাবে বৈৎ-শেমসের লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করায় তিনি হঠাৎ আঘাত করে ৫০ হাজার ৭০ জনকে হত্যা করেন। ১ শমূয়েলের ৬ অধ্যায়ে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[২২৭]

কখনো তিনি বিষধর সর্পের দ্বারা অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। যেমন অন্য একবার ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির অবাধ্যতা করলে সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করেন, তারা লোকদের দংশন করলে ইস্রায়েলীয়দের অনেক লোক মারা পড়ে। গণনা পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৮]

কখনো তিনি দূত (ফিরিশতা) প্রেরণ করে অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করেন, যেমন

---

২২৪. ২ রাজাবলি ১৯/৩৫।

২২৫. গণনা পুস্তক ১৬/২০-৩৫।

২২৬. গণনা পুস্তক ১৬/৪১-৫০।

২২৭. ১ শমূয়েল ৬/১৯।

২২৮. গণনা পুস্তক ২১/৬-৯।

ঘটেছিল দায়ূদের সময়ে। দায়ূদ ইস্রায়েল-সন্তানদের গণনা করলে সদাপ্রভু ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর এই মহাপাপের শাস্তি হিসেবে দূত প্রেরণ করে মহামারীর মাধ্যম ৭০ হাজার মানুষ ধ্বংস করেন। ২ শমূয়েলের ২৪ অধ্যায়ে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।২২৯

কখনো কখনো তিনি অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদেরকে পৃথিবীতে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করেন না। পাঠক জেনেছেন যে, খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশুর প্রেরিতগণ মোশি ও অন্যান্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং তাঁরা ঈশ্বরের সিন্দুকের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে প্রেরিতের হত্যাকারিগণ খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে নোহ, লোট ও মোশির যুগের কাফির বা অবিশ্বাসীদের চেয়েও খারাপ। প্রসিদ্ধ অত্যাচারী অবিশ্বাসী পৌত্তলিক রোমান সম্রাট নিরো (রাজত্ব : ৫৪-৬৮ খৃ) যীশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর, তাঁর স্ত্রী, পৌল ও আরো অনেক খৃস্টানকে কঠিনতম শাস্তি দিয়ে হত্যা করেন। অনুরূপভাবে অবিশ্বাসীরা প্রেরিতদের এবং তাঁদের অনুসারীদের অনেককে হত্যা করে। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করেন নি। তিনি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে, গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে, ভূমি উল্টিয়ে, প্রথমজাত সন্তানদের হত্যা করে, রোগ-ব্যাধি দিয়ে, দূত প্রেরণ করে, সর্প প্রেরণ করে বা অন্য কোনভাবে কোন শাস্তি প্রদান করেন নি।

দ্বিতীয় বিষয় : অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ভাববাদিগণের যুদ্ধ-জিহাদ

পূর্ববর্তী ভাববাদিগণ অবিশ্বাসী, বিধর্মী বা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের হত্যা করেছেন, তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে বন্দি করেছেন এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থার একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল ভাববাদীর এবং সকল ব্যবস্থার বিধান। বাইবেলের পুরাতন এবং নতুন নিয়ম পাঠ করলেই তা পাঠক জানতে পারবেন। এ বিষয়ে বাইবেলে অগণিত প্রমাণ রয়েছে। আমি এখানে অল্প কিছু প্রমাণ উল্লেখ করছি।

(১) দ্বিতীয় বিবরণের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১০ যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। ১১ তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে ও তোমার দাস হইবে। ১২ কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। ১৩ পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গধারে আঘাত করিবে, ১৪ কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার

২২৯. ২ শমূয়েল ২৪/১-১৫।

জন্য লুট-স্বরূপ গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে। ১৫ এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা হইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করিবে। ১৬ কিন্তু এই জাতিদের যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত রাখিবে না; ১৭ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তাহাদিগকে হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে।"

উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় এই ছয়টি জাতির ক্ষেত্রে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, এদের মধ্যকার নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকল শ্বাসবিশিষ্ট প্রাণীকে খড়গাঘাতে হত্যা করতে হবে। অন্যান্য সকল জাতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, তাদেরকে প্রথমে সন্ধির জন্য আহ্বান করতে হবে। যদি তারা সন্ধি করতে, অধীনতা স্বীকার করতে এবং কর প্রদান করতে রাজি হয় তবে ভাল। আর যদি তারা সন্ধি করতে রাজি না হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে বিজিত জাতির সকল পুরুষকে খড়গাঘাতে হত্যা করতে হবে, তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে ক্রীতদাসরূপে বন্দি করতে হবে এবং তাদের পশুসম্পদ ও অন্যান্য সকল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে হবে। বন্দিকৃত ও লুণ্ঠিত নারী, শিশু ও সম্পদ সদাপ্রভুর দত্ত লুট হিসেব মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, যা তারা ভোগ করবে। ইস্রায়েলীয়দের দেশ থেকে দূরবর্তী সকল জনপদের ক্ষেত্রে এরূপ করতে হবে।

খৃস্টান পাদরিগণ ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে যা কিছু ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালান সবকিছুর খণ্ডনে বাইবেলের এই একটি বক্তব্যই যথেষ্ট। অতীতে ও বর্তমানে মুসলিম পণ্ডিতগণ খৃস্টানদের অপপ্রচারের প্রত্যুত্তরে বাইবেলের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু পাদরিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। মনে হয় তারা প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে এ উদ্ধৃতিটি দেখতেই পান নি। তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন না। এ বক্তব্যকে স্বীকারও করেন না বা এর ব্যাখ্যাও দেন না।[২৩০]

(২) যাত্রা পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৩ কেননা আমার দূত তোমার অগ্রে

২৩০. খৃস্টানদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ অ-খৃস্টান বা সাধারণ খৃস্টানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কোন কোন পাদরি বুঝান যে, জিহাদের এ বিধান ও অনুরূপ বিধানাদি পুরাতন নিয়মের বিধান, যা ইহূদীদের জন্য, খৃস্টানদের জন্য নয়, যীশু এরূপ বিধান দেন নি। প্রকারান্তে তারা বুঝাতে চান যে, পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি যীশুর মাধ্যমে পরিবর্তিত ও রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এ কথা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁরা অসুবিধা দেখলে পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত বলে বুঝাতে চান এবং সুবিধা দেখলে পুরাতন নিয়মের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। মূলত খৃস্টান ধর্মতত্ত্বে রহিতকরণ বলে কিছু নেই। তাদের বিশ্বাস অনুসারে পুরাতন নিয়মের সকল নির্দেশ ও বিধানই খৃস্টানদের জন্য প্রযোজ্য ও ঐশ্বরিক নির্দেশ হিসেবে মান্য। যীশু নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পুরাতন নিয়মকে রহিত করতে বা পরিবর্তিত করতে আগমন করেন নি, বরং তা পালন ও পূর্ণ করতে আগমন করেছেন।

অগ্রে যাইবেন, এবং ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন; আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও।"

(৩) যাত্রা পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে উপর্যুক্ত ছয় জাতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "১২ সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশনিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্তী ফাঁদস্বরূপ হয়। ১৩ কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।"

(৪) গণনা পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : "৫১ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন যর্দন পার হইয়া কনান দেশে উপস্থিত হইবে, ৫২ তখন তোমাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসী সকলকে নির্মূল[২৩১] করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবে, ও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবে। ... ৫৫ কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসীদিগকে নির্মূল (অধিকারচ্যুত) না কর, তবে যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে তাহারা তোমাদের চক্ষে কণ্টক ও তোমাদর কক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে। ৫৬ আর আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।"

(৫) দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে লইয়া যাইবেন, ও তোমার সম্মুখ হইতে অনেক জাতিকে, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান (greater and mighter than thou) এই সাত জাতিকে দূর করিবেন; ২ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন, এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না। ... ৫ কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে; তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরা-মূর্তি সকল ছেদন করিবে, এবং তাহাদের ক্ষোদিত প্রতিমা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।"

---

২৩১. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠে এখানে 'নির্মূল' বা 'সমূলে বিনষ্ট' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে 'অধিকারচ্যুত' বলা হয়েছে।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এই সাত জাতির ক্ষেত্রে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে এদের সকল শ্বাস-বিশিষ্ট প্রাণীকে হত্যা করতে হবে, তাদের প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শন করা যাবে না, তাদের সাথে কোন সন্ধি বা শান্তিচুক্তি করা যাবে না, তাদের যজ্ঞবেদি বা ধর্মীয় উপাসনাগুলি বিনষ্ট করতে হবে, তাদের প্রতিমা বা স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলতে হবে, তাদের ক্ষোদিত প্রতিমা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের উচ্চস্থলীগুলি উচ্ছিন্ন করতে হবে। সর্বোপরি এই নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে ঈশ্বরের আগ্রহ এত বেশি যে, তিনি এ বিষয়ে কোনরূপ ঢিলেমি করার ব্যাপারে কঠিনভাবে সতর্ক করে বলেছেন যে, তোমরা যদি এভাবে তাদেরকে নির্মূল না কর তবে 'আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।'

এই সাত জাতির বিষয়ে বাইবেলে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে তারা "তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান (greater and mighter than thou)", অর্থাৎ এই সাত জাতি জনসংখ্যা ও শক্তিতে ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে বেশি ছিল। গণনা পুস্তকের ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণের দ্বাদশ বংশের মধ্যে লেবীয় বংশ বাদ দিয়ে অন্য একাদশ বংশের ২০ বছরের অধিক বয়স হয়েছে যুদ্ধ করতে সক্ষম এরূপ পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬,০৩,৫৫০ (ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) জন। লেবীয়দের নারী-পুরুষ কাউকেই এই গণনার মধ্যে ধরা হয় নি। এছাড়া অন্য একাদশ বংশের নারিগণকে এই গণনায় ধরা হয় নি। অনুরূপভাবে এই একাদশ বংশের ২০ বছর কম বয়সের শিশু, কিশোর ও যুবকদেরকে এই গণনায় ধরা হয়নি।[২৩২] এখন আমরা যদি গণনা থেকে বাদ দেওয়াদের ধরে হিসাব করি, অর্থাৎ লেবীয় বংশের সকল নারী-পুরুষ, অন্যান্য বংশের সকল নারী ও ২০ বছরের কম বয়স্ক পুরুষদের ধরে ইস্রায়েলীদের জনসংখ্যা নির্ধারণ করি, তবে তা কোন অবস্থাতেই আড়াই মিলিয়নের, অর্থাৎ ২৫ লক্ষের কম হবে না। আর এই সাত জাতির মানুষেরা যেহেতু জনসংখ্যায় ইস্রায়েলীদের চেয়ে অধিক ছিল, সেহেতু তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি ছিল বলে আমরা বুঝতে পারি।

পাদরি ড. কিথ ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির বিষয়বস্তু বাইবেলে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলির সত্যতা প্রমাণ করা। অন্য একজন পাদরি মি. মিররিক এই পুস্তকটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ফার্সী অনুবাদের নাম রাখেন 'কাশফুল আছার ফী কাসাসি আনবিয়াই বানী ইসরাঈল' (ইস্রায়েল-সন্তানদের নবীগণের কাহিনী বর্ণনা)। এই অনুবাদটি ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে, মোতাবেক ১২৬২ হিজরীতে এডিনবার্গে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় বলা

---

২৩২. গণনা পুস্তক ১/৪৫-৪৯।

হয়েছে : "প্রাচীন পুস্তকাদি থেকে জানা যায় যে, ইহূদীদের দেশগুলিতে তাদের অনুপ্রবেশ বা আগমনের ৫৫০ বছর পূর্বে ৮ কোটি (অর্থাৎ ৮০ মিলিয়ন) মানুষ বাস করত।"

অর্থাৎ মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের মিসর ত্যাগের সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্বেই ফিলিস্তিনের এ সকল অঞ্চলে ৮ কোটি মানুষ বসবাস করত। তাহলে সাড়ে পাঁচশত বছর পরে যখন মোশি মিসর ছেড়ে আসলেন তখন তাদের সংখ্যা ৮ কোটি বা তার বেশি ছিল। সদাপ্রভু ঈশ্বর আট কোটি বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে নির্মূল করার নির্দেশ দিলেন।

(৬) যাত্রা পুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ২০ আয়াত নিম্নরূপ : "যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, তাকে হত্যা করতে হবে।"[২৩৩]

(৭) দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক জানতে পারবেন যে, যদি কেউ সদাপ্রভু ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা, উপাসনা বা সেবা করার প্ররোচনা দেয় তবে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। এমনকি কোন অলৌকিক চিহ্ন-বিশিষ্ট ও অলৌকিক ক্ষমতাধারী ভাববাদীও যদি এরূপ কোন দেবতার সেবা করতে প্ররোচিত করে তাকেও এভাবে হত্যা করতে হবে। আর যদি কেউ মূর্তি বা প্রতিমা পূজার দিকে আহ্বান করে বা প্ররোচনা দেয় তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। যদি কোন আত্মীয়, বন্ধু বা আপনজনও এরূপ প্ররোচনা দেয় তবে তাকেও এভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। কোন গ্রাম বা জনপদবাসী যদি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা বা সেবা করে তবে সেই জনপদের সকল মানুষকে এবং তাদের সকল পশুকে খড়গাঘাতে হত্যা করতে হবে। এরপর সেই গ্রাম বা জনপদকে তার সকল সম্পদ, ঘরবাড়ি ও গাছপালাসহ আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। এই অগ্নিদগ্ধ গ্রামকে একটি পতিত টিলা হিসেবে ফেলে রাখতে হবে, পুনরায় তা আর আবাদ করা বা পুনর্নির্মাণ করা যাবে না।[২৩৪]

---

২৩৩. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলের ভাষ্য : "সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।" ইংরেজি : he shall be utterly destroyed.

২৩৪. ১ তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিংবা স্বপ্নদর্শক উঠিয়া যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন কিংবা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে; ২ এবং সেই চিহ্ন কিংবা অদ্ভুত লক্ষণ সফল হয়, যাহার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হই ও তাহাদের সেবা করি তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিংবা সেই স্বপ্নদর্শকের বাক্যে কর্ণপাত করিও না; ...আর সেই ভাববাদীর কিংবা সেই স্বপ্নদর্শকের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে ...তোমার ভ্রাতা, তোমার সহোদর কিংবা তোমার পুত্র কি কন্যা কিংবা তোমার বক্ষের স্ত্রী কিংবা তোমার প্রাণতুল্য মিত্র যদি গোপনে তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি ...তবে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হইও না, তাহার কথায়

(৮) দ্বিতীয় বিবরণের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২ তোমার মধ্যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোন নগরের দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছে; ৩ গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করিয়াছে, ও আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহাদের নিকটে অথবা সূর্যের বা চন্দ্রের কিংবা আকাশবাহিনীর কাহারও নিকটে প্রণিপাত করিয়াছে; ৪ আর তোমাকে বলা হইয়াছে ও তুমি শুনিয়াছ, তবে যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, যদি ইহা সত্য ও নিশ্চিত হয় যে, ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ ঘৃণার্হ কার্য হইয়াছে, ৫ তবে তুমি সেই দুষ্কর্মকারী পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আপন নগর-দ্বারের সমীপে আনিবে; পুরুষ বা স্ত্রীলোক হউক, তুমি প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবে।"

(৯) যাত্রা পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "২১ আর আমি মিসরীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না; ২২ কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিংবা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূপে তোমরা মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।"

এরপর এই পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে ঈশ্বর মোশিকে বলেন : "২ তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যলংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। ৩ আর সদাপ্রভু মিসরীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন।"

এরপর এই পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩৫ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির কথা অনুসারে কার্য করিল; ফলে তাহারা মিসরীয়দের কাছে রৌপ্যালংকার,

---

কর্ণপাত করিও না; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া করিবে না, তাহাকে কৃপা করিবে না, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে না। ৯ কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে; তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে তুমিই তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। ১০ তুমি তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবে, যেন সে মরিয়া যায় ... তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে যে নিবাস-নগর দিবেন, তাহার কোন নগর সম্বন্ধে যদি শুনিতে পাও যে, কতকগুলি পাষণ্ড তোমার মধ্য হইতে নির্গত হইয়া এই কথা বলিয়া আপন নগরবাসীদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি তবে তুমি খড়্গধারে সেই নগরের নিবাসীদিগকে আঘাত করিবে, এবং নগর ও তাহার মধ্যস্থিত পশুসুদ্ধ সকলই খড়্গধারে নিঃশেষ বিনাশ করিবে; ১৬ আর তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল তাহার চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই সকল দ্রব্য সর্বতোভাবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; তাহাতে সেই নগর চিরকালীন ঢিবি হইয়া থাকিবে, তাহা পুনর্বার নির্মিত হইবে না।" গণনা পুস্তক ১৩/১-১৬।

স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল। ৩৬ আর সদাপ্রভু মিসরীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিসরীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিসরীয়দের ধন হরণ করিল।"

পাঠক ইতোপূর্বে দেখেছেন যে, ইস্রায়েলীদের জনসংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। এই বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ সকলেই এভাবে মিসরীয়দের নিকট থেকে অপরিমেয় স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র ধার হিসেবে গ্রহণ করল। প্রথমে ঈশ্বর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করবে। এরপর সংবাদ দিলেন যে, তারা বাস্তবিকই মিসরীয়দের ধন হরণ করল। কিন্তু এই হরণ-প্রক্রিয়াটি ছিল সুস্পষ্টত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে। ঈশ্বর তাদেরকে এরূপ অবৈধ প্রক্রিয়ায় মিসরীয়দের দ্রব্য হরণ করার অনুমতি প্রদান করলেন।

(১০) যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে প্রতিমাপূজা বা গোবৎস পূজায় লিপ্ত ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে বলা হয়েছে : "২৫ পরে মোশি দেখিলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, কেননা হারোণ শত্রুদের মধ্যে বিদ্রূপের জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছিলেন। ২৬ তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর পক্ষে কে? সে আমার নিকটে আইসুক। তাহাতে লেবির সন্তানেরা সকলে তাঁহার নিকটে একত্র হইল। ২৭ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন উরুতে খড়গ বাঁধ ও শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রতিজন আপন আপন ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসীকে বধ কর। ২৮ তাহাতে লেবির সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিল, আর সেই দিন লোকদের মধ্যে কমপক্ষে তেইশ সহস্র লোক মারা পড়িল।"

এভাবে মোশি গোবৎস পূজা করার কারণে ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৩১, ১৮৪৪ ও ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে আমি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করেছি, যেখানে নিহতদের সংখ্যা 'তেইশ সহস্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য অনেক সংস্করণে তেইশের পরিবর্তে 'তিন সহস্র' বলা হয়েছে।

(১১) গণনা পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ যখন মোয়াবের কন্যাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করে তখন মোশি তাদের মধ্য থেকে ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) মানুষকে হত্যা করেন।[২৩৫]

(১২) গণনা পুস্তকের ৩১ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক নিম্নের কাহিনীটি জানতে পারবেন। মোশি ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহসের নেতৃত্বে মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে

২৩৫, গণনা পুস্তকে ২৫/১-১০।

যুদ্ধ করার জন্য বার হাজার মানুষের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে, মিদিয়নের পাঁচ জন রাজাকে বধ করে, বিলিয়মকেও খড়গ দ্বারা বধ করে এবং মিদিয়নের সমস্ত পুরুষকে বধ করে। 'তাঁরা মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নেয় এবং তাদের সমস্ত নিবাস-নগর ও সমস্ত ছাউনি পুড়িয়ে দেয়।' যখন তারা মোশির নিকট ফিরে যায় তখন মোশি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমরা কেন সমস্ত স্ত্রীলোককে জীবিত রেখেছ ? এরপর তিনি নির্দেশ দেন, 'তোমরা এখন বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।' তাঁর নির্দেশানুসারে এভাবে শিশু, কিশোর ও বালকদেরকে এবং 'পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত' নারীদেরকে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও ধৃত মানুষ ও জীবগণের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : মেষ : ৬,৭৫০০০, গরু : ৭২,০০০, গাধা : ৬১,০০০ এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নি এমন কুমারী বালিকাদের সংখ্যা ৩২,০০০। ধৃত মানুষ ও জীবগণ ছাড়া যে সব সম্পদ মুজাহিদগণ লুণ্ঠন করেছিলেন সেগুলি লুণ্ঠনকারীদের মালিকানায় চলে যায়। এরূপ লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসাব বাইবেলে প্রদান করা হয় নি। তবে সেনাবাহিনীর শতপতি ও সহস্রপতি নেতাগণ (the captains of thousand and the captains of hundreds) তাদের লুণ্ঠিত সম্পদের সামান্য কিছু অংশ মোশি ও ইলিয়াসর যাজককে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। মোশি ও ইলিয়াসরকে দেওয়া তাদের এই হাদিয়ার পরিমাণ ছিল ষোল হাজার সাত শত পঞ্চাশ শেকল।

সর্বাবস্থায় আমরা দেখলাম যে, ইস্রায়েলীয়গণ সকল বয়স্ক পুরুষ, শিশু এবং 'শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত' মহিলা ও বালিকাকে হত্যা করে কেবল কুমারী বালিকাদেরকে জীবিত রাখে এবং এরূপ কুমারীদের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার। তাহলে নিহত পুরুষ, বালক, শিশু ও নারীর সংখ্যা কত হতে পারে ?

(১৩) তোরাহ-এর ঈশ্বর যুদ্ধের নামে যে নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছেন মোশির মৃত্যুর পরে যিহোশূয় সে বিধান অনুসারে কাজ করতে থাকেন এবং এ সকল বিধান পালনের জন্য তিনি লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করেন। যে কোন পাঠক একটু কষ্ট করে যিহোশূয়ের পুস্তকের ১ম অধ্যায় থেকে ১১ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করলেই বিষয়টি জানতে পারবেন। যিহোশূয় নিজেই তাঁর পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মোট ৩১ জন বিধর্মী রাজাকে হত্যা করেছেন এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ তাদের রাজ্য দখল করেছে।

(১৪) বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৫ অধ্যায়ে ভাববাদী ও বিচারক শিমশোন সম্পর্কে বলা হয়েছে : "পরে তিনি একটি গর্দভের কাঁচা হন্য (new jawbone) দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্বক তাহা লইয়া তদ্বারা সহস্র লোককে আঘাত (হত্যা) করিলেন (slew a thousand men)।"

(১৫) ১ শমূয়েলের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৮ ঐ সময়ে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা গিয গশূরীয়, গির্ষীয় ও অমালেকীয়দিগকে আক্রমণ করিতেন, কেননা শূরের সন্নিকট ও মিসর পর্যন্ত যে দেশ, তথায় পুরাকাল হইতে সেই জাতিরা বাস করিত। ৯ আর দায়ূদ সেই দেশগুলি ধ্বংস করিতেন[২৩৬], পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিতেন না; মেষ, গরু, গর্দভ, উষ্ট্র ও বস্ত্র লুণ্ঠন করিতেন, পরে আখীশের নিকটে ফিরিয়া আসিতেন।"

এখানে দেখুন, দায়ূদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করুন। তিনি কিভাবে জনপদগুলি ধ্বংস করতেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গশূরীয়, গির্ষীয় ও অমালেকীয়দের সকল মানুষ হত্যা করতেন এবং তাদের মাল-সম্পদ লুণ্ঠন করতেন।

(১৬) ২ শমূয়েলের ৮ অধ্যায়ে দায়ূদের বিষয়ে বলা হয়েছে : "২ আর তিনি মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিয়া রজ্জুতে মাপিলেন, ভূমিতে শয়ন করাইয়া বধ করণার্থে দুই রজ্জু এবং জীবিত রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ এক রজ্জু দিয়া মাপিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। ৩ আর ... সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর ... দায়ূদ তাঁহাকে আঘাত করেন। ৪ দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে সতের শত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন ... ৫ পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আসিলে দায়ূদ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র জনকে হত্যা (slew)[২৩৭] করিলেন।

এখানে দায়ূদের কর্মকাণ্ড দেখুন! তিনি কিভাবে মোয়াবীয়দের, হদদেষর ও সৈন্যদের এবং অরামীয়দের হত্যা করলেন!

(১৭) ২ শমূয়েলের ১০ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত নিম্নরূপ : "আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবককেও আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি সেই স্থানে মারা পড়িলেন।"

(১৮) ২ শমূয়েলের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৯ তখন দায়ূদ সমস্ত লোককে একত্র করিলেন, ও রব্বাতে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন।

২৩৬. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলের আরবী পাঠ। ইংরেজিতে David smote the land : বাংলা বাইবেলে : 'দায়ূদ সেই দেশবাসীদিগকে আঘাত করিতেন ...।

২৩৭. বাংলা বাইবেলে : আঘাত করিলেন।

৩০ আর তিনি তথাকার রাজার মস্তক হইতে তাঁহার মুকুট লইলেন; তাহাতে এক তালন্ত পরিমাণ স্বর্ণ ও মণি ছিল; আর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল; এবং তিনি ঐ নগর হইতে অতি প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিলেন। ৩১ আর দায়ূদ তথাকার লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের দ্বারা কাটিলেন, লৌহের মইর দ্বারা দলিত করিলেন, ছুরি দ্বারা কাটিলেন এবং ইটের পাঁজার মধ্যে গমন করাইলেন।[২৩৮] তিনি অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন। পরে দায়ূদ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।"

আমি ১৮৩১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী বাইবেল থেকে উপরের বক্তব্যটি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করেছি।[২৩৯] তাহলে দেখুন কিরূপ বর্বরতার সাথে অম্মোন-সন্তানদেরকে হত্যা করলেন! কী ভয়ানকভাবে কষ্ট দিয়ে তিনি তাদের হত্যা করলেন! এর চেয়ে বর্বরতর আর কি কিছু হতে পারে ?

(১৯) ১ রাজাবলি ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা নিজেদেরকে বাল দেবতার ভাববাদী বলে দাবি করতেন এরূপ ২৫০ ব্যক্তিকে এলিয় ভাববাদী জবাই করেন।[২৪০]

(২০) চারজন রাজা একত্রে সদোম ও ঘমোরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তারা সদোম ও ঘমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া প্রস্থান করেন। বিশেষত তারা অব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে ও তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে যান। এ সংবাদ অব্রাহামের নিকট পৌছালে তিনি লোটকে মুক্ত করার জন্য বের হন। এই ঘটনার বিবরণে আদিপুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৪ অব্রাম যখন শুনিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ধৃত হইয়াছেন, তখন তিনি আপন গৃহজাত তিন শত আঠার জন যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসকে লইয়া দান পর্যন্ত ধাবমান হইয়া গেলেন। ১৫ পরে রাত্রিকালে আপন দাসদিগকে দুই দল করিয়া তিনি শত্রুগণকে আঘাত করিলেন, এবং দম্মেশকের উত্তরে স্থিত হোবা পর্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। এবং সকল সম্পদ, আর আপন জ্ঞাতি লোট ও তাঁহার সমস্ত সম্পদ এবং স্ত্রীলোকদিগকে ও লোক সকলকে ফিরাইয়া আনিলেন। ১৭

---

২৩৮. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ : বাংলা বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে : করাতের, লৌহের মইর ও লৌহের কুড়ালির মুখে রাখিলেন, এবং ইটের পাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাইলেন।

২৩৯. পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অনুবাদে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, যেন এই অমানবিক ও বর্বর হত্যাকাণ্ড স্পষ্ট না হয়।

২৪০. ১ রাজাবলি ১৮/১৭-৪০। এখানে লক্ষণীয় যে, কোন যুদ্ধের ময়দানে বা যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে এদের হত্যা করা হয় নি। একান্তই প্রবঞ্চনার মাধ্যমে এদেরকে হস্তগত করে হত্যা করা হয়।

অব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণকে হত্যা[২৪১] করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন করিলেন।"

(২১) ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায়ে পৌল বলেন : "৩২ আর অধিক কি বলিব ? গিদিয়োন, বারক, শিমশোন, যিপ্তহ এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে সময়ের অকুলান হইবে। ৩৩ বিশ্বাস দ্বারা ইহারা নানা রাজ্য পরাজিত করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বদ্ধ করিলেন, ৩৪ অগ্নির তেজ নির্বাপিত করিলেন, খড়্গের মুখ এড়াইলেন, দুর্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্য জাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন।"

ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠাতা ও খৃস্টানদের পবিত্রপুরুষ সাধু পৌলের বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সকল রাজা ও ভাববাদী যে সকল যুদ্ধ করেছেন, হত্যা করেছেন, যুদ্ধ ও হত্যার মাধ্যমে নানা রাজ্য পরাজিত করেছেন, অগ্নির তেজ নির্বাপিত করেছেন, প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, যুদ্ধে বিক্রম দেখিয়ে অন্যজাতীয়দের সৈন্যবাহিনী তাড়িয়ে দিয়েছেন, সবকিছুই পুণ্যকর্ম বলে গণ্য এবং কোন কিছুই পাপ নয়। এগুলি সবই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও শক্তির কারণে এবং ঈশ্বরের করুণা লাভের কারণে ঘটেছিল, হৃদয়ের কাঠিন্যের কারণে বা জুলুমের কারণে ঘটেনি। যদিও আমরা দেখি যে, এদের এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বর্বরতা, জুলুম, অকারণ গণহত্যা, শিশু ও নারী হত্যার মত অমানবিক কর্ম রয়েছে।

দায়ূদ তাঁর এ সকল যুদ্ধ-জিহাদকে নিজের পুণ্যকর্মের অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। গীতসংহিতার ১৮ গীতে তিনি বলেন : "২০ সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতানুযায়ী পুরস্কার দিলেন, আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন। ২১ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি, দুষ্টতাপূর্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই। ২২ কারণ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল, আমি তাঁহার বিধি আমার হইতে দূর করি নাই। ২৩ আর আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ ছিলাম, নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। ২৪ তাই সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতা অনুসারে ফল দিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে আমার হস্তের শুচিতানুসারে দিলেন।"

ঈশ্বর নিজেই দায়ূদের এ সকল জিহাদ-যুদ্ধ ও অন্যান্য সকল কর্ম পুণ্যকর্ম হিসেবে গৃহীত বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ১ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে ঈশ্বর

---

২৪১. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। ইংরেজিতে (KJV) slaughter বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে জয় লেখা হয়েছে।

বলেছেন : "আমার দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিবার জন্য সর্বান্তকরণে আমার অনুগামী ছিল।"

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা এবং অন্যান্য প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি ও পণ্ডিত বলেন যে, দায়ূদের জিহাদ ও যুদ্ধ ছিল তাঁর রাজত্বের জন্য।[২৪২] তাঁদের এই বক্তব্য তাদের অধার্মিকতা ও মিথ্যাচার প্রমাণ করে। কোন রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য বা সম্প্রসারণের জন্য নারী ও শিশুদের হত্যা করা বা নির্বিচারে একটি দেশের সকল মানুষ হত্যা করা জরুরী নয়।

তবে এ বিষয়টি আমাদের বিবেচ্য নয়। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা হয় যে, দায়ূদ রাজত্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, রাজত্বের জন্য এ সকল যুদ্ধ কি ঈশ্বরের মনোনীত (chosen), ঈশ্বরের মাসীহ বা খৃষ্ট (The Anointed), ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের প্রথমজাত (firstborn) পুত্র দায়ূদের[২৪৩] জন্য বৈধ ও ঈশ্বর অনুমোদিত ছিল ? এগুলি অবৈধ ছিল ও ঈশ্বরের নিকট অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত ছিল ? এখানে তৃতীয় কোন বিকল্প নেই।

যদি প্রথম বিকল্প সঠিক হয়, অর্থাৎ রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করা ও হত্যা করা বৈধ ও ঈশ্বর অনুমোদিত বলে তাঁরা স্বীকার করে নেন তবে তাতে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল বৈধতা ও অনুমোদন প্রমাণিত হয়)। আর যদি তাঁরা বলেন যে, দায়ূদের এ সকল জিহাদও অবৈধ ও ঈশ্বর-ঘৃণিত ছিল তবে তাতে প্রমাণ হবে যে, দায়ূদ মিথ্যা বলেছেন, খৃষ্টানদের মহাপুরুষ সাধু পৌল মিথ্যা বলেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্যও মিথ্যা। সর্বোপারি এতে প্রমাণিত হবে যে, হাজার হাজার নিরপরাধ বা হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী নয় এরূপ হাজার হাজার মানুষের রক্তের দায়ভার রয়েছে দায়ূদের উপর। একজন নিরপরাধের রক্তের দায়ভারই ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তাহলে এরূপ হাজার হাজার মানুষের রক্তের দায়ভার কাঁধে নিয়ে (ঈশ্বরের মসীহ ও ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র) দায়ূদ কিভাবে পারলৌকিক মুক্তি লাভ করবেন ?

যোহনের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে : "তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করেন না।"[২৪৪]

প্রকাশিত বাক্যের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে : "কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা মায়াবী, বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং

---

২৪২. বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দায়ূদ ও অন্যান্য ভাববাদীদের জিহাদ-রাষ্ট্রের জন্য বা ধর্মের জন্য ছিল না, বরং রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করা ও নির্বিচারে অসহায় মানুষদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে হত্যা করার বিকৃত আনন্দ লাভের জন্যই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন।

২৪৩. গীতসংহিতা ৮৯/১৯-২৭।

২৪৪. ১ যোহন ৩/১৫।

সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।" না'ঊযু বিল্লাহ! মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি।

দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

তৃতীয় বিষয় : ব্যবহারিক ব্যবস্থার বিবর্তন বনাম জুলুম ও অমানবিকতা

পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা শরীয়তের ব্যবহারিক বিধিবিধান পরবর্তী শরীয়তে হুবহু একইরূপ বিদ্যমান থাকা জরুরী নয় বরং একই ব্যবস্থা বা শরীয়তে একটি বিধান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একইরূপ থাকা জরুরী নয়। ব্যবহারিক বিধান ও ব্যবস্থা জনস্বার্থ, যুগের প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট মানুষদের চাহিদার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে 'নাসূখ' বা 'রহিতকরণ' বিষয়ক আলোচনায় পাঠক তা সবিস্তার জানতে পেরেছেন।

মোশির ব্যবস্থায় (শরীয়তে) যে পদ্ধতির জিহাদ বা যুদ্ধের বিধান রয়েছে তা নাস্তিক বা নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিতে জঘন্যতম বর্বরতা ও জুলুম। যীশুর ব্যবস্থায় জিহাদের এরূপ বিধান থাকে না।[২৪৫] ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর থেকে বেরিয়ে আসার আগে তাদের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ ছিল না, কিন্তু মিসর থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদেরকে জিহাদ বা যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় (যীশু তাঁর নিজের জীবদ্দশায় জিহাদ করেন নি, কারণ জিহাদের পরিবেশ বা অবস্থা তিনি পান নি)। পুনরাগমনের পরে যীশু জিহাদ করবেন। পুনরাগমনের পরে তিনি দাজ্জাল বা খৃষ্টারি (antichrist) ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে হত্যা করবেন। থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত ২য় পত্রের ২ অধ্যায় থেকে এবং প্রকাশিত বাক্যের ১৯ অধ্যায় থেকে তা জানা যায়।[২৪৬]

অনুরূপভাবে পাপী ও অবিশ্বাসীদের সতর্কীকরণ ও শাস্তি প্রদানের পদ্ধতিও সকল যুগে একই প্রকার হওয়া জরুরী নয়। প্রথম বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

---

২৪৫. যীশু জিহাদের বিধান বা মোশির ব্যবস্থার কোন কিছুই রহিত বা পরিবর্তন করেন নি। আমরা দেখেছি যে, খৃষ্টানগণ 'রহিতকরণে' বিশ্বাস করেন না। তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হতে পারে না। পুরাতন নিয়মে বা মোশির ব্যবস্থায় যা কিছু বিধান রয়েছে সবই চিরস্থায়ী এবং বাইবেল বিশ্বাসী সকলে জন্য অলঙ্ঘনীয় বিধান। যুগে যুগে খৃষ্টান পোপগণ পুরাতন নিয়মের জিহাদ সংক্রান্ত বিধানাবলির উপর নির্ভর করেই অ-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বর্বর যুদ্ধ, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ক কিছু নমুনা দেখতে পাব।

২৪৬. ২ থিষলনীকীয় ২/৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ১৯/২০-২১।

এজন্য আস্তিক বা নবুওয়ত ও ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় বিশ্বাস করেন এমন কোন মানুষের উচিত নয়, এরূপ বিষয়কে ভিত্তি করে কোন শরীয়ত বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা। এজন্য আস্তিক বা ধর্মে বিশ্বাসী কোন মানুষ বলতে পারেন না যে, জলপ্লাবনের সময় নোহের নৌকার প্রাণীগুলি ছাড়া বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণী ধ্বংস করা, লোটের সময়ে সদোমের ও ঘমোরার সমুদয় নগর ও সমস্ত অঞ্চল-নিবাসী সকল মানুষকে গগন হতে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষিয়ে ধ্বংস করা এবং মোশির সময়ে যে রাতে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর ত্যাগ করেছিল সেই রাতের মধ্যভাগ সিংহাসনের উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ্ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশস্থ্ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে হত্যা করা জুলুম ছিল। বিশেষত নোহের জলপ্লাবনে ও হাজার হাজার প্রাণীর জীবন নাশ এবং পরবর্তী দুটি ঘটনায় হাজার হাজার মানব শিশু ও হাজার হাজার পশু শাবক হত্যা করা খুবই বিবেক বিরুদ্ধ কর্ম; কারণ এরা তো কোনরূপ কোন অপরাধে জড়িত হয় নি।

অনুরূপভাবে তিনি বলতে পারেন না যে, বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে উপর্যুক্ত ৭ জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে নির্মূল করা জুলুম ছিল, বিশেষত সম্পূর্ণ নিরপরাধ শিশুদেরকে হত্যা করা, যাদের কোন অপরাধই ছিল না।

আমরা দেখেছি যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশে উপর্যুক্ত ৭ জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণ সকল পুরুষকে হত্যা করেছেন, সন্তান-সন্ততি ও নারীদেরকে বন্দি করেছেন, সম্পদ লুটপাট করেছেন, মোশির নির্দেশে মিদিয়নীয় যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সকল পুরুষকে এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সকল মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে এবং কুমারী বালিকাদের ভোগের জন্য বন্দি করা হয়েছে, তাদের ধন-সম্পদ ও পশুপাল লুণ্ঠন করা হয়েছে। এখন ভাববাদিগণে বিশ্বাসী কেউ বলতে পারেন না যে, এগুলি সব অমানবিক জুলুম ও বর্বরতা ছিল।

অনুরূপভাবে তিনি বলতে পারেন না যে, দায়ূদের জিহাদ ও অন্যান্য সকল বাইবেলীয় ভাববাদীর জিহাদ, এলিয় ভাববাদী কর্তৃক বাল দেবতার ২৫০ জন ভাববাদীকে জবাই করে হত্যা করা অথবা যীশুর পুনরাগমনের পরে ভাক্ত ভাববাদী বা খৃস্টারি ও তার বাহিনীকে হত্যা করা অমানবিক জুলুম। ভাববাদিগণে বিশ্বাসী কেউ বলতে পারেন না যে, উপরের এ সকল কর্ম কোনটিই জ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিতে বৈধ নয় এবং ঈশ্বর এরূপ জুলুম অত্যাচারের নির্দেশ দিতে পারেন না।

অনুরূপভাবে তাঁর জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, মূর্তি বা প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদানকারীকে হত্যা করা, ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতার উপাসনা বা সেবার জন্য

প্ররোচনা দানকারীকে হত্যা করা, কোন গ্রামের মানুষের এরূপ করলে সেই গ্রামের সকল মানুষই হত্যা করা, গোবৎস পূজার কারণে মোশি কর্তৃক ২৩ হাজার মানুষকে হত্যা করা, মোয়াবীয় নারীদের সাথে ব্যভিচার করার কারণে ও তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করার কারণে মোশি কর্তৃক ২৪ হাজার মানুষকে হত্যা করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও বর্বর জুলুম। এ সকল বিধানের উদ্দেশ্য হত্যা ও প্রস্তরাঘাতে হত্যার ভয় দেখিয়ে মানুষদেরকে মোশির ব্যবস্থার উপর টিকিয়ে রাখা। এ কথা সুস্পষ্ট যে, হৃদয়ের বিশ্বাস তো জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জন করা যায় না বরং জোরজবরদস্তি করে ঈশ্বরের প্রেম অর্জন একেবারেই অসম্ভব বিষয়। কাজেই এরূপ বিধান কখনোই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হতে পারে না।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও ভাববাদিগণে বিশ্বাস করে না, বরং ধর্মহীন বা নাস্তিক তিনি বাইবেলের উপর্যুক্ত বিধিবিধান অস্বীকার করতে পারেন এবং এগুলিকে অমানবিক বলে অভিহিত করতে পারেন। তার থেকে এরূপ মতামত অবাস্তব কিছু নয়। কিন্তু আমরা এই পুস্তকে নাস্তিকদের সাথে আলোচনা করছি না, বরং এ পুস্তকে আমরা আলোচনা করছি সাধারণভাবে সকল খৃস্টানের সাথে এবং বিশেষভাবে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের সাথে।

চতুর্থ বিষয় : খৃস্টান ধর্মগুরুদের তরবারি ও জবরদস্তি

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবি করেন যে, ইসলাম ধর্ম তরবারীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। তাঁদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রচারণা মাত্র তা ইতোপূর্বে এই পুস্তকের ভূমিকার ৭ম বিষয়ে পাঠক দেখতে পেয়েছেন। আর এ বিষয়ে খৃস্টান পণ্ডিতগণের মুখের কথা তাঁদের কর্মের বিপরীত। বর্তমান যুগের খৃস্টান ধর্মগুরুগণ এবং পূর্ব যুগের তাঁদের ত্রিত্ববাদী পূর্বসূরিগণ সকলেই যখনই কোন দেশ বা জাতির উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরেছেন, তখনই সেখানে সকল ভিন্নমতাবলম্বী বা ভিন্নধর্মাবলম্বীকে মুছে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।[২৪৭] আমি তাঁদেরই গ্রন্থাদি ও পুস্তিকাদি থেকে এর কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। প্রথমত, ইহূদীদের প্রতি খৃস্টানদের আচরণের কিছু নমুনা উল্লেখ করছি। খৃস্টান পাদরিদের রচিত "কাশফুল আছার ফী কাসাসি আনবিয়াই বানী ইসরাঈল" (ইস্রায়েল সন্তানদের ভাববাদিগণের কাহিনীর পর্দা উন্মোচন) গ্রন্থের বিষয়ে পাঠক ইতোপূর্বে দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় জানতে পেরেছেন। আমি এই পুস্তক থেকে ইহূদীদের সাথে তাদের আচরণের কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

২৪৭. এর পরবর্তী জ্বলন্ত নমুনা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদেরকে বিভৎস অত্যাচার ও বর্বর নির্যাতনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বা হত্যা করা এবং হিটলার কর্তৃক ইহূদীদেরকে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করা। এগুলি সবই খৃস্টান ধর্মগুরুদের সমর্থনে বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ঘটেছে।

গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : বায়যান্টাইন সম্রাট কনস্টান্টাইন (Constantine the Great), যিনি হিজরতের প্রায় তিন শত বছর পূর্বে রাজত্ব করেন (রাজত্বকাল ৩১২-২২৭ খৃস্টাব্দ), ইহূদীদের কান কাটার এবং তাদেরকে দেশের বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় নির্বাসিত করার নির্দেশ দেন।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে দীর্ঘদিন যাবৎ ইহূদীরা বসবাস করে আসছিল। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে আগমন করে তথায় নির্বিঘ্নে বসবাস করত। পঞ্চম খৃস্টীয় শতকে রোমান সম্রাট তাদেরকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের ধর্মগৃহ বা সিনাগগগুলি (Synagogue) ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যদি ইহূদীদের কেউ তার সম্পদ কাউকে প্রদানের জন্য ওসীয়ত বা উইল করে তবে তা গৃহীত হবে না। ইহূদীগণ এ সকল নির্দেশের বিরুদ্ধে সামান্য আপত্তি প্রকাশ করলেও তিনি তাদের সকল সম্পদ অধিগ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি অনেক ইহূদীকে হত্যা করেন এবং এমনভাবে তাদের রক্তপাত করেন ও নির্যাতন করেন যে, এ অঞ্চলের সকল ইহূদী ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।

২৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "(যীশুকে হত্যা করার কারণে) অভিশপ্ত হওয়ার পরে এন্টিয়কের ইহূদীগণ যখন বন্দি হলো তখন তাদের অনেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়, অনেককে হত্যা করা হয়। আর অবশিষ্টদেরকে বিতাড়িত করা হয়। রোমান সম্রাট তার সাম্রাজ্যে সর্বত্রই এ সকল ইহূদীদের উপরে বিভিন্নভাবে কঠিন অত্যাচার ও নিপীড়ন করেন। অবশেষে তিনি তাদেরকে তার সাম্রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবর্গকেও ইহূদীদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে উৎসাহিত করেন। ফলে ইহূদীদের অবস্থা এরূপ হয় যে, এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত খৃস্টান দেশে তারা কঠিন অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়।

"এর সামান্য কিছুদিন পরে স্পেনে তাদেরকে তিনটি শর্তের একটি মানতে নির্দেশ দেওয়া হয় : তারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে। যদি তারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় তবে তারা বন্দী থাকবে। যদি তারা উভয় শর্তের কোনটিই গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করা হবে।

"কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সেও তাদের সাথে একইরূপ আচরণ শুরু হয়। এভাবে অসহায় ইহূদীগণ এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গিয়েছে, কোথাও তাদের স্থিতি মেলে নি। এমনকি এশিয়াতেও তারা নিরাপত্তা লাভ করে নি বরং এশিয়াতেও অনেক সময় তারা নিহত হয়েছে, যেভাবে তারা ইউরোপীয় দেশগুলিতে নিহত হয়েছে।"

অতঃপর ২৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন : "ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে ইহুদীরা ছিল অবিশ্বাসী কাফির। এজন্যই তারা তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতেন। এই ক্যাথলিক ধর্মের মহান ধর্মগুরুগণ এ বিষয়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠান করেন। পরামর্শের মাধ্যমে তারা ইহুদীদের বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি প্রদান করেন :

প্রথমত, কোন খৃস্টান যদি অন্য খৃস্টানের বিরুদ্ধে কোন ইহুদীকে সমর্থন করে বা রক্ষা করে তবে সে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, কোন ইহুদীকে কোন রাষ্ট্রে কোনরূপ চাকরী বা পদ প্রদান করা যাবে না।

তৃতীয়ত, কোন খৃস্টান যদি কোন ইহুদীর ক্রীতদাস থাকে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

চতুর্থত, কোন ইহুদীর সাথে কেউ পানাহার করতে পারবে না বা কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক রাখবে না।

পঞ্চমত, ইহুদীদের সন্তানদেরকে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে এবং তাদেরকে খৃস্টধর্মের দীক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে।

এরূপ আরো অনেক ব্যবস্থা ও নির্দেশ তারা প্রদান করেন।"

নিঃসন্দেহে পঞ্চম নির্দেশটি ছিল উপর্যুক্ত নির্দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে অমানবিক ও জবরদস্তিমূলক।

অতঃপর তিনি লিখেছেন : "(দক্ষিণ ফ্রান্সের) টলোয (Toulouse) অঞ্চলের অধিবাসীদের রীতি ছিল যে, নিস্তার পর্বের (easter) সময়ে তারা ইহুদীদের মুখে চড় মারত। আর বিযিয়ের নগরের[২৪৮] অধিবাসীরা পর্বের প্রথম রবিবার থেকে পর্বের শেষদিন পর্যন্ত ইহুদীদেরকে পাথর মারত। এভাবে পাথর মেরে অনেক ইহুদীকে

২৪৮. পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশে ও নেতৃত্বে দুটি ক্রুসেড পরিচালিত হয়। প্রথমটি পূর্বমুখি চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২-১২০৪) যা মূলত বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। তা ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম (Western church) কর্তৃক গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ বা প্রাচ্য খৃস্টধর্ম (Eastern church) জবরদস্তিমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় ক্রুসেড ছিল পশ্চিমমুখি। তাঁর নির্দেশে ফ্রান্সের তথাকথিত ধর্মচ্যুত খৃস্টান (French heretics) বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করা হয়, যা আলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade) নামে পরিচিত। ফ্রান্সের এ সকল খৃস্টান পোপ ও খৃস্টান যাজকতন্ত্রের আধিপত্য অস্বীকার করেন। পোপ তাদেরকে জবরদস্তি ও নিপীড়নের মাধ্যমে স্বমতে আনার বা হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেড আহ্বান করেন। এ ক্রুসেডে অগণিত ইহুদীকেও হত্যা করা হয়। বিশেষত সিমোন ডি মন্টফোর্ট (Simon de Montfort) এই ক্রুসেড অভিযানে দক্ষিণ ফ্রান্সের এই বিযেইর নগর অধিকার করার পর তথাকার প্রায় সকল ইহুদী অধিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

হত্যাও করা হতো। এই শহরের খৃস্টান শাসক জনগণকে এরূপ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।"

এরপর তিনি ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ফ্রান্সের শাসকগণ ইহূদীদের বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে ইহূদীদের সম্পদ অর্জনের সুযোগ দিতেন। এরপর তারা তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। সম্পদের লোভে এই প্রকারের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরপর যখন ফিলিপ অগাস্টাস (Philip Augustus)[২৪৯] ফ্রান্সের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রথমে খৃস্টানদের নিকট ইহূদীদের যত ঋণ লগ্নি করা ছিল তার মোট পাওনার এক-পঞ্চমাংশ উসুল করেন এবং বাকি ঋণের দায় থেকে খৃস্টান নাগরিকদের মুক্ত করে দেন। আর এই উসুলকৃত এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক পয়সাও তিনি ইহূদীদেরকে দেন নি। এরপর তিনি সকল ইহূদীকে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। ফিলিপ অগাস্টাসের পরে তদীয় পুত্র সেন্ট লুই বা অষ্টম লুই (Louis VIII) রাজ্যভার গ্রহণ করেন।[২৫০] তিনি দুই বার ইহূদীদেরকে তার রাজ্যে আগমনের সুযোগ দেন এবং দুইবার তাদেরকে বিতাড়িত করেন। পরবর্তীকালে যখন ৬ষ্ঠ চার্লস (Charles VI) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি আবার ইহূদীদেরকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহূদীগণ ফ্রান্স থেকে ৭৮ বার বিতাড়িত হয়েছে।

"আর স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহূদীদের সংখ্যা সবচেয়ে কম করে হিসাব করলেও ১,৭০,০০০ পরিবারের চেয়ে কম হবে না। অস্ট্রিয়াতে অনেক ইহূদীকে হত্যা করা হয়েছে এবং অন্য অনেককে লুণ্ঠন করা হয়েছে। কেবল অল্পসংখ্যক ইহূদী খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে হত্যা ও লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে ইহূদীদের অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারা নিজেদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে নিজেদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে, স্ত্রী-সন্তানগণকে হত্যা করে এবং নিজেদেরকেও হত্যা করে। অনেকে সমুদ্রে ডুবে বা আগুনে আত্মহনন করে। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে অগণিত ইহূদীকে হত্যা করা হয়।

"ইহূদীদের নিপীড়নের বিষয়ে ইংরেজরা একমত পোষণ করে। তারা সম্মিলিতভাবে ইহূদীদের উপর এমন সীমাহীন অত্যাচার চালায় যে, মুক্তি থেকে নিরাশ হয়ে ইয়র্ক শহরের ইহূদীরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারা একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। এভাবে ১৫০০ ইহূদী পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করে। ইংল্যান্ডের সর্বত্র ইহূদীরা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, কোন সামন্ত শাসক সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাদের বিদ্রোহ ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ইহূদীদের হত্যা করত। এভাবে একবারে ৭০০ ইহূদীকে তারা হত্যা করত এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত।

---

২৪৯. ফ্রান্সের প্রসিদ্ধতম রাজাদের অন্যতম। ১১৮০ থেকে ১২২৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

২৫০. ১২২৩ থেকে ১২২৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বৃটিশ সম্রাট সিংহ হৃদয় রিচার্ড (রাজত্বকাল ১১৮৯-১১৯৯), তাঁর ভ্রাতা রাজা জন (রাজত্বকাল ১১৯৯-১২১৬) এবং তাঁর পুত্র তৃতীয় হেনরী (রাজত্বকাল ১২১৬-১২৭২) বারংবার বিভিন্ন অজুহাতে নিপীড়ন করে ইহূদীদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন। বিশেষ করে তৃতীয় হেনরীর নিয়মিত অভ্যাসই ছিল বিভিন্নভাবে জুলুম অত্যাচার করে ইহূদীদের ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া ও তাদেরকে নিপীড়ন করা। তিনি এমনভাবে ইহূদীদের উপর অত্যাচার করেন যে, ধনী ইহূদীরা হতদরিদ্রে পরিণত হয় এবং ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়। তারা রাজা তৃতীয় হেনরীর কাছে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদেরকে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তৃতীয় হেনরীর পুত্র এডওয়ার্ড (রাজত্বকাল ১২৭২-১৩০৭) রাজ্যভার গ্রহণ করার পরে তিনি ইহূদীদের সকল ধনসম্পদ কেড়ে নেন এবং তারপর ইহূদীদেরকে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ১৫,০০০ (পনের হাজার)-এরও বেশি ইহূদীকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় তার দেশ থেকে বহিষ্কার করেন।"

অতঃপর তিনি ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন : সুথী নামক একজন পর্যটক ৫০ বছর পূর্বের[২৫১] পর্তুগালের মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তারা ইহূদীদের ধরে আগুনে পোড়াত। পর্বের দিনে যেমন মানুষ আনন্দ উল্লাসে একত্রিত হয়, তেমনিভাবে তারা ইহূদী পোড়ানোর দিনে নারী-পুরষ সকলে সমবেত হয়। এ সময়ে তারা আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে এবং ইহূদীকে পোড়ানোর সময় উল্লাসে মেয়েরা চিৎকার করতে থাকে।

অতঃপর তিনি ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ ইহূদীদের বিষয়ে অনেক কঠিন আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন।"

'কাশফুল আসরার ফী কাসাসি আনবিয়াই বনী ইসরাঈল' গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

'সিয়ারুল মুতাকাদ্দিমীন' (পূর্ববর্তীদের জীবনী) গ্রন্থের লেখক বলেন : "রোমান সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইনের পরের ৬ষ্ঠ সম্রাট[২৫২] তার রাজ্যের নেতৃবৃন্দের পরামর্শের

---

২৫১. অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, ১৭৮০-১৮০০ সালে দিকে।

২৫২. সম্ভবত প্রসিদ্ধ রোমান সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস বা মহান থিওডোসিয়াসের (Theodosius I/Theeodosius The Great/Flavius Theodosius) কথা বলছেন। তিনি ৩৭৯ থেকে ৩৯৫ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। প্রথমে পূর্ব রোমের পরে পূর্ব ও পশ্চিম সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম যাজকীয় মহাসম্মেলন, নিকীয় কাউন্সিলে (Council of Nicaea) ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট ধর্ম সকল নাগরিকের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একেশ্বরবাদী খৃস্টান, আরিউসের অনুসারিগণ, অখৃস্টান প্যাগান ও অন্যদেরকে কঠিনভাবে নিপীড়ন করেন। ৩৮১ খৃস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে দ্বিতীয় যাজকীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন করে এর মাধ্যমে তাঁর এই জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকে আইনগত রূপ দেন।

ভিত্তিতে ৩৭৯ সালে নির্দেশ জারি করেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল নাগরিককে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে হত্যা করা হবে।"

এর চেয়ে কঠিনতর জবরদস্তি আর কী হতে পারে?

টমাস নিউটন নামক একজন বাইবেল বিশারদ বাইবেলের মধ্যে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকটি ১৮০৩ সালে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ কিভাবে যিরূশালেম দখল করে তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পাঁচ সপ্তাহব্যাপী অবরোধের পর ১০৯৯ সালের জুলাই মাসে ক্রুসেডারগণ যিরূশালেম অধিকার করেন। তারা তথাকার সকল অখৃস্টানকে হত্যা করেন।[২৫৩] এভাবে তারা ৭০ হাজারেরও বেশি মুসলিমকে হত্যা করেন। আর তারা ইহূদীদেরকে সমবেত করে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন।[২৫৪] তারা মসজিদের মধ্যে অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন।"

উপরের সংক্ষিপ্ত নমুনাগুলি থেকে পাঠক জানতে পারলেন, কিভাবে খৃস্টানগণ সাধারণভাবে সকল অ-খৃস্টান নাগরিক ও জনগণের উপর এবং বিশেষভাবে ইহূদীদের উপর জুলুম-অত্যাচার ও জবরদস্তি করেছে। অনুরূপভাবে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় যিরূশালেম অধিকার করে কিভাবে তারা গণহত্যা করেছে তাও পাঠক জানতে পারলেন। এখন আমি ক্যাথলিক সম্প্রদায় অন্যান্য খৃস্টান সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ অত্যাচার করেছে তার নমুনা উল্লেখ করব। প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'আছ-ছালাছ আশরাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবী সংকলন গ্রন্থ থেকে আমি এ সকল ঘটনা উদ্ধৃত করব।

উক্ত পুস্তকের ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "ইউরোপের দেশগুলিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ঈশ্বরের সাক্ষী বা শহীদ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে অগণিত বার যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়ন ও বিতাড়নের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২,৩০,০০০ (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার)-এর কম হবে না বলে মনে করা হয়। পোপকে বাদ দিয়ে শুধু যীশু খৃস্টে বিশ্বাস করার অপরাধে এবং শুধু বাইবেলকে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের পথপ্রদর্শক বলে বিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এছাড়াও হাজার

---

২৫৩. বস্তুত এরা হত্যা ছাড়া কিছুই বুঝতেন না এবং এখনো বুঝেন না।

২৫৪. আগুনে পুড়িয়ে মারা খৃস্ট ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ এতে খুবই আনন্দ লাভ করেন। আর যীশুর হত্যাকারীদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারির ধার কমিয়ে কী লাভ!

হাজার প্রটেস্ট্যান্টকে তারা হত্যা করেছে অস্ত্রের আঘাতে, সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে, গিলোটিন[২৫৫] নামক যন্ত্রের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টেনে ছিড়ে এবং অন্যান্য আরো বিভিন্ন প্রকারের অবর্ণনীয় বর্বরতম অত্যাচারের মাধ্যমে। ফ্রান্সে এক দিনেই ত্রিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। সেন্ট বর্থময়ের (St. Bartholomew) পর্বের দিনে এই হত্যাযজ্ঞ ঘটে।[২৫৬] এভাবেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাস সাধু ও পবিত্রগণের রক্তে রঞ্জিত।"

'ত্রয়োদশ পুস্তিকা' গ্রন্থের বক্তব্য আক্ষরিকভাবেই উদ্ধৃত করা হলো।

উক্ত সংকলন গ্রন্থের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় ১৩ নং পুস্তিকায় রয়েছে : "স্পেনের টলেডো রাজ্য পরিষদে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনে বলা হয়েছে : আমরা আইন প্রণয়ন করছি যে, ভবিষ্যতে এই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করতে হলে তাকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, অ-ক্যাথলিক কোন মানুষকে সে তার রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি দেবে না। ক্ষমতা গ্রহণের পরে যদি সে তার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে সে অনন্ত ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে বিতাড়িত হবে এবং অনন্ত নরকের চিরস্থায়ী খোরাক হবে।"

ল্যাটারান কাউন্সিল (Lateran Council)[২৫৭] ঘোষণা করে : "সকল রাজা, শাসক, প্রশাসক ও ক্ষমতাবানের অবশ্যই শপথ করতে হবে যে, চার্চ তাদের যে সকল নাগরিককে বিভ্রান্ত (heretic) বলে ফয়সালা দেবে, তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে সে সকল নাগরিককে নির্মূল করবেন। এরূপ বিভ্রান্ত একজনকেও তারা

---

২৫৫. সম্ভবত গিলোটিন (guillotine) বা অনুরূপ কোন যন্ত্র বুঝাচ্ছেন।

২৫৬. ১৫৭২ খৃস্টাব্দে ২৪/২৫ আগস্ট এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুসারে ২/৩ দিনে ৭০ হাজার প্রটেস্ট্যান্ট নর-নারীকে চরম নির্মমতার সাথে হত্যা করা হয়। রোমান ক্যাথলিক নেতাগণ এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে ক্যাথলিক ধর্মগুরু রোমের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী (Pope Gregory XIII) এত খুশি হন যে, তিনি এই দিবস উদযাপনের জন্য একটি মেডেল প্রদান করেন (Pope Gregory XIII had a medal struck to celebrate the event)। বিস্তারিত দেখুন, এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকা, আর্টিকেল : Saint Bartholomew's Day, Massacre of.

২৫৭. রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রীয় যে যাজকীয় মহাসম্মেলনগুলি রোমের ল্যাটারান প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিকে ল্যাটারান কাউন্সিল বলে। ১১২৩ থেকে ১৫১৭ পর্যন্ত পাঁচটি মহাসম্মেলন তথায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ল্যাটারান মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম ছিল, পাদরি বা যাজকদের (clerics) জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১১৩৯ সালে। এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পোপ বিরোধী বা ক্যাথলিক ধর্মমত বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করা। ১২১৫ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ মহাসম্মেলনে ইহুদী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক বিভিন্ন আইন পাশ করা হয়।

তাদের এলাকায় বসবাস রাখবেন না। তারা যদি এই শপথ রক্ষা না করেন তবে তাদের জনগণ তাদের আনুগত্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।"

কন্সটান্স মহাসম্মেলনেও (Council of Constance)[২৫৮] এই আইন বলবৎ রয়েছে। এছাড়া পোপ পঞ্চম মার্টিনিউসের[২৫৯] নির্দেশমালাতেও রয়েছে। পোপ তৃতীয় পল (Paul)-এর নেতৃত্বে ১৫৫১ খৃস্টাব্দে বিশপগণ যে শপথ গ্রহণ করেন তাতে রয়েছে: "বিভ্রান্তগণ (heretics), বিচ্ছিন্ন এবং মহামান্য পোপ ও তাঁর প্রতিনিধিদের অবাধ্য সকল মানুষকে আমি সর্বশক্তি দিয়ে বিতাড়িত করব এবং নির্মূল করব।"

ল্যাটারান কাউন্সিল ও কন্সটান্স কাউন্সিল উভয়ই বলছে: "যদি কেউ কোন বিভ্রান্ত (heretic) আটক করতে পারে, তবে তার জন্য অনুমতি আছে এবং তার অধিকার আছে যে, সে তার (আটককৃত বিভ্রান্ত ব্যক্তির) সমস্ত ধন-সম্পদ কেড়ে নেবে এবং সে উক্ত ব্যক্তিকে নিজের অধীনে (দাস হিসেবে) কাজে লাগাবে। এ বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকবে না।"

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (Innocent III)[২৬০] বলেন, "বিভ্রান্তদের (heretics) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার এ নির্দেশ আমরা প্রদান করছি সকল রাজা, সম্রাট ও শাসককে। চার্চের দণ্ডাবলির অধীনে তা কার্যকর করা তাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব।"

১৭২৪ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের পঞ্চদশ লূই (Louis XV)[২৬১] ১৮টি আইন জারি করেন। সেগুলির মধ্যে প্রথম আইনটি নিম্নরূপ: "আমরা আদেশ প্রদান করছি যে, একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মই আমাদের রাজত্বে অনুমোদিত থাকবে। অতএব যারা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের অনুসরণ করবে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হবে। অ-ক্যাথলিক নারীদের চুল কেটে দিতে হবে এবং তাদেরকে আমৃত্যু আটক রাখতে হবে।"

---

২৫৮. ১৪১৪-১৪১৮ সালে অনুষ্ঠিত।

২৫৯. সম্ভবত পোপ পঞ্চম মার্টিনকে বুঝাচ্ছেন। তিনি ১৪১৭ থেকে ১৪৩ পর্যন্ত পোপ ছিলেন।

২৬০. ১১৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৮ থেকে ১২১৬ পর্যন্ত পোপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (চতুর্থ ক্রুসেড) ছাড়াও ফ্রান্সের খৃস্টান ভিন্নমতাবলম্বীদের ও হেরেটিকদের বিরুদ্ধে আলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (Albigensian Crusade)-এর সংগঠক ও নেতা ছিলেন। তিনি ১২১৫ সালে চতুর্থ ল্যাটারান কাউন্সিল আহ্বান করেন।

২৬১. মূল পাঠে 'একাদশ লূই' রয়েছে। বাহ্যত তা ভুল। কারণ একাদশ লূই (Louis XI) ১৪২৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৪৬১ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৪৮৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭২৪ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন ১৫শ লূই (Louis XV)। তিনি ১৭১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১৫ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিলেন।

দ্বিতীয় আইনটি নিম্নরূপ : "আমরা নির্দেশ প্রদান করছি যে, যে সকল ধর্মপ্রচারক ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বাইরে কোন ধর্মসম্প্রদায় গঠন করেছেন এবং যারা ক্যাথলিক রীতির বাইরে কোন উপাসনা বা রীতি শিক্ষা দিয়েছেন বা পালন করেছেন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।"

১৭৬৫ সালে স্পেনের সম্রাটকে সম্বোধন করে বিশপগণ বলেন : "আইনকে তার সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন এবং ধর্মকে তার পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করুন যেন এ কথার মাধ্যমে আমরা ১৭২৪ সালের (উপর্যুক্ত) আইনগুলি নবায়ন করতে পারি।"

ইংল্যান্ড যখন পোপের অধীন ছিল তখন তথাকার অন্যতম বিধান ছিল, কোন মানুষ যদি বলে যে, প্রতিমা বা প্রতিমূর্তিকে (icon) সাজদা করা যাবে না (মূর্তিপূজা করা যাবে না) তবে তাকে কঠিন কারাগারে আবদ্ধ রাখা হবে, যতক্ষণ না সে প্রতিজ্ঞা করে ঘোষণা করে যে, সে মূর্তির সামনে সাজদা বা প্রণিপাত করবে। বিশপ বা গির্জার বিচারকের অধিকার রয়েছে যে, যাকেই তিনি বিভ্রান্ত (heretic) বলে সন্দেহ করবেন, তাকেই তিনি সমন দিয়ে নিজের কাছে উপস্থিত করাবেন বা তাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখবেন। আর অবাধ্য বিভ্রান্তকে (heretic) জনগণের সামনে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। সকল সম্রাট ও শাসককে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তারা গির্জার বিচারকদেরকে সহযোগিতা করবেন বিভ্রান্ত বা হেরেটিকদেরকে সমূলে বিনাশ করতে। যখনই কোন ব্যক্তি থেকে কোনরূপ বিভ্রান্তি প্রকাশ পাবে তখনই তারা তার সকল ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে তাকে গির্জার বিচারকের নিকট সমর্পণ করবেন। আগুনের প্রজ্বলিত শিখার মাধ্যমে তার পাপরাশি মুছে ফেলা হবে (তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে পাপমুক্ত করা হবে)।

বার্নিউস বলেন, স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস (Charles V)[২৬২] মিথ্যা ও ভিত্তিহীনভাবে দাবি করতেন যে, তিনি তরবারি দ্বারা নয়, বরং মুখের দ্বারা বিভ্রান্তদের নির্মূল করবেন। রোমে মুদ্রিত ল্যাটিন ও আরবী বাইবেলের নির্দেশিকা বা নির্ঘণ্টে (index) 'হা' (H) অক্ষরের মধ্যে রয়েছে : হেরেটিকদের (heretics) ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করব। সেখানে হেরেটিকদের হত্যা ও নির্মূল করার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, (ইস্রায়েল রাজ্যের) রাজা যেহূ (Jehu the son of Jehoshaphat) মিথ্যা পুরোহিতদেরকে খড়্গ দ্বারা হত্যা করেছিলেন।[২৬৩] এলিয় (Elijah) ভাববাদী বাল দেবতার ভাববাদিগণকে

২৬২. ১৫০০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৬ থেকে ১৫৫৬ পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পেরর ও স্পেনের সম্রাট ছিলেন এবং ১৫৫৮ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হেরেটিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোপ তৃতীয় পৌল (Paul III) তাঁকে অর্থ ও জনবল দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

২৬৩. রাজা যেহূ প্রবঞ্চনার মাধ্যমে বাল দেবতার পূজক ও যাজকদেরকে একত্রিত করে অতর্কিতে নির্মমভাবে হত্যা করেন। বিস্তারিত দেখুন ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮।

Contents

(Prophets of Baal) বলিদান করেছিলেন।[২৬৪] এরূপ আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে। এগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গির্জার সন্তানদের দায়িত্ব বিভ্রান্ত বা হেরেটিকদের নির্মূল করা।

অতঃপর (পুস্তিকা ত্রয়োদশের) ৩৪৬ ও ৩৪৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন, ক্রেমলিনীয়দের নেতৃস্থানীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিনটওয়ান ও অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, রোডনের টমাস[২৬৫] নামক এক বাইবেলের প্রচারককে পোপ জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। কারণ তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে সাধু ও খৃস্টের জন্য প্রকৃত শহীদ বলে গণ্য করেন।

৩৫০ থেকে ৩৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "স্পেনের আরাগন রাজ্যের (Kingdom of Aragòn) রাজা আলফনসো (Alfonso II) তাঁর রাজ্য থেকে আলবিজেনসিয়ান (Albigensian) খৃস্টানদেরকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন; কারণ তারা ছিল বিভ্রান্ত বা হেরেটিক। টোলোসের শাসক (count of Toulouse) রেমন্ডের (Raymond VI)[২৬৬] আপত্তি সত্ত্বেও ১২০৬ খৃস্টাব্দে পোপ তাঁর রাজ্যে চার্চীয় অনুসন্ধানকারিগণকে (Inquisitor) প্রেরণ করেন; কারণ কাউন্ট রেমন্ড এসকল আলবিজেনসিয়ান হেরেটিকদের বহিষ্কার করতে অস্বীকার করেছিলেন। এর

---

২৬৪. এলিয় ভাববাদী বাল দেবতার চারিশত পঞ্চাশজন ভাববাদীকে ধরে আটক করেন এবং তাদেরকে কীশোন স্রোতমার্গে নিয়ে সেখানে তাদেরকে বধ বা জবাই করেন। বিস্তারিত দেখুন ১ রাজাবলি ১৮/৪০।

২৬৫. মূল গ্রন্থের আরবী পাঠ থেকে নামটি এরূপই প্রতিভাত হয়। এই নামে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানতে পারি নি। তবে আরনলডো (Arnold of Brescia/ Arnaldo da Brescia) দ্বাদশ খৃষ্টীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ও সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১১০০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৫৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি পোপ ও কার্ডিনালদের অনাচার ও অবৈধ সম্পদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতেন এবং চার্চের সংস্কারের চেষ্টা করেন। একাধিকবার তিনি পোপ কর্তৃক ধর্মচ্যুত বা ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দিত হন। সর্বশেষ পোপ চতুর্থ আড্রিয়ান (Adrian IV)-এর নির্দেশে তিনি ধৃত হন এবং যাজকীয় ট্রাইবুনাল (ecclesiastical tribunal) কর্তৃক তাঁর বিচার হয়। বিচারে বিভ্রান্তি (heresy)-র জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁর দেহ পুড়ানো হয় এবং ছাই টাইবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পোপের বিরোধিতার কারণে ধার্মিক খৃস্টানদেরকে পুড়িয়ে মারার এরূপ অনেক ঘটনা চার্চের ইতিহাসে রয়েছে।

২৬৬. ১১৫৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২২ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হেরেটিক বা ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কিছুটা সহনশীল ছিলেন। এজন্য তাঁকে পোপ ও তাঁর অনুসারী রাজন্যবর্গের কোপের মুখে পড়তে হয়। চার্চ কর্তৃক বহিষ্কৃত (excommunicated) হওয়ার কারণে তাঁকে মৃত্যুর পরে খৃস্টীয় কায়দার কবর দিতে বাধা দেওয়া হয়।

কিছু পরে পোপ অথবা পোপের নির্দেশে ফ্রান্সের সম্রাট টোলোস শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী কাউন্ট রেমন্ডকে তার শহরে অবরুদ্ধ করে। তিনি প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন এবং অস্ত্রের বলে অস্ত্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। অবশেষে রেমন্ডের বাহিনী পরাজিত হয়। তাদের উপর নেমে আসে সর্বপ্রকারে লাঞ্ছনা, শাস্তি ও অপমান। এই যুদ্ধের পরিচালনায় পোপ তাঁর নিজের বাহিনীর মানুষদেরকে বলতেন : "আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করছি যে, তোমরা এসকল ঘৃণ্য হেরেটিক বা বিভ্রান্ত আলবিজেনসিয়ানদের নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং কঠিন হাতে তাদেরকে বিতাড়িত করবে। সারাগোসা (Zaragoza/Saragossa) -বাসীদের (স্পেনীয় মুসলিমদের) বিরুদ্ধে তোমরা যে কাঠিন্য প্রদর্শন করেছ তার চেয়েও বেশি কঠিন হবে এদের সাথে।"

"১৪০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে পোপের বাহিনী অতর্কিতভাবে পিডমন্ট (Piedmont) উপত্যকায় (সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) আলবিজেনসিয়ানদের উপর আক্রমণ করে। তারা বিনা যুদ্ধে তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের অনেককেই খড়গাঘাতে হত্যা করা হয়। অনেকেই বরফের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

"এই ঘটনার ৮৭ বছর পরে পোপ ক্রিমোনা (Cremona) শহরে আলব্রেটস এরশিডিয়া কোনসকে নির্দেশ দেন ফ্রান্সের প্রান্তসীমায় এবং পিডমন্ট উপত্যকায় বসবাসরত আলবিজেনসিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যারা ১৪০০ সালের যুদ্ধের পর আবার তথায় ফিরে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ১৮,০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধ প্রায় ত্রিশ বছর চলতে থাকে। এই যুদ্ধ ছিল সে সকল খৃস্টানের বিরুদ্ধে যারা বলে, আমরা সর্বদা সম্রাটকে ভক্তি-সম্মান করি, তাঁর সকল কর প্রদান করি, তবে যে ধর্মবিশ্বাস এবং যে ভূসম্পত্তি আমরা পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি তা আমরা পরিত্যাগ করতে চাই না।

"ইটালির কালাবরিয়া (Calabria) প্রদেশে ১৫৬০ খৃস্টাব্দে হাজার হাজার প্রটেস্ট্যান্টকে হত্যা করা হয়। তাদের অনেককে সৈন্যরা হত্যা করে। অন্য অনেককে ধর্মীয় অনুসন্ধানকারী বা পরিদর্শকগণ (Inquisitor) হত্যা করেন। এজন্য রোমান গুরু বলেছেন : আমি আতঙ্কে প্রকম্পিত হতে থাকি, যখন আমি স্মরণ করি সেই জল্লাদের কথা, যার দাঁতের মধ্যে রয়েছে রক্তাক্ত খড়গ, তার হাতের রুমাল থেকে রক্ত টপটপ করে পড়ছে, তার হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত এবং সে একের পর এক মানুষকে কারাগার থেকে বের করে আনছে, যেমন করে কসাই তার ছাগলগুলি

বের করে আনে।

"১৬০১ খৃস্টাব্দে স্যাভয়ের ডিউক (duke of Savoy) ৫০০ আলবিজেনসিয়ান পরিবারকে বিতাড়িত করেন। এছাড়া ১৬৫৫ সালে ও ১৬৮৬ সালে পিডমন্ট উপত্যকায় আবার তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। কারণ পোপের নির্দেশে সম্রাট ১৪শ লূই (Louis XIV)[২৬৭] দশসহস্রাধিক সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসরত এ সকল মানুষের উপর আক্রমণ চালান। তার বাহিনী এদের অনেককে জবাই করে। আর দশ সহস্রের বেশি মানুষকে আটক করা হয়। এদের অনেকেই ভিড় ও ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণ করে। আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ছিল কঠিন শীতের সময়। সমস্ত অঞ্চল বরফে আবৃত ছিল। এজন্য প্রচণ্ড শীতে অনেক মাতা এবং তাদের কোলের সন্তান রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকে।

"পোপের মতের ভিত্তিতে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস (Charles V) ১৫২১খৃস্টাব্দে স্পেনের ফ্লামাঙ্ক অঞ্চল থেকে প্রটেস্ট্যান্টদের বিতাড়ন করার নির্দেশ দেন। এর ফলে পাঁচ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। চালর্সের পরে তার পুত্র ফিলিপ (Philip II) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৫৫৯ সালে যখন তিনি স্পেনে গমন করেন তখন তিনি আলবার ডিউক (the Duke of Alba)-কে প্রটেস্ট্যান্ট বিতাড়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় জল্লাদের হাতে ১৮,০০০ মানুষকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে তিনি গৌরব করতেন যে, তার সমগ্র রাজ্যে ৩৬,০০০ মানুষকে (প্রটেস্ট্যান্টকে) তিনি হত্যা করেছেন।"

'উপরে পাদরি কিনের বক্তব্যে সেন্ট বর্থলময়ের (St. Bartholomew) পর্বের দিনের যে হত্যাকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :' ১৫৭২ খৃস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট সেন্ট বর্থলময়ের পর্বের দিনে পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। ফ্রান্সের সম্রাট (নবম চার্লস : Charles IX) তাঁর ভগ্নিকে (মার্গারেট : Margaret of France/ Marguerite de Valois) নাভারের যুবরাজ (Henry of Navarre)-এর সাথে বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। নাভারের যুবরাজ ছিলেন ফ্রান্সের প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ও নেতৃবৃন্দের অন্যতম। বিবাহের প্রতিশ্রুতি ও

---

২৬৭. ১৬৩৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৪৩-১৭১৫ ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিলেন। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট বলে গণ্য। তাঁকে Louis The Great, Louis The Grand Monarch, The Sun King ইত্যাদি বলা হয়। তিনি প্রটেস্ট্যান্টদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জোরপূর্বক তাদের ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্ম পালনের অধিকার সম্বলিত ফরাসী আইন (Edict of Nantes) বাতিল ঘোষণা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে চার লক্ষেরও বেশি প্রটেস্ট্যান্ট ফ্রান্স ত্যাগ করে ইংল্যান্ড, প্রুশিয়া, হল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়।

আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করার জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধব প্রটেস্ট্যান্ট নেতৃবৃন্দ সকলে প্যারিসে সমবেত হন। যখন প্রভাতী প্রার্থনার জন্য গির্জায় ঘন্টা বাজতে শুরু করে তখনই এই গণহত্যা শুরু হয়। (রাজমাতা ক্যাথেরিন (Catherine de ও রাজা পঞ্চম চার্লসের) পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তারা যুবরাজ, তার সকল প্রটেস্ট্যান্ট সাথী এবং প্যারিসের সকল প্রটেস্ট্যান্টের উপরে আক্রমণ চালান। এ সময়েই তারা ১০ হাজার মানুষ জবাই করে। একইরূপ গণহত্যা চালান হয় রোয়েন (Rouen), লিয়োন (Lyon) ও ফ্রান্সের অধিকাংশ এলাকায়। এমনকি কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এই গণহত্যায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়। প্রটেস্ট্যান্টদের উপর এই জুলুম অত্যাচার ত্রিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; কারণ প্রটেস্ট্যান্টগণ শক্তিকে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। এই ত্রিশ বছর ব্যাপী ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে তাদের (প্রটেস্ট্যান্টদের) মধ্য থেকে ৯ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। সেন্ট বর্থলময়ের পর্বের দিবসে ফ্রান্স সম্রাটের এই কর্মের কথা যখন (ক্যাথলিকদের রাজধানী) রোমের মানুষেরা শুনল, তখন তাদের দুর্গগুলির টাওয়ার থেকে কামানের গোলা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। পোপ (ত্রয়োদশ গ্রেগরি : (Gregory XIII) তাঁর কার্ডিনালদের (ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গির্জা ও বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গির্জা) সেন্ট পিটার্স গির্জায় (Saint Peter's Basilica) ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেন। উপরন্তু তিনি ফ্রান্সের সম্রাটকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও সম্মাননা প্রদান করে পত্র লিখেন। তিনি তাঁর এই গণহত্যার মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে মহান খেদমত করলেন তার জন্য পোপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

"এরপর যখন সম্রাট চতুর্থ হেনরী ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তিনি ১৫৯৩ খৃস্টাব্দে প্রটেস্ট্যান্টদের উপর নিপীড়ন অত্যাচার বন্ধ করে দেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই (১৬১০ খৃস্টাব্দে) তিনি নিহত হন এবং মনে করা হয় যে, ধর্মের কারণে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করতে অস্বীকৃতির কারণেই তিনি নিহত হন।

"অতঃপর ১৬৮৫ খৃস্টাব্দে আবার নতুন করে নিপীড়ন শুরু হয় এবং অনেক মানুষ নিহত হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন : মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ৫০ হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।"

পুস্তিকা ত্রয়োদশের বক্তব্য এখানেই শেষ। আমি উক্ত পুস্তকের দ্বাদশ পুস্তিকা থেকে উপরের কথাগুলি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করেছি।

এ হলো প্রটেস্ট্যান্টদের উপর ক্যাথলিকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের কিছু ঘটনা। ক্যাথলিকদের উপর প্রটেস্ট্যান্টদের নিপীড়নের অবস্থাও প্রায় একই রকমের। আমি এখানে 'মিরআতুস্ সিদ্‌ক' (সত্যের দর্পণ) নামক গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ক কিছু কথা

উদ্ধৃত করছি। গ্রন্থটিকে ইংরেজি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেছেন টমাস এঙেগলস নামক একজন ক্যাথলিক পণ্ডিত। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উর্দু অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃস্টানদের নিকট গ্রন্থটি বহুল পরিচিত ও প্রচারিত।

এই গ্রন্থের ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "শুরুতেই প্রটেস্ট্যান্টগণ ৬৪৫টি মঠ, ৯০টি পাঠশালা, ২৩৭৬টি গির্জা ও ১১০টি হাসপাতাল জবরদখল ও লুণ্ঠন করে। তারা এগুলিকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে বা তাদের নেতৃবন্দ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। এ সকল স্থান থেকে হাজার হাজার অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে তারা বিবস্ত্র নগ্ন অবস্থায় বিতাড়িত করে।"

অতঃপর ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন : "তাদের লালসার হাত এমন লম্বা হয়েছিল যে, মৃতেরা পর্যন্ত রেহাই পায় নি। তারা মৃতদেহগুলিকেও কষ্ট দেয় এবং তাদের কাফন লুণ্ঠন করে।"

অতঃপর ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "এ সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে হারিয়ে যায় অনেক পাঠাগার-পুস্তক ভাণ্ডার। জি. বেল সেগুলির বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন : তারা অগণিত পুস্তক লুণ্ঠন করে। এসকল পুস্তকের পৃষ্ঠা তারা রান্নার আগুন জ্বালানোর জন্য, মোমদানি ও জুতা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করে। কিছু কিছু বই পুস্তক তারা মুদিখানার দোকানদার বা সাবান বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে। অনেক বই তারা বাঁধাইকারীদের মাধ্যমে সাগরের ওপারে বিক্রয় করে। এ সকল পুস্তকের সংখ্যা ১০০ বা ৫০ ছিল না, বরং গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই পুস্তক তারা এভাবে বিনষ্ট করেছে। তাদের এরূপ কর্মে অন্যান্য জাতির মানুষেরা অবাক হয়ে গিয়েছে। আমি একজন ব্যবসায়ীকে জানি যিনি এরূপ দুটি পাঠাগার ক্রয় করেছেন, প্রতিটি পাঠাগার মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে। এরূপ অত্যাচার করার পরে তারা গির্জার ভাণ্ডারে নগ্ন দেওয়ালগুলি ছাড়া আর কিছুই রেখে যায় নি। এরপরেও তারা মনে করে যে, তারা মর্যাদাবান মানুষ। তারা তাদের ধর্মের মানুষ দিয়ে গির্জাগুলি ভরে ফেলেছে।"

অতঃপর ৫২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রটেস্ট্যান্টগণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কত রকমের জুলুম-অত্যাচার করেছে তা আমরা এখন একটু পর্যালোচনা করি। অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা এক শতেরও বেশি আইন প্রণয়ন করেছে, যেগুলি সবই ন্যায়নীতি ও করুণার পরিপন্থি। এ সকল অন্যায় আইনের কতিপয় আইন আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

১- ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী তার পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লাভ করবে না।

২- কোন ক্যাথলিক ১৮ বছর বয়স হওয়ার পরে কোন ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে না। কেবল প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করলেই সে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার লাভ করবে।

৩- ক্যাথলিকদের কোন কার্যালয় থাকবে না।

৪- কোন ক্যাথলিক শিক্ষা খাতে কর্ম করতে পারবে না। যদি কেউ এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে তবে সে স্থায়ীভাবে কারারুদ্ধ হবে।

৫- ক্যাথলিক ধর্মালম্বী সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ কর প্রদান করবে।

৬- যদি কোন ক্যাথলিক পাদরি যাজক প্রার্থনা করে, তবে তাকে তার নিজের সম্পদ থেকে ৩৩০ মুদ্রা প্রদান করতে হবে। আর যাজক নয় এমন কোন ক্যাথলিক যদি প্রার্থনা করে তবে তাকে ৭০০ মুদ্রা প্রদান করতে হবে এবং তার এক বছরের জেল হবে।

৭- যদি কোন ক্যাথলিক তার সন্তানকে ইংল্যান্ডের বাইরে কোথাও লেখাপড়া করতে পাঠায় তবে উক্ত পিতা ও সন্তান উভয়কে হত্যা করা হবে এবং তার সকল সম্পত্তি ও পালিত পশু বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮- ক্যাথলিকগণ কোন রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করতে পারবে না।

৯- যে ক্যাথলিক রবিবার অথবা পর্বের দিনে প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চে উপস্থিত হবে না, তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ২০০ মুদ্রা (recusancy fines) গ্রহণ করা হবে এবং সে সমাজচ্যুত বলে গণ্য হবে। তাকে কোন রাষ্ট্রীয় পদ প্রদান করা হবে না।

১০- কোন ক্যাথলিক লন্ডন থেকে পাঁচ মাইল দুরত্বে কোথাও গমন করলে তার নিকট থেকে জরিমানা হিসেবে ১০০০ মুদ্রা গ্রহণ করা হবে।

১১- কোন ক্যাথলিক শাসক বা বিচারকের নিকট প্রচলিত আইনে বিচার প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করা হবে না।

১২- নিজ সম্পদ লুণ্ঠিত হবে ভয়ে কোন ক্যাথলিক পাঁচ মাইলের বেশি দূরে কোথাও গমন করত না এবং ১০০০ মুদ্রা জরিমানার ভয়ে কোন ক্যাথলিক কোন বিষয়ে প্রশাসক বা বিচারকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে পারত না।

১৩- ইংলিশ (প্রটেস্ট্যান্ট) চার্চের পদ্ধতিতে সম্পন্ন না হলে ক্যাথলিকদের বিবাহ কার্যকর করা হবে না, তাদের মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা হবে না, তাদের সমাধিস্থ করা হবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে বাপ্তাইজ করা হবে না।

১৪- যদি ক্যাথলিক ধর্মের কোন মহিলা বিবাহ করে তবে রাষ্ট্র তার যৌতুক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে। আর এই মহিলা তার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে না। তার স্বামী তার জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোন

কিছুর ওসীয়তও করতে পারবে না। ক্যাথলিকদের স্ত্রীদের স্বামীরা প্রতি মাসে ১০ মুদ্রা করে প্রদান না করলে অথবা তাদের ভূ-সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রকে প্রদান না করলে তাদেরকে আটকে রাখা হতো।

১৫- অতঃপর চূড়ান্ত বিধান প্রদান করা হয়, যদি তারা সকলেই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে আটক করা হবে এবং সারা জীবনের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করা হবে। যদি তারা এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, অথবা বিতাড়নের পরে বিনা অনুমতিতে আবার দেশে ফিরে আসে, তবে তাদের জন্য ভয়ঙ্করতম পরিণতি অপেক্ষা করত।

১৬- ক্যাথলিকদের হত্যার সময় এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ ও সৎকারের সময় কোন যাজক উপস্থিত থাকবেন না।

১৭- কোন ক্যাথলিকের বাড়িতে কোন অস্ত্র থাকবে না।

১৮- কোন ক্যাথলিক ৫ মুদ্রার চেয়ে বেশি দামি কোন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে পারবে না।

১৯- কোন ক্যাথলিক যাজক যদি তার যাজকীয় কর্ম পালন করেন তবে তাকে স্থায়ীভাবে কারারুদ্ধ করা হবে।

২০- ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী কোন যাজক-পাদরি যদি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মানুসারী না হন এবং তিন দিনের বেশি ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য করা হবে ও হত্যা করা হবে।

২১- কোন ব্যক্তি অনুরূপ কোন যাজককে তার বাড়িতে স্থান দিলে তাকেও হত্যা করা হবে।

২২- বিচারালয়ে কোন ক্যাথলিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

"উপর্যুক্ত আইনগুলির ভিত্তিতে রাণী ১ম এলিযাবেথের (Elizebeth I)[২৬৮] শাসনামলে ২০৪ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ১০৪ জন ছিলেন পাদরি বা যাজক। অবশিষ্ট ১০০ জন ছিলেন সম্পদশালী মানুষ। একটি মাত্র অপরাধেই এদের হত্যা করা হয়, তা হলো, তারা স্বীকার করেন যে, তারা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী। অন্য আরো ৯ জন যাজক ও মহান ব্যক্তি কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত্যু বরণ করেন। ১০৫ ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এদের অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়, ধন-সম্পদ ক্রোক করা হয় এবং তাদের সকল সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এভাবে তাদের পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

---

২৬৮. রাজা অষ্টম হেনরীর কন্যা। ১৫৫৮ থেকে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিলেন।

স্কটল্যান্ডের রাণী[২৬৯] মেরিকে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন রাণী এলিযাবেথের খালাতো বোন। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়।"

অতঃপর ৬১-৬৬ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, রাণী এলিযাবেথের নির্দেশে অনেক ক্যাথলিক সাধু, পাদরি ও পণ্ডিতকে জাহাজে করে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হয়। আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক জনগণকে জোরপূর্বক প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আয়ারল্যান্ডে গমন করে। তারা ক্যাথলিকদের গির্জাগুলি পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের হত্যা করে। জঙ্গলের বন্য পশু শিকার করার মতই তারা ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের শিকার করত। তারা কাউকেই নিরাপত্তা প্রদান করত না। কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করলেও এরপর তারা তাকে হত্যা করত। স্মর্ক দুর্গে যে সেনাবাহিনী ছিল তারা তাদেরকে হত্যা করে। তারা গ্রামের পর গ্রাম ও জনপদ পুড়িয়ে দেয়। তারা ফসল ও পশুপাল বিনষ্ট করে এবং বয়স ও সামাজিক মর্যাদার কোনরূপ তোয়াক্কা না করে নাগরিকদেরকে বিতাড়িত করে। এরপর ১৬৪৩ ও ১৬৪৪ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট জমিদারদের প্রেরণ করে ক্যাথলিকদের সকল সম্পদ ও ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য। কোনরূপ পার্থক্য না করে তারা সকল ক্যাথলিকের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। এভাবে

---

২৬৯. স্কটল্যান্ডের রাজা ৫ম জেমসের একমাত্র কন্যা মেরি স্টুয়ার্ট (Mary Stuart or Mary Stewart)। ১৫৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের মাত্র ৬ দিন পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে ১৫৪২ সালেই তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৫৬৭ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের রাণী ছিলেন। স্কটল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ডে প্রায় ২০ বছর বন্দীদশায় থাকার পর ১৫৮৭ সালে তার শিরোচ্ছেদ করা হয়। ৫ বছর বয়সে মেরির মাতা মেরিকে ফ্রান্সের রাজ পরিবারে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি ক্যাথলিক ধর্মমতের উপর লালিত হন। ১৫৬১ সালে মেরি স্কটল্যান্ডে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত স্কটল্যান্ডের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়। ১৫৬৭ সালে মেরি স্কটল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের ক্যাথলিকগণ প্রটেস্ট্যান্ট এলিযাবেথকে অপসারণ করে ক্যাথলিক মেরিকে সিংহাসনে বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৫৭০ সালে পোপ পঞ্চম পাইয়াস (Pius V) এলিযাবেথকে ধর্মচ্যুত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইংল্যান্ডের নাগরিকগণ এলিযাবেথকে প্রদত্ত আনুগত্যের শপথ পালন করতে বাধ্য নয়। তিনি তাদেরকে আনুগত্যের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। ১৫৮০ সালে পরবর্তী পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ফতওয়া প্রদান করেন যে, এলিযাবেথের মত একজন বিভ্রান্ত (heretic)-কে হত্যা করে বিশ্বকে পবিত্র করলে হত্যাকারীর কোন পাপ হবে না। এমতাবস্থায় ১৫৮৭ সালে এলিযাবেথের নির্দেশে মেরিকে হত্যা করা হয়।

ক্যাথলিকদের উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত থাকে রাজা প্রথম জেমস[২৭০] পর্যন্ত। তিনি জুলুম-অত্যাচার কিছুটা হালকা করেন।

১৭৭৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ক্যাথলিকদের উপর করুণা করে অত্যাচারমূলক আইনগুলির অবসান ঘটান।[২৭১] কিন্তু এতে প্রটেস্ট্যান্টগণ তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৭৮০ সালে ২রা মে ৪৪ হাজার প্রটেস্ট্যান্টের স্বাক্ষরিত এক আবেদন রাজার নিকট জমা দেয়। এতে তারা দাবি করে যে, পার্লামেন্ট যেন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক আইনগুলি আগের মতই বলবৎ রাখে। কিন্তু পার্লামেন্ট তাদের দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তখন এক লক্ষ প্রটেস্ট্যান্ট লন্ডনে সমবেত হয়ে বিভিন্ন গির্জায় অগ্নি সংযোগ করে এবং ক্যাথলিকদের বাড়িঘর ধ্বংস করে। এক স্থানের আগুনই ৩৬ স্থানে দৃশ্যমান ছিল। এই রায়ট ৬ দিন পর্যন্ত চলে। এরপর ১৭৯১ সালে রাজা অন্য এক আইনের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদেরকে অধিকার প্রদান করেন। এখন পর্যন্ত তারা এ সকল অধিকার ভোগ করছে।"

অতঃপর ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "আয়ারল্যান্ডের চার্টার স্কুলের (Charter School) অবস্থা কি আপনারা শোনেন নি ? এ কথা তো নিশ্চিত যে, প্রটেস্ট্যান্টগণ প্রতি বছর ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে এবং সবচেয়ে বড় স্থানগুলি ভাড়া নেয়। তারা এই অর্থ দিয়ে দরিদ্র ও অসহায় ক্যাথলিক সন্তানদের ক্রয় করে। এরপর তাদেরকে গাড়িতে করে অন্য এলাকায় প্রেরণ করে যেন তাদের পিতামাতারা তা দেখতে না পায়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, এ সকল হতভাগা যখন তাদের দেশে ফিরে আসে তখন তারা পরিচয় না জানার কারণে নিজেদের ভাই, বোন, পিতা বা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"

ক্যাথলিকদের 'মিরআতুস সিদ্‌ক' (সত্যের দর্পণ) গ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।

---

২৭০. রাজা প্রথম জেমস (James I) জন্ম, মৃত্যু ১৬২৫। স্কটল্যান্ডের বিতাড়িত রাণী মেরির একমাত্র পুত্র। জেমসের জন্মের পরের বছর ১৫৬৭ সালে মেরি স্কটল্যান্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। জেমস ১ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৩ সালে প্রথম এলিযাবেথের মৃত্যুর পরে তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসনও লাভ করেন এবং ১৬২৫ সাল পর্যন্ত 'গ্রেট ব্রিটেনের' রাজত্ব করেন। তাঁর নির্দেশে ও নেতৃত্বে ১৬১১ খৃস্টাব্দে বাইবেলের প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট অনুবাদ কিং জেমস ভারসন বা অথোরাইজড ভারসন প্রকাশিত হয়।

২৭১. ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের (George III: George William Fredrick) সময়ে (১৭৬০-১৮২০) রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত কঠোর নিপীড়নমূলক আইনসমূহ ক্রমান্বয়ে বাতিল করা হয় এবং ক্যাথলিকদের সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক চাকরীর অধিকার, ভোটাধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার অধিকার ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়া Catholic Emancipation নামে পরিচিত। ১৭৭৮ সালে The first Relief Act-এর মাধ্যমে ক্যাথলিকদের ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার প্রদান করা হয়।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের এক দল আরেক দলের উপর কিরূপ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু লিখছি না। কারণ এতে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে ভয় পাচ্ছি। এজন্য খৃস্টানদের সহিংসতা বিষয়ক আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, এরাই মুসলিমদের বা ইসলাম ধর্মের নিন্দা করেন। দেখুন কিভাবে এরা জুলুম, নিপীড়ন ও জবরদস্তির মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে!

পঞ্চম বিষয় : ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থা

ইসলামে জিহাদের বিধান নিম্নরূপ[২৭২] : কাফির বা অবিশ্বাসিগণকে প্রথমে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ

২৭২. ইসলামের জিহাদ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বৈ কিছুই নয়। রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের বৈধতা থাকতে হবে। আর যুদ্ধের পরিস্থিতি আসলে যুদ্ধের জন্য ত্যাগের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। 'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম, কষ্ট ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।" স্বভাবতই মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু অমুসলিম রাষ্ট্র। এজন্যই রাষ্ট্রীয় শত্রুদেরকে কাফির বা অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্য কোনভাবে কোন অযোদ্ধাকে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয় নি বরং জিহাদের বৈধতার জন্য অনেক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সেগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ, (২) শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির যে কোন সুযোগ গ্রহণ করা ও (৪) শুধু যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করা। মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ইসলামে জিহাদ বৈধ করা হয় নি। মক্কায় অবিশ্বাসীদের দ্বারা অত্যাচারিত শতশত মুসলিম অনেকবারই সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মক্কার সমাজপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধ বা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন নি। শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রচারের মাধ্যমে মদীনার মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনার মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলেন তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে" (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "রাষ্ট্রপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে" (বুখারী ও মুসলিম)। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সন্ধির নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে" (সূরা আনফাল, ৬১ আয়াত)। কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে : "তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না; আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসেন না" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০)। এই নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, বেসামরিক মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদির পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ হলো : যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোন মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোন শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না,

Contents

করে তবে তারা সকল বিষয়ে অন্যান্য মুসলিমদের মতই অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে আরব উপদ্বীপের মানুষ ও অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক বিধান রয়েছে। আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বিধান যে, তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। মোশির ব্যবস্থায় ৭ জাতির ক্ষেত্রে এবং ধর্মত্যাগী, প্রতিমা-পূজক এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতার সেবায় প্ররোচনা দানকারীর ক্ষেত্রে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল ইসলামে

না, কোন মহিলাকে হত্যা করবে না, কোন সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোন জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোন প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোন গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ্ দয়াকারী, কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন (আবূ দাউদ ও বায়হাকী)। বাইবেলের গণহত্যার নির্দেশের সাথে কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশের তুলনা করলে যে কোন ধর্মের যে কোন পাঠক পার্থক্য অনুভব করবেন। অনেকে স্বীকার করবেন যে, ইসলাম যুদ্ধকে সবচেয়ে মানবিক ও সবচেয়ে কম সহিংস করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্র থাকবে অথচ যুদ্ধের অনুমতি থাকবে না, অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলেও 'ডান গালে চড় খেয়ে বাম গাল এগিয়ে দেওয়ার' নীতি অনুসরণ করতে হবে বলে যদি কেউ দাবি করেন তবে তাকে পাগল বা ভণ্ড বলা ছাড়া উপায় থাকে না। যুদ্ধের আশংকা স্বীকার করে, প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানসহ ইসলামে সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইবেলীয় ভাববাদিগণের যুদ্ধের সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর যুদ্ধগুলি তুলনা করে দেখলে যে কোন পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তিনি কিভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যুদ্ধকে কম ধ্বংসাত্মক করার। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু শত্রুপক্ষের নাগরিক ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বা বস্তুকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মীয় আলোচনা বা বিতর্কে সর্বোচ্চ শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না" (সূরা আন'আম, ১০৮ আয়াত)। অন্যত্র বলা হয়েছে : "তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না" (সূরা আনকাবূত, ৪৬ আয়াত)। অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে : "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই" (সূরা বাকারা, ২৫৬ আয়াত)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীদের অনেকের সন্তান ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন (তাবারী, ইবনু কাছীর, ইবনু হিব্বান)। মুসলিম মানস এমনভাবেই তৈরি যে, সে কখনোই অন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বা কাউকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। খৃষ্টধর্মের ইতিহাসই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার ইতিহাস। খৃষ্টান পোপ, চার্চ ও শাসকদের হাতে কোটি কোটি ইহুদী, মুসলমান, তথাকথিত ডাইনী (Witch), তথাকথিত ধর্মদ্রোহী (heretic) , বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা চিন্তাবিদ নির্মমভাবে নিহত বা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ একটি ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আরবদের ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সকল রাষ্ট্র ও দেশের ক্ষেত্রে বিধান এই যে, যদি যুদ্ধ শুরু হয় বা যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে তাদেরকে সন্ধি করতে বা কর প্রদান ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করতে আহ্বান করা হবে। যদি তারা তাতে রাজি হন তবে তারা তাদের জীবন, ধর্ম ও সম্পদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করবেন। অধিকার ও মর্যাদায় তাদের রক্ত ও সম্পদ মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদের সাথে সমমর্যাদার বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা সন্ধি বা কর প্রদানে অসম্মত হন তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য ইসলামে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে সেগুলি রক্ষা করতে হবে। ইসলামী ফিকহের পুস্তকগুলিতে এ সকল শর্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধনীতির বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ যে সকল ভিত্তিহীন আজগুবি তথ্য পেশ করেন তা হয় সম্পূর্ণ বানোয়াট গালগল্প অথবা অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র। আমি এখানে পারস্যের সেনাপতির কাছে প্রেরিত মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রা)-এর পত্র এবং সিরিয়ার খৃস্টানদেরকে দেওয়া দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পত্র উদ্ধৃত করছি যেন জ্ঞানী পাঠক যুদ্ধ বিষয়ে মুসলিমদের নীতি বুঝতে পারেন।

প্রথম পত্রটি নিম্নরূপ

"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। খালিদ ইবনু ওয়ালীদের পক্ষ থেকে পারস্যের জনগণের সাথে রুস্তম ও মিহরানের প্রতি। যারা সত্যপথের অনুসরণ করেন তাদের প্রতি শান্তি। অতঃপর, আমরা আপনাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যদি আপনারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তবে আপনারা বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করুন। যদি আপনারা তাও অস্বীকার করেন, তবে জেনে রাখুন, আমার সাথে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হতে ভালবাসেন। পারস্যবাসিগণ যেমন মদ ভালবাসে তেমনি এরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যু ভালবাসেন। আর যারা সত্যপথের অনুসারী তাদের প্রতি শান্তি।"

দ্বিতীয় পত্রটি নিম্নরূপ

"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র দাস বিশ্বাসীদের প্রধান (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়াবাসীদের (যিরূশালেম-ফিলিস্তিনবাসীদের) প্রতি এই নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছি তাদের জীবনের, তাদের গীর্জা-চার্চ ও উপাসনালয়সমূহের, তাদের ক্রুশসমূহের, তাদের অসুস্থদের এবং তাদের সুস্থদের।

আমরা এই মর্মে নিরাপত্তা প্রদান করছি যে, তাদের গীর্জা ও উপাসনালয়গুলি এবং তাদের ক্রুশসমূহ দখল করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না, সেগুলির কোন কমতি করা হবে না, তাদেরকে তাদের ধর্মের বিষয়ে কোনরূপ জবরদস্তি করা হবে না, তাদের কাউকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া হবে না এবং যিরূশালেমে কোন ইহূদী বসবাস করবে না।[২৭৩] যিরূশালেমবাসীর দায়িত্ব যে, অন্যান্য শহরের মানুষেরা যেরূপ কর প্রদান করে তদ্রূপ কর তারা প্রদান করবে, তারা তাদের মধ্য থেকে যিরূশালেমের স্থায়ী বাসিন্দা নন এরূপ বহিরাগত রোমানদেরকে (তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসী, কিন্তু যিরূশালেমের স্থায়ী বাসিন্দা নয়) এবং চোর-ডাকাত বা অপরিচিতদেরকে বের করে দেবে। যদি বহিরাগতরা যিরূশালেম ত্যাগ করে চলে যায় তবে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছান পর্যন্ত তাদেরকে তাদের জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যদি এরূপ বহিরাগতদের কেউ যিরূশালেমে অবস্থান করতে চায় তবে তাকেও নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, তবে তাকে অন্যান্য যিরূশালেমবাসীর ন্যায় কর প্রদান করতে হবে। আর যিরূশালেমের অধিবাসীদের কেউ যদি তার উপাসনালয় এবং ক্রুশ-মূর্তিগুলি খালি করে তার ধন-সম্পদ নিয়ে রোমানদের সাথে চলে যেতে চায় তবে তাকে তার কাঙ্খিত নিরাপদ স্থানে পৌছান পর্যন্ত তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয় ও ক্রুশ-মূর্তিগুলির পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। অন্যান্য দেশের যে সকল মানুষ যিরূশালেমে অবস্থান করছে তারা চাইলে যিরূশালেমে থেকে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য যিরূশালেমবাসীর মতই তাকে কর দিতে হবে। আর তারা চাইলে তাদের নিজ দেশে চলে যেতে পারে। আমরা নিরাপত্তা প্রদান করছি যে, ফসল কেটে ঘরে না তোলা পর্যন্ত যিরূশালেমবাসীর নিকট থেকে কোন কর গ্রহণ করা হবে না। এই পত্রে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত বিষয়গুলির জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ম ও যিম্মাদারি, তাঁর রাসূলের (সা) যিম্মাদারি, মুসলিম শাসকদের

২৭৩. খৃস্টানদের দাবি অনুসারে তাদের ধর্মীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে উমর (রা) এই নিরাপত্তা প্রদান করেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ৭০ খৃস্টাব্দের দিকে রোমান সম্রাট টিটাসের সময়ে তৎপুত্র পরবর্তী সম্রাট ভ্যাসপাসিয়ান যিরূশালেম ধ্বংস করেন এবং সেখান থেকে ইহূদীদেরকে বহিস্কৃত করেন। এরপর ইহূদীদের পুনঃপুন বিদ্রোহের মুখে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান ১৩৬ খৃস্টাব্দে যিরূশালেমের ধর্মধাম সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে তথায় জুপিটারের মূর্তি ও মন্দির স্থাপন করেন এবং ইহূদীদের জন্য বছরে একটি দিন বাদে অন্য কোন সময়ে যিরূশালেমে প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। এর প্রায় দুই শত বছর পরে সম্রাট কন্সটান্টাইনের সময়ে খৃস্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তখন থেকে খৃস্টানগণ যিরূশালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারা ইহূদীদেরকে যিরূশালেমে বসবাস করতে দিতেন না এবং বছরে একটি দিন বাদে অন্য কোন সময় তাদেরকে তথায় প্রবেশ করতে দিতেন না। এই পরিস্থিতিতেই উমর (রা)-এর সময়ে ৬৩৭ খৃস্টাব্দে (১৫ হিজরীতে) যিরূশালেম ও ফিলিস্তিন মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে আসে। এ সময়ে উমর (রা) যিরূশালেমের খৃস্টানদেরকে এই নিরাপত্তা প্রদান করেন।

যিম্মাদারি ও সকল মু'মিনের যিম্মাদারি ঘোষণা করা হলো, যতক্ষণ তারা তাদের প্রতিশ্রুত কর প্রদান করবে। এই চুক্তির সাক্ষী সাহাবীগণের মধ্য থেকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস, আবদুর রাহমান ইবনু আউফ এবং মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম আজমা'ঈন)।"

সকল মানুষ স্বীকার করেন যে, আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) ইসলামের বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন ও সুদৃঢ় ছিলেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের জিহাদ ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় জিহাদ। তিনি নিজে যিরূশালেমের অবরোধে উপস্থিত হন। যিরূশালেম অধিকার করার পরে খৃস্টানগণ কর প্রদানে রাজি হলে তিনি একজন খৃস্টানকেও হত্যা করেন নি। কাউকে তিনি ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে জবরদস্তি করেন নি।[২৭৪] তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। খৃস্টান ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাকারগণও এ কথা স্বীকার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক এ বিষয়ে টমাস নিউটনের বক্তব্য দেখেছেন। আর খৃস্টানগণ যিরূশালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পরে মুসলিম ও ইহূদীদের বিরুদ্ধে কি বর্বর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তাও পাঠক এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত গবেষকের বক্তব্য থেকেই জেনেছেন।

মোশির ব্যবস্থায় জিহাদ বা বাইবেলীয় জিহাদ এবং মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যবস্থার (শরীয়তের) জিহাদের মধ্যে যে সকল মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেগুলির অন্যতম :

(১) বাইবেলীয় জিহাদে বিধর্মী বা অবিশ্বাসীদের সংশোধনের বা বাইবেলীয় ধর্ম গ্রহণের কোন সুযোগ রাখা হয় নি। সংশোধন বা পরিবর্তনের কোন সুযোগ ছাড়াই বিধর্মীদেরকে বা ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে

২৭৪. জবরদস্তি তো দূরের কথা, ইসলামের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় নি যে, মুসলিমগণ বিজিত দেশের অমুসলিম মানুষদের দ্বারে দ্বারে, জনসমাবেশে ধর্ম প্রচার করছেন বা কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধ করেছেন। বিজিত দেশের মানুষদের কর গ্রহণ করেছেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সামগ্রিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন। কাউকে কখনো বিশ্বাসের বিষয়ে, ধর্মের বিষয়ে কোনরূপ বিরক্ত করেন নি। কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বাধা দেন নি। ইসলাম যতটুকু প্রচার লাভ করেছে তা একান্তই ইসলামের নিজের সত্যতার কারণে। মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে অমুসলিমগণ ইসলামের আলো অনুভব করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আজো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোনরূপ নিয়মতান্ত্রিক বা সুসংবদ্ধ প্রচার ছাড়াই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। পক্ষান্তরে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন কর্তৃক খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত খৃস্টধর্মের ইতিহাসই প্রচারের নামে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার, সম্ভব হলে জবরদস্তি করে ধর্মান্তর করা, না হলে কৌশলে, প্রতারণা করে বা ধোঁকা দিয়ে ধর্মান্তর করা। ধর্মান্তর করা সম্ভব না হলে ইনকুইজিশনের নামে, ক্রুসেডের নামে, ধর্মীয় আদালতের নামে বা হেরেটিকদের বিচারের নামে ভিন্নধর্মী বা ভিন্ন মতাবলম্বীকে হত্যা করা বা আগুনে পুড়িয়ে মারা।

ইসলামে প্রথমে সুন্দর আলোচনা, উপদেশ ও সংলাপের মাধ্যমে অমুসলিমকে ইসলামের পথে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে বিশ্বাসিগণ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যুদ্ধরত বিধর্মীগণ সংশোধন না হলে যুদ্ধ করা এবং তার আগে তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় বা আপত্তি থাকতে পারে না। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে : "দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, (ইহাতেই আমার সন্তোষ)।" যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৫ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।"

(২) বাইবেলে নারী ও শিশু হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত উপর্যুক্ত ৭ জাতির বয়স নির্বিশেষে সকল নারী ও শিশুকে হত্যা করতে বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে নারী ও শিশুদের হত্যা সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। এমনি আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে যেখানে যুদ্ধের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে সেখানেও আরব উপদ্বীপের কোন পৌত্তলিক শিশু বা মহিলাকে হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যবস্থায় ৭ জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[২৭৫]

ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদরিগণের অপপ্রচার খণ্ডনের পূর্বে উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয় আমি ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করলাম। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারছি যে, ঐশ্বরিক নির্দেশনা বা বাইবেলের বিধানের আলোকে ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ আপত্তি থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে জ্ঞান, বিবেক বা যুক্তির আলোকেই ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ আপত্তি থাকতে পারে না। বাইবেলের নির্দেশ বা ঐশ্বরিক প্রেরণা ও নির্দেশের আলোকে ইসলামী জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি বা আপত্তিকর কিছু নেই তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। এখন আমি জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করব।

---

২৭৫. পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলীয় জিহাদ ও ইসলামের জিহাদের মধ্যে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। বাইবেলে অযোদ্ধাদেরকে হত্যা করার, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার, নির্যাতন করে হত্যা করার, যুদ্ধ ছাড়াই প্রবঞ্চনা ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মাধ্যমে বিধর্মীদের ধনসম্পদ হরণ করার এবং যুদ্ধ ছাড়াও নিরস্ত্র বিধর্মীদেরকে কৌশলে বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। এ সকল কর্ম সবই ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, কর্মের জগতে সংস্কারের পূর্বে চিন্তার জগতে সংস্কারের প্রয়োজন। কর্মের সংস্কারের পূর্বে বিশ্বাসকে সংশোধন করতে হয়। সকল ধর্মের সকলের নিকটেই এ কথা অনস্বীকার্য সত্য। তাদের সকলের মতেই বিশ্বাস ছাড়া শুধু সৎকর্ম বা ধার্মিকতায় কোন লাভ নেই। খৃস্টানগণ আমাদের সাথে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না। কারণ তাদের মতে যীশুর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ধার্মিকতা ও সৎকর্ম মুক্তি দিতে পারে না। তাদের বিশ্বাস অনুসারে যীশুতে বিশ্বাসী একজন পাপী, কৃপণ, অহংকারী, জালিম ও পরদ্রব্য লুণ্ঠনকারীর চেয়ে যীশুতে অবিশ্বাসী একজন দানশীল, মানবসেবক ও বিনয়ী ব্যক্তি অধিক দুষ্ট ও অধার্মিক বলে গণ্য।

বিশুদ্ধ মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথাও প্রমাণিত যে, অনেক সময় মানুষ নিজের ভুল ও অন্যায় সম্পর্কে অন্য কেউ সচেতন করলে সচেতন হন। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ সত্যকে অনুভব ও অনুধাবন করার পরেও নিজের বা নিজ দল, গোষ্ঠীর বা জাতির মর্যাদা ও শক্তির কারণে সত্যকে মানেন না। তিনি তার দলের, মতের, জাতির বা গোষ্ঠীর বাইরের কোন মানুষের কথার প্রতি কর্ণপাত করেন না। তিনি এরূপ ব্যক্তির কথা শুনতেই চান না, বিশেষত যদি সেই কথা তার দল, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রকৃতি, প্রচলন বা রীতিনীতির বিরোধী হয় এবং সে সত্য গ্রহণ করলে তাকে দৈহিক উপাসনা ও সম্পদ ব্যয়ের মত কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে তিনি সত্যকে অনুধাবন করার পরেও মানবীয় দুর্বলতার কারণে অথবা নিজ দল, গোষ্ঠী বা জাতির অত্যাচার বা তিরস্কারের ভয়ে সত্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু যদি সত্যগ্রহণের পথে বাধা দেওয়ার মত এরূপ শক্তি অপসারিত হয়, তবে সত্য গ্রহণ ও স্বীকার করা মানুষের জন্য সহজতর হয়। এক্ষেত্রে তিনি সত্যকে বিচার করা ও হৃদয়ের সাক্ষ্যকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মত পরিবেশ লাভ করেন।

এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথাও প্রমাণিত যে, শত্রু যদি দেখে যে, প্রতিপক্ষ আয়েশী হয়ে পড়েছে অথবা বৈরাগী, 'অতি-শান্তিপ্রিয়' বা 'মহা-শান্তিবাদী' হয়ে পড়েছে তখন সে তার রাষ্ট্র দখল করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। অতীতের সকল রাষ্ট্রের পতনের এটিই মূল কারণ। আর শত্রুর অধিকারে যাওয়ার পরে সেই রাষ্ট্র বা জাতির ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধিত হয়।

আর এ কারণেই সকল খৃস্টান সম্প্রদায় তাদের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের 'শান্তির বাণী' পরিত্যাগ করে 'শক্তির' পথে চলেছেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলেন, ব্যাপ্টিজমের মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রত্যেক খৃস্টানের উপরে প্রকৃত জাগতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং ব্যাপ্টিজমের সাথে সাথে সকল

খৃস্টান চার্চের প্রকৃত প্রজায় পরিণত হন। তাকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুগত থাকতে হবে এবং তার নির্দেশ মান্য করতে হবে। চার্চের দায়িত্ব যে, সকল অবাধ্য ও পাপীকে সে চার্চীয় শাস্তি ও দণ্ড প্রদান করবে এবং যারা তাদের বিভ্রান্তি পরিত্যাগ করতে রাজি হবে না এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াবে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে সমর্পণ করবে যেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে চার্চ নির্দেশিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। আর এভাবে যে কোন প্রকারের শাস্তি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যাথলিক বিশ্বাস ও চার্চীয় রীতিনীতি সংরক্ষণ করার অধিকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের রয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের এই বক্তব্য ও মূলনীতি উদ্ধৃত করেছেন প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান তাঁর সংকলিত ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত 'আস-ছালাছ আশরাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) নামক আরবী সংকলন গ্রন্থের ১২শ পুস্তিকার ৩৬০ পৃষ্ঠায়।

আর ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ বলেন, বৃটেনের মহামান্য রাজা (অথবা রাণী) বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং তাঁর অধীন সকল দেশের সর্বোচ্চ বিধায়ক ও মালিক। সকল অবস্থায় ও ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক তিনি। তাঁর রাজত্বের কেউ কোনভাবে অন্য কারো কর্তৃত্বাধীন হতে পারবে না। রাজা ও শাসকদের নির্দেশে খৃস্টানগণ অস্ত্রধারণ করবেন এবং যুদ্ধ করবেন। তাদের ধর্মবিশ্বাসের ৩৭ ধারায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উভয় খৃস্টান সম্প্রদায়ই যীশুর 'অহিংসার' বাণী পরিত্যাগ করলেন। যীশু বলেছেন : "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। ৪০ আর যে আমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙ্রাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। ৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। ৪২ যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও।"[২৭৬]

তারা তাদের ধর্মের বিশ্বাস ও মূলনীতি হিসেবে যা নির্ধারণ করেছেন তা যীশুর এ সকল কথার বিপরীত (খৃস্টানগণ যদি খৃস্টের এই নির্দেশ পালন করত তবে বিশ্ব অনেক ধ্বংস ও বর্বরতা থেকে রক্ষা পেত), আমি বেশি না বলে শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে, খৃস্টানগণ যদি খৃস্টের এই নির্দেশ পালন করত তবে ভারতে তাদের রাজত্ব

২৭৬. মথি ৫/৩৯-৪২। আরো দেখুন: লূক ৬/২৯-৩০।

কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। ভারতীয়গণ বিনা কষ্টেই তাদেরকে বের করে দিতেন।২৭৭

একজন প্রাজ্ঞ রসিক পণ্ডিত—আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন২৭৮, যীশুর উপর্যুক্ত বক্তব্যের বিষয়ে বলেন, "এখানে মানুষকে এমন একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা পালন করা তার সাধ্যের বাইরে।

"কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। (যীশুর শিষ্যদের মত) কিছু জেলে, যাদের কোন চোগাই নেই তাদেরকে হয়ত অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে এই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া কোন মানুষকেই এই নির্দেশ পালনে বাধ্য করা সম্ভব নয়।"

এরপর তিনি বলেন, "দুষ্টের প্রতিরোধ না করা এবং এক গালে চড় খেলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়া বিষয়ক এই খৃষ্টীয় নির্দেশ সম্পর্কে মার্ক ও যোহনের সুসমাচারে

---

২৭৭. সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে, খৃস্টান ধর্মগুরুগণ খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন, রাজার নির্দেশে যুদ্ধে গমনকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেন, ক্রুসেডের ঘোষণা দেন। কিন্তু যখন খৃস্টানগণ কর্তৃক পরদেশ দখল, ধ্বংস, গণহত্যা ইত্যাদির বিষয়ে বলা হয়, তখন বলেন, এগুলি রাজাদের অন্যায়, কোন রাজা বা রাজ্য খৃস্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। খৃস্টধর্ম এগুলির জন্য দায়ী নয়... ইত্যাদি। আমরা দেখেছি যে, শুধু খৃস্টান রাজাগণই নন, খৃস্টান চার্চ ও স্বয়ং পোপও ধর্মের নামে যুদ্ধ, সহিংসতা, গণহত্যা ও জুলুম-উৎপীড়নে লিপ্ত হয়েছে। খৃস্টানগণ পোপের "অভ্রান্ততা"-য় (infallibility) বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস অনুসারে চার্চ ও পোপ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ধর্মের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত দেন তা অভ্রান্ত, সকল ভুলের উর্ধ্বে এবং ঈশ্বরের নির্দেশ বলেই গণ্য। কিন্তু যখন পোপদের ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড, গণহত্যা ও ধর্মীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের কথা বলা হয়, তখন তারা বিভিন্নভাবে পাশ কাটিয়ে বলতে চান, এগুলি সংঘাত, সহিংসতা, গণহত্যা ও নিপীড়নে লিপ্ত! খৃস্টানদের বাইবেল সহিংসতায় ও জাতিগত বৈষম্যের শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এরপর তারা দাবি করবেন, খৃস্টধর্ম অহিংস, ঈশ্বরই প্রেম। চার্চের একান্ত অনুগত খৃস্টান ছাড়া অন্য কাউকে ঈশ্বর প্রেম করেন বলে চার্চের ইতিহাস থেকে বুঝা যায় না।

২৭৮. এখানে প্রাজ্ঞ রসিক পণ্ডিত বলতে গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ আরবীয় পণ্ডিত আহমদ ফারিস শিদইয়াককে বুঝাচ্ছেন। তিনি উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবীয় কবি, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক ছিলেন। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে তিনি লেবাননের এক প্রসিদ্ধ খৃস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন 'ফারিস'। লেবানন ও মিসরে উচ্চশিক্ষা ল্যাভের পরে তিনি প্রায় তিন দশক খৃস্টধর্ম প্রচার, মিশনারী ও যাজকীয় দায়িত্বাদির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ১৮৪৮ সালে লন্ডনের বাইবেল সোসাইটি তাঁকে আরবী ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তিউনিসে গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে 'আহমদ ফারিস' রাখেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বছর সাহিত্য, কবিতা, সমাজসেবা ও ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখার পরে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে প্রায় ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। গ্রন্থকার উদ্ধৃত এই বক্তব্যটি তাঁরই।

কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। যদিও খৃস্টান জগতের সকলেই এ বিধান পালন না করার বিষয়ে একমত। তাদের কেউই এই নির্দেশ কখনোই পালন করেন নি বা করেন না, তবুও এই খৃস্টীয় নির্দেশ নিয়ে তাদের গৌরব ও কথার ফুলঝুরির শেষ নেই। এই নির্দেশটি দিয়ে তারা তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান। খৃস্টের এতবড় একটি নির্দেশ কিভাবে মার্ক ও যোহন অবহেলা করলেন ও এড়িয়ে গেলেন ? অথচ তাঁরা দুজনে অন্য দুজনের সাথে মিলে গর্দভ শাবকের গল্প ঘটা করে লিখলেন ?[২৭৯] এই কি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের নিয়ম ? এভাবেই কি সুসমাচার রচনা করেছেন তাঁরা ? একান্তই গুরুত্বহীন ফালতু বিষয়গুলি ঘটা করে লিখলেন, অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় শিক্ষাটি এড়িয়ে গেলেন। বিশেষ করে যীশু তো তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এখানে একটি ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। যে দু'জন সুসমাচার লেখক যীশুর এই নির্দেশটি উল্লেখ করেছেন তারা অন্যেরা পালন করবে আশাতে উল্লেখ করেছেন। আর যে দু'জন তা উল্লেখ করেন নি তাঁরা নিজেদের পালনের ভয়ে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই নির্দেশ উল্লেখ করলে নিজেদেরকেই তো তা পালন করতে হবে, কাজেই পালন করার ভয়ে তাঁরা তা উল্লেখ করা থেকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

"কোন কোন নাস্তিক পণ্ডিত বলেন, দুষ্টের প্রতিরোধ না করা এবং এক গালে চড় খেলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে খৃস্টের যে নির্দেশগুলি নিয়ে খৃস্টানগণ খুব গৌরব প্রকাশ করেন এগুলির ধর্মীয় অবস্থান আগে চিহ্নিত করতে হবে। এই নির্দেশগুলি হয় ঔচিত্যবোধক উপদেশ বলে গণ্য হবে, অথবা এগুলি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান (ফরয/compulsory) বলে গণ্য হবে। যদি এগুলি ঐচিত্যবোধক উপদেশ বলে গণ্য হয় তবে এগুলি ভাল উপদেশ যা বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে পালন করা ভাল। তবে এ অর্থে এরূপ নির্দেশ খৃস্টধর্মের একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং অন্যান্য ধর্মেও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। আর দুষ্টের প্রতিরোধ না করার ও এক গালে চড় খেলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়া যদি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান হয় তবে নিঃসন্দেহে এই খৃস্টীয় নির্দেশের মাধ্যমে সকল অশান্তি ও অকল্যাণের মহাদ্বার উন্মোচিত হবে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র, সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

উপরের আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম যে সকল শর্তসহ জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে বৈধ করেছে সে সকল শর্তসহ জিহাদের বৈধতা কোনভাবেই যুক্তি ও বিবেকের বিপরীত নয়।[২৮০]

---

২৭৯. মথি ২১/১-৭; মার্ক ১১/১-৭; লূক ১৯/২৯-৩৫; যোহন ১২/১৪-১৫।

২৮০. যুদ্ধের বৈধতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কখনো কখনো যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সভ্যতার একমাত্র দাবি যে, যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক রাখা এবং অসামরিক লক্ষ্যবস্তুকে যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখা। শরীয়তে মুহাম্মাদীতে এটাই করা হয়েছে। যেখানে বাইবেলীয় যুদ্ধ যথাসম্ভব বেশি রক্তপাত, নির্যাতন ও অপ্রয়োজনীয় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে

এখানে একটি গল্প মনে পড়ল, যা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। ভারতের বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চলের এক মুফতির কার্যালয়ে এক পাদরি এসে বলেন, মাননীয় মুফতী সাহেব, মুসলিমদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমি উত্তরদাতাকে এক বছর সময় দেব আমার প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার জন্য। তখন মুফতী সাহেব তাঁর আদালতের তত্ত্বাবধায়ককে ইশারা করেন পাদরি মহাশয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে। উক্ত কর্মকর্তা রসিক মানুষ ছিলেন। পাদরি মহাশয়ের সাথে তাঁর নিম্নরূপ কথোপকথন হয়:

তত্ত্বাবধায়ক : পাদরি মহাশয়, আপনার প্রশ্নটি কি ?

পাদরি : আপনাদের নবী দাবি করলেন যে, তাঁকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোশিকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হলো না, যীশুকেও (ঈসাকে) জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হলো না, অথচ আপনাদের নবীকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হলো। তার কারণ কী ?

তত্ত্বাবধায়ক : আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আমাকে এক বছর সময় প্রদান করতে চাচ্ছেন ?

পাদরি : হ্যাঁ।

তত্ত্বাবধায়ক : দুটি কারণে আমরা আপনার কাছে সময় চাচ্ছি না, বরং এখনই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথম কারণ, আমরা ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করি; ছুটির দিন ছাড়া আমাদের কোন অবসর নেই। কাজেই আমাদেরকে এক বছরের ছুটি ও অবসর কে প্রদান করবে ? আর দ্বিতীয় কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন সময়ের বা চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই নেই। একজন নিম্ন-জজের (সহকারী জজের) বিষয়ে আপনি কি বলেন, যদি তাঁর কাছে প্রমাণিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি প্রকৃতই হত্যার অপরাধে অপরাধী, তাহলে বৃটিশ আইন অনুসারে কি তিনি হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন ?

ইসলামে যুদ্ধকে যথসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলে অযোদ্ধা বা পরাজিত শত্রুকে ধর্মের কারণে জবাই করা বা হত্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে কাউকে ধর্মের কারণে হত্যা তো দূরের কথা— সামান্যতম মানসিক কষ্ট দেওয়া বা তার ধর্মে পূজনীয় বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধের শর্তাবলির পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুদ্ধের সাথে বাইবেলীয় ভাববাদিগণের যুদ্ধের তুলনা করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। বস্তুত যুদ্ধের মত ধ্বংসাত্মক কর্মকেও ইসলামে মানবীয় রূপ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা, জাতিসংঘ এবং জেনেভা কনভেনশন যে যুদ্ধের স্বীকৃতি দেয় তার প্রকৃতরূপ কেবল ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার মধ্যেই পাওয়া যায়।

পাদরি : না, তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন না, বরং তিনি এই হত্যাকারীকে তাঁর ঊর্ধ্বতন বিচারক বা সেশন জজের নিকট প্রেরণ করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক : এই ঊর্ধ্বতন বা সেশন জজের নিকট যদি প্রমাণিত হয় যে, লোকটি সত্যই খুনি, তবে কি তিনি বৃটিশ আইন অনুসারে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন ?

পাদরি : না। কারণ তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য অনুমোদন বা নির্দেশ লাভ করেন নি। তাঁর পদের দায়িত্ব যে, তিনি দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন বিচারককে এ বিষয়ে জানাবেন। এই ঊর্ধ্বতন বিচারক থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায় হলে তারপর সেশন জজ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেবেন।

তত্ত্বাবধায়ক : এরা তিনজনই কি একই বৃটিশ রাজ্যের কর্মকর্তা নন ?

পাদরি : হ্যাঁ, তবে পদমর্যাদার পার্থক্যের কারণে তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতার পার্থক্য থাকে

তত্ত্বাবধায়ক : এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজের কথা থেকেই সুস্পষ্ট হয়েছে। এখন আপনি জেনে রাখুন যে, মোশি ও যীশু প্রথম দুই বিচারকের পর্যায়ের এবং আমাদের নবী তৃতীয় সর্বোচ্চ বিচারকের পর্যায়ের। প্রথম দুই বিচারকের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমোদন না থাকার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তৃতীয় সর্বোচ্চ বিচারপতিও এরূপ অনুমোদন ও ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না। তেমনি প্রথম দুই ভাববাদীর জিহাদ করার অনুমতি না থাকা প্রমাণ করে না যে, তৃতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদীও এরূপ অনুমোদন ও ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না।

এ কথায় পাদরি মহাশয় লা-জওয়াব হয়ে চলে যান।[২৮১]

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপরের আলোচনা পাঠ করলে এবং অন্ধ উগ্রতা ও অযৌক্তিক গোঁড়ামি বাদ দিয়ে তা বিচার করলে যে কোন পাঠক স্বীকার করবেন যে, বাইবেলে বা মোশির ব্যবস্থায় জিহাদের জন্য যে পর্যায়ের উগ্রতা, সহিংসতা ও ধর্মত্যাগীকে বা ধর্মত্যাগে উৎসাহ দানকারীকে হত্যা করার যে পর্যায়ের নির্দেশ রয়েছে তা ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সহিংস, উগ্র ও ধ্বংসাত্মক। মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থায় জিহাদের ক্ষেত্রে এ সকল উগ্রতা ও অপ্রয়োজনীয় ধ্বংস ও

২৮১. আমরা দেখেছি যে, মূল প্রশ্নটির ভিত্তিই মিথ্যার উপরে। বাইবেল থেকে আমরা দেখেছি যে, মোশিকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশ ও বাইবেলের সকল নির্দেশ পালন ও পরিপূর্ণ করার জন্যই যীশুর আগমন বলে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও যদি প্রকৃতই মোশি ও যীশুর জন্য জিহাদের নির্দেশ না থাকত তবুও মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্য অনুমোদন ও নির্দেশ থাকা আবশ্যক ছিল তা এ উত্তর থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

সহিংসতা রোধ করে একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই জিহাদের বিষয়ে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ ইসলামের বা মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেন তা শুধু মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। বড় অবাক লাগে যে, তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে বা ইসলামের নবীর (সা) বিরুদ্ধে এরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ ও বিষোদগার করেন, অথচ নিজেদের পূর্বসূরিগণ কিভাবে জুলুম, অত্যাচার ও জবরদস্তি করে তাঁদের ধর্ম প্রচার করেছেন এবং ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে কিভাবে নিপীড়নমূলক আইনকানুন তৈরি করেছেন সেগুলি একটুও পর্যালোচনা করেন না।

জিহাদ বিষয়ক অভিযোগের প্রত্যুত্তরের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। এজন্য এ বিষয়ে পাদরি মহোদয়গণের পুস্তকাদিতে যে সকল প্রলাপ রয়েছে তা আর আলোচনা করছি না। উপরে যা লিখেছি তাই তাঁদের এ সকল প্রলাপের বাতুলতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় অভিযোগ : অলৌকিক চিহ্ন বিষয়ক অভিযোগ

খৃস্টান পাদরিগণ বলেন, নবুওয়ত বা ভাববাদিত্বের অন্যতম শর্ত যে, নবুওয়তের দাবিদার অলৌকিক চিহ্ন বা মু'জিযা প্রদর্শন করবেন। মুহাম্মাদ (স) কোন মু'জিযা বা অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করেন নি। কুরআনের অনেক আয়াত থেকে তা জানা যায়।

এ বিষয়ে সূরা আন'আমে বলা হয়েছে : "তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফায়সালাকারী-দিগের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[২৮২]

এই সূরাতেই আরো বলা হয়েছে : "তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। বল, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও যে তারা বিশ্বাস করবে না এ কথা তোমাদেরকে কিভাবে বোধগম্য করানো যাবে?"[২৮৩]

অনুরূপভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে : "এবং তারা বলে, কখনোই তোমাতে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা, অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি

---

২৮২. সূরা আন'আম : ৫৭ আয়াত।

২৮৩. সূরা আন'আম : ১০৯ আয়াত।

স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।' বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।"[২৮৪]

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলি থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা) অবিশ্বাসীদের প্রার্থিত অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদর্শন করেন নি।

অভিযোগের উত্তর

এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এই অভিযোগে তাঁরা যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সে তিনটি বিষয়ই ভুল ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মাত্র। প্রথম বিষয়ে তাঁরা দাবি করেছেন যে, নবুওয়ত বা ভাববাদিত্বের অন্যতম শর্ত যে, নবুওয়তের দাবিদার অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযা প্রদর্শন করবেন। খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত বাইবেলই প্রমাণ করে যে, ভাববাদির জন্য অলৌকিকত্ব কোন শর্ত নয়। কাজেই ভাববাদিত্বের দাবিদার কর্তৃক অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন না করা প্রমাণ করে না যে, তিনি ভাববাদী নন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪১ আয়াত রয়েছে: "তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিল, এবং বলিল, যোহন কোন চিহ্ন-কার্য করেন নাই... ।"

আর মথিলিখিত সুসমাচারের ৪১ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে :"সকলের মতেই যোহন ভাববাদী।" ১৮২৫ সালের আরবী বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে : "সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে (all hold John as a prophet)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যীশু বলেছেন, তিনি 'ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' (more than a prophet)[২৮৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই ভাববাদী এবং ভাববাদিগণ থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কোন অলৌকিক চিহ্ন-কার্য প্রদর্শন করেন নি। যোহন বাপ্তাইজকের ভাববাদিত্ব খৃস্টানগণের নিকট অবশ্য স্বীকৃত, অথচ অনেকের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি কোন অলৌকিক কার্য করেন নি।

দ্বিতীয়ত তাঁরা দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা) অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের এ কথাটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবি। ইতোপূর্বে এই অধ্যায়ের

---

২৮৪. সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল) ৯০-৯৩।

২৮৫. মথি ১১/৯।

প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা) অগণিত মহান অলৌকিক কার্য করেছেন।[২৮৬]

তৃতীয়ত তাঁরা দাবি করেছেন যে, কুরআনের এ সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সা) অলৌকিক চিহ্ন-কার্য করেন নি। এখানে তাঁরা হয় ভুল বুঝেছেন অথবা জেনেশুনে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ কথা বলেছেন। এ সকল আয়াতের অর্থ কাফিরদের দাবিকৃত নির্ধারিত অলৌকিক চিহ্ন-কার্য করতে অস্বীকৃতি জানানো বা এ কথা জানানো যে, চিহ্ন-কার্য বা অলৌকিকত্বের মূল ক্ষমতা আল্লাহ্র। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুসারেই আমি অলৌকিক কার্য করি, তোমাদের প্রস্তাব অনুসারে নয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : "তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই।" এখানে 'যা সত্বর চাচ্ছ' বলতে কাফিরদের নির্দিষ্ট একটি দাবির কথা বুঝানো হয়েছে, যে দাবি অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কাফিরগণ দাবি করেছিল : "আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।"[২৮৭] এ আয়াতের অর্থ, তোমাদের দাবিকৃত আযাব সত্বর তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব বা ক্ষমতা নয়। 'কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই,' অর্থাৎ শাস্তি সত্বর প্রদান করা অথবা পাওনা শাস্তি পিছিয়ে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্রই ক্ষমতা। 'তিনি সত্য বিবৃত করেন,' অর্থাৎ দ্রুত অথবা বিলম্বিত শাস্তির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন এবং 'ফায়সালাকারীদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ,' অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও নির্ধারক।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে, সে শাস্তিকে দ্রুত বা বিলম্বিত করার ক্ষমতা আমার নয়। কাফিরদের প্রার্থিত শাস্তি তারা বদর যুদ্ধের দিনেই পেয়েছিল। কাজেই এ আয়াত প্রমাণ করে না যে, মুহাম্মাদ (সা) কখনোই কোন অলৌকিক কার্য করেন নি।

দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, 'তারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত' অর্থাৎ তাদের প্রস্তাব অনুসারে যদি কোন নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হতো, 'তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত'। বল, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত,' অর্থাৎ তিনি যখন যেভাবে যে নিদর্শন দেখাতে চান সেভাবেই সে নিদর্শন আমি দেখাব, তোমাদের প্রস্তাব অনুসারে নয়। "তাদের নিকট

---

২৮৬. বরং তাঁর অলৌকিক চিহ্নগুলির কিছু চিরন্তন। কুরআনের অনেক সংবাদের সত্যতা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং মুহাম্মাদ-এর অলৌকিকত্বের চিরন্তনতা প্রমাণ করেছে।

২৮৭. সূরা আনফাল : ৩২ আয়াত।

নিদর্শন আসলেও যে তারা বিশ্বাস করবে না এ কথা তোমাদেরকে কি[illegible] বোধগম্য করানো যাবে ?" অর্থাৎ তাদেরকে চিহ্ন-কার্য দেখানো হলেও তারা বিশ্বাস করবে না, বরং যাদু ইত্যাদি অভিযোগ তুলে অবিশ্বাসে অটল থাকবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিশ্বাস করবে না বলেই আল্লাহ্ তাদের দাবিকৃত বা প্রস্তাবিত নিদর্শন দেখালেন না।

তৃতীয় আয়াতের অর্থ, সত্যকে জেনে বিশ্বাস গ্রহণের মানসে নয়, বরং জিদ ও ঝগড়ার জন্যই শুধু তারা বলে যে, 'কখনোই তোমাতে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে' অর্থাৎ মক্কার ভূমিতে, 'এক চিরন্তন, চিরপ্রবাহময় প্রস্রবণ উৎসারিত করবে অথবা তোমার খেজুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।' কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, 'আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাব..'[২৮৮] এই আয়াতের দিকে কটাক্ষ করে তারা বলে : অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে,' 'অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে' তোমার নবুওয়তের দাবির সত্যতা ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য, 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ আকাশ থেকে তুমি আমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে যাতে তোমার দাবির সত্যতা ঘোষণা করা হবে–যা আমরা পাঠ করব।' ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি এই শর্তে যে, তুমি একটি সিড়ি এনে আকাশের সাথে লাগাবে। এরপর আমাদের চোখের সামনে সিড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যাবে এবং সেখান থেকে একটি লিখিত নবুওয়তনামা নিয়ে আসবে, সেই নবুওয়তনামার সাথে চারজন ফিরিশতা থাকবেন যারা তোমার নবুওয়তনামার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে এবং আমরা তা পাঠ করব।' তোমার বিস্ময় প্রকাশ করে তুমি বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল' অন্যান্য রাসূলদের মতই।

অবিশ্বাসীরা সত্য জানার আগ্রহে এ সকল প্রস্তাব পেশ করে নি। একান্তই ঝগড়া ও বিতর্কের জন্য তারা এ সব কথা বলেছে। তাদের প্রস্তাবিত সকল চিহ্ন বা নিদর্শন দেখানো হলেও তারা যাদু বলে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি তা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করত তবু কাফিরগণ বলত, এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই

---

২৮৮. সূরা সাবা, ৯ আয়াত।

নয়।"২৮৯ অন্যত্র তিনি বলেছেন : "যদি তাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।"২৯০

এভাবে কুরআন কারীমে কোন কোন আয়াতে কাফিরদেরকে তাদের প্রস্তাবিত নিদর্শন বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলি থেকে বাহ্যিকভাবে কারো কাছে মনে হতে পারে যে, মু'জিযা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করতে বোধহয় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বস্তুত এ সকল আয়াতের অর্থ কাফিরদের প্রস্তাবিত অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে অস্বীকার করা। এ থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদ (সা) অন্য সময়ে আল্লাহ্র নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোন অলৌকিক কার্য বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন নি।

নবীগণ বা ভাববাদিগণ অবিশ্বাসীদের দাবি বা প্রস্তাব মত চিহ্ন বা অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে বাধ্য নন বরং তাঁরা যখন দেখেন যে, অবিশ্বাসীরা একান্তই পরীক্ষার জন্য, ঝগড়ার জন্য বা উপহাসচ্ছলে অলৌকিক চিহ্ন দাবি করছে, তখন তাঁরা তা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন। আমি বাইবেলে নতুন নিয়ম থেকে এ বিষয়ক প্রমাণাদি উল্লেখ করছি।

প্রথম প্রমাণ : মার্কলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে : "১১ পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। ১২ তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালে লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে ? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই প্রজন্মের (কালের) লোকদিগকে২৯১ কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না (There shall no sign be given unto this generation)।"

এখানে ফরীশীরা যীশুর কাছে পরীক্ষামূলকভাবে অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন দাবি করে। যীশু তাদের দাবি অনুসারে চিহ্ন দেখালেন না। এমনকি তিনি এ কথাও বললেন না যে, ইতোপূর্বে আমি অমুক চিহ্ন দেখিয়েছি। তিনি তাদের এ কথাও বললেন না যে, অমুক সময়ে তোমাদেরকে আমি চিহ্ন দেখাব বরং তিনি বললেন : "এই প্রজন্মের লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না (There shall no sign be given unto this generation)।" এই প্রজন্ম বা এই কালের বলতে যীশুর

২৮৯. সূরা আন'আম : ৭ আয়াত।

২৯০. সূরা হিজর : ১৪-১৫ আয়াত।

২৯১. বাংলা বাইবেলে (কেরী) : এই লোকদিগকে। গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠ এবং ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন ও রিভাইজ্ড স্টান্ডার্ড ভার্সন উভয় সংস্করণেই রয়েছে : 'এই প্রজন্মের লোকদিগকে।'

Contents

সময়ে বিদ্যমান সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, যীশুর সমসাময়িক কোন মানুষকে যীশু কোন চিহ্ন দেখান নি।

দ্বিতীয় প্রমাণ : লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৮ যীশুকে দেখিয়া হেরোদ[২৯২] অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃত কোন চিহ্ন দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন (he hoped to have seen some miracle done by him) । ৯ তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না। ১০ আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়াইয়া উগ্রভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল। ১১ আর হেরোদ ও তাঁহার সেনারা তাঁহাকে তুচ্ছ করিলেন, ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং জমকাল পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে পীলাতের[২৯৩] নিকটে ফিরিয়া পাঠাইলেন।"

২৯২. এখানে হেরোদ বলতে Herod Antipas-কে বুঝানো হয়েছে। তার পিতা মহান হেরোদ (Herod the Great) ছিলেন রোমান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত যিরূশালেমের বা যুডিয়া (Judaea) রাজ্যের রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩৭ থেকে ৪ সাল পর্যন্ত যুডিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর সময়েই তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে (খৃষ্টপূর্ব ৮/৯ সালে) যীশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রোমান সম্রাট অগাস্টাস (Caesar Augustus 27 BC-AD 14) ফিলিস্তিনকে তার তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাদের মধ্যে একজন হেরোদ এনটিপাস (Herod Antipas)। তিনি গালিলী (Galilee) ও পেরেয়া (Peraea) -র রাজা (tetrarch) নিযুক্ত হন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃষ্টপূর্ব ৪ সাল থেকে ৩৯ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু পর্যন্ত গালিলী ও পেরেয়ার গভর্নর ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তার সময়েই যীশুকে ক্রুশে চড়ানো হয়।

২৯৩. পীলাত (Pilate, Pontius)। রোমান সম্রাট টিবেরিয়াস (Tiberius Caesar Augustus: 14-37 AD)-এর সময়ে ২৬ থেকে ৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুডিয়া রাজ্যের রোমান নাইট গভর্নর (Prefect/procurator) ছিলেন। ৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইহূদীগণ যীশুকে গ্রেফতার করার পরে রোমান গভর্নর পীলাতের কাছে সমর্পণ করেন। পীলাত জানতে পারলেন যে, এ সময়ে নিস্তারপর্ব (Passover) উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজা হেরোদ যিরূশালেমে অবস্থান করছেন। যেহেতু যীশু হেরোদের রাজ্য গালিলীর অধিবাসী ছিলেন, সেহেতু পীলাত বিচারের জন্য যীশুকে হেরোদের নিকট প্রেরণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হেরোদ যীশুর থেকে কিছু অলৌকিক চিহ্ন দেখার আগ্রহ পোষণ করতেন। তিনি যীশুর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন এবং আন্তরিক ভক্তির সাথেই তিনি যীশুর থেকে কিছু অলৌকিক চিহ্ন দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যীশু কোন কথা না বলায় তার ভক্তি উবে যায়। তিনি অবজ্ঞাভরে তাকে আবার পীলাতের কাছে প্রেরণ করেন। পীলাত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় একটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক তথ্যাদি অনুসারে, বিশেষত সমসাময়িক ইহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাসের (Josephus) বর্ণনা অনুসারে পীলাত অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন শাসক ও বিচারক ছিলেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের নতুন নিয়মে তাকে একজন দুর্বল ও অথর্ব ব্যক্তিত্বের মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উপস্থিত কিছু জনতার চাপে তিনি একজন প্রকৃত অপরাধীকে মুক্ত করে তার দৃষ্টিতেই নিশ্চিতভাবে নিরপরাধ একজন মানুষকে ক্রুশে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেবেন এ কথা পীলাতের মত একজন দৃঢ়চেতা বিচারকের পক্ষে খুবই অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়।

এখানে যীশু হেরোদের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও কোন অলৌকিক চিহ্ন দেখালেন না। বাইবেলের ভাষা থেকে সুস্পষ্ট যে, হেরোদ পরীক্ষামূলকভাবে বা কুটতর্কের উদ্দেশ্যে চিহ্ন দেখতে চান নি; বরং নিজের ভক্তিকে সুদৃঢ় করতেই আন্তরিকভাবে চিহ্ন দেখতে চেয়েছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, যদি যীশু এ সময়ে চিহ্ন দেখাতেন, তবে হেরোদ তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করতেন, ইহূদীদেরকে তাদের মিথ্যা অভিযোগের কারণে অভিযুক্ত করতেন এবং তিনি ও তার সেনারা তাঁকে তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করতেন না। এমনকি ইতোপূর্বে তিনি কোন চিহ্ন দেখিয়েছেন তাও তিনি বললেন না। ভবিষ্যতে দেখাবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন না .

তৃতীয় প্রমাণ : লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে রয়েছে : "৬৩ আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল। ৬৪ আর তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাববাণী বল দেখি, কে তোকে মারিল ? ৬৫ আর তাহারা নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা কহিতে লাগিল।"

এখানে ইহূদীগণ চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে এরূপ প্রশ্ন করেছিল, এজন্য তিনি তাদেরকে উত্তর দেন নি (অতীতে তিনি কোন চিহ্ন দেখিয়েছেন বা ভবিষ্যতে দেখাবেন সে কথাও তিনি বলেন নি)।

চতুর্থ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ৪০ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর. যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। ৪১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ৪২ ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক; ৪৩ তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি উহাকে চান; কেননা ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র; ৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল।"

এখানে এরা সকলেই চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু যীশু চিহ্ন দেখান নি। তিনি এ সময়ে নিজেকে রক্ষা করেন নি বা ক্রুশ থেকে নেমে আসেন নি, যদিও পথচারিগণ, প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণ, প্রাচীনবর্গ ও চোরদ্বয় তাঁকে তিরস্কার করে এবং চিহ্ন দেখতে চায় (অতীতে কোন চিহ্ন দেখিয়েছেন বা ভবিষ্যতে দেখাবেন সেকথাও তিনি বলেন নি)।

প্রধান যাজকগণ, অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবর্গ বলেছিলেন, যদি তিনি ক্রুশ হতে নেমে আসেন তবে তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে। কাজেই এ সময়ে তো তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, তাঁর অবমাননা দূর করতে এবং ইহূদীদের অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার প্রমাণ করতে অন্তত একবার ক্রুশ থেকে নেমে আসবেন। এরপর আবার ক্রুশে উঠে জীবনত্যাগ করবেন। কিন্তু যেহেতু ইহূদীদের চিহ্ন প্রার্থনা ছিল মূলত উপহাস ও অবিশ্বাসের কারণে, এজন্য তিনি তা করেন নি।[২৯৪]

পঞ্চম প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন-কার্য দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোক চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। ৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র (three days and three nights) বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র (three days and three nights) পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

অধ্যাপক ও ফরীশীগণ তাঁর কাছে চিহ্ন-কার্য দেখতে চান। কিন্তু যীশু এ সময়ে তাদেরকে কোন চিহ্ন দেখান নি। ইতোপূর্বে কোন চিহ্ন-কার্য তিনি করেছেন তাও তিনি বলেন নি বরং তিনি তাদেরকে গালাগালি করলেন এবং দুষ্ট ও ব্যভিচারী বলে অভিহিত করলেন। তিনি তাদেরকে একটি চিহ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন যা তিনি তাদেরকে কোনদিনই দেখান নি। তিনি বললেন, "যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।" এ কথাটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল। যীশু কখনোই তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে ছিলেন না (বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি মাত্র দুই রাত ও এক দিন পৃথিবীর গর্ভে ছিলেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে যীশুকে কবরস্থ করা হয়। এরপর রবিবার প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এই দেহটি কবর থেকে অদৃশ্য হয়। যোহনের সুসমাচারে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে)।[২৯৫] ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা বিস্তারিত জেনেছেন।

তবে এই বক্তব্যটির অশুদ্ধতা ছাড়াও এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। যীশু তাঁর প্রতিশ্রুত মত পৃথিবীর গর্ভ থেকে পুনরুত্থানের চিহ্নটি অধ্যাপক ও ফরীশীদেরকে দেখান নি। তারা স্বচক্ষে যীশুর পুনরুত্থান দেখেন নি। যীশু যদি সত্যই মৃতদের মধ্য

---

২৯৪. এ সময়ে যদি যীশু এ সকল চিহ্ন দেখাতেন তবে সকল ইহূদী ও বিশ্বের অগণিত মানুষ তাঁর আত্মত্যাগে বিশ্বাস করে মুক্তি লাভ করতে পারত। অথচ তিনি তা দেখালেন না!

২৯৫. যোহন ২০/১-১৮। আরো দেখুন : মথি ২৮/১-১০; মার্ক ১৬/১-১১; লূক ২৪/১-১২।

থেকে পুনরুত্থিত হতেন তবে তাঁর দায়িত্ব হতো যে, এ সকল অবিশ্বাসীকে –যাদেরকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন–তাদের সামনে প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজেকে প্রকাশিত করবেন। এতে প্রতিশ্রুতি পালিত হত এবং এ সকল অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের পক্ষে আর কোন প্রমাণ থাকত না। কিন্তু তিনি নিজেকে এদের সামনে বা অন্য কোন ইহূদীর সামনে একটিবারের জন্যও প্রকাশ করেন নি। এজন্যই ইহূদীরা যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইহূদীরা বলে যে, যীশুর শিষ্যগণ রাত্রিবেলায় যীশুর মৃতদেহ চুরি করেছিলেন।

ষষ্ঠ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ে দিয়াবল কর্তৃক যীশুকে পরীক্ষা করার বিষয়ে বলা হয়েছে : "৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায়। ৪ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে'। ৫ তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, ৬ আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে, 'তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।' ৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না'।"

এখানে দিয়াবল পরীক্ষার জন্য যীশুর নিকট থেকে দুটি চিহ্ন দাবি করে। যীশু একটিও প্রদর্শন করতে রাজি হন নি। দ্বিতীয় বারে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের কোন সৃষ্টি ও উপাসকের উচিত নয় নিজ উপাস্য ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা; বরং সৃষ্টি ও উপাস্যের দায়িত্ব প্রভুর সাথে আদব রক্ষা করা ও কোনরূপ পরীক্ষা ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা।

সপ্তম প্রমাণ : যোহনলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য এই, যেন তাহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। ৩০ তাহারা তাহাকে কহিল, ভাল, আপনি এমন কি চিহ্ন-কার্য করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিব ? আপনি কি কার্য করিতেছেন ? ৩১ আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে, 'তিনি ভোজনের জন্য তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন'।"

এখানে ইহূদীগণ যীশুর নিকট চিহ্ন দাবি করে। তিনি তাদেরকে চিহ্ন দেখালেন না। ইতোপূর্বে তিনি কখনো কোন চিহ্ন দেখিয়েছেন বলেও উল্লেখ করলেন না বরং এমন এক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য উত্তর তিনি তাদেরকে প্রদান করলেন যে, অধিকাংশ

শ্রোতাই তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।[২৯৬] বরং এই কথার কারণে তাঁর শিষ্যদের অনেকেই ধর্মত্যাগ করে চলে যায়। এই অধ্যায়ের ৬৬ আয়াতে তা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬০ সালের আরবী অনুবাদ অনুসারে এই আয়াতে বলা হয়েছে : "এই সময় থেকে তাঁহার অনেক শিষ্য পশ্চাতে ফিরিয়া গেল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না।" ১৮২৫ সালের আরবী বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে: "৬৬ ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য ধর্মত্যাগ করিয়া পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর কখনোই যাতায়াত করিল না।"[২৯৭]

অষ্টম প্রমাণ : ১ করিন্থীয়র ১ অধ্যায়ে রয়েছে : "২২ কেননা যিহূদীরা চিহ্ন চায়, এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে; ২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খৃষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।"

এখানে আমরা দেখছি যে, ইহূদীগণ যীশুর নিকট থেকে যেমন চিহ্ন দাবি করত, তেমনিভাবে তারা প্রেরিতগণের নিকটও চিহ্ন দাবি করত। খৃষ্টানদের পবিত্রপুরুষ সাধু পৌল স্বীকার করলেন যে, ইহূদীরা চিহ্ন দাবি করত, কিন্তু প্রেরিতগণ চিহ্ন প্রদর্শন না করে শুধু যীশুর নামে প্রচার করতেন।[২৯৮]

বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত উপরের বক্তব্যগুলি প্রমাণ করে যে, যারা চিহ্ন দাবি করতেন তাদের সামনে যীশু নিজে এবং তাঁর প্রেরিতগণ চিহ্ন প্রদর্শন করতেন না। এমনকি তাঁরা ইতোপূর্বে কোথাও কোন চিহ্ন দেখিয়েছেন বলেও তাদের কাছে বলতেন না।

---

২৯৬. "৩২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছে, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। ৩৩ কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন দান করে। ৩৪ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদিগকে দিউন। ৩৫ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য ... ৬০ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে পারে ? ৬১ কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা করিতেছে, যীশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, এই কথায় কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে ?...."

২৯৭. বাংলা বাইবেলে (কেরি): 'ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না।' ইংরেজি (KJV): "From that time many of his disciples went back, and walked no more with him."

২৯৮. এই প্রচারের সাথে কোন চিহ্ন না থাকার কারণে ইহূদীরা একে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন মনে করত। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান ও দর্শনের কিছু না থাকাতে গ্রীকরা একে মূর্খতা বলে মনে করত।

এখন উপরের বক্তব্যগুলির ভিত্তিতে একজন দাবি করতে পারেন যে, যীশু এবং তাঁর প্রেরিতগণ কখনো কোন অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন প্রদর্শন করেন নি। কোন অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন-কার্য সাধন করার কোন ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। যদি তাঁদের এরূপ কোন ক্ষমতা থাকত তবে তাঁরা অবিশ্বাসীদের দাবি অনুসারে এ সকল সময়ে তা প্রদর্শন করতেন। অথবা অন্তত বলতেন যে, অমুক সময়ে অমুক স্থানে আমি অমুক চিহ্ন-কার্য প্রদর্শন করেছি, তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখ। তাঁরা চিহ্ন দেখান নি এবং পূর্বে দেখিয়েছেন বলেও দাবি করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, চিহ্ন-কার্য প্রদর্শনের কোন ক্ষমতাই তাঁদের ছিল না।

যদি কেউ নতুন নিয়মের এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে এরূপ দাবি করেন তবে পাদরি মহাশয়গণ সমস্বরে বলবেন যে, এই দাবি অন্যায় ও সত্যের বিকৃতি। কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সা) কোন অলৌকিক চিহ্ন দেখান নি বলে পাদরিগণ যে দাবি করেন তাও আমাদের মতে অনুরূপ অন্যায় ও সত্যের বিকৃতি। বিশেষত কুরআনের অনেক স্থানে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (স)-এর অনেক অলৌকিক কার্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এরূপ দাবি করা নিঃসন্দেহে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে সত্য গোপনের অপচেষ্টা।

ইতোপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক মুহাম্মাদ (সা)-এর কিছু অলৌকিক কার্যের কথা জানতে পেরেছেন। কুরআন করীমে আরো অনেক স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা) কাফিরদেরকে অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদর্শন করতেন, কিন্তু তারা তা যাদু বলে উড়িয়ে দিত এবং উপহাস করত। এ সকল আয়াতের মধ্যে রয়েছে :

(১) সূরা সাফ্ফাতে বলা হয়েছে : "তারা কোন চিহ্ন-কার্য দেখলে উপহাস করে এবং বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[২৯৯]

তাফসীরে কাশ্শাফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "যখন তারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া বা অনুরূপ কোন চিহ্ন-কার্য দর্শন করে, তখন তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে সে বিষয় নিয়ে উপহাস করে বা একে অপরকে উপহাস করতে উৎসাহ প্রদান করে।"

তাফসীরে কবীরে আল্লামা রাযী বলেন : "আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের চতুর্থ যে কর্মটি বর্ণনা করেছেন তা হলো যে, তারা কোন অলৌকিক কার্য দেখলে বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।' এভাবে তারা কোন চিহ্ন দর্শন করলে তা নিয়ে উপহাস করে। তাদের উপহাসের কারণ তারা মনে করে যে, যাদুর মাধ্যমেই

২৯৯. সূরা সাফফাত : ১৪-১৫ আয়াত।

এই চিহ্ন প্রদর্শন করা হয়েছে। এজন্য তারা একে 'সুস্পষ্ট যাদু' বলত। অর্থাৎ তাদের মতে, এ সকল চিহ্ন যে যাদু তা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট যার যাদুত্ব বুঝতে কারো কষ্ট হয় না।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাবী বলেন : "যখন তারা কোন চিহ্ন-কার্য দেখে, অর্থাৎ কোন মু'জিযা দেখতে পায়, তখন তারা এই মু'জিযা নিয়ে কঠিনভাবে উপহাস ও বিদ্রূপে লিপ্ত হয়, একে অপরকে উপহাস করতে উৎসাহিত করে এবং বলে যে, এ যাদু মাত্র যার যাদুত্ব খুবই স্পষ্ট।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে : "তারা চন্দ্র দিখণ্ডিত করার মত কোন চিহ্ন-কার্য দেখলে উপহাস করে এবং বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

(২) সূরা কামারে বলা হয়েছে : "চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন চিহ্ন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু'।"[৩০০] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদে জানতে পেরেছেন।

(৩) সূরা আলে-ইমরানে রয়েছে : "ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দানের পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ (নিদর্শনসমূহ) আগমন করার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন?"[৩০১]

এখানে 'বাইয়িনাত' বা 'সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ' শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে : "কুরআনের প্রমাণাদি এবং অন্যান্য সকল অলৌকিক চিহ্নসমূহ, যেগুলির দ্বারা নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব প্রমাণিত হয়।"

কুরআন কারীমে অনেক স্থানে মাউসূফ বা বিশেষিত বিশেষ্যকে উল্লেখ না করে শুধু বিশেষণ চিহ্ন হিসেবে 'বাইয়িনাত' বা 'সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, এক্ষেত্রে 'সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ' বলতে 'সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ' বুঝানো হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ব্যবহার খুবই কম। কাজেই এই শব্দকে এই সাধারণ অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। নিম্নের আয়াতগুলিতে শব্দটিকে এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

- সূরা বাকারায় বলা হয়েছে : "মরিয়ম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ) প্রদান করেছি।"[৩০২]

---

৩০০. সূরা কামার : ১-২ আয়াত।

৩০১. সূরা আলে-ইমরান : ৮৬ আয়াত।

৩০২. সূরা বাকারা : ৮৭ ও ২৩৫ আয়াত।

- সূরা নিসায় বলা হয়েছে : "অতঃপর তাদের কাছে সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ) প্রকাশ পাওয়ার পরেও তারা গো-বৎস্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে।"[৩০৩]

- সূরা মায়িদায় ঈসা (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে : "যখন তুমি তাদের নিকট সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ) নিয়ে আগমন করলে।"[৩০৪]

- সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে : "তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ)-সহ আগমন করেছিলেন।"[৩০৫]

- সূরা ইউনূসে বলা হয়েছে : "সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ)-সহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ আগমন করেন।"[৩০৬]

- এই সূরাতে বলা হয়েছে : "তারা তাদের নিকট সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ)-সহ আগমন করেছিলেন।"[৩০৭]

- সূরা নাহলে বলা হয়েছে : "প্রেরণ করেছিলাম সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ) ও গ্রন্থাবলিসহ।"[৩০৮]

- সূরা তাহায় বলা হয়েছে : "আমাদের নিকট যে সুস্পষ্টগুলি (চিহ্নগুলি) এসেছে সেগুলির উপরে তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না।"[৩০৯]

- সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে : "অথচ সে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্টসমূহ (চিহ্নসমূহ) নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে।"[৩১০]

- সূরা হাদীদে বলা হয়েছে : "নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্টসমূহ (সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ) সহ আগমন করতেন।"[৩১২]

এভাবে আরো অনেক স্থানে 'বাইয়্যিনাত' বা 'সুস্পষ্টসমূহ' শব্দটি 'সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূহ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

৩০৩. সূরা নিসা : ১৫৩ আয়াত।

৩০৪. সূরা মায়িদা : ১১০ আয়াত।

৩০৫. সূরা আ'রাফ : ১০১ আয়াত।

৩০৬. সূরা ইউনূস : ১৩ আয়াত।

৩০৭. সূরা ইউনূস : ৭৪ আয়াত।

৩০৮. সূরা নাহ্ল : ৪৪ আয়াত।

৩০৯. সূরা তাহা : ৭২ আয়াত।

৩১০. সূরা মু'মিন : ২৮ আয়াত।

৩১১. সূরা হাদীদ : ২৫ আয়াত।

৩১২. সূরা তাগাবুন : ৬ আয়াত।

(৪) সূরা আন'আমে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর চিহ্নসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে ? জালিমগণ আদৌ সফলকাম হবে না।"[৩১৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, যেমন ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে দাবি করা, তারা তাদের উপাসকদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে বলে দাবি করা ইত্যাদি, অথবা তাঁর চিহ্নসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, যেমন কুরআনকে এবং অন্যান্য অলৌকিক চিহ্নসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলিকে যাদু বলে আখ্যায়িত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কেউ হতে পারে না।"

এখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে 'অথবা' বলা হয়েছে, যেন বুঝা যায় যে, উভয় বিষয়ের প্রত্যেকটিই নিজের আত্মার উপর কঠিনতম জুলুম ও ভয়ঙ্করতম অন্যায়। আর অবিশ্বাসীরা অনেক সময় দুটি অন্যায়ের মধ্যে একত্রে নিপতিত হয়।

এ বিষয়ে তাফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে : "এভাবে অবিশ্বাসিগণ দুটি পরস্পর বিরোধী অন্যায়কে একত্রিত করত। একদিকে তারা কোন প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা বলত। অপরদিকে তারা সন্দেহাতীতভাবে যুক্তি, বিবেক ও অলৌকিক চিহ্নসমূহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করত। তারা কোনরূপ তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া যে সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা আল্লাহ্র বিষয়ে বলত সেগুলির মধ্যে অন্যতম, তাদের অবিশ্বাস ও অংশবাদিতার দায়ভার আল্লাহ্র উপরে চাপানো। তারা বলত : "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না।"[৩১৪]

অনুরূপভাবে তারা ধর্মের নামে নানান গর্হিত ও অশ্লীল কাজ করে দাবি করত যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : "যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩১৫] এছাড়া তারা ফিরিশতাগণের বিষয়ে দাবি করত যে, তারা আল্লাহ্র কন্যা।[৩১৬] তারা

৩১৩. সূরা আন'আম : ২১ আয়াত।

৩১৪. সূরা আন'আম : ১৪৮ আয়াত।

৩১৫. সূরা আন'আম : ২৮ আয়াত।

৩১৬. অনেক আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন : সূরা আন'আম : ১০০ আয়াত; সূরা নাহ্ল : ৫৭ আয়াত; সূরা সাফফাত : ১৪৯ ও ১৫৩ আয়াত; সূরা যুখরুফ : ১৬ আয়াত ও সূরা তূর : ৩৯ আয়াত।

ফিরিশতাগণের নামে মানত, সাজদা, জবাই ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের পূজা করত এবং দাবি করত যে, "এরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।"[৩১৭]

পৌত্তলিক আরবগণ তাদের পশু প্রতিমার নামে ছেড়ে দিত। কখনো পশুর কান কেটে তাকে ছেড়ে দিত। এগুলিকে 'বাহীরা' বলা হতো। কখনো অনেকগুলি বাচ্চা হলে বা বিশেষ কোন বিপদমুক্তির কারণে তারা উট প্রতিমার নামে ছেড়ে দিত। এগুলিকে 'সায়িবা' বলা হতো। তারা বলত যে, এ সকল পশুর ব্যবহার বা মাংস ভক্ষণ হারাম। তারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দাবি করত যে, আল্লাহ্‌ই এগুলি ব্যবহার বা মাংস ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন।[৩১৮]

এভাবে তারা কোনরূপ তথ্য, আসমানী কিতাব, কোন নবীর বক্তব্য ছাড়াই আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা বলত। অপরদিকে কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্নসমূকে অস্বীকার করত এবং এগুলিকে যাদু বলে আখ্যায়িত করত। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করে।

তাফসীরে কাবীরে রয়েছে : "অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও ক্ষতির দ্বিতীয় দিক যে, তারা আল্লাহ্‌র চিহ্নগুলি অস্বীকার করত। আল্লাহ্‌র চিহ্ন অস্বীকার করার অর্থ তারা মুহাম্মাদ (সা)-এর অলৌকিক কর্মগুলি বা চিহ্ন-কার্যগুলি সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলত, এগুলিকে অবিশ্বাস করত এবং কুরআনও যে একটি অলৌকিক প্রমাণ তাও তারা অস্বীকার করত।"

সূরা আন'আমের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : "যখন তাদের নিকট কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করব না।' আল্লাহ্ রিসালাতের ভার (রাসূল বা ভাববাদী পদের দায়িত্ব) কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।"[৩১৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে : "যখন তাদের নিকট কোন চিহ্ন আসে, অর্থাৎ যখন কোন অনস্বীকার্য সুস্পষ্ট অলৌকিক চিহ্ন-কার্য তাদের সামনে প্রকাশিত হয়।"

---

৩১৭. সূরা ইউনুস : ১৮ আয়াত।

৩১৮. সূরা মায়িদা : ১০৩ আয়াত।

৩১৯. সূরা আন'আম : ১২৪ আয়াত।

পোপ আলেকযান্ডার[৩২০] বিশ্বাস করতেন যে, মুহাম্মাদ (সা) ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ওহী-ইলহামপ্রাপ্ত, যদিও সেই ওহী-ইলহাম অবশ্য গ্রহণীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর লেখা 'ডেনসিডি'[৩২১] নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বলেছেন :"হে মুহাম্মাদ! কপোত তোমার কর্ণের নিকটে।" ১৭৯৭ ও ১৮০৬ খৃস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক থেকে আমি এ কথাটি উদ্ধৃত করেছি। তবে তা ১৭৯৭ সালের মুদ্রণে ২৬৭ পৃষ্ঠায় এবং ১৮০৬ সালে মুদ্রণে ৩০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সম্ভবত পোপ মহাশয় মনে করতেন যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণা কপোতের মাধ্যমেই আসত। কারণ খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণা আসে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। আর যীশু যখন যোহন বাপ্তাইজকের নিকট যেয়ে বাপতাইজিত হয়ে জল থেকে উঠলেন তখন পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় তার উপর নেমে আসেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২২] এজন্য পোপ মহাশয় ধারণা করেছিলেন যে, মুহাম্মাদের ওহীও বোধহয় কপোতের মাধ্যমেই আসত।[৩২৩]

৩২০. সম্ভবত গ্রন্থকার পোপ চতুর্থ আলেকযান্ডারকে (Alexander VI) বুঝাচ্ছেন। তিনি ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬১ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ১২৪৩ থেকে ১২৬১ পর্যন্ত পোপ ছিলেন। পোপের দায়িত্ব লাভের পরে তিনি তাঁর পূর্বসূরী পোপ ৪র্থ ইনোসেন্টর নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। তিনি সিসিলির রাজা ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এছাড়া ফ্রান্সে ইনকুইজিশন (Inquisitin) বা ভিন্নধর্মী ও বিশেষত ইহূদী ও মুসলিমদের এবং খৃস্টান ভিন্ন মতাবলম্বীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করেন। এছাড়া তাতারদের বিরুদ্ধে একটি ক্রুসেডের আয়োজন করার জন্যও তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

৩২১. মূল পাঠে গ্রন্থটির নাম সুস্পষ্ট নয়। অন্য কোন সূত্র থেকেও গ্রন্থটির নাম যাচাই করতে পারিনি।

৩২২. মথি ৩/১৬।

৩২৩. এখানে অন্য একটি বিষয় রয়েছে। মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদরি ও পোপদের অপপ্রচারের ভিত্তিই ছিল মিথ্যা। অগণিত মিথ্যার মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে প্রতারিত করেছিলেন। এ প্রকারের অনেক মিথ্যার একটি যে, মুহাম্মাদ (সা) সাধারণ মানুষদের ও তাঁর অনুসারীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি কপোত প্রতিপালন করেছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে কপোতটি তাঁর কানের কাছে এসে বসত। আর তিনি সাধারণ মানুষদের বুঝাতেন যে, কপোতটি পবিত্র আত্মা, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নিয়ে এসেছেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনী ও ইতিহাসের সাথে পরিচিত যে কোন ধর্ম ও মতের মানুষ স্বীকার করবেন যে, এত বড় ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা বিশ্বের ইতিহাসে খুব কমই আছে। তাঁর জীবনে একটিবারের জন্যও তিনি কপোতের মাধ্যমে ওহী লাভের দাবি করেন নি। অথচ 'অভ্রান্ত' (?) পোপগণ তা প্রচার করতেন। পোপদের এই তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে কেউ যীশুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারে। একজন অবিশ্বাসী বা খৃস্টধর্ম বিরোধী মানুষ দাবি করতে পারে যে, যীশু একটি কপোত পালন করেছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। বাপ্তাইজিত হওয়ার পরে তাঁর ইঙ্গিতে তা তাঁর কাছে এসেছিল।

তৃতীয় অভিযোগ : নারী বিষয়ক

পাদরিগণ মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে নারী বিষয়ক যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন সেগুলির পাঁচটি দিক রয়েছে :

প্রথম বিষয় : সাধারণ মুসলিমদের জন্য ৪টির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়, অথচ মুহাম্মাদ (সা) এই সংখ্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; বরং তিনি নিজের জন্য ৯টি স্ত্রী গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ্ আমাকে চারটির অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : মুসলিমদের জন্য তাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ফরয। মুহাম্মাদ (সা) দাবি করেন, তাঁর বিষয়ে আল্লাহ্র বিশেষ বিধান যে, তাঁর জন্য সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ফরয নয়।

তৃতীয় বিষয় : তিনি যায়দ ইবনু হারিসা (রা)-এর বাড়িতে প্রবেশ করেন। তিনি যখন পর্দা উঠান তখন যায়দের স্ত্রী যয়নাব বিনতু জাহশ (রা)-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এতে তাঁর অন্তরের মধ্যে যয়নাবের প্রতি প্রেমের উদ্রেক হয়। তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ্! যখন যায়দ (রা) এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নাবকে তালাক দেন। এরপর মুহাম্মাদ (সা) যয়নাবকে বিবাহ করেন। তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ্ আমাকে এই বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয় : তিনি তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা)-এর গৃহে অবস্থানের দিনে, তাঁর গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় তাঁর মিসরীয় দাসী-স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর সাথে মিলিত হন। এতে হাফসা (রা) রেগে যান। তখন মুহাম্মাদ (সা) বলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করে দিলাম। কিন্তু এরপর তিনি এই হারাম করার সঙ্কল্প টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। তখন তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে কাফ্ফারা দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন।

পঞ্চম বিষয় : মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুসারীদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে ইদ্দতের পরে তার বিধবা স্ত্রীকে অন্যরা বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) নিজের বিষয়ে দাবি করেন যে, আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রীদের কেউ বিবাহ করতে পারবে না।

পাদরি মহাশয়গণ যথাসাধ্য চেষ্টা করে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে যত কিছু নারীবিষয়ক অভিযোগ উত্থাপন করেন সবই এই পাঁচটি বিষয় কেন্দ্রিক। ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত তাঁদের পুস্তকাদিতে এই বিষয়গুলি সবগুলি একত্রে অথবা এগুলির কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মীযানুল হক (সত্যের মাপদণ্ড), তাহকীকুদ দীনিল হক (সত্য ধর্মের অনুসন্ধান), দাফিউল বুহতান (অপবাদ খণ্ডন), দালাইল ইছবাতি রিসালাতিল মাসীহ (মাসীহের দায়িত্বের প্রমাণ), দালাইলুন নবুওয়াত

(ভাববাদিত্বের প্রমাণ), রাদ্দুল লাগও (বাতিলের প্রতিবাদ) ইত্যাদি পাদরিগণের লেখা সকল পুস্তকেই এ সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ পর্যালোচনা

এই পাঁচটি বিষয়ের বাতুলতা প্রমাণের জন্য আমি ভূমিকা হিসেবে আটটি বিষয় উল্লেখ করব। এই আটটি বিষয়ের আলোকে উপর্যুক্ত পাঁচটি অভিযোগের প্রকৃত অবস্থা পাঠকের কাছে সুস্পস্ট হয়ে যাবে।

প্রথম বিষয় : বাইবেলীয় ব্যবস্থায় বহুবিবাহ ও ভাববাদিগণের বহু ভার্যা গ্রহণ

বাইবেলের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ পূর্ববর্তী ধর্ম-ব্যবস্থাগুলিতে বৈধ ছিল। নিম্নের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করুন :

(১) অবরাহাম সারাকে বিবাহ করেন। এরপর সারার জীবদ্দশাতেই তিনি হাগারকে বিবাহ করেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁকে ওহী বা প্রেরণা প্রদান করতেন এবং কল্যাণ ও সঠিক বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যদি দ্বিতীয় বিবাহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবৈধ হত তবে অবশ্যই ঈশ্বর তাঁর প্রিয়পাত্র অবরাহামকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করতেন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে নির্দেশ দিতেন এবং এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করতেন।

(২) যাকোব চারটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লেয়া, রাহেল, বিলহা ও সিল্পা নামের চারজন মহিলাকে বিবাহ করেন। প্রথম মহিলাদ্বয় যাকোবের মামার কন্যা দু' বোন এবং পরের দু' স্ত্রী দাসী-স্ত্রী ছিলেন। দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা মোশির ব্যবস্থায় কঠিনভাবে ও চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জেনেছেন। যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ হয়, তবে অবশ্যই এ সকল অবৈধ স্ত্রীর সন্তানগণ অবৈধ ও জারজ সন্তান বলে গণ্য হবেন। না'উযু বিল্লাহ! ঈশ্বর প্রায়ই যাকোবকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, কোন্ কর্ম করলে ভাল হবে তা বলে দিতেন এবং কল্যাণের পথের নির্দেশনা দিতেন। কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ঈশ্বর তাঁকে অতি সামান্য বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করলেন, অথচ বিবাহ, ব্যভিচার ও জারজ সন্তান লাভের মত এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছুই বললেন না ? ঈশ্বর যাকোবকে চারটি স্ত্রী গ্রহণের বিষয়ে কোন আপত্তি জানালেন না, এমনকি দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করতেও আপত্তি জানালেন না। এতে প্রমাণিত হলো যে, যাকোবের শরীয়তে বা ব্যবস্থায় এরূপ একাধিক বিবাহ ও দু' বোনকে একত্রে বিবাহ বৈধ ছিল।

(৩) যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন অনেক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩০ গিদিয়োনের ঔরসজাত সত্তরটি পুত্র ছিল, কেননা তাঁহার অনেক স্ত্রী ছিল। ৩১ আর শিখিমে তাঁহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও

তাঁহার জন্য একটি পুত্র প্রসব করিল, আর তিনি তাহার নাম অবীমেলক্ রাখিলেন।"

বাইবেলের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, এই গিদিয়োন একজন ভাববাদী ছিলেন। বিচারকর্তৃগণের ৬ ও ৭ অধ্যায়ের বক্তব্য এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন।

(৪) ঈশ্বরের অন্যতম ভাববাদী দায়ূদ। তিনি অনেক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে ইহূদীদের রাজা শৌলের (Saul) কন্যা মীখল (Michal)-কে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পণ বা যৌতুক (dowry) ধার্য করা হয় পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক (an hundred foreskins of the Philistines)। এই পণের বিনিময়ে রাজা শৌল তাঁর কন্যা মীখলকে দায়ূদের হাতে সমর্পণ করেন। এই যৌতুক প্রদানের ঘটনা বর্ণনা করে ১ শমূয়েলের ১৮ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "তখন কাল সম্পূর্ণ হয় নাই; দায়ূদ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া পলেষ্টীয়দের দুই শত জনকে বধ করিলেন, এবং রাজার জামাতা হইবার জন্য দায়ূদ পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক আনিয়া রাজাকে দিলেন; পরে শৌল তাঁহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিলেন।"

নাস্তিকগণ এই পণ বা যৌতুকের বিষয়ে উপহাস করেন (বড় অদ্ভুত যৌতুক! শুধু বিবাহের জন্য অকারণে দুই শত মানুষ হত্যা করে একশত লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রহ করা!)। কি উদ্দেশ্যে এতগুলি লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রহ করলেন শৌল ? তিনি কি এগুলিকে একত্রিত করে মূল্যবান উপহার হিসেবে কন্যাকে দিতে মনস্থ করেছিলেন ? না অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ?

আমি এখানে শৌলের লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। আমরা দায়ূদের বিবাহের বিষয়ে ফিরে যেতে চাই। যখন দায়ূদ শৌলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তখন শৌল তাঁর কন্যা দায়ূদের স্ত্রী মীখলকে নিয়ে গল্লীম নিবাসী লয়িশের পুত্র পলটিকে দিলেন। ১ শমূয়েলের ২৫ অধ্যায়ের ৪৪ আয়াতে তা বলা হয়েছে। আর দায়ূদ অন্য ৬ জন মহিলাকে বিবাহ করলেন : (১) যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়াম, (২) অবীগল[৩২৪] (৩) মাখা, গশূরের তলময় রাজার কন্যা, (৪) হগীত, (৫) অবীটল এবং (৬) ইগ্লা। ২ শমূয়েলের ৩ অধ্যায়ে এ সকল স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২৫]

এই ছয় স্ত্রীর প্রেম ও সাহচর্য দায়ূদের পবিত্র অন্তর থেকে প্রথম স্ত্রী মীখলের প্রেম মুছে ফেলতে পারে নি, যদিও মীখল তখন অন্যের অঙ্কশায়িনী। এজন্য রাজা শৌল

---

৩২৪. অবীগলের স্বামীর মৃত্যু ও দায়ূদের সাথে তার বিবাহের কাহিনীও চমৎকার। দেখুন : ১ শমূয়েল ২৫ অধ্যায়।

৩২৫. ২ শমূয়েল ৩/২-৫।

Contents

যখন নিহত হলেন তখন দায়ূদ শৌলের পুত্র ঈশবোশতের নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন, আমি পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক পণ দিয়ে যাকে বিবাহ করেছি, আমার সেই স্ত্রী মীখলকে ফেরত দাও। এতে ঈশবোশৎ মীখলের দ্বিতীয় স্বামী লয়িশের পুত্র পল্টিয়লের নিকট থেকে জোরপূর্বক মীখলকে ছিনিয়ে নিয়ে দায়ূদের নিকট প্রেরণ করেন। অসহায় পল্‌টিয়ল তার পশ্চাতে রোদন করতে করতে বহূরীম পর্যন্ত সঙ্গে যান। ২ শমূয়েলের ৩ অধ্যায়েই এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে।৩২৬ দায়ূদের কাছে ফিরে এসে মীখল আবার তাঁর স্ত্রীতে পরিণত হলেন।৩২৭ এভাবে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা সাতে পরিণত হয়। এরপর দায়ূদ আরো অনেক স্ত্রী ও দাসী-স্ত্রী (উপপত্নী) গ্রহণ করেন, "১৩ আর দায়ূদ হিব্রোণ হইতে আসিলে পর যিরূশালেমে আরও উপপত্নী ও ভার্যা গ্রহণ করিলেন, তাহাতে দায়ূদের আরও পুত্র-কন্যা জন্মিল (And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David) ।"

এত সংখ্যক স্ত্রী ও উপপত্নী থাকার পরেও দায়ূদ উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। পরে তিনি কৌশলে ও ষড়যন্ত্র করে স্বামী উরিয়কে হত্যা করেন এবং তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই পরিচ্ছেদের শুরুতে পাঠক জেনেছেন যে, ঈশ্বর এই ব্যভিচারের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেন। বাইবেল থেকে সুনিশ্চিতভঅবে বুঝা যায় যে, এই ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্রমূলক বিবাহের কারণে দায়ূদের পাপ হলেও, অন্যান্য বহুসংখ্যক স্ত্রীকে বিবাহ করে তিনি কোন পাপ করেন নি। যদি এর আগের বহু বিবাহের কারণে কোন পাপ হতো তবে অবশ্যই ঈশ্বর তাঁকে সেজন্য তিরস্কার করতেন, যেমনটি তিনি তাঁকে উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে বিবাহ করার কারণে তিরস্কার করেন। ঈশ্বর পূর্বের বহুবিবাহের কারণে দায়ূদকে তিরস্কার না করে বহুবিবাহের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন এবং তিনি নিজেই দায়ূদকে এতগুলি স্ত্রী প্রদান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর দায়ূদকে প্রদত্ত তাঁর করুণার কথা উল্লেখ করে বলেন : "যদি এগুলি অল্প হয় তবে আমি এ সকল স্ত্রীর মত আরো স্ত্রী, এদের মত আরো স্ত্রী তোমাকে বৃদ্ধি করে দেব।" উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের পরে নাথন ভাববাদীর মুখে ঈশ্বর দায়ূদকে যে ভাববাণী পাঠান সেই বাণীতে তিনি একথা বলেন। এই বক্তব্যটি বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। ১৬৭১ সালে মহান রোমে প্রকাশিত সংস্করণের ভিত্তিতে ১৮২২, ১৮৩১ ও

---

৩২৬. ২ শমূয়েল ৩/১৪-১৬।

৩২৭. একজনের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে অন্যের কাছে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। আবার তার কাছ থেকে কেড়ে এনে আগের জনকে দেওয়া হচ্ছে। কোন বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, শোক, অবসর কিছুই নেই।

১৮৪৪ সালে লন্ডনে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের বক্তব্যটি নিম্নরূপ : "আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে এ সকল স্ত্রীর অনুরূপ এবং এ সকল স্ত্রীর অনুরূপ বৃদ্ধি করিয়া দিতাম।"[৩২৮]

এখানে 'আমি দিয়াছি' এবং 'আমি বৃদ্ধি করে দিতাম তাদের অনুরূপ এবং তাদের অনুরূপ' কথাগুলি থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর নিজেই এ সকল স্ত্রী দায়ূদকে দান করেছেন এবং দায়ূদ-এর বহুবিবাহে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে বক্তব্যটির শেষাংশ নিম্নরূপ : "আর তোমাদের দৃষ্টিতে তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমার উচিত ছিল তা আমাকে বলা, তাহলে আমি সে সকল স্ত্রীর অনুরূপ এবং সে সকল স্ত্রীর অনুরূপ তোমাকে বৃদ্ধি করিয়া দিতাম।"[৩২৯]

এরপর দায়ূদ তাঁর শেষ জীবনে শূনেমীয়া অবীশগ নামের এক কুমারী যুবতীকে বিবাহ করেন। উক্ত যুবতী স্ত্রী অতি সুন্দরী ছিল। ১ রাজাবলির ১ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩০]

(৫) শলোমন এক হাজার রমণীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ৭০০ স্ত্রী ছিলেন স্বাধীন মহিলা পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের কন্যা। আর ৩০০ জন ছিলেন দাসী-স্ত্রী বা উপপত্নী। এ সকল পত্নী ও উপপত্নীর প্ররোচনায় তিনি শেষ বয়সে ধর্মত্যাগ করে ধর্মদ্রোহী হয়ে যান এবং প্রতিমা পূজার জন্য মন্দির ও উচ্চস্থলী নির্মাণ করেন। ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩১]

তোরাহ-এর কোন স্থানের কোন বক্তব্য থেকে বুঝা যায় না যে, একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ বা অবৈধ। মোশি তাঁর ব্যবস্থায় সকল অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়–বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে সকল অবৈধ বিষয়-বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি একাধিক বিবাহ অবৈধ হতো তবে অবশ্যই মোশি একইভাবে তার অবৈধতার কথা উল্লেখ করতেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্দেশ থেকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা বুঝা যায়। প্রথম অভিযোগের উত্তর আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, মোশির নির্দেশে বন্দি

---

৩২৮. ২ শমূয়েল ১২/৮।

৩২৯. বাংলা বাইবেলে : "আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম।"

৩৩০. ১ রাজাবলি ১/১-৪।

৩৩১. ১ রাজাবলি ১১/১-১০।

বালক-বালিকা ও নারীদের মধ্য থেকে ৩২,০০০ কুমারী বালিকাকে মোশির বাহিনীর ভোগের জন্য জীবিত রাখা হয়। এই কুমারী বালিকাদেরকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে দাসী-স্ত্রী বা উপপত্নীরূপে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। বিবাহিত-অবিবাহিত সকল পুরুষের মধ্যে কুমারী বালিকাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হয়। অবিবাহিতদেরকে বিশেষ কোন অগ্রাধিকার বা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে কোনরূপ উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় বিবরণের ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১০ তুমি তোমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করেন, ও তুমি তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যাও; ১১ এবং সেই বন্দিদের মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাও; ১২ তবে তাহাকে আপন গৃহমধ্যে আনিবে, এবং সে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে ও নখ কাটিবে; ১৩ আর আপনার বন্দিত্ব দশার বস্ত্র ত্যাগ করিবে; পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্য সম্পূর্ণ এক মাস বিলাপ করিবে; তাহার পরে তুমি তাহার নিকটে গমন করিতে পারিবে, তুমি তাহার স্বামী হইবে ও সে তোমার স্ত্রী হইবে। ১৪ আর যদি তাহাতে তোমার প্রীতি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবে; কিন্তু কোন প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে না; তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিবে না, কেননা তুমি তাহাকে মান ভ্রষ্টা করিয়াছ। ১৫ যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়; ১৬ তবে আপন পুত্রদিগকে সর্বস্বের অধিকার দিবার সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। ১৭ কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই।"

ঈশ্বর বলেছেন : "সেই বন্দির মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া প্রেমাসক্ত ....."। এখানে তিনি যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণের জন্য ইস্রায়েল সন্তানগণকে ঢালাও অনুমতি প্রদান করেছেন। এই নির্দেশ শুধু অবিবাহিত বা স্ত্রীবিহীন পুরুষদের জন্য নয়, বরং স্ত্রী-বিহীন ও বিবাহিত সকলের জন্যই উন্মুক্ত। অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে এভাবে একজন পুরুষ শুধু একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবেন এ কথাও এখানে বলা হয় নি, বরং যদি কেউ একাধিক স্ত্রীকে দেখে প্রেমাসক্ত হন তবে সবগুলিকেই গ্রহণ করতে পারবেন বলে এ নির্দেশ থেকে বুঝা যায়। এভাবে ইস্রায়েল সন্তানগণকে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু ঈশ্বর বলেছেন : "যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে...."। এখানে সুস্পষ্টত একাধিক স্ত্রী পরিগ্রহণের বৈধতা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুমতি এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোশির ব্যবস্থায় বহুবিবাহ বৈধ ছিল। এজন্যই গিদিয়োন, দায়ূদ ও অন্যান্য ভাববাদী বহু বিবাহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় : যয়নাবের বিবাহের বিষয়ে প্রকৃত সত্য ও এ সম্পর্কে বাইবেলের বিধানাবলি

যয়নাব বিনতু জাহশের[৩৩২] বিবাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা নিম্নরূপ : যয়নাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। তিনি তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়দ

৩৩২. যয়নাব বিনতু জাহ্শ মুহাম্মাদ (সা)-এর ফুফু উমায়মার কন্যা। তিনি হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়ত লাভের প্রথম দিকেই প্রায় ২০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের কিছু পূর্বে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমনের কিছু পরে ৪র্থ হিজরী সালের দিকে তাঁর পালিত পুত্র বলে খ্যাত যায়দ ইবনু হারিসার সাথে যয়নাবের বিবাহের প্রস্তাব দেন। যায়দ মূলত ক্রীতদাস ছিলেন। আরবের মানুষদের মধ্যে জাত্যাভিমান খুবই বেশি ছিল। তারা অনারব ও ক্রীতদাসদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এজন্য যয়নাব এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি সম্মত হন এবং উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখার এক কন্যা নিজের ফুফাতো বোন যয়নাবকে যায়দের সাথে বিবাহ দিয়ে বংশ গৌরব, জাত্যাভিমান এবং জন্মের কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের উচ্ছেদে একটি সফল প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা পরবর্তীকালে ইসলামী শরীয়তে বিশেষ অবদান রেখেছে। বছর না যেতেই যয়নাবের সাথে যায়দের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। পারিবারিক কলহের সময় যয়নাব নিজের বংশ গৌরব ও যায়দের নিম্ন বংশ ইত্যাদি তুলে খোটা দিতেন এবং প্রায়শ কলহ হতো। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা)-কে অবগত করান যে, যায়দ যয়নাবকে তালাক দেবে এবং এরপর আপনাকে তাকে বিবাহ করতে হবে। কারণ আরব দেশের আরেকটি জাহিলী রীতি ছিল পালিত পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মতই বিবেচনা করা। এজন্য পালিত পুত্রকে তার পিতার পরিবর্তে পালক পিতার নামে পরিচয় দেওয়া হতো এবং উত্তরাধিকার ও বিবাহ-শাদির বিষয়ে তাকে পুত্র হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। এ রীতিকে তারা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়ত ও দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করত। এতে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনাচার, মূল পিতার অধিকার নষ্ট, সন্তানের পরিচয় নষ্ট, বংশ পরিচয় পরিবর্তনের কারণে ঘনিষ্ট রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি পাপ সংঘটিত হতো। মহান আল্লাহ্ এই জাহিলী রীতি বিনষ্ট করার জন্য এরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। আমরা জানি যে, সমাজের প্রচলনের বাইরে কোন কাজ করা খুবই কষ্টকর। সমাজের প্রচলনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করার চেয়ে নিজে সেই কর্ম করা অধিকতর কঠিন। বর্ণ প্রথা বা অস্পৃশ্য প্রথা যে সমাজে রয়েছে সেখানে একজন সমাজকর্মী হয়ত এগুলির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতে

ইবনু হারিসার গৃহে ছিলেন। যায়দ তাকে তালাক দেন। যখন তালাক পরবর্তী অপেক্ষা-সময় বা ইদ্দত পার হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা আহযাবের কিছু আয়াত ও আয়াতের ব্যাখ্যা, তাফসীরে কাবীরের কিছু ভাষ্য আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। আল্লাহ্ বলেছেন : "স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোক ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতপর যায়দ যখন তার সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে,

---

পারবেন, কিন্তু নিজে একজন অচ্ছ্যুতের সাথে একত্রে খাওয়া বা অচ্ছ্যুৎকে কন্যা দান করা তার জন্য অনেক কঠিন। এক্ষেত্রে তাকে আরো অনেক কঠিন সামাজিক প্রতিরোধ ও ঘৃণার সম্মুখীন হতে হবে। বিধবা বিবাহের একই অবস্থা ছিল অতীতে। সে সময়ে অনেক সমাজ সেবকই বিধবা বিবাহের পক্ষে বলেছেন, কিন্তু নিজে বিধবা বিবাহ করার ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব বোধ করেছেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমাজের তিক্ত সমালোচনার ভয়ে আল্লাহ্র কাছে এই দায়িত্ব থেকে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যায়দ তাঁকে যয়নাবের বিষয়ে অভিযোগ করলে তাকে মিলে-মিশে থাকার উপদেশ দেন। তিনি জানতেন যে, সম্ভবত আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ নড়চড় হবে না, ফলে যায়দ যয়নাবকে তালাক দেবে এবং আমাকে তাকে বিবাহ করতে হবে। তবুও বিষয়টি যায়দকে না জানিয়ে তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে ভিন্ন ফয়সালার আশা করছিলেন। এক পর্যায়ে যায়দ যয়নাবকে তালাক দেন। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবকে বিবাহ করেন। যায়দ ও যয়নাবের বিবাহ প্রায় ১ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ৫ হিজরীর যুলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবকে বিবাহ করেন। এ সময় যয়নাবের বয়স ছিল ৩৫ বছর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স ছিল প্রায় ৫৮ বছর। এভাবে আমরা দেখছি যে, যয়নাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ দুটি সামাজিক অনাচার দূর করতে প্রায়োগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মজার বিষয় যে, আরেকটি সামাজিক অনাচার দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যয়নাবের বিবাহকে কেন্দ্র করে। তা হলো ইসলামী হিজাব বা পর্দার প্রচলন। আরবের মেয়েরা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকল পুরুষের সামনে মাথা, মুখ, গ্রীবা, হাত, পা, বক্ষের অংশ বিশেষ ইত্যাদি অনাবৃত রেখেই গমনাগমন ও মেলামেশা করত। ইসলামের প্রথম দিকে এ বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মূলত অধিকাংশ প্রায়োগিক ইসলামী বিধিবিধান মদীনায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরই প্রদান করা হয়। এ সময়ে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যয়নাবের বিবাহের পরে ওলীমা অনুষ্ঠানের পরেই আল্লাহ্ হিজাব বিষয়ক নির্দেশ নাযিল করেন। সহীহ্ বুখারীসহ সকল হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক ঘটনাদি বিস্তারিত সংকলিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের প্রায় ১০ বছর পরে ২০ বা ২১ হিজরীতে যয়নাব (রা) ইন্তেকাল করেন। যয়নাবের বিবাহের এই প্রেক্ষাপট আমাদেরকে পরবর্তী বিষয়াদি বুঝতে সাহায্যে করবে।

সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদিগের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।"৩৩৩

তাফসীরে কাবীরে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে : "স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ অর্থাৎ যায়দ ইবনু হারিসা। আল্লাহ্ তাঁকে ইসলামের অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি, মর্যাদা ইত্যাদি অনুগ্রহ প্রদান করেছেন।

তুমি তাকে বলছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।' যায়দ তাঁর স্ত্রী যয়নাবকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেন, তুমি স্ত্রীকে তালাক দিও না, বরং তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিষয়ে বা তাকে তালাক দেওয়ার বিযয়ে আল্লাহকে ভয় কর।

'তুমি তোমার অন্তরে গোপন করছ আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'। অর্থাৎ তোমার অন্তরের মধ্যে ছিল যে, তুমি যয়নাবকে বিবাহ্ করবে৩৩৪; কিন্তু তুমি তা গোপন করছিলে।

'তুমি লোক ভয় করছিলে৩৩৫ অর্থাৎ তুমি ভয় পাচ্ছিলে যে, মানুষেরা বলবে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর নিজ পুত্রের স্ত্রী বা পুত্রবধুকে বিবাহ্ করেছেন।

'অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত', অর্থাৎ লোকের ভয় হৃদয়ে মোটেও স্থান না দিয়ে শুধু আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এখানে আল্লাহ্ বলেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্কে ভয় করেন নি, বরং লোকভয় থেকে তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ পবিত্র করে কেবল আল্লাহ্র ভয় সেখানে স্থান দাও।

---

৩৩৩. সূরা আহযাব : ৩৭ আয়াত।

৩৩৪. যায়দ যখন যয়নাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসেন তার আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন যে, যায়দের বিবাহ্ টিকবে না এবং বিচ্ছেদের পরে যয়নাবকে আপনাকেই বিবাহ্ করতে হবে। সমাজের যুগযুগ ধরে লালিত প্রথার বিরোধী এই কঠিন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে মনে আশা করছিলেন যে, হয়তবা আল্লাহ্ তাঁর এই নির্দেশ প্রত্যাহার করবেন। এজন্য যায়দ যখন অভিযোগ করতে আসেন তখন তিনি বলেন নি যে, তোমার বিবাহ্ টিকবে না এবং যয়নাবকে পরে আমাকেই বিবাহ্ করতে হবে। কথাটি তিনি মনের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন এ আশায় যে, অন্য কোন বিকল্প হয়ত আল্লাহ্ দেবেন।

৩৩৫. লোকের ভয়ে সত্যগোপন করা যীশুর বিশেষ রীতি ছিল। পার্থক্য এই যে, যীশু লোকের ভয়ে বিশ্বাস বিষয়ক মহাসত্যগুলিও গোপন করেছেন, আর মুহাম্মাদ (সা) বিশ্বাস বা আবশ্যকীয় বিষয়ে সকল ভয় উপেক্ষা করে সত্য বলেছেন। এক্ষেত্রে বিকল্পের আশায় কথাটি গোপন রাখছিলেন। হয়তবা অন্যভাবে আল্লাহ্ বিষয়টির ব্যবস্থা করবেন। তারপরও আল্লাহ্ তাঁর এই বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন : "যারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করে এবং আল্লাহ্কেই ভয় করে আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না।"৩৩৬

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : 'অতপর যায়দ যখন তার সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করল ...'। অর্থাৎ যায়দ যয়নাবকে তালাক দিল এবং তালাক পরবর্তী ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল শেষ হল। বিবাহ যতক্ষণ বহাল থাকে ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীর দায়িত্বে থাকে এবং তার প্রয়োজনাদি মেটায়। এভাবে বিবাহ সূত্র বহাল থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ইদ্দত বা অপেক্ষা সময়েও বিবাহের সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় না; কারণ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং ভরণ-পোষণ বা সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বও রয়ে যায়। ফলে বিবাহসূত্র পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় না। স্বামীর তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দতকাল বা অপেক্ষাকাল যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই বিবাহসূত্রটি পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়। এটাই শরীয়তের বিধান। কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে বা তালাকের পরে অপেক্ষারত স্ত্রীকে বিবাহ করা অবৈধ। এজন্যই আল্লাহ্ বললেন যে, 'যায়দ যখন বিবাহসূত্র ছিন্ন করল'।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : 'যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে, সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদিগের কোন বিঘ্ন না হয়' অর্থাৎ পোষ্যপুত্রগণ তাদের স্ত্রীদের তালাক দিলে এবং তালাকের পরে ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল অতিক্রান্ত হলে পালক পিতারা প্রয়োজনে সে সকল নারীকে বিবাহ করতে পারবে। এখানে আল্লাহ্ স্পষ্টতই উল্লেখ করলেন যে, যয়নাবের সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিবাহ তাঁর নিজের ইচ্ছা, প্রয়োজন বা যৌনতা মেটানোর জন্য নয়; বরং একান্তই ইসলামের একটি বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইসলামের বিধিবিধান যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখের কথা ও নির্দেশনার মাধ্যমে জানা যায়, তেমনিভাবে তাঁর কর্মের মাধ্যমেও জানা যায়।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : 'আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে' অর্থাৎ আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বিবাহের মাধ্যমে যেমন শরীয়তের একটি বিধান প্রচলিত হয়েছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তেমনি এই বিবাহের মধ্যে অন্যান্য কল্যাণময় দিকও ছিল এবং এর দ্বারা কোন অকল্যাণ বা ক্ষতি সাধিত হয় নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, যয়নাব (রা) যায়দ (রা)-এর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতেন এবং নিজের বংশমর্যাদার কারণে যায়দের উপর অহঙ্কার করতেন। এতে দাম্পত্য প্রেম ও শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। যায়দ যয়নাবকে তালাক দিতে মনস্থ

৩৩৬. সূরা আহযাব : ৩৯ আয়াত।

করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তালাক প্রদান না করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায়দ তাঁকে তালাক দেন । পরবর্তীতে শরীয়তের বিধান অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি কিছু আগেই এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ জানতে পেরেছিলেন, তবে আরবদের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির বিরোধিতার কারণে মানুষের সমালোচনার ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন যে, এরূপ বিষয় নিয়ে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির বিরোধিতা করা হয়ত এত প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। এভাবে তিনি নির্দেশটি পালন থেকে অব্যাহতি আশা করছিলেন। এ কারণে তিনি প্রথমে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। তৃতীয় বিষয় থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, এ বিষয়টি কোন আপত্তিকর বিষয় নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যয়নাব (রা)-এর বিবাহের বিষয়ে তাফসীরে বায়যাবীতে যে বর্ণনা সংকলন করা হয়েছে তার সূত্র বা সনদ দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। গবেষক মুহাদ্দিসগণ এর সনদের দুর্বলতা ও অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ভারতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ আবদুল হক দেহলবী (১০৫ হি/ ১৬৪২ খৃ) তাঁর কোন কোন গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। শারহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে : "বলা হয়ে থাকে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবকে পর্দার আড়াল থেকে দেখতে পেয়ে তাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে এরূপ গল্প বলা থেকে বিরত থাকা দরকার।[৩৩৭]

৩৩৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যয়নাব (রা)-এর বিবাহের পর তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দী থেকেই কিছু ভিত্তিহীন ও জাল গল্প প্রচারিত হয়েছে। কোন কোন তাফসীর লেখক এবং গল্পকার ওয়ায়িযগণ এগুলি বলে আসর জমাতেন। অনেক তাফসীর প্রণেতা বাছবিচার না করেই সকল গল্পকাহিনী তাফসীর গ্রন্থে লিখতেন। তাফসীর প্রণেতাদের এই রীতির বিষয়ে আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন প্রকারের নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতেন। আমি উপর্যুক্ত 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে হাদীস নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে কোন বর্ণনা বা তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ form of critisim নামে কেবল অর্থগত বা তথ্যগত নিরীক্ষার উপরেই মূলত নির্ভর করেন, সূত্রগত বা সনদের নিরীক্ষা তাদের মধ্যে নেই। কারণ কোন বর্ণনার সনদই তাদের নিকট সংরক্ষিত নয়। ফলে মিথ্যাবাদী বা জালিয়াতের বর্ণনা এবং সত্যবাদীর বর্ণনা একই মানদণ্ডে রেখে অর্থগত নিরীক্ষা করা হয়। এতে অনেক প্রকার বিভ্রান্তির জন্ম নেয়। মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ যে কোন বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরতা বিচারের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী পর্যালোচনা করেন : প্রথমত সূত্রগত নিরীক্ষা এবং দ্বিতীয়ত : অর্থগত বা তথ্যগত নিরীক্ষা। যে কোন তথ্য গ্রহণ করার আগে প্রথমে তাঁরা বিচার করেন যে, তথ্যটি কে প্রদান করেছেন এবং কার সূত্রে তা সংগ্রহ করেছেন। সূত্রের ব্যক্তিগণ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হলে তাঁরা তাঁর বর্ণনার অর্থ বিচার করেন। সূত্রগত বিচারে মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, যয়নাবের বিবাহ বিষয়ক এই বর্ণনা মিথ্যাবাদী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের রচিত ও বর্ণিত। আমরা সে বিষয়ে আলোচনা

তৃতীয় বিষয় : বাইবেলের আলোকে ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সামাজিক রীতি ও যুক্তির বিরোধিতা

ঐশ্বরিক বিধান বা ধর্মীয় ব্যবস্থা সকল যুগে, সকল সমাজে একরূপ হওয়া জরুরী নয়। অনুরূপভাবে ঐশ্বরিক বিধান বা ধর্মীয় ব্যবস্থা সকল দেশের সকল মানুষের রীতি

করব না। এখানে বর্ণনাটির অর্থগত আলোচনা এর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করবে। এই বর্ণনার মূল বিষয় যে, যায়দের সাথে যয়নাবের বিবাহের পরে একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দের বাড়ি গমন করেন। পর্দার ফাঁকে হঠাৎ করে যয়নাবের মুখ বা মাথার চুল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এতে যয়নাবের প্রতি তাঁর অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হয়। তিনি সুবহানাল্লাহ্ বলে চলে আসেন। পরবর্তীতে যায়দ স্ত্রী পরিত্যাগ করলে তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। এ হলো এ বানোয়াট কাহিনীর সারসংক্ষেপ। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

(১) মুহাম্মাদ (সা) তাঁর আপন ফুফাতো বোন যয়নাবকে জন্ম থেকেই দেখেছেন। তাঁর সামনেই যয়নাব বড় হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। মদীনায় এসেও তাঁকে সর্বদা দেখেছেন। কোন পর্দা ব্যবস্থা তৎকালে ছিল না। যয়নাবের প্রতি তাঁর মনে সামান্যতম আগ্রহ থাকলে মদীনায় আগমনের পূর্বে বা পরে তিনি তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে যয়নাব নিজে ও তাঁর পরিবার মহাখুশি হতেন এবং এক কথায় রাজি হতেন। যায়দের সাথে বিবাহের পূর্বে তারা নিজেরাই তাঁর সাথে যয়নাবকে বিবাহ প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

(২) যে মহিলাকে তিনি শিশুকাল থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত সর্বদা দেখেছেন, তাঁকে হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে এক নযর দেখাতে তাঁর মনে প্রেম জন্মাবে, এ কথা কি কোন পাগলেও কল্পনা করতে পারে! বিশেষত যখন মহিলা যুবতী ছিলেন এবং পুরুষও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে পর্দা ছাড়াই বারবার দেখে আলোড়িত হলেন না আর এখন একবারে হঠাৎ দেখায় আলোড়িত হবেন ?

(৩) যে কোন জালিয়াত জালিয়াতি করার সময় কিছু ভুল রেখে দেয়। জালিয়াতরা যখন এই গল্পটি বানিয়েছিল তখন পর্দা ব্যবস্থা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্য পর্দা ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই তারা গল্পটি বানিয়েছে । তারা লক্ষ্য করেনি যে, যায়দের সাথে যয়নাবের বিবাহের আগে বা পরে মুসলিম সমাজে পর্দা ব্যবস্থা ছিল না। এমনিতেই মহিলারা মাথা, গলা, চুল, মুখমণ্ডল ইত্যাদি অনাবৃত রেখে বাড়িতে ও বাইরে সকলের সামনে চলত, কথাবার্তা বলত ও মিশত। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্দার আড়াল থেকে এক নযর তাকে দেখেছিলেন বলে যে কাহিনী বলা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন।

(৪) এই জাল ও মিথ্যা গল্পটিকে সত্য বলে ধরে নিলেও মুহাম্মাদ (সা) বাইবেলীয় ভাববাদিগণের চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক দৃঢ়তা ও ধার্মিকতা দেখিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি ঈশ্বরের মাসীহ ও প্রথমজাত পুত্র দায়ূদের মত পরের স্ত্রীকে দেখামাত্র ডেকে এনে ব্যভিচার করেন নি, স্বামীকে কৌশলে তার কাছে পাঠিয়ে জারজ সন্তানের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন নি এবং সর্বোপরি তাকে কৌশলে হত্যা করে স্ত্রীকে দখল করেন নি। অনুরূপভাবে তিনি ঈশ্বরের অন্য আরেক মাসীহ এবং একমাত্র পুত্র নসরতীয় যীশুর ন্যায় সুপরিচিত বেশ্যাকে ক্ষমার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে চুমু খেতে বা তার নিজের খোলা চুল দিয়ে তার পা মুছে দিতে দেননি এবং বিবাহ ছাড়াই এরূপ মহিলাদেরকে নিয়ে একত্রে ভ্রমণ ও বসবাস করেন নি।

বা মন-মানসিকতার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে তাও জরুরী নয় (অনেক সময় সামাজিক লোকাচার, রীতি বা ধর্মীয় আচারকে অপসারিত করতে প্রচারক বা সংস্কারককে উক্ত রীতিবিরোধী কর্মে লিপ্ত হতে হয়। এজন্য কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা অন্য ধর্মের ব্যবস্থার বিপরীত হলে বা নির্দিষ্ট কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষের রীতি বা মানসিকতার বিরোধী হলেই তাকে 'ঐশ্বরিক নয়' বা 'ঈশ্বর এরূপ বিধান দিতে পারেন না' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খৃস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলই এ কথা প্রমাণ করে)।

পাঠক ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 'নাস্‌খ' বা রহিতকরণের' আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন যে, ঐশ্বরিক বিধান বা আসমানী শরীয়ত সকল যুগে ও ধর্মে এক ছিল না। যুগ, সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে ঈশ্বরের বিধান বা শরীয়তের বিধানাবলিতে পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়টি উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক জেনেছেন যে, অবরাহামের স্ত্রী সারা অবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন[৩৩৮], যাকোব দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করেছিলেন[৩৩৯] এবং মোশির পিতা অম্রমের (ইমরানের) স্ত্রী যোকেবদ ছিলেন তাঁর আপন পিসি বা ফুফু, অর্থাৎ অম্রম আপন ফুফুকে বিবাহ করেছিলেন[৩৪০]। এই তিনটি বিবাহই মোশির ব্যবস্থায়, যীশুর ব্যবস্থায় এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যবস্থায় (শরীয়তে) নিষিদ্ধ ও ব্যভিচার বলে গণ্য। বিশেষত বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করা ও আপন ফুফুকে বিবাহ করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিতে এরূপ বিবাহ ঘৃণ্যতম পাপ ও জঘন্যতম অনাচার। এরূপ বিবাহকে তারা কঠিনভাবে নিন্দা করে এবং যারা এরূপ বিবাহ করে তাদেরকে তারা অত্যন্ত ঘৃণা ও উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে। এরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা তাদের দৃষ্টিতে সাধারণ ব্যভিচারজাত সন্তানের চেয়ে অধিক খারাপ।

লূকলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৯ .... এবং অনেক করগ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও তাহাদের অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা কি কারণে করগ্রাহী ও পাপীদের (publicans and sinners) সঙ্গে ভোজন পান করিতেছ ? .... ৩৩ পরে তাহারা তাঁহাকে কহিল, (কেন) যোহনের শিষ্যগণ বার বার (অধিকাংশ সময়/ প্রায়শ) উপবাস করে ও প্রার্থনা করে, ফরীশীদের শিষ্যেরাও

---

৩৩৮. আদি পুস্তক ২০/১২; লেবীয় ১৮/৯; ২০/১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২।

৩৩৯. আদিপুস্তক ২৯/১৫-৩০; লেবীয় ১৮/১৮।

৩৪০. যাত্রা পুস্তক ৬/৩০; গণনা পুস্তক ২৬/৫৯; লেবীয় ১৮/১২; ২০/১৯।

সেইরূপ করে ; কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে (Why do the disciples of John fast often, and make prayers and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink)?

অধ্যাপকগণ ও ফরীশীগণ ছিলেন ইহূদী ধর্মের সর্বোচ্চ মর্যাদার ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক মানুষ। তাঁরা যীশুর সমালোচনা করতেন যে, যীশুর শিষ্যগণ পাপীদের এবং করগ্রাহকদের সাথে পানাহার করে এবং তারা পেটুক ও সর্বদা পানাহারে লিপ্ত থাকে, উপবাস (সিয়াম) ও প্রার্থনা (সালাত) আদায় করে না।

লূকের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ আর করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে তাঁহার বাক্য শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেছিল। ২ তাহাতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে, ও তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করে।"

এখানেও আমরা দেখছি যে, ফরীশীগণ ও অধ্যাপকগণ যীশুর নিন্দা ও তিরস্কার করেন এজন্য যে, তিনি পাপীদের সাথে পানাহার করেন এবং তাদের গ্রহণ করেন।

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "২ আর যখন পিতর যিরূশালেমে আসিলেন, তখন ছিন্নত্বক্ লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিলেন, ৩ তুমি অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছ ও তাহাদের সহিত আহার করিয়াছ।"

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ আর ফরীশীরা ও কয়েক জন অধ্যাপক যিরূশালেম হইতে আসিয়া তাঁহার নিকটে একত্র হইল। ২ তাহারা দেখিল যে, তাঁহার কয়েকজন শিষ্য অশুচি অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতেছে। (তারা এর নিন্দা করল : they found fault) ৩ ফরীশীগণ ও যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি (the tradition of the elders) মান্য করায় ভাল করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে না। ৪ আর বাজার হইতে আসিলে তাহারা স্নান না করিয়া আহার করে না; এবং তাহারা আরও অনেক বিষয় মানিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, ঘটি, ঘড়া ও পিতলের নানা পাত্র ধৌত করা। ৫ পরে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হস্তে আহার করে, ইহার কারণ কি ?"

ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণদের ধর্মে এবং সাধারণভাবে ভারতীয় হিন্দু ধর্মে ধরা, ছোয়া, একত্রে পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন বিধিবিধান রয়েছে। যদি কোন হিন্দু কোন মুসলিম, ইহূদী বা খৃস্টানের সাথে একত্রে পানাহার করে তবে সে ধর্মচ্যুত বলে বিবেচিত হয়।

পালিত পুত্র পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা আরব পৌত্তলিকদের নিকট অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে গণ্য ছিল। যায়দ ছিলেন মুহাম্মাদ (সা)-এর পালিত পুত্র। তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ্ করার নির্দেশ পালনে মুহাম্মাদ (সা) লোকনিন্দার ভয় পেয়েছেন (তিনি মনে করেছিলেন, এই নির্দেশটি হয়ত অত জরুরী নয় বা বিকল্প কোন ব্যবস্থায় আল্লাহ্ এই বিধানটি প্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই এজন্য লোকনিন্দার মধ্যে নিপতিত হওয়াকে তিনি জরুরী মনে করেন নি)। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাঁকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলেন তখন তিনি পৌত্তলিকদের রীতির তোয়াক্কা না করে আল্লাহ্র নির্দেশ বা ব্যবস্থা প্রকাশের জন্য বিবাহ্ করলেন।[৩৪১]

চতুর্থ বিষয় : মুহাম্মাদ (সা)-এর বিষয়ে পাদরিগণের অভিযোগ বনাম বাইবেলীয় উদ্ভট বিধিবিধান

যে সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং ইসলামের অমুক বিধান, অমুক বিধান অযৌক্তিক, মুহাম্মাদ (সা)-এর মনগড়া ইত্যাদি বলে দাবি করেন, তাঁদেরকে নিলর্জ্জ বেহায়া না বলে কোন উপায় নেই। তাঁরা পরের ধর্মের ভুলভ্রান্তি খুঁজে বেড়ান, অথচ নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কী আছে তা একটু ভেবে দেখেন না। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল যে কত প্রকারের অগণিত ভুল, বৈপরীত্য ও উদ্ভট বিধিবিধানে পরিপূর্ণ তা একটুও ভাবেন না বা বলেন না। এই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে এবং ৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে পাঠক বাইবেলের বৈপরীত্য, ভুল ও অযৌক্তিক বিধানাবলি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এছাড়া বাইবেলীয় ভাববাদীদিগের, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এবং সঙ্গী-সাথীদের পাপাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের বিষয়েও পাঠক জানতে পেরেছেন এই পরিচ্ছেদের শুরুতে। আমি চাচ্ছি না যে, এ বিষয়ক কিছু কথা থেকে আমাদের এই বিষয়ে আরো কিছু জানতে পারেন, যদিও ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জেনেছেন।

(১) আদিপুস্তকের ৩০ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩ আর যাকোব লিবৃনী, লুস ও আর্মোণ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিলেন। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুপাল জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে পালের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বকশূন্য রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল রাখিতে লাগিলেন; তাহাতে জল পান করিবার সময়ে তাহারা গর্ভধারণ করিত। ৩৯ আর সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দুচিতি ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত। ৪০ পরে যাকোব

---

৩৪১. যদি যীশু ইহুদীদের অস্পৃশ্যৎ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু উপদেশ দিতেন এবং নিজে কার্যের মাধ্যমে অস্পৃশ্যৎ ব্যবস্থার বিলোপ না করতেন, তবে কি এই ব্যবস্থাটি এত সহজে খৃষ্টধর্ম থেকে বিলুপ্ত হতো?

সেই সকল বৎস পৃথক করিতেন এবং লাবণের রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি রাখিতেন ; এইরূপে তিনি লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া পালকে পৃথক করিতেন। ৪১ আর বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ভধারণ করে, এই জন্য নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা রাখিতেন; ৪২ কিন্তু দুর্বল পশুদের সম্মুখে রাখিতেন না। তাহাতে দুর্বল পশুগণ লাবনের ও বলবান পশু সকল যাকোবের হইত। ৪৩ আর যাকোব অতি বর্ধিষ্ণু হইলেন এবং তাঁহার পশু ও দাস-দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দভ যথেষ্ট হইল (ছিল)।"

এ বড় অদ্ভুৎ ও উদ্ভট কথা! সাধারণ নিয়ম যে, পশুর সন্তান তাদের পিতা-মাতার আকৃতি বা রঙ গ্রহণ করবে। কোন বুদ্ধিমান এ কথা কল্পনা করতে পারে না যে, পশু গর্ভধারণের সময় যে রঙের লাঠি বা বা শাখা দেখবে সেই রঙের বাচ্চা প্রসব করবে। তাহলে তো বসন্তকালের সকল পশু শাবকই সবুজ রঙের হত।

(২) লেবীয় পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪৭ আর লোমের বস্ত্রে কিম্বা মসীনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠ রোগের কলঙ্ক হয়, ৪৮ লোমের কিম্বা মসীনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্মে কি চর্কনির্মিত কোন দ্রব্যে যদি হয়; ৪৯ এবং বস্ত্রে কিম্বা চর্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মনির্মিত কোন দ্রব্য যদি ঈষৎ শ্যামবর্ণ কিম্বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ কলঙ্ক হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক; তাহা যাজককে দেখাইতে হইবে ; ৫০ পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত বস্তু সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫১ পরে সপ্তম দিনে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিবে, যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মে কিম্বা চর্মনির্মিত দ্রব্যে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা সংহারক কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। ৫২ অতএব বস্ত্র কিম্বা লোমকৃত কি মসীনাকৃত তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম নির্মিত দ্রব্য, যাহা কিছুতে সেই কলঙ্ক হয়, তাহা সে পোড়াইয়া দিবে; কারণ তাহা সংহারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে। ৫৩ কিন্তু যাজক দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই কলঙ্ক বস্ত্রে কিংবা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিংবা চর্মে কোন দ্রব্যে বাড়িয়া না উঠে, ৫৪ তবে যাজক সেই কলঙ্কবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাত দিন তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫৫ ধৌত হইলে পর যাজক সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, সেই কলঙ্ক যদি অন্য বর্ণ না হইয়া থাকে ও সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া না থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; উহা ভিতরে কিংবা বাহিরে উৎপন্ন ক্ষত। ৫৬ কিন্তু যদি যাজক দেখে, আর দেখ, ধৌত করিবার পরে যাজকের দৃষ্টিতে যদি সেই কলঙ্ক মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্র হইতে কিম্বা চর্ম হইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ান হইতে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ৫৭ তথাপি যদি সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্মনির্মিত কোন দ্রব্যে তাহা পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে তাহা ব্যাপক

কুষ্ঠ; যাহাতে সেই কলঙ্ক থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে। ৫৮ আর যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবে, তাহা হইতে যদি সেই কলঙ্ক দূর হয়, তবে দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবে ; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। ৫৯ লোমের কিম্বা মসীনাকৃত বস্ত্রের কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্মনির্মিত কোন পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠের জন্য কলংকের এই ব্যবস্থা।"

এই বাইবেলীয় বিধানগুলি একটু ভেবে দেখুন! এগুলি মানবীয় কল্পনা ও কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। চামড়া, পাত্র, কাপড় ইত্যাদি এভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করার কোন বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ভিত্তি আছে কি ?

(৩) লেবীয় পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৪ আমি যে দেশ অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিব, সেই কনান দেশে তোমাদের প্রবেশের পর যদি আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোন গৃহে কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক (plague fo leprosy) উৎপন্ন করি, ৩৫ তবে সেই গৃহের মালিক আসিয়া যাজককে এই সংবাদ দিবে, আমার দৃষ্টিতে গৃহে কলঙ্কের মত দেখা দিতেছে। ৩৬ তৎপরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ঐ কলঙ্ক দেখিবার জন্য যাজকের প্রবেশের পূর্বে গৃহটি শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহে দেখিতে প্রবেশ করিবে। ৩৭ আর সে সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, যদি গৃহের দেওয়ালে কলঙ্ক নিম্ন ও ঈষৎ হরিৎ কিম্বা লোহিতবর্ণ হয় এবং তাহার দৃষ্টিতে দেওয়াল অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ৩৮ তবে যাজক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহ দ্বারে গিয়া সাত দিন ঐ গৃহ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৩৯ সপ্তম দিনে যাজক পুনর্বার আসিয়া দৃষ্টি করিবে; আর দেখ, গৃহের দেওয়ালে সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া থাকে, ৪০ তবে যাজক আজ্ঞা করিবে, যেন কলঙ্ক বিশিষ্ট প্রস্তর সকল উৎপাটন করিয়া লোকেরা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ করে। ৪১ পরে সে গৃহের ভিতরের চারিদিক ঘর্ষণ করাইবে, ও তাহারা সেই ঘর্ষণের ধুলা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে ফেলিয়া দিবে। ৪২ আর তাহারা অন্য প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তরের স্থানে বসাইবে ও অন্য প্রলেপ লইয়া গৃহ লেপন করিবে। ৪৩ এইরূপে প্রস্তর উৎপাটন এবং গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পর যদি পুনর্বার কলঙ্ক জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়, তবে যাজক আসিয়া দেখিবে ; ৪৪ আর দেখ, যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ আছে , সেই গৃহ অশুচি। ৪৫ লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং গৃহের প্রস্তর, কাষ্ঠ ও প্রলেপ সকল নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। ৪৬ আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৪৭ আর যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।"

এ বিধানগুলিও মানবীয় কল্পনা ও কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। মাকড়শার ঘরের চেয়ে দুর্বল ভিত্তিহীন এ সকল কুসংস্কার ও কল্পনার ভিত্তিতে বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলতে হবে ? ইউরোপের জ্ঞানিগণ কি বিশ্বাস করেন যে, কাপড়, কাপড়ের সুতা, চামড়ার তৈরি কাপড়, বাড়িঘর বা নির্মাণ সামগ্রী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হতে পারে যে কারণে সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা ভেঙ্গে ফেলতে হবে?৩৪২

(৪) লেবীয় পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "পুরুষের শরীরে প্রমেহ (ক্ষত,পুজ) হইলে সেই প্রমেহে সে অশুচি হইবে (when any man hath a running issue out of his flesh (RSV : has a discharge from his body), because of his issue he is unclean) ... "১২ আর প্রমেহী যে কোন মাটির পাত্র স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র জলে ধৌত হইবে। .... ১৬ আর যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপনার সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে। ... ২২ আর (যে স্ত্রীর মাসিক হয়) যে কেহ তাহার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে।.... ২৪ আর অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহার রক্তস্রাব তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে এবং যে কোন শয্যায় সে শয়ন করিবে তাহাও অশুচি হইবে।"

এই বিধানগুলি একটু চিন্তা করে দেখুন! মাটির পাত্র ভেঙ্গে ফেলার বিধানটি অকারণে সম্পদ নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয়। একথা তো স্পষ্ট যে, এরূপ ব্যক্তি কোন একটি পাত্র স্পর্শ করলেই সেই পাত্রের মধ্য রোগ-ব্যাধি বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়বে এরূপ চিন্তা করার কোন ভিত্তি নেই। এরপরেও যদি কল্পনা করা হয় যে, উক্ত পাত্রের মধ্যে অসুস্থতা বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে, তবে সেক্ষেত্রে তো পাত্রটি ধৌত করলেই হত, যেমনভাবে কাঠের পাত্র ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভেঙ্গে ফেলার কী প্রয়োজন ?

---

৩৪২. আবার এ সকল অশুচি (unclean) গৃহ শুচি (clean) করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখুন : "৪৮ আর যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, আর দেখ, সেই গৃহ লেপনের পর কলঙ্ক আর বাড়ে নাই, তবে যাজক সেই গৃহকে শুচি বলিবে; কেননা কলঙ্কের উপশম হইয়াছে। ৪৯ পরে সে ঐ গৃহ শুচি করণার্থে দুইটি পক্ষী, এরস কাষ্ঠ, লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব লইবে, ৫০ এবং মাটির পাত্রে স্রোতজলের উপরে একটি পক্ষী হনন করিবে। ৫১ পরে সে ঐ এরস কাষ্ঠ, এসোব, লোহিতবর্ণ লোম ও জীবিত পক্ষী, এই সকল লইয়া হত পক্ষীর রক্তে ও স্রোতজলে ডুবাইয়া সাত বার গৃহ ছিটাইয়া দিবে। ৫২ এইরূপে পক্ষীর রক্ত, স্রোতজল, জীবিত পক্ষী, এরস কাষ্ঠ, এসোব ও লোহিতবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সেই গৃহ শুচি করিবে। ৫৩ পরে ঐ জীবিত পক্ষীকে নগরের বাহিরে মাঠের দিকে ছাড়িয়া দিবে এবং গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; তাহাতে তাহা শুচি হইবে।"

দ্বিতীয় বিধানটি দেখুন! রেতঃপাতের পরে সমস্ত শরীর জলে ধৌত করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকার অর্থ কি ?

তৃতীয় বিধানটিও অদ্ভুৎ ও উদ্ভট! ঋতুবতী রমণী কোন কিছুর উপর বসলেই তাতে তার ঋতুস্রাবের রক্ত লেগে যাওয়া জরুরী নয়। এরপর সেই আসন স্পর্শ করলে স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে ঋতুস্রাবের রক্ত বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ে বলে চিন্তা করার কি কোনরূপ ভিত্তি আছে ? এরপরও যদি কল্পনা করা হয় যে, স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়েছে, তবে স্পর্শকারীর দেহ ও কাপড়চোপড় পুরোপুরি ধৌত করলেই তো হল। দেহ ও পোশাক ধৌত করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশুচি থাকার অর্থ কি ? সবচেয়ে মজার বিষয় যে, কোন পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় বা স্বপ্নে রেতঃপাত করে তবে তাকে তার পোশাক ধৌত করতে হয় না, শুধু নিজে স্নান করলেই হবে। অথচ ঋতুবতীর আসন স্পর্শ করলে তাকে স্নান করা ছাড়াও নিজের পোশাকও ধৌত করতে হবে।

উপরের তিনটি বিধানের চেয়েও অদ্ভুৎ ও বিস্ময়কর বিধান চতুর্থ বিধান। ঋতুবতী স্ত্রীর রক্তস্রাব গায়ে লাগার কারণে পুরুষও স্ত্রীর মত ঋতুবতী বলে গণ্য হবে! এজন্য ঋতুবতী যেমন ৭ দিন অশুচি থাকে এই পুরুষকেও সেভাবে ৭ দিন অশুচি থাকতে হবে ?

মাসিক রক্তস্রাব এবং প্রলম্বিত রক্তস্রাবের বিষয়ে লেবীয় পুস্তকের এই অধ্যায়ে আরো অনেক অদ্ভুৎ ও কঠিন বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের এ সকল পবিত্র বিধানের আলোকে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অশুচি ও অপবিত্র মানুষ হচ্ছেন খৃস্টানগণ; কারণ তারা এ সকল বিধান কোনভাবে পালন করেন না বা এসবের কোন তোয়াক্কা করেন না।

(৫) লেবীয় পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "পরে সেই দুইটি ছাগ লইয়া সমাগম-তাম্বুল দ্বার-সমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ৮ পরে হারোণ ঐ দুইটি ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে ; এক গুলি সদাপ্রভুর নিমিত্ত ও অন্যগুলি আযাযীলের[৩৪৩] নিমিত্ত (for Aza'zel) হইবে।[৩৪৪] ৯ গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ সদাপ্রভুর নিমিত্তে হয়, হারোণ তাহাকে লইয়া পাপার্থে বলিদান করিবে। ১০ কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা

৩৪৩. ইহূদী-খৃস্টান বিশ্বাস অনুসারে শয়তান বা প্রান্তরের শয়তানের নামে আযাযীল।

৩৪৪. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলের আরবী পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণ রিভাইজ্‌ড স্টান্ডার্ড ভার্সনেও এরূপ বলা হয়েছে : one lot for the LORD, and the other lot for Aza'zel. পূর্ববর্তী ইংরেজি ভার্সন (KJV)-এ বলা হয়েছে : one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat। কেরির বাংলা বাইবেলে : "একগুলি সদাপ্রভুর নিমিত্তে ও অন্যগুলি ত্যাগের নিমিত্তে হইবে।"

যে ছাগ আযাযীলের নিমিত্তে হয়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে, এজন্য আযাযীলের নিমিত্তে তাকে প্রান্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।"৩৪৫

বড় অদ্ভুৎ বিধান! আযাযীলের জন্য পশু বলিদান বা পশু উৎসর্গ করার অর্থ কী ? সদাপ্রভু ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করার বা বলিদান করা নিষিদ্ধ। অথচ এখানে আযাযীলের জন্য পশু উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ছাড়া অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ করা। আমি ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের দেবতাদের নামে ষাড় ছেড়ে দেন। কিন্তু তারা তা ছেড়ে দেন জনপদের মধ্যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করার জন্য মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেন না।

(৬) দ্বিতীয় বিবরণের ২৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "৫ যদি ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন অপুত্রক হইয়া মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য গোষ্ঠিভুক্ত পুরুষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহার কাছে যাইবে, তাহাকে বিবাহ করিবে এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিবে। ৬পরে সেই স্ত্রী যে প্রথম পুত্র প্রসব করিবে, সে ঐ মৃত ভ্রাতার নামে উত্তরাধিকারী হইবে; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে তাহার নাম লুপ্ত হইবে না। ৭ আর সেই পুরুষ যদি তাহার ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, তবে সেই ভ্রাতৃপত্নী নগর দ্বারে প্রাচীনবর্গের কাছে গিয়া বলিবে, আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে আপন ভ্রাতার নাম রক্ষা করিতে অসম্মত, সে আমার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিতে চাহে না। ৮ তখন তাহার নগরের প্রাচীনবর্গ তাহাকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে ; যদি সে দাঁড়াইয়া বলে, উহাকে গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; ৯ তবে তাহার ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে পাদুকা খুলিবে, এবং তাহার মুখে থুথু দিবে, আর উত্তমরূপে এই কথা কহিবে,যে কেহ আপন ভ্রাতার কুল

---

৩৪৫. গ্রন্থকার প্রদত্ত বাইবেলে আরবী পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণ রিভাজড স্টান্ডার্ড ভার্সনেও এরূপ বলা হয়েছে : But the goat, on which the lot fell for Aza'zel shall presented alive before the LORD, to make an atonement with him, that it may be sent away into the wilderness to Aza'zel. পূর্ববর্তী ইংরেজি ভার্সন (KJV)-এ বলা হয়েছে : But the goat, on which the fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness। কেরির বাংলা বাইবেলে : "কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ ত্যাগের নিমিত্তে হয়, সে যেন ত্যাগের নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে।"

রক্ষা না করে, তাহার প্রতি এইরূপ করা যাইবে। ১০ আর ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার নাম হইবে, 'মুক্ত পাদুকার কুল'।"

বড় অদ্ভুৎ বিধান! মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতেই হবে! এই স্ত্রী অন্ধ হতে পারে, কানা হতে পারে, খোড়া হতে পারে, অসুন্দর হতে পারে, বিকৃত আকৃতির হতে পারে, অসৎ চরিত্রের হতে পারে, দুষ্টা হতে পারে অথবা অন্য কোন ত্রুটি তার মধ্যে থাকতে পারে। বেচারা দেবরের কি কোন পছন্দ থাকতে পারে না যে, একজন মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কোন নারীকে বিবাহ করতে তাকে বাধ্য করা হবে! ভাইয়ের বংশ রক্ষার এ এক অদ্ভুৎ বিধান।

এর চেয়ে অবাক বিষয় যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ এই মহান ও পবিত্র বিধান পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন : "ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" ১৮৪০ সালে ফালতায় মুদ্রিত ইংলিশ চার্চের সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক ও অন্যান্য চার্চীয় নিয়মাবলির মধ্যে এই বিধানটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, বৈধ ও অবৈধতার বিধানাবলি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। খৃস্টানগণ এগুলি পুরাতন নিয়ম থেকেই গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চম বিষয় : বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু ও প্রেরিতগণের মাতলামি ও অশ্লীলতা

যদি কারো উদ্দেশ্য হয় বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা অথবা যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষের দোষ সন্ধান করা তবে সে বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে স্বয়ং যীশু ও প্রেরিতদের বিরুদ্ধেও নৈতিক স্খলন ও অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। পাদরিগণ যেভাবে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে নারীঘটিত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনিও সেভাবে যীশু ও প্রেরিতদের বিরুদ্ধে নারীঘটিত অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন।

লূকলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৩ কারণ যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া রুটি খান না, দ্রাক্ষারস (মদ) ও পান করেন না, ৩৪ আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন, আর তোমরা বল ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু। ..... ৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে আপনার সঙ্গে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভোজনে বসিলেন। ৩৭ আর দেখ, সেই নগরে এক পাপীষ্ঠা স্ত্রীলোক ছিল; সে যখন জানিতে পারিল; তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে ভোজনে বসিয়াছেন, তখন একটি শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া আসিল, ৩৮ এবং পশ্চাৎ দিকে তাঁহার চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে চক্ষের

জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে লাগিল এবং আপনার মাথার চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, আর তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে করিতে সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। ৩৯ তাহা দেখিয়া, যে ফরীশী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সে মনে মনে কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে জানিতে পারিত, ইহাকে যে স্পর্শ করিতেছে সে কে এবং কি প্রকার স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপীষ্ঠা। ... ৪৪ আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ ? আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। ৪৫ তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে আসিয়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতেছে, ক্ষান্ত হয় নাই। তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভিষিক্ত করিলে না, ৪৬ কিন্তু এ সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছে। ৪৭ এই জন্য তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ, তাহার ক্ষমা হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। ৪৮ পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে। ৪৯ তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল, এ কে যে, পাপ ক্ষমাও করে ? ৫০ কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।"[৩৪৬]

যোহনের সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, তাহার নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী মার্থার গ্রামের লোক। ২ ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন, এবং আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন; তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত ছিলেন। ... ৫ যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন।"

যীশুর প্রেমকৃত এই মরিয়মই যীশুকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দেন এবং তার নিজের চুল দিয়ে তাঁর পদযুগল মুছে দেন।

যোহনের সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "২১ এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে। ২২ শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয় বলিলেন।

---

৩৪৬. বিশ্বাস ও অনুতাপ খুবই ভাল বিষয়, কিন্তু সেজন্য একজন নারী একজন যুবক ধর্মগুরুকে চুমু খাবে ? নিজের চুল দিয়ে পা মোছাবে ? এভাবে ধর্মের নামে বা পাইকারী ক্ষমার নামে নারীদেরকে প্রভাবিত করে কাছে আনার পরে কত রকমের অপরাধে যে ধর্মগুরু বা পুরোহিতরা জড়িয়ে পড়েন তা আমাদের অজানা নয়।

২৩ তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন.(there was leaning on Jesus bosom one of his deciples, whom Jesus loved) । ২৪ তখন শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে ? ২৫ তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে ? (He then lying on Jesus breast saith unto him, Lord, who is it?)

যীশুর এই শিষ্যের বিষয়ে বাইবেলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু তাকে 'প্রেম' করতেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে, ২০ অধ্যায়ের ২ আয়াতে এবং ২১ অধ্যায়ের ৭ ও ২১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু উক্ত শিষ্যকে 'প্রেম' করতেন।[৩৪৭]

লূকলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সেই বারো জন, ২ এবং যাঁহারা দুষ্ট আত্মা কিংবা রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলীনী নাম্নী মরিয়ম, যাহা হইতে সাতটি ভূত বাহির হইয়াছিল, ৩ যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী, এবং শোশন্না ও অন্য অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্যা করিতেন।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে আমরা দেখলাম যে, যীশু ও প্রেরিতগণ মদপানে এত বেশি অভ্যস্ত ছিলেন যে, মানুষেরা তাদেরকে মদ্যপ বলত। এছাড়া আমরা দেখলাম যে, যীশু ও প্রেরিতগণ নারী ও পুরুষদের সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এখন বাইবেলের আলোকে এরূপ আচরণের পরিণাম আলোচনা করব।

স্পষ্টতই মদ (দ্রাক্ষারস) সকল পাপের জননী এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য। মদ বিভ্রান্তি, অবিশ্বাস, ঈশ্বর-নিন্দা ও ধ্বংসের কারণ। পুণ্যবান ও ধার্মিকগণের জন্য মদপান উচিত নয়। মদপানকারী ভাববাদী হোন আর যেই হোন না কেন মদ তাকে মাতাল করে তার জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবেই। আর এজন্যই ঈশ্বর হারোণ ও তার সন্তানদের জন্য সমাগম তাম্বুতে প্রবেশের সময় মদপান করা নিষিদ্ধ ও অবৈধ

৩৪৭. এই প্রেমের সাথে উক্ত বসার পদ্ধতির সংযোগ করে খুব খারাপ অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কোলে হেলান দিয়ে বসা এবং বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলে বসা ইত্যাদি কর্ম থেকে সমকামিতার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা নোংরা অর্থ গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থকার পরে এদিকে ইঙ্গিত করবেন।

বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই অবৈধতার বিধান পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধান বলে ঘোষণা করেছেন।

লেবীয় পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে : "৮ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, ৯ তোমরা যেন মারা না পড়, এইজন্য যে সময়ে তুমি কিংবা তোমার পুত্রগণ সমাগত-তাম্বুতে (tabernacle of the congregation) প্রবেশ করিবে, তৎকালে দ্রাক্ষারস কি মদ্য (wine nor strong drink) পান করিও না; ইহা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।"

আর এজন্যই সদাপ্রভুর দূত (ফিরিশতা) সরা-নিবাসী মানোহ নামক ব্যক্তি স্ত্রীকে গর্ভকালীন সময়ে মদপান করতে এবং অন্য কোন প্রকারের মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন যেন গর্ভস্থ সন্তান পবিত্র ও ধার্মিক হয়, যেন মায়ের পান করা মদের অশুচিতা তার গর্ভস্থ সন্তানকে স্পর্শ না করে। এ বিষয়ে সদাপ্রভুর দূত এই মহিলাকে বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৪ অতএব সাবধান, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না (and drink not wine nor strong drink) এবং কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। ... ১৩ সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সেই সকল বিষয়ে সে সাবধান থাকুক। ১৪ সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে না, এবং কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যাহা কিছু আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।"

আর এজন্যই যখন প্রভুর দূত (ফিরিশতা) সখরিয়কে (যাকারিয়া আ) যোহন বাপ্তাইজকের (ইয়াহইয়া আ) জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন তখন তিনি যোহনের ধার্মিকতার গুণাবলি উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি কখনো মদ বা সুরা পান করবেন না। লূকলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৫ আয়াত নিম্নরূপ : "কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না।"

আর এজন্যই যিশাইয় ভাববাদী মদপানকারীদের নিন্দা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, ভাববাদিগণ ও যাজকগণ মদ ও সুরা পানের কারণে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত হয়েছেন। যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২২ আয়াত নিম্নরূপ : "ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর, আর সুরা মিশাইতে বলবান (Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink)।"

তাঁর পুস্তকের ২৮ অধ্যায়ের ৭ আয়াত নিম্নরূপ : "কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষারসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়াছে; যাজক ও ভাববাদী সুরাপানে ভ্রান্ত হইয়াছে; তাহারা দ্রাক্ষারসে কবলিত ও সুরাপানে টলটলায়মান হয়, তাহারা দর্শনে ভ্রান্ত ও

বিচারে বিচলিত হয় (But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment)।"

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে পাঠক দেখেছেন যে, মদপান করার কারণে নোহ মাতাল হয়ে যান এবং তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে লোট মদপানের ফলে মাতাল হয়ে যান এবং তার নিজ কন্যাদ্বয়ের সাথে এমন কর্মে লিপ্ত হন, যে কর্মে কোন পাড় মাতালও কখনো লিপ্ত হয়েছে বলে শোনা যায় না।

নিস্তারপর্বের পূর্বে যীশুর মদপান ও মাতলামির বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪ তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং নিজ পোশাকাদি খুলিয়া রাখিলেন আর একখানি গামছা লইয়া লুঙ্গির মত পরিধান করিলেন।[৩৪৮] ৫ পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, এবং যে গামছা তিনি পরিধান করিয়াছিলেন[৩৪৯] তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।"

যে সকল পাদরি মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করেন তাদেরকে নির্বাক করতে ইতোপূর্বে উল্লিখিত রসিক সাহিত্যিক আহমদ ফারিস শিদইয়াক–আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবন দান করুন–এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন : "এ কথা থেকে মনে হয়, যীশু এ সময়ে এমন মাতাল হয়েছিলেন যে, তিনি কি করছিলেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। কারণ পা ধোয়ানোর জন্য তো পোশাকাদি খুলে নগ্ন হওয়া লাগে না।"

ঈশ্বরের ভাববাদী ও প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী শলোমন তাঁর হিতোপদেশের ২৩ অধ্যায়ে বলেন : "৩১ দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ, যদিও উহা পাত্রে চক্‌মক্ করে, যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়; ৩২ অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায় দংশন করে।"

যুবতী বা পরিণত বয়সী নারীদের সাথে পুরুষদের একান্ত সংমিশ্রণও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদজনক বিষয়। বিশেষত এক্ষেত্রে পুরুষ যদি যুবক বা মধ্যবয়সী,

৩৪৮. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী বাইবেলের পাঠের অনুবাদ। ইংরেজীতেও এরূপই বলা হয়েছে : KJV : laid aside his garments; and took a towel, and girded himself. RSV : laid aside his garments; and girded himself with a towel. বাংলা বাইবেলে (কেরি) : উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন।

৩৪৯. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে (কেরি) : যে গামছা দ্বারা কটিবন্ধন করিয়াছিলেন।

অবিবাহিত ও মদ্যপ হন এবং মহিলা যদি ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়, যুবকের ভালবাসার পাত্র হয়, তার সাথে সর্বদা একত্রে চলাচল ও রাত্রিযাপন করতে থাকে এবং নিজের সম্পদ দিয়ে সদাসর্বদা এরূপ যুবকের সেবাযত্ন করতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার কোনই আশা থাকে না। পাঠক ইতোপূর্বে ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র ও ঈশ্বরের মাসীহ দায়ূদের অবস্থা দেখেছেন। একজন মহিলার প্রতি একবারের দৃষ্টি তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন বিবাহিত, তাঁর ঘরে ছিল অনেকগুলি সুন্দরী স্ত্রী এবং তাঁর বয়সও ৫০ পার হয়ে গিয়েছিল।

অনুরূপভাবে পাঠক শলোমনের অবস্থাও দেখেছেন। নারীরা কিভাবে তাঁর বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে ফেলে এবং তাঁকে ধর্মত্যাগী বানিয়ে ফেলে। যুবক বয়সে যিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন ধার্মিক ভাববাদী, তিনি বৃদ্ধ বয়সে ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেন।

এভাবে নারীদের সাথে সংমিশ্রণ ও পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করায় নারীদের প্রভাবের বিষয়ে শলোমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। এছাড়া পিতামাতা, ভাইবোনের ও পূর্বপুরুষদের ব্যভিচারের কাহিনীও তাঁর অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়। শলোমন ছিলেন উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবার সন্তান। নিজের পিতা ও মাতার ব্যভিচারের কাহিনী শলোমন জানতেন। অনুরূপভাবে নিজের বোন তামরের সাথে নিজের ভাই অম্মোনের ব্যভিচারের কথাও তিনি জানতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ যিহূদা-পুত্র রূবেণ যে তার পিতার স্ত্রী বিলহার সাথে ব্যভিচার করেছিল তাও তিনি জানতেন। অনুরূপভাবে যিহূদা নিজেও তাঁর পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এ সব ঘটনা নারী ও ব্যভিচারের বিষয়ে শলোমনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে জোরদার করেছিল যে, তিনি তাঁর হিতোপদেশে এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়াকড়ি করেছেন।

হিতোপদেশের ৫ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "২ নারীর ষড়যন্ত্রে কর্ণপাত করিও না।[৩৫০] ৩ কেননা বেগানা-অনাত্মীয় নারীর (strange woman)[৩৫১] ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার বাক্য তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ; ৪ কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত, দ্বিধার খড়গের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ৫ তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়, তাহার পদক্ষেপ পাতালে (নরকে: hell) পড়ে। ৬ সে জীবনের সমান পথ পায় না, তাহার পথ সকল চঞ্চল; সে কিছু জানে না। ৭ অতএব বৎসগণ, আমার কথা শুন, আমার মুখের বাক্য হইতে বিমুখ হইও না। ... ২০ বৎস, বেগানা-অনাত্মীয় নারীতে (strange woman)[৩৫২] কেন মোহিত হইবে? বিজাতীয়ার বক্ষ কেন আলিঙ্গন করিবে?"

---

৩৫০. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। বাংলা ও ইংরেজি বাইবেলে এই কথাটুকু নেই।

৩৫১. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি কিং জেমস ভার্সনেও strange woman বলা হয়েছে। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে strange woman বলা হয়েছে। বাংলায়: "পরকীয়া স্ত্রী" লেখা হয়েছে।

৩৫২. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। ইংরেজি কিং জেমস ভার্সনেও strange woman বলা হয়েছে। রিভাইজ্‌ড স্টান্ডার্ড ভার্সনে loose woman বলা হয়েছে।

এরপর তিনি ৬ অধ্যায়ে বলেন : "২৪ সে তোমাকে রক্ষা করিবে, দুষ্টা স্ত্রী (evil woman) হইতে, বিজাতীয়ার (strange woman) জিহ্বার চাটুবাদ হইতে। ২৫ তুমি হৃদয়ে উহার সৌন্দর্যে লুব্ধ হইও না, উহার আপাঙ্গ-ভঙ্গিতে ধৃত হইও না। ২৬ কেননা ব্যভিচারী নারীর মূল্য এক টুকরা রুটির পরিমাণ।[৩৫৩] পরস্ত্রী (the adulteress/a man's wife) [মনুষ্যের] মহামূল্য প্রাণ মৃগয়া (শিকার : hunt) করে। ২৭ কেহ যদি বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখে, তবে তাহার বস্ত্র কি পুড়িয়া যাইবে না? ২৮ কেহ যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া চলে, তবে তাহার পদতল কি দগ্ধ হইবে না? ২৯ তদ্রূপ যে প্রতিবাসীর স্ত্রীর কাছে গমন করে; যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত (নিরপরাধ : innocent) থাকিবে না।"

এরপর ৭ অধ্যায়ে তিনি পরস্ত্রী বা বেগানা রমণীর বিষয়ে বলেন : "২৪ এখন বৎসগণ, আমার বাক্য শুন, আমার মুখের কথায় অবধান কর। ২৫ তোমার চিত্ত উহার (নারীর : her) পথে না যাউক, তুমি উহার (নারীর : her) পথে ভ্রমণ করিও না, ২৬ কেননা সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে, তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল। ২৭ তাহার গৃহ পাতালের (নরকের : hell) পথ, যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।"

এরপর ২৩ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "৩৩ তোমার চক্ষু পরকীয়া স্ত্রীদিগকে (strange woman) দেখিবে, তোমার চিত্ত কুটিল কহিবে; ৩৪ তুমি তাহার তুল্য হইবে, যে সমুদ্রের মধ্যস্থলে শয়ন করে, যে মাস্তুলের উপরে শয়ন করে।"

কিশোর বা যুবকদের একান্ত সংমিশ্রণও নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলনের জন্য খুবই আশংকাজনক বিষয়। অনেক সময় তা পুরুষ-মহিলার সংমিশ্রণের চেয়েও খারাপ ফল বহন করে। উপরের বিষয়গুলির আলোকে আমি নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

আমরা দেখেছি যে, যীশু মদপান করতেন। তিনি এমনভাবে মদপান করতেন যে, তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা তাঁকে পেটুক ও মদ্যপ বলত। পাশাপাশি তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক। আমরা দেখেছি যে, মরিয়ম অশ্লীলতায় অভ্যস্ত নারী ছিল। তার পাপ ও অশ্লীলতা ছিল সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এরূপ একজন মহিলা যখন তার চোখের পানি দিয়ে যীশুর মত মদপানে অভ্যস্ত অবিবাহিত যুবকের পদযুগল ভিজিয়ে দিচ্ছিল, অনবরত তাঁর পদচুম্বন করেই যাচ্ছিল এবং তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পদযুগল

---

৩৫৩. গ্রন্থকার প্রদত্ত আরবী পাঠের অনুবাদ। সর্বশেষ ইংরেজি সংস্করণ (RSV) -এও এরূপই বলা হয়েছে : For a harlot may be hired for a loaf of bread পূর্বতন ইংরেজি সংস্করণ (KJV)-এ বলা হয়েছে : For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread । বাংলা বাইবেলের (কেরি) অনুবাদ : "কেননা বারাঙ্গনা (whorish woman) দ্বারা অন্নাভাব ঘটে।

মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনি কিভাবে তাঁর পূর্বপুরুষদের পদস্খলন ও উপদেশের কথা ভুলে গেলেন ? তাঁর পূর্বপুরুষ যিহূদা, দায়ূদ ও শলোমনের কথা তাঁর মনে পড়ল না ? কিভাবে তিনি নারীদের বিষয়ে শলোমনের উপদেশাবলি ভুলে গেলেন ? তিনি কিভাবে ভুলে গেলেন যে, এই নারীর মূল্য এক টুকরো রুটির সমতুল্য ? তিনি কিভাবে ভুলে গেলেন যে, যে তাকে স্পর্শ করে সে অদণ্ডিত বা নিরপরাধ থাকতে পারে না, যেমন কেউ বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখলে তার বস্ত্র না পুড়ে পারে না এবং কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে চললে তার পদতল দগ্ধ না হয়ে পারে না ?

তাহলে কিভাবে তিনি এই স্ত্রীকে এভাবে তাঁকে স্পর্শ করতে দিলেন যাতে শেষ পর্যন্ত ফরীশী এসে আপত্তি করল ? কিভাবে চিন্তা করা যায় যে, যীশু নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ও নারীর প্রতি নিজের আকর্ষণ মেটানোর জন্য এরূপ করেন নি? একজন অবিবাহিত অনাত্মীয় যুবককে অনবরত চুমু খাওয়া এবং তার পদযুগল নিজের চুল দিয়ে মুছে দেওয়া কতবড় পুণ্যের কাজ যে, তার বিনিময়ে এই পাপী মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো ? এই কি ন্যায়বিচার ঈশ্বরের পবিত্র মহান সত্তার প্রজ্ঞার প্রকাশ ? এরূপ করাই কি ঈশ্বরের জন্য সমীচীন ?

এজন্যই রসিক সাহিত্যিক ও সমালোচক আহমদ ফারিস শিদইয়াক বলেন : "এই মরিয়ম তখন ছিল একজন সুপরিচিতা বেশ্যা যাকে সবাই ইচ্ছা করলে ভোগ করতে পারত। এখন কল্পনা করুন, একজন সুপরিচিতা বেশ্যা, যে ইতোপূর্বে গোপনে বা প্রকাশ্যে অনুতাপ করেনি, তওবা করেনি বা তার পাপের পথ থেকে ফিরে আসেনি, এরূপ একজন বেশ্যাকে একজন খৃস্টান পাদরি বা বিশপ অনুমতি দিলেন যে, তিনি যখন তার কোন বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হবেন তখন সে উপস্থিত সকলের সামনে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দেবে। বিষয়টি কি খুব মানানসই হবে ?

"যীশু মরিয়মকে ভালবাসতেন বা প্রেম করতেন। এই প্রেমকৃত রমণী ও অন্যান্য অনেক নারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পথে পথে চলতেন ও রাত্রিযাপন করতেন। এ সকল রমণী তাদের সম্পদ দিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করত। তাহলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, এরূপ অবাধ সংমিশ্রণ, চলাচল ও রাত্রিযাপনের পরেও যীশু ও তাঁর প্রেরিতদের পদস্খলন হয় নি ? যেভাবে পদস্খলন ঘটেছিল রূবেণের, ফলে তিনি তার পিতার স্ত্রী বিলহার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন, পদস্খলন ঘটেছিল যিহূদার, ফলে তিনি পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং পদস্খলন ঘটেছিল দায়ূদের, ফলে তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।"

এজন্য পূর্বোক্ত রসিক সমালোচক (আহমদ ফারিস শিদইয়াক) বলেন : "এর চেয়েও অদ্ভুৎ বিষয় যা লূক উল্লেখ করেছেন। লূক উল্লেখ করেছেন যে, যীশু ও তাঁর

শিষ্যগণ তাদের সাথে মরিয়ম ও অন্যান্য কয়েকজন নারীকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। আর ব্যভিচার ও পাপের বিষয়ে মরিয়মের প্রসিদ্ধি ছিল সুপরিচিত। আপনি জানেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, মানুষেরা আলাদা আলাদা ঘরে পৃথকভাবে শয়ন করতে সক্ষম হন না বা এরূপ ব্যবস্থা বা প্রচলন নেই। এজন্য এ কথা নিশ্চিত যে, ঈশ্বরের এ সকল সাধু পুরুষেরা ঈশ্বরের এ সকল সাধু রমণীদের সাথে একই ঘরে শয়ন করতেন এবং রাত্রি যাপন করতেন।"

এক্ষেত্রে প্রেরিতগণের পদস্খলনের আশংকা অধিকতর। কারণ খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে তারা বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তাঁরা এ সময়ে ব্যভিচার থেকে মুক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা যায় না। পরবর্তী যুগের খৃস্টান সাধু, পাদরি ও বিশপগণের অবস্থা দেখলেই তা বুঝা যায়। ক্যাথলিক বিশপ, পুরোহিত (Deacons) কার্ডিনাল ও পাদরিগণের অনেকেই বিবাহ করতেন না। তাঁরা দাবি করতেন যে, অবিবাহিত থাকা জীবনকে পবিত্র ও যৌনতার কলুষমুক্ত রাখার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যা করতেন তা সর্বপ্রকার পাপের সুযোগপ্রাপ্ত ধনী বিলাসী পাপাচারীরাও করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাদের গীর্জাগুলি বেশ্যালয়ের মতই ব্যভিচারের কারখানায় পরিণত হয়েছিল।

প্রটেস্ট্যান্ট আরব ধর্মগুরু ইসহাক বরদকান সংকলিত 'আছ-ছালাছা আশরাতা রিসালা' (পুস্তিকা ত্রয়োদশ) গ্রন্থের ১৪৪ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পুস্তিকার মধ্যে বলা হয়েছে : "সাধু বার্নার্ডোস (St. Bernard Clairvaux, D. 1153) বলেন : তারা চার্চ থেকে পবিত্র ও সম্মানিত বিবাহ ও পাপমুক্ত শয়নকে বের করে দিয়েছে। আর এর ফলে তারা চার্চকে ব্যভিচার, সমকামিতা, মাতা ও ভগ্নিগণের সাথে যৌনতা এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নোংরামি দিয়ে ভরে ফেলেছে।"

পর্তুগালের সালভা অঞ্চলের বিশপ আলফারোয বিলাগিয়াস ১৩০০ খৃস্টাব্দে বলেছেন : হায়! যদি যাজকগণ অবিবাহিতভাবে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা না করতো তবে কতই না ভাল হতো! বিশেষত স্পেনের যাজকগণ। কারণ সে দেশে জনগণের বৈধ সন্তানের সংখ্যা যাজকদের অবৈধ সন্তানদের চেয়ে সংখ্যায় তেমন বেশি হবে না!

পঞ্চদশ শতকে অস্ট্রিয়ার সালযবুর্গের বিশপ যোহন লিখেছেন যে, "তিনি খুব কম যাজককেই পেয়েছেন, যারা মেয়েদের সাথে ভয়ঙ্করভাবে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত নয়। আর সন্ন্যাসিনীদের ধর্মাশ্রম বা মঠগুলি তো ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত বেশ্যালয়ের চেয়েও অপবিত্র।"

এ সকল বিশপ, কার্ডিনাল ও পুরোহিতদের নিষ্পাপতা ও পবিত্রতার বিষয়ে প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরুগণের এ সকল বক্তব্যই যথেষ্ট। কাজেই এর চেয়ে বেশি আর বলার দরকার নেই; বরং আমার মন্তব্য যে, এদের অবস্থা ভারতীয় ভণ্ড হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতই। এরা বিবাহকে তাদের সন্ন্যাসব্রত ও সাধনার জন্য বড় বাধা ও কঠিন অন্যায় বলে দাবি করেন। কিন্তু যৌনতা, ব্যভিচার ও অনাচারের ক্ষেত্রে তারা যত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে যায়, ততদূর ধনী, বিলাসী ও পাপাচারী মানুষেরা যেতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ল। একজন পথিক ভারতের এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামের নিকট যেয়ে তিনি এক যুবতী মেয়েকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। তিনি বলেন, মেয়ে, তুমি কি এ গ্রামের মেয়ে না এ গ্রামের বধু ? ঐ যুবতী পথিককে উত্তরে বলে, আমি এই গ্রামের মেয়ে, তবে খাহেশ মেটানোয় আমি এ গ্রামের বধুদের চেয়ে ভাল। স্বপ্নে তারা যা না পায় আমি তাও পাই।

এভাবেই বিবাহিতদের চেয়েও এ সকল অবিবাহিতের ভাগ্য অনেক প্রশস্ত। নাস্তিক বা খৃস্টধর্ম বিরোধী কেউ বলতে পারেন যে, যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ এ সকল মহিলার মাধ্যমে তাঁদের বিবাহের প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছেন। এজন্য যীশুর বিবাহের প্রয়োজন হয় নি এবং প্রেরিতগণের বিবাহের বা বহুবিবাহের প্রয়োজন হয় নি, ঠিক যেভাবে ক্যাথলিক বিশপ ও পুরোহিতগণের বিবাহের প্রয়োজন হয় না এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপভাবে যারা সমকামিতার পাপ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন তাদের দৃষ্টিতে যীশুর সাথে তাঁর প্রেমকৃত শিষ্যের আচরণ আপত্তিজনক। আমরা দেখেছি যে, সুসমাচার লেখক যোহন যীশুর প্রেমকৃত শিষ্যের বিষয়ে লিখেছেন : "তিনি যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে ? (He then lying on Jesus breast saith unto him, Lord, who is it?)"

এ কথার উপর মন্তব্য করে রসিক সমালোচক আহমদ ফারিস শিদইয়াক বলেন: "ঠিক যেভাবে রমণী তার প্রেমিককে আদর করে তার থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করে।"

সুপ্রিয় পাঠক! এখানে এই পঞ্চম বিষয়ের আলোচনায় যা কিছু লিখেছি সবই তর্কের খাতিরে লিখেছি। খৃস্টান পাদরিগণের ধর্মীয় উগ্রতা, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি বিষোদগারের প্রকৃতি ধরিয়ে দিতেই আমি এগুলি লিখেছি। আমি যীশু ও তাঁর সম্মানিত প্রেরিতদের বিষয়ে কখনোই এরূপ বিশ্বাস করি না। আমি এই গ্রন্থের ভূমিকায় এবং অন্যান্য স্থানে এ কথা উল্লেখ করেছি।

ষষ্ঠ বিষয় : ব্যক্তিগত শপথ ও শপথ ভঙ্গের ইসলামী বিধান

মারিয়া কিবতিয়াকে[৩৫৪] হারাম[৩৫৫] করার বিষয়টি শপথ ও শপথ থেকে বিমুক্ত হওয়ার[৩৫৬] বিষয় ইসলামী নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন।"[৩৫৭] এই আয়াতর ব্যাখ্যায় তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে : "স্ত্রী বা দাসী-স্ত্রীকে হারাম ঘোষণা করাও শপথের অন্তর্ভুক্ত।" মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, "আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করলাম।" এই কথাটি এই প্রকারের একটি ব্যক্তিগত শপথ।

সপ্তম বিষয় : বাইবেলের আলোকে ঈশ্বর বা ভাববাদিগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিবর্তন

যদি কোন ভাববাদী বলেন যে, আমি অমুক কাজ করব না, এরপর কাজটি মূলত বৈধ হওয়ার কারণে, অথবা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নির্দেশের কারণে যদি তিনি সেই কর্ম করেন, তবে তাকে পাপী বা অপরাধী বলা যায় না, বরং দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি কাজটি না করলেই তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে অবাধ্য ও অপরাধী বলতে হবে। ভাববাদিগণ তো দূরের কথা, স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বরই অনেক ক্ষেত্রে এরূপ

৩৫৪. হিজরী ৬ সালে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোম, পারস্য, বাহরাইন, মিসর, ইথিওপিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেন। মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার রোমান শাসনকর্তা মুকাওকিস তাঁর পত্র অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্য কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এর মধ্য ছিলেন 'মারিয়া' নাম্নী একজন দাসী। ৭ম হিজরী সালে এই হাদিয়া লাভের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে দাসী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ১৮/২০ মাস পরে ১০ হিজরীতে ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের প্রায় ৫ বছর পরে খলীফা উমরের সময়ে ১৬ হিজরীতে মারিয়া ইন্তেকাল করেন। বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৫৫. সূরা তাহরীমের ১ম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন ? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি মত মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন। কোন কোন তাবিঈ মুফাস্সির এখানে মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে জালালাইনে এই মতটিই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই মতটি কোন বিশুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয় নি। পক্ষান্তরে সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকজন স্ত্রীর কথায় তিনি আর কখনো মধু খাবেন না বলে শপথ করেন। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন।

৩৫৬. কোন শপথ যদি ব্যক্তিগত হয় এবং এর সাথে অন্য কারো অধিকার নষ্টের বিষয় সংযুক্ত না থাকে, তবে সেই শপথ থেকে বিমুক্ত হওয়ার জন্য ইসলামে ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৫৭. সূরা তাহরীম : ২ আয়াত।

করেছেন বলে খৃষ্টানদের পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম থেকে জানা যায়। এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করেছি। এগুলির পুনরাবৃত্তি বা নতুন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নতুন নিয়ম থেকে জানা যায় যে, যীশুও এরূপ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন কনানীয় স্ত্রীলোক এসে যীশুর কাছে তার ভূতগ্রস্ত কন্যাকে ভূতমুক্ত করার জন্য যীশুর দয়া প্রার্থনা করে। যীশু তাকে দয়া করতে অস্বীকার করেন। পরে মহিলার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যীশু তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তার কন্যার জন্য আশীর্বাদ করেন; ফলে কন্যা সুস্থ হয়ে যায়।[৩৫৮]

যোহনলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গালীলের কান্না নগরে এক বিবাহের অনুষ্ঠানে যীশুর মাতা তাঁকে অনুরোধ করেন জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করতে। যীশু প্রথমে অস্বীকার করে তাঁর মাতাকে বলেন, "হে নারী! আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি ? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" পরে তিনি কয়েক জালা জল দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেন।[৩৫৯]

অষ্টম বিষয় : আল্লাহ্‌র প্রিয়গণের জন্য বিশেষ বিধান

বাইবেলের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ বিশেষ কিছু বিধান দিতে পারেন যা সাধারণ বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য আমরা দেখি যে, সমাগত-তাম্বুর বিষয়ে হারোণের সন্তানদেরকে সদাপ্রভু অনেক বিশেষ বিধান প্রদান করেছেন, যেগুলি অন্যান্য ইস্রায়েলীয়ের ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, লেবীর অন্যান্য সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়।

বাইবেলীয় ঈশ্বরপুত্র ও ভাববাদিগণের কর্মের সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলির তুলনা

সম্মানিত পাঠক! উপরের আটটি বিষয় থেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে পাদরিগণের উত্থাপিত নারী বিষয়ক পাঁচটি অভিযোগেরই উত্তর আপনি জেনে গিয়েছেন। তবে এ সকল পরমত অসহিষ্ণু উগ্র ও ধর্মান্ধ পাদরিদের বিচারবুদ্ধি দেখে আমি সত্যিই হতবাক হয়ে যাই। তাঁরা যদি অন্যের ধর্মে এমন কিছু দেখতে পান যা তাঁদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে ভাল বলে গণ্য নয়, তবে তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে দেন যে, মহাপবিত্র মহাজ্ঞানী ঈশ্বর কখনো এরূপ বিধান দিতে পারেন না বা এরূপ বিধান বা এই বিষয় কখনো ঈশ্বরের পবিত্র ও প্রজ্ঞাময় সত্তার পক্ষ থেকে হতে

---

৩৫৮. মথি ১৫/২১-২৮।

৩৫৯. যোহন ২/১-১১।

পারে না। অথবা তাঁরা বলেন, এরূপ কর্ম কখনো কোন ভাববাদী বা নবীর দ্বারা হতে পারে না বা তা ভাববাদীর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু যদি তাঁদের ধর্মে এর চেয়েও জঘন্য কোন কিছু থাকে তবে তা তাঁদের মতে সন্দেহাতীতভাবে ঈশ্বরের বাক্য, মহাপ্রজ্ঞাময় মহাপবিত্র ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ভাববাদীর মর্যাদার জন্য খুবই সমীচীন বলে গণ্য।

এজন্যই তাঁদের মতে নিম্নের বিষয়গুলি সবই মহাপবিত্র মহাপ্রজ্ঞাময় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং ভাববাদিগণের মর্যাদার সাথে খুবই সুসমঞ্জস বলে বিবেচিত :

(১) সদাপ্রভু ঈশ্বর যিহিষ্কেল ভাববাদীকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, তিনি তাঁর বাম পার্শ্বের উপর ৩৯০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের পাপের কষ্ট বহন করবেন। অতঃপর তিনি ডান পার্শ্বের উপর ৪০ দিন শুয়ে থাকবেন এবং যিহূদীয়দের পাপ বহন করবেন।[৩৬০]

(২) তিনি তাঁকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, দীর্ঘ ৩৯০ দিন তিনি মানুষের মল দ্বারা পিঠা তৈরি করে তা ভক্ষণ করবেন।[৩৬১]

(৩) সদাপ্রভু ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি সজ্ঞানে সচেতন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিন বছর যাবত নিজের গুপ্তাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে বিবস্ত্র উলঙ্গ থাকবেন এবং এভাবেই তিনি নারী ও পুরুষদের মধ্যে চলাফেরা ও ভ্রমণ করবেন।[৩৬২]

(৪) সদাপ্রভু ঈশ্বর হোশেয় ভাববাদীকে নির্দেশ দিলেন একজন বেশ্যা-ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করার এবং ব্যভিচারের সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করার।[৩৬৩]

(৫) সদাপ্রভু ঈশ্বর এই ভাববাদীকেই আরো নির্দেশ দেন এমন একজন ব্যভিচারিণী মেয়ের সাথে প্রেম করতে, যার স্বামী আছে এবং স্বামী তাকে ভালবাসে, কিন্তু মেয়েটি ব্যভিচারিণী।[৩৬৪]

খৃস্টান পাদরিগণের মতে এগুলি সবই মহাপবিত্র মহাপ্রজ্ঞাময় ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক নির্দেশ এবং এ সকল মহান ভাববাদীর ভাববাদিত্বের মর্যাদার সাথে অত্যন্ত সুসমঞ্জস ও যৌক্তিক। তবে স্বামী কর্তৃক যয়নাবকে তালাক প্রদান এবং তালাক পরবর্তী ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল শেষ হওয়ার

---

৩৬০. যিহিষ্কেল ৪/৪-১২।

৩৬১. যিহিষ্কেল ৪/৪-১২।

৩৬২. যিশাইয় ২০/২-৪।

৩৬৩. হোশেয় ১/২-৩।

৩৬৪. হোশেয় ৩/১।

পর তাঁকে বিবাহ করার বিষয়ে মুহাম্মাদ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া কখনোই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হতে পারে না এবং তা মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়তের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না।

অনুরূপভাবে পাদরি মহোদয়গণের মতে নিম্নের কোন কর্মের জন্যই ঈশ্বরের পুত্রদের পুত্রত্ব বা ভাববাদিগণের ভাববাদিত্ব নষ্ট হয় নি :

(১) তোরাহ-এর সুস্পষ্ট বাণী অনুসারে যাকোব ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র।[৩৬৫] মামাতো বোন রাহেলকে প্রেম করায়, তাকে বিবাহ করার উদগ্র বাসনায় ১৪টি বছর তার পিতার সেবা করায়, একত্রে ৪টি স্ত্রী গ্রহণ করায় এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার কারণে তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা নষ্ট হয় নি বা তিনি ভাববাদিত্ব হারান নি।[৩৬৬]

(২) গীতসংহিতার সুস্পষ্ট বাণী অনুসারে দায়ূদ ঈশ্বরের আরেকজন প্রথমজাত পুত্র।[৩৬৭] উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের পূর্বেই একত্রে বহু স্ত্রীকে বিবাহ করায় এবং স্ত্রীগণের পাশাপাশি বহু সংখ্যক উপপত্নী গ্রহণ করায় তিনি ভাববাদিত্ব হারান নি বা তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ন হয় নি বরং এ সকল পত্নী ও উপপত্নী ঈশ্বরের সন্তুষ্টির দান ও উপহার বলে গণ্য হলো। এতগুলি পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণের ফলে দায়ূদের মর্যাদা এত বাড়ল যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে বললেন : "যদি এগুলি অল্প হয় তবে আমি এ সকল স্ত্রীর মত আরো স্ত্রী, এদের মত আরো স্ত্রী তোমাকে বৃদ্ধি করে দেব।" ঈশ্বর কোনভাবে বহুপত্নী গ্রহণের জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন না। কেবল উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় ও উরিয়কে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করায় তিনি দায়ূদকে তিরস্কার করলেন।[৩৬৮]

(৩) পবিত্র বাইবেলের সাক্ষ্য অনুসারে ঈশ্বরের আরেক পুত্র শলোমন।[৩৬৯] এক হাজার পত্নী ও উপপত্নী গ্রহণ করায় এবং শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে ঈশ্বর-নিন্দা ও প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হওয়ায় তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা (এবং ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার মর্যাদা) একটুও ক্ষুণ্ন হলো না বা তিনি ভাববাদিত্ব হারালেন না বরং তাঁর ভাববাদিত্ব চিরস্বীকৃত এবং তাঁর রচিত তিনটি পুস্তক : হিতোপদেশ, উপদেশক ও পরমগীত ঐশ্বরিক পুস্তক ও ঈশ্বরের বাণী হিসেবে চিরস্থায়ী মর্যাদা লাভ করল।

---

৩৬৫. যাত্রা পুস্তক ৪/২২।

৩৬৬. আদিপুস্তক ২৯/১৫-১৩।

৩৬৭. গীতসংহিতা ৮৮/২৭।

৩৬৮. তবে তিরস্কারেই শেষ, এজন্য ভাববাদিত্বের মর্যাদা নষ্ট হল না বা ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র হওয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো না বরং দায়ূদের রচিত গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী হিসেবেই মর্যাদা পেল।

৩৬৯. ২ শমূয়েল ৭/১৪।

(৪) লোট তাঁর কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা নষ্ট হলো না।

(৫) ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও তাঁর মহান শিষ্যগণ পাপী, দুশ্চরিত্রা ও বেশ্যা নারীকে প্রেম করলেন, আবার কোন কোন শিষ্যকেও প্রেম করলেন, এরূপ নারীদেরকে সাথে নিয়ে একত্রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন এবং রাত্রিযাপন করলেন, কিন্তু এজন্য তাঁর ভাববাদিত্বের মর্যাদা নষ্ট হলো না। এমনকি মদপান করে, যুবক বয়সে এভাবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও সংমিশ্রণের জন্য তাঁদেরকে কোন অভিযোগও করা হলো না।

এত কিছুর পরেও এ সকল ভাববাদীর ভাববাদিত্ব নষ্ট হলো না এবং তাঁরা ভাববাদিত্ব হারালেন না। কিন্তু বহু স্ত্রী গ্রহণ করার কারণে, যায়দের পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে শরীয়ত-সম্মতভাবে বিবাহ করার কারণে এবং তাঁর বৈধ দাসী-স্ত্রীকে হারাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে তা পরিবর্তন করার কারণে মুহাম্মাদ (সা) ভাববাদী হওয়ার যোগ্যতা হারালেন!

পাদরি মহোদয়গণের এরূপ বিবেচনার কারণ খুঁজতে যেয়ে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়ে। সম্ভবত পাদরি মহোদয়গণ মনে করেন যে, মুসলিমদের ঈশ্বর অকৃত্রিমভাবে এক। কোন দিক থেকে তাঁর সত্তার মধ্যে সংখ্যাধিক্যের কোন সুযোগ নেই। যৌক্তিক বা গাণিতিক দিক থেকে এখানে কোন গোজামিল নেই। কাজেই এই ঈশ্বরের পক্ষে কোন অযৌক্তিক বা অসমীচীন কাজ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পাদরি মহোদয়দের ঈশ্বর এক হলেও তাঁর একের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ তিনজন ঈশ্বর। ঈশ্বরসত্তার তিন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ঐশ্বরিক গুণাবলির পরিপূর্ণতায় ভূষিত এবং একে অপরের থেকে পরিপূর্ণভাবে ও প্রকৃতভাবে স্বতন্ত্র। এই পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ ঐশ্বরিক গুণাবলির অধিকারী সম্পূর্ণ পৃথক তিন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এক ঈশ্বরের পক্ষে অশোভন বা অশালীন কাজ করায় কোন অসুবিধা নেই (মূল ঐশ্বরিক সত্তাই যেহেতু অযৌক্তিকতার সমন্বয়, সেহেতু তাঁর জন্য অযৌক্তিক কাজ করাতে অসুবিধা নেই)।

প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের অর্থই সংখ্যাধিক্য। পাদরিগণ যদিও সংখ্যাধিক্য স্বীকার করেন না, তবে তিনজন ঐশ্বরিক সত্তা একে অপরের থেকে প্রকৃতভাবে স্বতন্ত্র বলে দাবি করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক এ বিষয়ে জেনেছেন। এজন্য হয়তবা পাদরিগণ বিশ্বাস করেন যে, মুসলিমদের ঈশ্বরের চেয়ে খৃস্টানদের ঈশ্বর অধিক শক্তিশালী। কারণ একের চেয়ে তিন তো অধিক, কাজেই তিনজন পরিপূর্ণ ঈশ্বরের সমন্বয়ে গঠিত ঈশ্বর অবশ্যই একক ব্যক্তিত্ব ও সত্তার অধিকারী ঈশ্বরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

অথবা তাঁরা হয়ত মনে করেন যে, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদী হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিমাপূজা, প্রতিমার জন্য উৎসর্গ, চুরি,

ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা, ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলা, ঈশ্বরের ভাববাণী প্রচারের নামে মিথ্যা বলা ইত্যাদি সকল প্রকার পাপই ভাববাদীদের পক্ষে করা সম্ভব। এগুলির কারণে ভাববাদিত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু মুসলিমদের ভাববাদীর তো এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য মুসলিমদের ভাববাদীর ক্ষেত্রে তাঁরা অতিরিক্ত সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেন।

অথবা হয়ত তাঁরা মনে করেন যে, যাকোব, দায়ূদ, শলোমন এবং যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। কাজেই তাঁদের অধিকার ছিল তাঁদের পিতার রাজত্বে যা ইচ্ছা তাই করবেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সা) ঈশ্বরের বান্দা এবং একজন বান্দার পুত্র। কাজেই তিনি তো তাঁর প্রভুর রাজত্বে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না।

এরূপ নোংরা চিন্তা, পরধর্ম বিদ্বেষ ও অন্ধ গোঁড়ামি থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি।

চতুর্থ অভিযোগ : মুহাম্মাদ (সা)-এর পাপ ও শাফা'আত বিষয়ক

পাদরিগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সা) পাপী ছিলেন এবং কোন পাপী অন্য পাপীদের জন্য সুপারিশ বা শাফা'আত করতে পারেন না।

এই দাবির প্রথম অংশ, মুহাম্মাদ (সা)-এর পাপী হওয়ার বিষয়ে তাঁরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। সূরা মুমিনে বলা হয়েছে : "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার পাপের (ত্রুটির) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"৩৭০

সূরা মুহাম্মাদে বলা হয়েছে : "সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য।"৩৭১

সূরা ফাত্হে রয়েছে : "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষৎ পাপসমূহ (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করেন।"৩৭২

হাদীসে রয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলতেন : "অতএব আপনি ক্ষমা করুন আমার জন্য আমি আগে যা করেছি এবং আমি পরে যা করেছি, আমি গোপনে যা করেছি এবং প্রকাশ্যে যা করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভাল জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।"

অন্যান্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ ধরনের বাক্যের মাধ্যমে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

---

৩৭০. সূরা মুমিন (গাফির) : ৫৫ আয়াত।
৩৭১. সূরা মুহাম্মাদ : ১৯ আয়াত।
৩৭২. সূরা ফাতহ : ১-২ আয়াত।

অভিযোগের উত্তর

এই অভিযোগটি দুটি দাবির সমন্বয়ে গঠিত : প্রথম দাবি : মুহাম্মাদ (সা) পাপী ছিলেন এবং দ্বিতীয় দাবি : কোন পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারেন না। এই দুটি দাবিই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কাজেই এই দুই মিথ্যার ভিত্তিতে যা প্রমাণ করা হয়েছে তা স্বভাবতই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এই দাবিদ্বয়ের ভিত্তিহীনতা প্রমাণের জন্য ভূমিকা হিসেবে আমি পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করব :

প্রথম বিষয় : স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির বিনয় প্রকাশের ভাষার আক্ষরিক ও প্রায়োগিক অর্থ

মহান আল্লাহ্ প্রভু, পালনকর্তা ও স্রষ্টা। সকল সৃষ্টজগত তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত। মহান স্রষ্টা যখন তাঁর কোন সৃষ্টিকে সম্বোধন করেন তখন তাঁর সম্বোধনের মধ্যে মালিকসুলভ নির্দেশনা থাকাই স্বাভাবিক। অপরদিকে বান্দা যখন তার প্রভুকে সম্বোধন করবে বা প্রভুর বিষয়ে কথা বলবে তখন তার মধ্যে চূড়ান্ত বিনয় ও আকুতি থাকতে হবে। নবী বা ভাববাদিগণ ছিলেন আল্লাহ্র অত্যন্ত অনুগত বান্দা। কাজেই তাঁদের কথার মধ্যে এই বিনয়, আকুতি ও সমর্পণ সবচেয়ে বেশি থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই এ সকল ক্ষেত্রে সকল বক্তব্যকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করলে তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তির জন্ম দেবে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের অগণিত বক্তব্য তা প্রমাণ করে। আমি এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

(১) মার্কলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে এবং লূক লিখিত সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ে[৩৭৩] রয়েছে : "১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক জন দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্গুরু (Good Master) : অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব ? ১৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর (Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God।" মার্কের ভাষ্য অনুসারে বক্তব্য এখানেই শেষ।[৩৭৪]

এখানে যীশু স্বীকার করলেন যে, তিনি সৎ ছিলেন না এবং একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউই সৎ নয়।

(২) গীতসংহিতার ২২ গীতে রয়েছে : "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ? আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক ? ২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না; রাত্রিতে [ডাকি], আমার বিরাম হয় না।"

---

৩৭৩. লূকের ১৮ অধ্যায়ের ১৮ ও ১৯ আয়াত।

৩৭৪. লূকের ভাষ্যও প্রায় একই।

ত্রিত্ববাদী খৃস্টান পণ্ডিতগণের মতানুসারে এই বক্তব্য মূলত যীশুর। তাঁদের মতে যীশুই এ কথা বলেছেন।

(৩) মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৪৬ আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, 'এলী, এলী, লামা শবক্তানী,' অর্থাৎ 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? (My God, my God, why hast thou forsaken me?)"

(৪) মার্কের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে : "৪: তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম (baptism of repentance for the remission for sins) প্রচার করিতে লাগিলেন। ৫ তাহাতে সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া (confessing their sins) যর্দন নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। ... ৯ সেই সময়ে যীশু গালীলের নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের দ্বারা যর্দনে বাপ্তাইজিত হইলেন।"

এখানে আমরা দেখছি যে, যোহন বাপ্তাইজকের বাপ্তাইজ ছিল তাওবা (মন পরিবর্তন) ও পাপমোচনের জন্য। মার্ক সে কথা ৪ ও ৫ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন।

লূকলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ : "তাহাতে তিনি যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন (Preaching the baptism of repentance for the remission of sins)।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে রয়েছে : "আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের (repentance আরবীতে তওবার) নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি।"

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১৩ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে রয়েছে : "তাঁহার আগমনের অগ্রে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল-জাতির কাছে মন পরিবর্তনের (তওবার) বাপ্তিস্ম প্রচার করিয়াছিলেন।"

প্রেরিতগণের কার্যবিবরনের ১৯ অধ্যায়ের ৪ আয়াতে রয়েছে : "পৌল কহিলেন, যোহন মন পরিবর্তনের(তওবার) বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ করিতেন।"

উপরের আয়াতগুলি সবগুলিই প্রমাণ করে যে, যোহন বাপ্তাইজকের বাপ্তিস্ম ছিল পাপমোচনের জন্য তওবার বা অনুতাপের বাপ্তিস্ম। আর যীশু এই বাপ্তিস্ম গ্রহণ

করেছিলেন বলে স্বীকার করার অর্থই যে যীশু নিজের পাপ স্বীকার করে তওবা ও পাপমোচনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এ ছাড়া যোহনের বাপ্তিস্মের মৌলিক আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

মথির সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে : "আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি (forgive us our debts, as we forgive our debtors); আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।[৩৭৫]

এ কথা স্পষ্ট যে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি সে প্রার্থনা নিজেও পালন করতেন। কারণ দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, তিনি বেশি বেশি প্রার্থনা করতেন। আর বাইবেলের কোন বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁর শেখানো এই প্রার্থনাটি বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রার্থনা করতেন। কাজেই বাহ্যত বুঝা যায় যে, 'আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর' বলে তিনি বহুবার প্রার্থনা করতেন। হাজার হাজার বার তিনি এভাবে প্রার্থনা করেছেন বলেই বুঝা যায়।

ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ ভাববাদিগণের জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত মনে করেন না। তাঁদের মতে ভাববাদী পাপ করতে পারেন বা পাপী ভাববাদী হতে পারেন। তবে তাঁরা যীশুর ক্ষেত্রে নিষ্পাপত্বের দাবি করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, মানবীয় ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও যীশু নিষ্পাপ ছিলেন।[৩৭৬] তাদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু সৎ ছিলেন, ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন, ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, যীশু বলেছেন :

(১) আমাকে সৎ কেন বলিতেছ....

(২) ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?

(৩) আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক ?

(৪) আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না।

(৫) যোহনের কাছে পাপ স্বীকার করে পাপমোচন ও তাওবার বাপ্তিস্ম গ্রহণ

(৬) আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।

---

৩৭৫. মথি ৬/১২-১৩।

৩৭৬. তা কি করে হয়! ধর্মের বা জন্মের কারণে পরজাতির মানুষদেরকে কুকুর বলা, অকারণে সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটি বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলা, ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষকে শয়তান বলা বা অনুরূপ গালি দেওয়া ইত্যাদি কর্ম তো বাহ্যত পাপ ও অপরাধ বলেই গণ্য।

ত্রিত্ববাদী খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করবেন যে, যীশুর এ সকল বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না; বরং এগুলিকে বিনয় ও দাসত্বের প্রকাশ হিসেবে ধরতে হবে। তাঁরা যদি এ সকল বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাঁদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, যীশু সৎ ছিলেন না, তিনি ঈশ্বর-পরিত্যক্ত ছিলেন, তিনি মুক্তি থেকে দূরে ছিলেন, ঈশ্বর তাঁর ডাকে সাড়া দিতেন না বা তাঁর প্রার্থনা কবুল করতেন না, তিনি পাপী ছিলেন। তাঁরা যেহেতু তা স্বীকার করবেন না, সেহেতু তাঁরা বলতে বাধ্য হবেন যে, যীশুর মানবীয় সত্তা ঈশ্বরের প্রতি দাসত্বের প্রকাশ, আকুতি ও বিনয় হিসেবে এ সকল কথা বলেছেন।

গীতসংহিতার ৫৩ গীতে রয়েছে : "২ ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কিনা, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। ৩ সকলে বিপথে গিয়াছে, একসঙ্গে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই, একজনও নাই।"

যিশাইয়র পুস্তকের ৫৯ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ধার্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ, অন্ধকার; আলোকের অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি। ... ১২ কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম অনেক হইয়াছে, আমাদের পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে; ফলে আমাদের অধর্ম সকল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, আর আমরা আপনাদের অপরাধ সকল জানি; ১৩ তাহা অধর্ম ও সদাপ্রভুকে অস্বীকার, আপন ঈশ্বরের অনুগমন হইতে বিমুখ হওয়া, উপদ্রবের ও বিদ্রোহের কথাবার্তা, মিথ্যা কথা গর্ভে ধারণ ও হৃদয় হইতে বাহির করণ।"

যিশাইয়র পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ে রয়েছে : ৬ আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। ৭ আবার, কেহ তোমার নামে ডাকে না, তোমাকে ধরিতে উৎসুক হয় না; কেননা তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছ, আমাদের অপরাধের হস্তে আমাদিগকে গলিয়া যাইতে দিতেছ।"

নিঃসন্দেহে দায়ূদের যুগে অনেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ বিদ্যমান ছিলেন। নাথন ভাববাদী তাঁদের একজন। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের মতে ভাববাদিগণের জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়। তাদের এই বিশ্বাস অনুসারে যদি মনে করা হয় যে, নাথন ভাববাদীও নিষ্পাপ ছিলেন না, তবুও তো অন্তত ৫৩ গীতের ৩ আয়াতের আক্ষরিক অর্থ তাঁর ও তাঁর মত ধার্মিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্যে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ

যিশাইয় ভাববাদী নিজের ও অন্যান্য মানুষদের কথা এখানে বলেছেন। আমরা জানি যে, যিশাইয় ভাববাদী, তাঁর যুগের অন্যান্য ভাববাদী এবং অন্যান্য অনেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ সে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা নিষ্পাপ না হলেও অন্তত এ কথা নিশ্চিত যে, যিশাইয়র উপর্যুক্ত বক্তব্যদ্বয়ের আক্ষরিক অর্থ তাঁদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই গীতসংহিতার উপর্যুক্ত বক্তব্য এবং যিশাইয় ভাববাদীর উপর্যুক্ত বক্তব্যদ্বয় কখনোই বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে সত্য হতে পারে না বা আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে সেগুলিকে দায়ূদ, নাথন, যিশাইয় ও অন্যান্য ভাববাদীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। বরং এ কথা মানতে হবে যে, বান্দার আকুতি, স্রষ্টার প্রতি তার অসহায়ত্ব, দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশই এ সকল বাক্যের উদ্দেশ্য।

দানিয়েলের পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে[৩৭৭], যিরমিয়ের বিলাপের ৩ ও ৫ অধ্যায়ে[৩৭৮] এবং পিতরের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়েও[৩৭৯] অনুরূপ বক্তব্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিষয় : ভাববাদিগণের কথা ও কর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুসারীদেরকে শিক্ষা প্রদান

অনেক সময় ভাববাদিগণের কর্মের মূল উদ্দেশ্য হয় উম্মত বা অনুসারীদের শিক্ষা দান করা যেন তারা ভাববাদীদের এ সকল কর্ম ও কথা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। বস্তুত নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন না থাকলেও এভাবে এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেক কর্ম করেন।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যীশু ৪০ দিবারাত্র সিয়াম পালন করেন (চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন)।[৩৮০]

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ : "পরে অতি প্রত্যূষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ১৬ আয়াত নিম্নরূপ : "কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ১২ আয়াত নিম্নরূপ : "সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির হইয়া পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।"

---

৩৭৭. দানিয়েল ৯/৩-১৯।

৩৭৮. বিলাপ ৩/১-৪৭৬; ৫/১-২২।

৩৭৯. ১ পিতর ৪/১-৪।

৩৮০. মথি ৪/২।

ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশুর সত্তার সাথে ঈশ্বরের সত্তা মিশ্রিত ও একীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং যীশু ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) ছিলেন। কাজেই তাঁর জন্য তো এভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও আকুতি প্রকাশ করে রাতের পর রাত কাটানোর কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঈশ্বর তো তাঁর সত্তার সাথে মিশেই আছেন, আবার নির্জনে যেয়ে প্রার্থনা করার বা উপবাস করার কী প্রয়োজন ? এভাবে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, অনুসারী ও বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এরূপ করেছিলেন।

তৃতীয় বিষয় : ধর্মীয় শব্দাবলির আভিধানিক অর্থ বনাম পারিভাষিক অর্থ

ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে যথাসম্ভব ধর্মীয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। একান্ত কোন কারণে বাধ্য না হলে কোন ধর্মীয় শব্দকে সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির জন্ম নেবে। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, নিকাহ, তালাক ইত্যাদি শব্দ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত হলে অবশ্যই ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। 'যান্‌ব' (পাপ) শব্দটিও একটি ধর্মীয় পরিভাষা। কুরআন বা হাদীসে এই শব্দটি ব্যবহৃত হলে তাকে অবশ্যই ইসলামী পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় 'যান্‌ব' বা পাপ শব্দটি ভাববাদিগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় 'ভুল' বা 'স্খলন'। যদি কোন ভাববাদী বা নিষ্পাপ ব্যক্তি কোন ইবাদত পালন করতে যেয়ে বা কোন বৈধ কর্ম করতে যেয়ে অসাবধানতায়, অজান্তে বা অজ্ঞাতসারে উক্ত ইবাদত বা বৈধ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত একটি পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন তবে তাকে 'ভুল' বা 'স্খলন' বলা হয় এবং ইসলামী পরিভাষায় নবীদের ক্ষেত্রে 'যান্‌ব' বা পাপ বলতে এরূপ ভুল বা স্খলন বুঝানো হয়। যেমন একজন পথচারীর উদ্দেশ্য পথ ধরে চলে নিজের গন্তব্যে পৌঁছনো। তবে রাস্তার কাদা, পাথর বা অনুরূপ কিছুর কারণে তার পাা পিছলে যেতে পারে বা তিনি হোঁচট খেতে পারেন। এছাড়া নবী বা ভাববাদিগণের ক্ষেত্রে 'যান্‌ব' বা পাপ বললে অনেক সময় উত্তম কর্মটি না করে অনুত্তম বৈধ কর্ম করা বুঝানো হয়।

চতুর্থ বিষয় : আল্লাহ্ ও ভাববাদিগণের বাক্যে রূপক অর্থের ব্যবহার

আল্লাহ্‌র বাণীতে বা ঐশ্বরিক গ্রন্থাবলিতে এবং ভাববাদিগণের কথাবার্তার মধ্যে রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার ব্যাপক। চতুর্থ অধ্যায়ের ভূমিকায় পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনেছেন। কাজেই এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এছাড়া ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৪র্থ বিভ্রান্তির উত্তরে পাঠক জেনেছেন যে, 'মুযাফ' উহ্য রাখা, অর্থাৎ সম্পর্কিত প্রকৃত ব্যক্তিকে উহ্য রেখে অন্যের দিকে সম্পর্ক করে শব্দ ব্যবহার করা বাইবেলের পুস্তকাবলিতে ব্যাপক।

পঞ্চম বিষয় : শুধু আরাধনা ও দাসত্ব প্রকাশই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হতে পারে

প্রার্থনার উদ্দেশ্যে শুধু প্রার্থিত বস্তু চাওয়াই নয়, অনেক সময় প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি নিশ্চিত থাকলেও বা প্রার্থিত বস্তুর প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকলেও কেবল দাসত্ব প্রকাশ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। যেমন কুরআনে নিম্নের প্রার্থনাটি উল্লেখ করা হয়েছে : "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও।"[৩৮১] আল্লাহ্ যা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার প্রাপ্তি তো নিশ্চিত। কারণ আল্লাহ্ তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কাজেই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত বিষয় পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রার্থনার মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।

অন্যত্র নিম্নের প্রার্থনাটি উল্লেখ করা হয়েছে : "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও।"[৩৮২] আমরা জানি যে, আল্লাহ্ কখনোই ন্যায় ছাড়া অন্যায় বিচার করেন না। তারপরও এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রকাশ ও ইবাদত করা।

মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ

সম্মানিত পাঠক!

উপরের পাঁচটি বিষয় আলোচনার পরে আমি এখন পাদরিগণের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করব।

আমরা দেখেছি যে, পাদরিগণের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে 'ক্ষমা প্রার্থনা'-র কথা বলা হয়েছে। এ সকল স্থানে মূল আরবীতে 'ইসতিগফার' বা 'গুফরান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী 'গুফরান' শব্দের অর্থ আচ্ছাদন করা, আবরণ করা বা আবৃত করা।[৩৮৩] সাধারণভাবে কোন খারাপ কিছুকে আবৃত বা গোপন করে রাখাকে গুফরান বলা হয়। আর 'ইসতিগফার' অর্থ এই 'গুফরান' প্রার্থনা করা। কোন ব্যক্তির ত্রুটি, পাপ বা খারাপ দিক আবৃত করা দুভাবে সম্ভব :

প্রথমত, তাকে ত্রুটি, পাপ বা খারাপ কিছু থেকে রক্ষা করা বা নির্ভুল ও নিষ্পাপ হিসেবে তাকে রক্ষা করা। কারণ ত্রুটি ও পাপ থেকে রক্ষা করে নিষ্পাপ রাখার অর্থ

---

৩৮১. সূরা আলে-ইমরান : ১৯৪ আয়াত।

৩৮২. সূরা আনবিয়া : ১১২ আয়াত।

৩৮৩. আরবীতে 'গাফারা' অর্থ আবৃত করা। এজন্যই মাথায় যে হেলমেট পরা হয় তাকে 'মিগফার' বলা হয়; কারণ তা মাথা আবৃত করে রাখে।

মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির খারাপ দিক আবৃত ও গোপন রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা।[৩৮৪]

দ্বিতীয়ত, তার থেকে ত্রুটি, পাপ বা খারাপ কিছু সংঘটিত হয়ে গেলে তা আবৃত করা।

'গুফরান' ও 'ইসতিগফারের' উপর্যুক্ত দুটি দিকের আলোকে এখন আমরা আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করব :

প্রথম আয়াতে, অর্থাৎ সূরা মু'মিনের ৫৫ আয়াতে, আল্লাহ্ বলেছেন : "তুমি তোমার পাপের জন্য 'গুফরান' অর্থাৎ আবরণ, আচ্ছাদন বা আবৃতি (ক্ষমা) প্রার্থনা কর।" এবং দ্বিতীয় আয়াতে, অর্থাৎ সূরা মুহাম্মাদের ১৯ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন : "আবরণ, আচ্ছাদন বা আবৃতি (ক্ষমা) প্রার্থনা কর তোমার জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য।"

এই দুই স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষেত্রে আবরণ বা আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনার কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে :

(১) এ স্থানদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষেত্রে আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা বা নিষ্পাপত্ব প্রার্থনা করা। অর্থাৎ তোমার পাপ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে, বা তোমার থেকে প্রার্থনার অর্থ তাদের থেকে পাপ সংঘটিত হলে তার জন্য আবৃতি বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) তাঁর 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : "এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিনটি অবস্থা : আল্লাহ্র সাথে তাঁর অবস্থা, নিজের সাথে তাঁর অবস্থা এবং অন্যান্যদের সাথে তাঁর অবস্থা। আল্লাহ্ সাথে তাঁর অবস্থার করণীয় আল্লাহ্র একত্ব ঘোষণা করা। তাঁর নিজের সাথে তাঁর করণীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছ সংরক্ষণ প্রার্থনা করা। আর মুমিনদের সাথে তাঁর অবস্থা এই যে, তিনি সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।"

(২) অথবা উপর্যুক্ত দুই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদানের অর্থ এভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশ করা ও ইবাদত পালন করা। প্রকৃতই যে তাঁর পাপ ছিল বা তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তা নয়, বরং

---

৩৮৪. 'ক্ষমা' অর্থও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাকে পাপ থেকে রক্ষা করা হলো, তাকে মূলত পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়ার কষ্ট, লাঞ্ছনা বা অসম্মান থেকে ক্ষমা করা হলো। যেমন আমরা অনেক সময় বলি, ক্ষমা করুন, এমন কাজ করতে আমাকে বলবেন না।

একান্তই দাসত্ব প্রকাশের জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন : "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও।" অন্যত্র প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন : "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও।" পঞ্চম বিষয়ের আলাচনায় পাঠক তা দেখছেন।

(৩) অথবা এই দুই স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্য উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়া। উম্মতের সকলেই যেন তাঁর এই প্রার্থনা অনুকরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এজন্যই তিনি এরূপ করতে নির্দেশিত হয়েছেন। তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর উম্মত যেন তাঁর আদর্শ অনুকরণ করতে পারে সেজন্য তিনি এরূপ করেছেন।"

(৪) অথবা এই দুই আয়াতেই 'তোমার পাপ' বলতে 'তোমার উম্মতের পাপ' বা 'তোমার বংশধরের পাপ' বুঝানো হয়েছে। মূল সম্পর্কিত শব্দকে উহ্য রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য কোন শব্দকে সম্পর্কিত হিসেবে উল্লেখ করা আরবী, হিব্রু ইত্যাদি সেমিটিক ভাষাগুলিতে ব্যাপক। চতুর্থ বিষয়ের আলোচনায় পাঠক জেনেছেন যে, এরূপ ব্যবহার বাইবেলের পুস্তকাদিতে ব্যাপক।[৩৮৫] এ ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম আয়াতের অর্থ : "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার উম্মতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর... ।"

আর এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ : "সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার বংশধর পরিজনের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের জন্য যারা তোমার বংশধর বা পরিজন নয়।" পরিবারের সসদ্যদের বিশেষভাবে উল্লেখের পরে সাধারণ মুমিন নর-নারীদের কথা উল্লেখ করা কোন অবাক বিষয় নয়।

(৫) অথবা আয়াতদ্বয়ে 'যান্‌ব' বা 'পাপ' বলতে 'ত্রুটি', 'স্খলন' বা 'উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করা' বুঝানো হয়েছে।

---

৩৮৫. যেমন : "অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন; যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল।" গীতসংহিতা : ৭৮/২১। "যাকোবকে অভিশাপে ও ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সমর্পণ করিলাম।" যিশাইয় ৪৩/২৮। এখানে যাকোব বা ইস্রায়েল বলতে যাকোবের বংশধর বা ইস্রায়েল সন্তানগণ বুঝানো হয়েছে। এরূপ অগণিত উদাহরণ বাইবেলে রয়েছে।

কোন কোন প্রিয়জন ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, বার্ধক্যে উপনীত জনৈক প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত[৩৮৬] তাঁর নতুন এক গ্রন্থে এই পঞ্চম ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন : "যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, উত্তম বিষয় পরিত্যাগ ছাড়া মুহাম্মাদ (সা) কোন পাপ করেন নি, তাহলেও মুহাম্মাদ (সা) পাপী ছিলেন বলে প্রমাণিত হলো। কারণ উত্তম বিষয় বর্জন করাও পাপ। আল্লাহ্র কালাম, অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল একথার সাক্ষ্য দেয়। যাকোব তাঁর পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলেছেন : "বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম করিতে জানে, অথচ না করে, তাহার পাপ হয় (to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin)।"

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তব্য তাঁর বার্ধক্যজনিত প্রলাপ বৈ কিছুই নয়। কারণ নিঃসন্দেহে মদপান ত্যাগ করা উত্তম কর্ম। এজন্যই ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে মদপান না করার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এছাড়া ভাববাদিগণও মদের বিষয়ে কি বলেছেন তা আমরা দেখেছি। অনুরূপভাবে নিঃসন্দেহে একজন সুপরিচিত বেশ্যাকে নিজের পদযুগল ধৌত করতে এবং নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিতে সুযোগ না দেওয়াই উত্তম। এছাড়া এরূপ যুবতী অনাত্মীয় পরনারীদের সাথে একান্ত ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা, চলাফেরা, মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো ও রাত্রি যাপন না করাই উত্তম। বিশেষত অবিবাহিত যুবক পুরুষের জন্য তা করা কখনোই

---

৩৮৬. গ্রন্থকারের বংশধরের নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত বলতে গ্রন্থকার ড.ফান্ডারকেই বুঝাচ্ছেন। ১৮৫৪ সালে আগ্রার প্রকাশ্য বিতর্কে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ্র কাছে পরাজিত হওয়ার পরে ভারতের খৃস্টানদের নিকট মি. ফান্ডারের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইউরোপে ফিরে যান। কিছুদিন পরে চার্চ তাঁকে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য তুরস্কে প্রেরণ করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তুরস্কে গমন করেন। তথায় তিনি প্রচার করেন যে, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ আলিম রাহমাতুল্লাহকে বিতর্কে পরাজিত করে এসেছেন এবং ভারতের মুসলিমগণ দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তুর্কি খলীফার আহ্বানে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে (১২৮০ হিজরীর রজব মাসে) শাইখ রাহমাতুল্লাহ্ তুরস্কে পৌছান। তাঁর তুরস্কে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে ড. ফান্ডার সবার অগোচরে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। দু'বছর পরে ১৮৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ্ ১৮৬৪ সালের প্রথমার্ধে 'ইযহারুল হক' পুস্তকটি রচনা করেন। তখনও মি. ফান্ডার জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'মীযানুল হক' গ্রন্থটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করে তুরস্কে প্রচার করেছিলেন। গ্রন্থকার একাধিক স্থানে এই সংস্করণকে 'নতুন' সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তুর্কি ভাষা জানতেন না। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন বন্ধুর নিকট থেকে এই তথ্যগুলি তিনি জেনেছেন, সরাসরি পুস্তক পাঠ করে জানেন নি। এজন্যই তিনি সরাসরি তাঁর নাম উল্লেখ এড়িয়ে গিয়েছেন।

সমীচীন নয়। যীশু এই উত্তম কর্মগুলির কোনটিই করেন নি বরং অনুত্তম কর্মগুলিই করেছেন। এমনকি এজন্য মানুষেরা তাঁকে নিন্দাও করেছে। তৃতীয় অভিযোগের উত্তম আলোচনায় পাঠক এ সব বিষয় বিস্তারিত জেনেছেন। তাহলে এই প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের মতানুসারে তাঁর ঈশ্বর স্বয়ং যীশুও পাপী ছিলেন, কারণ তিনি উত্তম বিষয় বর্জন করে অনুত্তম কর্ম করেছিলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এই পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম তাওরাত ও ইঞ্জিল এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তিনি 'তাওরাত' কথাটি এখানে সংযোগ করেছেন। মূলত তাওরাতে এ কথা নেই। তিনি যাকোবের পত্র ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এই বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারেন নি।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোকে প্রমাণিত যে, যাকোবের পত্রটি ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ নয় এবং নতুন নিয়মের অংশ নয়। বিশেষত প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মি. লুথার এই পত্রের গ্রহণযোগ্যতা কঠিনভাবে অস্বীকার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক তা জেনেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল পণ্ডিতের গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকে যাকোবের পত্রটি আদৌ আল্লাহ্‌র কালাম নয়। কাজেই নিঃসন্দেহে পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তব্য একেবারেই বাতিল ও অর্থহীন।

তৃতীয় আয়াত, অর্থাৎ সূরা ফাতহের ২ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন : "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপসমূহ মার্জনা করেন।"

এখানে সম্পর্কিত মূল শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ তোমার পাপসমূহ বলতে তোমার উম্মতের পাপসমূহ বুঝানো হয়েছে অথবা পাপ বলতে উত্তম বিষয় পরিত্যাগ বুঝানো হয়েছে অথবা মার্জনা বা ক্ষমা করা বলতে পাপ থেকে সংরক্ষণ বা নিষ্পাপ থাকার ক্ষমতা প্রদান করা বুঝানো হয়েছে।

ইমাম সুবকী ও ইবনু আতিয়্যাহ বলেন : "এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বারা প্রকৃতই কোন পাপ সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা ক্ষমা করলেন বরং এ আয়াতের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ (নসা)-এর মর্যাদা ঘোষণা করা এবং সম্মাননা প্রদান করা। এ সূরার প্রথম থেকেই আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছেন। এজন্য প্রথমেই তাঁকে সুস্পষ্ট বিজয় দানের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন যে, এই বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমা, তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পূর্ণ করণ, তাঁকে সরল পথে পরিচালনা করা এবং তাঁকে বলিষ্ঠ সাহায্য প্রদান করা। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া বুঝাতে গেলে মূল বক্তব্যের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক গতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। পুরো বক্তব্যের

উদ্দেশ্য তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা। যেমন মনিব তার চাকরের উপর সন্তুষ্ট হলে তার কোন অপরাধ না থাকলেও বলতে পারেন, "আমি তোমার আগে পিছের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম (তোমার সাত খুন মাফ); কোন অপরাধের জন্যই আমি তোমাকে শাস্তি দেব না।"

হাদীসে উল্লিখিত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রার্থনাটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

(১) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আল্লাহ্র সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত বান্দা এবং আল্লাহ্র বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পূর্ণতমভাবে তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তর সর্বদা তাঁর প্রভু প্রতিপালকের স্মরণে এবং তাঁরই প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে চাইত। অন্য সকল কিছুর চিন্তা থেকে মনকে পরিপূর্ণভাবে খালি করে নিজের সম্পূর্ণ দেহ, মন, আবেগ ও অনুভূতি আল্লাহ্র প্রতি সমর্পণ করে তাঁরই স্মরণ ও প্রার্থনায় থাকতে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। এ ছিল তাঁর সর্বোচ্চ অবস্থা । কিন্তু কখনো কখনো স্বাভাবিক প্রয়োজনে ধর্মীয় ও জাগতিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোনিবেশ করতে হতো। এরূপ মনোনিবেশ মূলত কোন অন্যায় না হলেও তিনি একে নিজের পূর্ণতার জন্য ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতেন। এজন্য তিনি এরূপ ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং সর্বোচ্চ অবস্থার প্রার্থনা করতেন। নিজের সর্বোচ্চ অবস্থার ত্রুটি হচ্ছে দেখে অতি প্রয়োজনে জাগতিক বা সামাজিক বিষয়ের দিকে মনোনিবেশও তিনি নিজের জন্য পাপ বলে গণ্য করতেন এবং এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা জরুরী মনে করতেন।

(২) এছাড়া দাসত্বের প্রকাশ তো প্রার্থনাতেই (আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার দাসত্ব ও প্রেমের মধুর সম্পর্ক যারা না বোঝে তারাই শুধু মনে করে যে, পাপ হলেই শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। পাপ হোক আর না হোক, কি জানি কি ত্রুটি হয়ে গেল, হয়তবা মালিকের সঠিক মর্যাদা রক্ষা করতে ভুল হয়ে গিয়েছে, হয়তবা মালিকের স্মরণ থেকে বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলাম, একথা ভেবে ক্ষমা চাওয়া এবং নিজের অসহায়ত্ব ও প্রভুর অনুগ্রহ লাভের আবেগ প্রকাশে রয়েছে অতুলনীয় আত্মিক তৃপ্তি ও উন্নতি। এ হলো দাসত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ)। দাসত্বের এই বিনয় প্রকাশের জন্যই যীশু নিজের জন্য 'সততা'-কে অস্বীকার করেছেন। তিনি ব্যাপ্তিস্মের সময় পাপের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি'আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর' বলে বারংবার প্রার্থনা করেছেন। এই দাসত্বের প্রকাশের জন্যই তিনি বলেছেন : "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?" তিনি আরো বলেছেন : "আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক?" "আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না" ইত্যাদি।

(৩) ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রার্থনা অনেক সময় একান্ত ইবাদত

হিসেবেই করা হয়। প্রার্থিত বিষয় অর্জনের জন্য নয়, কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশ করা ও ইবাদত পালন করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হয়। এমনও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যও ছিল এরূপ ইবাদত পালন।

(৪) আরেকটি জোরালো সম্ভাবনা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যেন উম্মত তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরিপূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে।

(৫) আরেকটি জোরালো সম্ভাবনা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুটিনাটি ত্রুটি বা স্খলনের জন্য এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তৃতীয় বিষয়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নবীগণের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি ও 'স্খলন'ও পাপ বলে গণ্য। আর এজন্য তিনি অতি সাধারণ ভুলত্রুটি বা উত্তম বর্জনের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।[৩৮৭]

উপরের পাঁচটি ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই জোরালো এবং গ্রহণযোগ্য। কোন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কিছু নেই। যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই উপরের পাঁচটি ব্যাখ্যার সবগুলো বা কয়েকটি প্রযোজ্য।

এভাবে আমরা দেখছি যে, পাদরিগণের উদ্ধৃত আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণ করা যায় না যে,রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন পাপ করেছিলেন বা তিনি পাপী ছিলেন।[৩৮৮] এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাঁদের এই অভিযোগের-প্রথম ভিত্তিটি মিথ্যা ও বাতিল।

তাঁদের এই অভিযোগের দ্বিতীয় দাবি যে, কোন পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারে না। তাঁদের এই দাবিটিও মিথ্যা। তাঁদের এই দাবির ভিত্তি কী? কোন একটি ভিত্তির উপরে তাঁদের এই দাবিকে দাঁড় করাতে হবে। হয় তাঁরা তাঁদের দাবির ভিত্তি রাখবেন তাঁদের মনগড়া কোন তত্ত্বের উপর, অথবা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির

৩৮৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামান্যতম ত্রুটিকেও 'পাপ' বলে গণ্য করে তাওবা করতেন। কাউকে গালি দিলে বা কারো প্রতি একটি কঠোর কথা বললে তা তিনি নিজের জন্য অপরাধ মনে করে তাওবা করতেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও ক্ষমা চাইতেন। এ হলো মানবতার চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহ্র প্রতি বিনয় ও সমর্পণের সর্বোচ্চ পর্যায়। পক্ষান্তরে বাইবেলের যীশু মানুষকে যাচ্ছে-তাই গালি দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অথবা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান নি।

৩৮৮. বাইবেলীয় ভাববাদিগণ ও ঈশ্বরের পুত্রগণ সম্পর্কে বাইবেলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা অমুক অমুক পাপের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে এমন কোন প্রমাণ পাদরিগণ কখনোই দেখাতে পারেন না। কুরআনের আয়াত বা কোন হাদীস দ্বারা তাঁরা সুনির্ধারিতভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না যে, মুহাম্মাদ (সা) অমুক পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন।

উপর অথবা বাইবেলের কোন বক্তব্যের উপর। যদি তাঁদের দাবির ভিত্তি হয় তাঁদের অযৌক্তিক মনগড়া কোন তত্ত্ব তাহলে এরূপ তত্ত্বের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ এরূপ অনেক অর্থহীন গোলকধাঁধার ন্যায় অযৌক্তিক মনগড়া তত্ত্ব বানিয়ে ছেন যেগুলি আলোচনারও যোগ্যতা রাখে না। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পাঠক এ বিষয়ে কিছু জেনেছেন।

আর যদি তাঁদের এই দাবির ভিত্তি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি হয় তবে তাঁরা সে যুক্তি পেশ করুন, আমরা বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তা বিচার করব। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, তাঁদের পক্ষে এমন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করা কখনোই সম্ভব নয়। কোন পাপী মানুষকে যদি আল্লাহ্ সরাসরি ক্ষমা করে দেন এবং এরপর অন্যান্য মানুষদের বিষয়ে তার সুপারিশ গ্রহণ করেন তবে যুক্তি ও বিবেকের দাবি তো এই যে, কোন পাপ বা অপরাধ যতক্ষণ ক্ষমা না হয় ততক্ষণ তা অন্যায় ও খারাপ বলে গণ্য। পাপের ক্ষমা হয়ে যাওয়ার পরে তো আর পাপীকে সেই পাপের কারণে খারাপ বা অপরাধী বলা যায় না। কাজেই ক্ষমা লাভের পরে অকল্যাণ অপসারিত ও দূরীভূত হয়ে যায়।

পাদরিগণ তাঁদের বাতিল কল্পনার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ (সা)-এর পাপের প্রমাণ হিসেবে সূরা ফাতহের যে আয়াত উল্লেখ করেছেন সে আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে : "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপসমূহ (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করেন।" আর মুহাম্মাদ (সা)-এর অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ এই পৃথিবীতেই ক্ষমাকৃত হওয়ার পরে তো আর পরকালে অন্যান্য পাপীর জন্য সুপারিশ বা শাফা'আত করতে তাঁর কোন অসুবিধা থাকে না।

আর পাদরিগণ যদি দাবি করেন যে, বাইবেলের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না, তবে নিঃসন্দেহে তাঁদের এই দাবি মিথ্যা। বাইবেলের কোথাও এরূপ কোন কথা বলা হয় নি বরং বাইবেল থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক পাপী অন্য পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারেন এবং ঈশ্বর সেই সুপারিশ গ্রহণও করেন।

ইস্রায়েল সন্তানগণ যখন গোবৎস পূজা করলেন, তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের সকলকেই ধ্বংস ও সংহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য সুপারিশ করেন। এতে ঈশ্বর সে সুপারিশ গ্রহণ করেন ও ইস্রায়েলীয়দের সংহার করা থেকে ক্ষান্ত হন।[৩৮৯] যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯০]

---

৩৮৯. ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলে মোশির পাপের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। আর ঈশ্বর এই পাপী মোশির সুপারিশ গ্রহণ করলেন। অনুরূপভাবে হারোণের গোবৎস পূজা ও অন্যান্য পাপের কথা বাইবেলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অথচ তাঁর সুপারিশও ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন বলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব।

৩৯০. যাত্রা পুস্তক ৩২/৭-১৪।

এরপর ঈশ্বর মোশিকে ও ইস্রায়েল সন্তানগণকে কেনান দেশে প্রবেশের নির্দেশ দেন, কিন্তু ঈশ্বর নিজে তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন : "... দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমার মধ্যবর্তী হইয়া যাইব না; কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; পাছে পথের মধ্যে তোমাকে সংহার করি (I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people : lest I consume thee in the way)।" তখন মোশি সদাপ্রভুর কাছে সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশের কারণে ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং ইস্রায়েলীদের সঙ্গী হতে রাজি হন। যাত্রা পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯১]

এরপর আরেকবার ইস্রায়েলীয়গণ পাপ ও অবাধ্যতায় নিপতিত হলে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের সকলকে এক নিমিষে সংহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন মোশি ও হারোণ তাদের জন্য সুপারিশ করেন। ঈশ্বর তাঁদের দুজনের সুপারিশ গ্রহণ করেন। অন্য আরেক ঘটনায় ইস্রায়েলীয়গণ অবাধ্যতা করলে সদাপ্রভু ঈশ্বর জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করেন। তারা লোকদেরকে দংশন করলে ইস্রায়েলের অনেক লোক মারা যায়। তখন মোশি লোকদের জন্য সদাপ্রভুর নিকট সুপারিশ করেন। সদাপ্রভু মোশির সুপারিশ গ্রহণ করে ইস্রায়েলীয়দের বাঁচার ব্যবস্থা করেন। গণনা পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে এবং ২১ অধ্যায়ের এ সকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯২]

কাজেই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা কোন দিক থেকেই মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক পাপীদের জন্য সুপারিশ করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে প্রশংসিত সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন, যে মর্যাদা দানের জন্য আপনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। আর পুনরুত্থানের দিবসে তাঁর সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য আমাদের প্রদান করুন।

এই অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।

আমি এই পুস্তকটি রচনা শুরু করি ১২৮০ হিজরীর রজব মাসের ১৬ তারিখে (১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের২৬/২৭ তারিখে)। আমি পুস্তকটি রচনা সমাপ্ত করি এ বছরেরই যুলহাজ্জ মাসের শেষে (২৯/১২/১২৮০ হি মোতাবেক ৪/৬/১৮৬৪ খৃ)।[৩৯৩] জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

---

৩৯১. যাত্রা পুস্তক ৩৩/১-৩; ১২-২৩।

৩৯২. গণনা পুস্তক ১৬/২০-২৪ ও ৪১-৫০; ২১/৪-৯।

৩৯৩. অর্থাৎ গ্রন্থকার মাত্র ১৬০/১৬১ দিনে বা সাড়ে পাঁচ মাসেরও কম সময়ে পুস্তকটি রচনা করেন। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৫ মাসের সাথে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরের ৫/৬ দিন এবং ১৮৬৪ সালের জুন মাসের ৪/৫ দিন।

আরবী বর্ণের সংখ্যা মানের হিসাব অনুসারে এই পুস্তকের রচনাকাল ১২৮০ সালের জন্য নিম্নের বাক্যটি প্রযোজ্য : "তায়ীদুল হাক্ক বিরাহ্‌মাতিল্লাহ্‌' আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সত্যের সাহায্য' : ১২৮০।[৩৯৪]

আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি সেই হিংসুক থেকে, সমাবেশ-বৈঠকে যার একমাত্র পাওনা নিন্দা ও লাঞ্ছনা, ফিরিশতাদের নিকট থেকে যার একমাত্র পাওনা অভিশাপ ও ঘৃণা, সৃষ্টির নিকট থেকে যার একমাত্র পাওনা দুশ্চিন্তা ও ভয়, মৃত্যুর সময় তার একমাত্র পাওনা যন্ত্রণা ও কষ্ট এবং পুনরুত্থানের দিবসে যার একমাত্র পাওনা কেলেঙ্কারি ও শাস্তি। আমি আমার সকল বিষয় সমর্পণ করছি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছে। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আমি আকুতি ও সমর্পণের সাথে বলছি :

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج
رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه ج وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا
اَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكفِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।"[৩৯৫]

---

৩৯৪. *প্রাচীন* আরব, ইহুদী ও অন্যান্য *সেমিটিক* জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে আরবী বর্ণমালার বর্ণগুলির সংখ্যামান রয়েছে; আলিফের মান ১, বা-এর মান ২, জীমের মান ৩, দালের মান ৪... ইত্যাদি। এরূপ হিসাব করে গ্রন্থকার উল্লিখিত 'তায়ীদুল হাক্ক বিরাহ্‌মাতিল্লাহ্‌' বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণগুলির সংখ্যামান যোগ করলে যোগফল হয় ১২৮০।

৩৯৫. সূরা বাকারা : ২৮৬ আয়াত।

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অ: স:/৪৬৭১-৩২৫০